# দেশে দেশে চলি উড়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই মাঘ, ১৩৬১

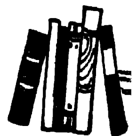
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৬৩

ছয় টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জাঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



আমাদের ১৯৫৩ সালের বিশ্বভ্রমণ সার্থক হয়েছে যাঁদের প্রসাদে—যাঁদের নামগুণগান এ বইটিতে থাকলেও যথেষ্ট করা হয়নি—তাঁদের হাতেই দিলাম এ-উপহার :

ডাক্তার মহম্মদ আবদুল রাউফ, শ্রীনায়াব, রিরি নাকায়ামা, ডাক্তার চার্লস মুর, ডাক্তার স্পীগেলবার্গ, স্টিফেন শোয়েবেল, ডাক্তার হরিদাস চৌধুরী, রুডল্ফ শেফার, আজিম হুসেন, ডেভিড হাণ্টার, মারিয়ো ভেলেজ, অলিভ পাওয়েল, জে. ম্যাকবলো, স্বামী অশোকানন্দ, মার্শাল কেম্পার, ওয়াল্ট্ পেজ, স্বামী প্রভবানন্দ, অলডাস হাক্সলি, জেরাল্ড্ হার্ড, ক্রিস্টফার ইশারুড, ফ্রাংক্লিন উল্ফ্, জন টমাস, আর্থার লাল, রিচার্ড মিলার, জোসেফ ক্যাম্পবেল, লেসলি পাফরথ, ইউজিন এক্মান, টম পাওয়ার্স, জোসেফ হাইল, স্বামী নিখিলানন্দ, ননীগোপাল বসু, ডেভিড ডানলপ, পীটার চক, অরিন্দম, বার্টরাণ্ড রাসেল, আলান কোহেন, জ্যোতি মল্লিক, বিনোদ মোদি, শাহেদ, এবেরার, ওয়াল্দ্স্মিৎ, মোহান্তি, বিনয়রঞ্জন সেন, জানোলি, ভ্লাদিমির ভানেক, মাগুইদ, সেমেদা, কার্মেলো, কে. বি. ট্যাণ্ডন, শ্রীমতী নাওমি সাগাওয়া, শ্রীমতী সুমি হানায়াগি, মিস মড ওক্স্, মিসেস লী টমাস, মিসেস মিরিয়াম ওয়াটারম্যান, শ্রীমতী বীণা চৌধুরী, মিসেস ক্রে, মিসেস এলেন প্লানটিফ, মিস এরিকা আণ্ডার্সন, মিসেস হেড্‌বিগ হামিল্টন, মিস মারিতা, মিস নাতাশা রামবোভা, মিস রুথ সেণ্ট ডেনিস, মিস রুথ রিঙ্গার, মিসেস লেওনাইন ফেরহেল, মিসেস মুরিয়েল নন্দা, ডোরিস, মাদাম আনিয়া তাইয়ার, মাদাম জানোলি, মাদাম আনালিসা, মাদমোয়াসেল মিরা, মাদাম মিরিয়াম সমেরবুর্গ, মাদাম মিলড্রেড ডিলিং, মিসেস জে. হারিসন।

মাদ্রাজ
১৩ মার্চ্চ, ১৯৫৪

কৃতজ্ঞ
শ্রীদিলীপকুমার রায়



# ভূমিকা

কবি শেক্ষপীয়র বলেছেন—পড়েছিলাম সে কবে:

How much a duffer that has been taught to roam
Excels a duffer that has been kept at home!

যে-বোকাকে হ'ল শেখানো উড়িতে দেশে দেশে মেলি' পাখা,
তার চেয়ে কত বেশি বোকা—যাকে গৃহে হ'ল ধ'রে রাখা!

যুক্তি দিয়ে এ-রায়টিকে নামঞ্জুর করা যায়—কার কোন্ রায়কেই বা না যায়? কিন্তু আবার মঞ্জুর করবার স্বপক্ষেও সুযুক্তি পেশ করা যায় এই ব'লে যে, স্বদেশে স্বগৃহেই যার চিরস্থিতি সে দেশান্তরে না যাওয়ার দরুন স্বদেশ বা স্বগৃহের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হ'য়ে উঠতে পারে না।

এর কাটান্ যুক্তি এই যে, এমনো হ'য়ে থাকে অনেক সময়েই—যেমন ধরা যাক বিখ্যাত "আমেরিকান টুরিস্টের" বেলা—যিনি দেশে দেশে হাজার ঘুরে হাজার ঠেকেও কিছুই শিখলেন না, ঘরে ফিরে শুধু—দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—কবুল করলেন: "যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চ'টে ম'টেই তো—তা নৈলে, বুঝলে কি না?—হ্যাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো!"

কিন্তু এমনটা এ-দিনদুনিয়ার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটলেও খতিয়ে বলা চলে—ইনি অঘটনই বটেন। গেটে বলতেন একটি চমৎকার কথা—কত চমৎকার কথাই না তিনি ব'লে গেছেন:

Wer fremde Sprache nicht kennt,
weiszt nichts von seiner einigen.

অর্থাৎ

মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা শেখে নি কভু যে হায়,
জানে না সে তার আপন ভাষারো মহিমা রস কোথায়।

খুঁজলে এ-কথার বিপক্ষেও যুক্তি মিলবে। কিন্তু তর্কাতর্কির ঝাঁজ ছেড়ে যদি শান্ত মনে বিচার করা যায় তাহ'লে বোধ হয় মন এ-কথায় সায় দিতে আপত্তি

করে না যে, নানা দেশের মতিগতি তথা নানা ভাষার রীতি-নীতি জানলে কুফলের চেয়ে সুফল ফলার সম্ভাবনাই বেশি।

এই ধরনের মনোভাব-উদ্বুদ্ধ হ'য়েই যে সর্বদা গৃহপ্রিয় মানুষ পরিব্রাজক হ'ন এ-কথা বলি না, কিন্তু এ-কথা বোধহয় বলা চলে যে এ-যুগের একটি প্রধান বাণী—ঘরের বাইরে যারা তারা পর নয়, তাই বাইরেকে যতটা পারি জানতে চাওয়া, বুঝতে শেখা বাঞ্ছনীয়। এ-বাণীতে আমাদের মন যদি সাড়া না দিত তবে ভ্রমণের হাজারো অসুবিধা ঝামেলা ঝকমারি সইত কোন্ "বোকা"?

না, ভ্রমণের স্বপক্ষে ওকালতি করতেই এ-ভূমিকার অবতারণা নয়। আমি বলতে চাইছি এই কথা যে, পঁচিশ বৎসর বাদে ফের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম একটি পুরোনো সত্য নতুন ক'রে: যে, একদিকে যেমন বিদেশকে স্বদেশ থেকে যে-চোখে দেখি বিদেশে গেলে দেখি সে ঠিক তা নয়, পক্ষান্তরে স্বদেশকে ঘরে ব'সে যে-চোখে দেখি বিদেশে গেলে আর তাকে সে-চোখে দেখা যায় না—যেতে পারে না।

আমেরিকা সম্বন্ধে ও আমাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেব। আমেরিকা সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছিলাম! কিন্তু গিয়ে দেখলাম যে, অনেক শোনা-কথা যেমন সত্য হ'লেও ঠিক সে-ভাবে সত্য নয় যে-ভাবে আমেরিকান সভ্যতাকে কল্পনা করেছিলাম, ঠিক তেমনি ওদের দেশের সভ্যতার পাশাপাশি আমাদের দেশের সভ্যতাকে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, আগে তেমন ক'রে দেখি নি। দেখলাম—আমাদের দেশ যদিও দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, নিয়তি-নিপীড়িত, তবু সে এমন একটা মহিমায় মহিমময় যে-মহিমা অন্য কোনো দেশে দেখতে পাই নি। সে-মহিমার পরম স্বরূপ—ধর্ম। ধর্ম বলতে ঠিক কী বুঝছি দুকথায় বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া হাজার বললেও যাঁরা ধর্মকে মনে করেন সেকেলে কুসংস্কার তাঁদের মন কিছুতেই নেবে না যে ধর্মপ্রাণ হওয়া ভালো হ'তে পারে। কিন্তু তবু বলবই বলব যে, বহু গ্লানি মালিন্য দৈন্য সত্ত্বেও ভারত শুধু যে আজো ধর্মপ্রাণ তাই নয়, এই আস্তিক্যই তাকে ধারণ ক'রে আছে। আমার এ-দেখার খবর আমি সাধ্যমত কিছু দিতে চেষ্টা করেছি এ-বইটিতে। কিন্তু তবু যদি না পেরে থাকি তাই একবার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না আরো এইজন্যে যে, এ আমার একার দেখা নয়

—আমার শিষ্যা ইন্দিরাও দেখতে পেয়েছে ভারতের এ-মহিমা—যে-আবিষ্কারের কথা সে বলেছিল আমেরিকায় তার নানা বক্তৃতায় তথা কথালাপে। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছিলাম আমেরিকায়, কেন না দেখা তার স্বধর্ম।

দেশে ফিরে এবৎসর প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ তীর্থোৎসব দেখে আমি আরো বুঝতে পারি ভারতের এ-মহিমা। কুম্ভমেলা সম্বন্ধে যে বইটি লিখছি তাতে সাধ্যমত গুছিয়ে বলবার প্রয়াস পাব—কেন ধর্মপ্রাণতার বীজ যুগে যুগে ভারতের মাটিতে ও আবহে প্রেম তথা ধ্যানফলপ্রসূ হ'য়ে এসেছে যার ফলে ভারত বলতে পেরেছে এমন অসমসাহসিক কথা যে, ভগবান্ যে ভগবান্ তিনিও পরাধীন, এক ভক্তই স্বাধীন: ভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ বলেছেন দুর্বাসাকে: "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!"

জানি এযুগে এধরনের কথায় অনেকেই রাগ করেন, বলেন—দেশভক্তির ফেরে পড়লে মানুষ এই ধরনের অত্যুক্তিই করে। যাঁদের এমন কথা মনে হয় তাঁদের তৃপ্তি দিতে পারবে না আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে" কি "কুম্ভমেলা-প্রসঙ্গে"। যত দিন যায় ততই মানুষ উপলব্ধি করে একটি কথা: যে, মনের কথা বলতে চাইলেও বলতে পারা যায় শুধু তাদের কাছে যাদের নাম—দরদী।

পরিশেষে এ-বিশ্বভ্রমণ-উপলক্ষে এই দরদীদের নমস্কার করছি যাঁদের দেখা পেয়েছিলাম বিদেশে—যাঁদের প্রীতি শ্রদ্ধা মৈত্রীর আলোয় অনেক কিছু দেখতে পেয়েছি স্পষ্ট ক'রে যা ঝাপসাই থেকে যেত তাঁদের দেখা না মিললে। এঁদেরই উৎসর্গ করেছি এ-বইটি, ঋণ শোধ করতে নয়—স্বীকার করতে। ইতি।

১০ই মার্চ, ১৯৫৪

মান্দ্রাজ।

## দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

অল্পদিনের মধ্যেই "দেশে দেশে চলি উড়ে"-র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে কিছু যোগ ক'রে দিলাম—বিশেষ ক'রে কয়েকটি চিঠি, যেগুলি মনে হ'ল অনেকের কাছেই চিত্তাকর্ষক মনে হবে। এ-সংস্করণের প্রুফ দেখে দিয়েছেন আমার পরম স্নেহভাজন ও সুগায়ক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। এজন্যে তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী।

# উপক্রমণিকা

ভাগবতে আছে নারদকে ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিলেন : "যাযাবর্ হও।" "দি ওয়াণ্ডারিং জু" ব'লে একটা কথা বাইব্লের সময় থেকে কালাপানির ওপারের লোকেরা শুনে আসছে। "কপালং কপালং কপালং মূলম্" ব'লে একটা সংস্কৃত প্রবাদও না শুনেছে কে ? তাই উনিশ শো সাতাশ সালে য়ুরোপযাত্রার পথে দিলীপকুমার যখন স্থাণুধর্মী হ'তে চেয়ে ফিরে এলেন আশ্রমবাসী হ'তে, তখন মহাকাল নিশ্চয় অলক্ষ্যে মুচকে হেসেছিলেন তাঁর নিরাকার ওষ্ঠাধরে। পরিণাম—এ-চির ভ্রাম্যমাণের পুনরায় স্থিতি ছেড়ে গতির চরণে আত্মসমর্পণ—ফের স্থরু হওয়া ভ্রমণ—৮ই জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে, নিশুত রাতে যাকে বলে—এবং সে কী সাহসিক ভ্রমণ দৈত্যপ্রতিম প্যান-আমেরিকান গগন-গরুড়ের ডানায় ! রোমহর্ষক নয় ?

কিন্তু স্থরুরও আগে থাকে উপক্রমণিকা—যাকে সাহেব-পুরাণে বলে প্রোলোগ। বৎসরাধিক আগে একদিন কন্যোপমা শিষ্যা ইন্দিরার একটি দর্শন হয়। তিনি দেখেন আমি আমেরিকায় একটি প্রকাণ্ড হলে বক্তৃতা করছি—বহু শ্রোতা—অগণ্য দীপমালা ইত্যাদি। দর্শনান্তে ধ্যানভঙ্গের পরে শিষ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : "গুরু ! তোমাকে যেতেই হবে আমেরিকা। বিধিলিপি।"

"বলো কি বৎসে ! অমন অলুক্ষুণে কথা !"

"ভবিতব্য। তাছাড়া অলুক্ষুণে কেন ? যখন বিধিলিপি ?"

কিন্তু নানা তকরারের পর স্থির করলাম ইন্দিরার দর্শন ভ্রান্ত। কারণ ১৯২৭-এ আমার আমেরিকা-প্রয়াণ যখন বিধিলিপির চেয়েও অবধারিত থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয় নি সে-দেশে—যখন বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে এক জাহাজে আসন পেয়েও টিকিট না কিনে "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে ঘরের ছেলে এলাম ঘরে ফিরে—তখন কেমন ক'রে মানা যেতে পারে যে এবার ( যখন আমেরিকা যাত্রার না ছিল সঙ্কল্প, না পাথেয় ) অনিশ্চিতের ললাটে বিধি লিপিবদ্ধ করবেন এ হেন অকল্পনীয় নিশ্চিতকে ? ইন্দিরা হার মানল না তবু—বলল : "আচ্ছা, দেখো !"

অতঃপর আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ—"আমেরিকান আকাডেমি অফ এশিয়ান স্টাডিস্"-এর নিয়ন্তা পেন্স্‌বরো সাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধ—তাঁদের ওখানে দক্ষিণা-বিনিময়ে বক্তৃতা দিতে হবে কয়েকমাস। আমি লিখলাম বেলা যায়—এ-শেষ বয়সে আর চাকরি করা সম্ভব নয়—তবে তাঁদের অতিথি হ'য়ে মাস দুই ভারতীয় সঙ্গীত তথা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে রাজী আছি। যথাবিধি পাকা কথা হ'য়ে গেল—শুভদৃষ্টির আগে।



শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

কিন্তু সপ্ত সাগর ত্রয়োদশ নদীর পারে যাওয়া এ-যুগে একদিক দিয়ে সুসাধ্যতর হ'লেও আমার পক্ষে পাথেয় সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্যের মতন মনে হ'ল। ঠিক হ'ল কন্সার্ট দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতে গান গেয়ে আমি সব জড়িয়ে পনের হাজার মুদ্রা তুললাম। কিন্তু হায়রে, শুধু বায়ুপোতের বিলই তো ষোলো হাজার সতের হাজারের ধাক্কা—মানে আকাশ-পথে জাপান হনোলুলু দিয়ে আমেরিকা গিয়ে ইংলণ্ড ফ্রান্স ইতালি মিশর হ'য়ে ফিরতে হ'লে এর চেয়ে

কমে শুভকর্ম-সম্পাদন অসম্ভব। এ ছাড়া আর এক মুস্কিল—মার্কিন মুদ্রা, ডলার যোগাড় করা। ইন্দিরাকে বললাম: "দেখলে?" ইন্দিরা বললে: "দেখো। যাওয়া হবেই।" ঐ এক কথা—"বিধিলিপি, আমি দেখেছি যে!"

হঠাৎ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, দিল্লির সদাশয় সদস্য, এলেন এগিয়ে। কইলেন আজাদ সাহেবের সঙ্গে কথা। আমি তাঁকে লিখলাম তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যে, আমেরিকা যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয় যদি দু হাজার ডলার সরকার দেন আমাদের "সাংস্কৃতিক ভ্রমণে" (Cultural tour)। "আজাদ সাহেব অনুকূল মনে হচ্ছে—আসুন চ'লে দিল্লি"—লিখলেন বন্ধুবর সুরেন্দ্রমোহন। অথ ৩রা জানুয়ারী পৌঁছলাম দিল্লি। ৫ই গাইলাম গান রাষ্ট্রপতি-ভবনে। পণ্ডিতজি, রাষ্ট্রপতি, আজাদজি, কাটজুজি প্রমুখ সবাই ছিলেন। বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদ তথা সুরেন্দ্র-মোহনও। ইন্দিরা দুটি নৃত্য করল আমার মীরাভজনের সঙ্গে। মনে হয় এই আসরেই আমাদের কপাল ফিরল: উদার সরকার দিলেন প্রার্থিতের অধিক পাথেয়। আমরা আশা করেছিলাম বড় জোর দু হাজার ডলার—কি না দশ হাজার টাকা। চেক এল বিশহাজারী। ভবিতব্য আর কার নাম? ওরফে ভাগবতী কৃপা।

প্রশ্ন উঠতে পারে কৃপা বলছি কেন—আমেরিকা যাওয়ার সার্থকতা কোথায় কোন্‌খানে ও কতটুকু? আমি কি বক্তৃতা দেওয়ায় এখনো বিশ্বাস করি? নিজেকে নিয়ে আবার চরকিবাজি খেলতে কি সত্যি আমার প্রাণ চায় যখন বেলা যায়?

না। সব কথা বলব না—হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে। কেবল এইটুকু বলি—আমরা কী বিশ্বাস করি না-করি—আমরা সব সময়ে নিজেরাই জানি না। জানি যেটুকু দেখতে পাই। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানে পড়েছিলাম জাহাজের বার আনারও বেশি অংশ থাকে জলের নিচে—বাইরে দেখা যায় মাত্র চার আনা। তেমনি আমাদের নিয়তির বেলায়। যেটুকু ধ'রে ছুঁয়ে পাই সেটুকু নগণ্য বলব না, কিন্তু শুধু সেটুকু থেকে অদৃষ্টের সমস্ত ছক কাটতে গেলে ভ্রান্তির অথই জলে হাবুডুবু খেতে হবে। সুতরাং মেনে নিলাম—যখন এত বড় যোগাযোগ হ'য়ে গেল—নিরীহ সাংস্কৃতিক পরিবেষককে যখন রাজমহল থেকে ভাতা দিয়ে করা হ'ল রাজপ্রতিনিধি, তখন জপ করাই ভালো—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!" তর্কে ইন্দিরারই জয় হ'ল। ভাগ্যে শাস্ত্রের বিধান বাঁচিয়ে দিল: "সর্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" জয় হোক এমন অপ্রতিবাচ্য শিষ্যার!

পিছিয়ে গিয়েছিলাম যেখান থেকে সেইখানেই ফিরে আসা যেতে পারে—এতক্ষণে। অন্য ভাষায়, উপক্রমণিকা থেকে নামা যাক্ ভ্রমণের আদিপর্বে।

উড্ডীয়মান হ'লাম ইন্দিরা ও আমি উভয়ে দিল্লির "পালম্" ঘাঁটি থেকে—পণ্ডিতজি, কাটজু, আজাদ সাহেব ও সুরেন্দ্রমোহনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। প্রত্যেকের সঙ্গেই অনেক কথা হ'ল। পণ্ডিতজি, আজাদ ও কাটজু সাহেব বন্ধুর মতনই অভিনন্দন জানালেন। কাটজু বললেন দিলাশা দিয়েঃ "আমেরিকা জয় ক'রে দিগ্বিজয়ী নাম নিয়ে ফেরা চাই।" আমি ভাবলাম বলি ম্লান হেসেঃ "Man proposes, God disposes"—কিন্তু আত্মসংযম করলাম। জীবনের পাশা খেলায় অদৃষ্টের ঘুঁটি কোন্ পথে চলবে কে বলতে পারে আগে থেকে ?


চীন

# হংকং

প্রথমেই দেখা গেল—প্যান-আমেরিকান বিমান বড় কেওকেটা নয়। প্রায় একটি ছোটখাট উড়ো জাহাজ বললেই হয়। বিলাসের সে কী অজস্র সরঞ্জাম! সর্বোপরি ঝুলন্ত শয়নাগার! এগুলি দিনমানে থাকে অদৃশ্য—ছাদের সঙ্গে মিশে। রাত হ'লেই হয় ঝোঝুল্যমান। কী যে আরাম শুয়ে! অবশ্য সে-আরামের অধিকারী হ'তে হ'লে আলাদা দক্ষিণা দিতে হয়—মাথা পিছু প্রতি রাতে পঁয়ত্রিশ ডলার, মানে প্রায় ১৭৫৲। কিন্তু আরামের বর্ণনা বিড়ম্বনা—যে আরাম পেয়েছে সে যেন শুধু বলে "কী আরাম!" ব্যস্। তার বেশি বলা মানে শুধু পণ্ডশ্রম। কারণ বিমানে ঝাঁকুনিবিহীন শয্যায় শুয়ে যে কী শান্তি, সে-কথা উড্ডুক্ষু শয়নানভিজ্ঞকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো অসম্ভব।

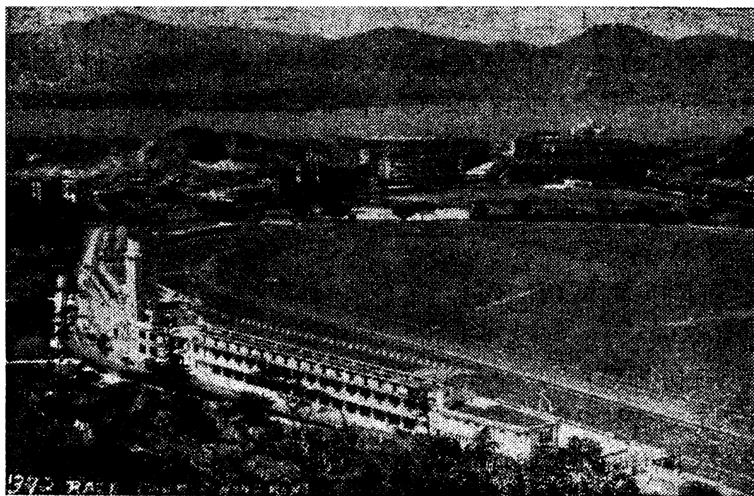
হংকং-এর কাছে এসে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা গেল বিমানের গবাক্ষ দিয়ে। দুধারে রাশি রাশি মেঘ, ছোট বড় শ্বেত পদ্মের মতন নীলাকাশে ভাসছে—কিন্তু সে-নীলাকাশ উপরে নয়। যেন আকাশকে উলটে দেওয়া হয়েছে। কী ব্যাপার! অবিকল আকাশ—নিচে ঢ'লে পড়ল কেমন ক'রে? কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মালুম হ'লঃ ওমা! কী চোখের ভুল! আকাশ কোথায়! এ যে সমুদ্রের নীল জল! মেঘের উপর থেকে নীরদনলিনকে দেখাচ্ছে যেন আকাশপ্রতিম জলের ওড়নায় চুম্‌কি ফুল বসানো! রাশি রাশি শ্বেতপদ্মকে কে যেন বসিয়েছে নীলাম্বুর দিগন্তবিতত উত্তরীয়ে! খানিক বাদে মেঘের আকৃতি বদল হ'ল—যেন থরে থরে শ্বেত তুষার ভাসছে জলের উপর! খানিক বাদে আবার আর এক দৃশ্য—সাদা মেঘের ক্ষেত—সর্বত্র সমভাবে কোপানো। ঠিক যেন একটি ক্ষেত—কেবল রঙিন নয়, সাদা, এই যা।

এক জায়গায় দেখলাম আর একটি দৃশ্য—হংকং পৌঁছবার খানিক আগেই—বেলা তখন তিনটে হবে। নীল সমুদ্রের মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপপ্রতিম তরল ব্যাপ্তি—কিন্তু উজ্জ্বল ঝিকমিকে সবুজ। ঠিক যেন একটি ডিম্বাকৃতি কিরণময়

প্রান্তর—ধারে ধারে হীরের পাড়—মধ্যে মরকত মণি! কিন্তু স্বয়ংপ্রভ মণি—যাকে সাহেব-পুরাণে বলে : সেল্‌ফ-ল্যুমিনাস—সে যে কী নয়নানন্দদায়ক!

হংকং-এ পৌঁছলাম বেলা প্রায় পাঁচটা। আমাদের গরুড় সেদিন ওখানে ঘাঁটিতে ঘুমিয়ে পরদিন ফের গর্জাবে জেগে। আমাদের ঘুম পাড়াতে বৈমানিকেরা পাঠিয়ে দিলেন হংকং-এর বিখ্যাত মিরামার হোটেলে।

হোটেলে গিয়ে স্নান সেরে এক পেয়ালা চৈনিক চা খেয়ে ইন্দিরাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পদব্রজে। ট্যাক্সি ক'রে কী হবে—রাতে কীই বা দেখব! পথে বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক—হঠাৎ এক সিন্ধুদেশীয় বণিক নমস্কার ক'রে সম্ভাষণ করলেন হিন্দিতে। তাঁর দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে যথোচিত খাতির ক'রে তাঁর মোটরে একচক্র ঘুরিয়ে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিলেন। ট্যাক্সি করতে হ'ল না, অথচ



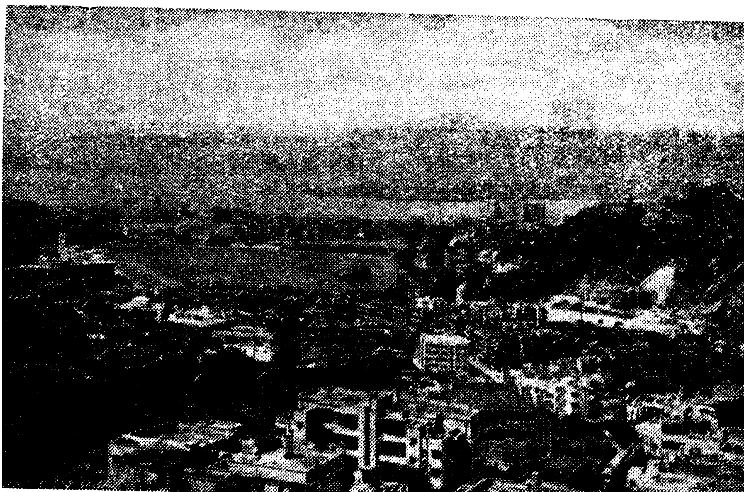
রেস কোর্স—হংকং

অভিজ্ঞ সারথির দৌলতে নিরাপদে বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘোরা হ'ল। না-চাইতে কিছু পেলে তার দাম যায় বেড়ে। ওঁ ভাগবতী কৃপা!

* * *

সকালে উঠে কয়েকজন বন্ধুকে চিঠিপত্র লিখে এক ট্যাক্সি নিয়ে বেরুনো গেল। সারথি হংকং শহরটা দেখালো। দুধারে বিপণি-সম্ভারের এমন শোভা

কখনো দেখিনি। আর প্রতি বিপণির সামনে এদিকে ওদিকে শীর্ষে তলায় চৈনিক হরফে কত কী লেখা! অর্থ-পরিগ্রহ করতে পারা গেল না বটে, কিন্তু শোভা-পরিগ্রহ করা ঠেকায় কে? বাস্তবিক, সে তো হরফ নয়—যেন আল্পনা আঁকা! হরেক রকমের আল্পনা—উপর থেকে নিচে সাজানো, এপাশ থেকে ওপাশে কত কাগজে কত বিজ্ঞাপন উড়ছে—যেন একটা চিরন্তন সর্বজনীন উৎসব! অপিচ, একটি বিপণিও নেই কুদৃশ্য! হংকং ধনী শহর বটে! অলকায় কুবেরের রাজ্যে যক্ষজাতীয় বণিকরা হয়ত আরো ভালো দোকান সাজান, কিন্তু

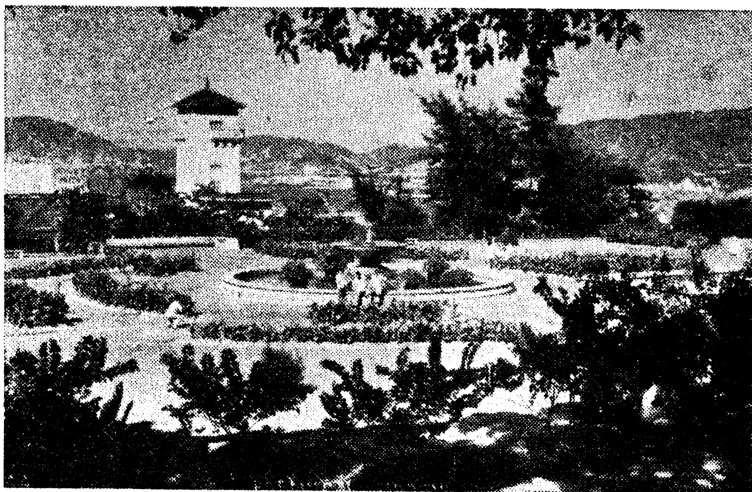


হ্যাপি ভ্যালি—হংকং

মর্ত্যলোকের এ হেন নয়নাভিরাম বিপণি-সজ্জা এ-যাবৎ চোখে পড়ে নি। পরে টোকিওর বিপণি-সজ্জাও এত মুগ্ধ করতে পারে নি আমাদের। এককথায় বৈশ্যসভ্যতা-নামক মহাগিরিতে হংকং যদি গৌরীশঙ্কর নাও হয়, তবে তুঙ্গতায় তার কাছাকাছি—একথা প্রতি চৈনিক শ্রেষ্ঠীই সগর্বে রটনা করতে পারেন।

হংকং থেকে রওনা হ'লাম পরদিন, কিনা ১০ই, বেলা আড়াইটেয়। টোকিয়ো পৌঁছলাম রাত সাড়ে ন'টা। পাটীগণিত অনুসারে আমাদের উড়ন্ত সময়

ক' ঘণ্টা? সাত ঘণ্টা তো? না, হ'ল না। আমরা উড়েছি মাত্র ছ' ঘণ্টা। কারণ ইতিমধ্যে পৃথিবী ঘুরে গেছেন এক ঘণ্টা। কাজেই বলা যেতে পারে যে আমরা বয়স বাঁচালাম এক ঘণ্টা। অন্য ভাষায়, যদি, ধরা যাক্ হংকং-এ আড়াইটের সময় সদ্যঃপ্রসূত দিলীপকুমারকে সেদিন বিমানে চড়িয়ে দেওয়া হ'ত, তবে টোকিয়োতে যখন শিশু দিলীপকুমার পৌঁছতেন তখন তাঁর পোষাকি (official) বয়স হ'ত ছয় ঘণ্টা, কিন্তু আসল ঘরোয়া বয়স হ'ত সাত ঘণ্টা। এই বিচিত্র গণনার আরো রোমহর্ষক উদাহরণ দেওয়া যাক—যদিও খানিকটা আষাঢ়ে গল্পর মতনই শোনাবে। জানুয়ারি মাসের ১৮ই তারিখে আমরা সন্ধ্যা ৬টার সময় টোকিয়ো থেকে হনোলুলু রওনা হ'লাম। পনের ঘণ্টা



বোটানিকাল গার্ডেন—হংকং

উড়ে ও মধ্যে তিন ঘণ্টা Wake Island-এ নেমে আঠার ঘণ্টা বাদে পৌঁছলাম হনোলুলু। সেখানে কখন পৌঁছব তা'হলে? ১৯শে তারিখে দুপুরবেলা বারোটায় তো? কিন্তু না—আমরা পৌঁছলাম বেলা চারটেয়, অথচ ১৮ই তারিখে। তার মানে? হিসেব করুন দিলীপকুমারের বয়স কত বেঁচে গেল। না, বেঁচে গেলই বা বলি কেন? বলব দিলীপকুমারের বয়স ১৮+২=২০ ঘণ্টা

কমে গেল।* ভাবতে ভারি মজা লাগছে ব'লেই এ সাদা কথাটা ঘোরালো ক'রে বললাম—আশা করি শত্রু হেসে বলবেন না: "দিলীপকুমার এবার পাকা চুলে কলপ দিয়ে 'যুবো' সাজবেন বা।" কিন্তু এবার গম্ভীর হওয়া যাক—হংকং-এর আদিপর্বের পরে টোকিয়ো-পর্বের সভাপর্বের পালাগান হোক সুরু।

* * *

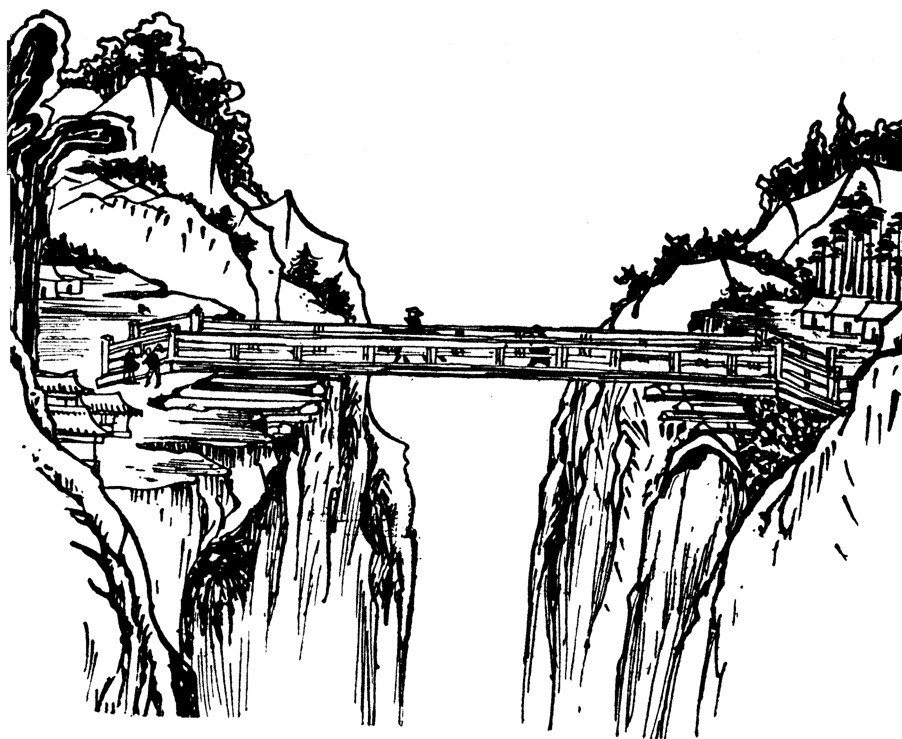
টোকিয়োয় পৌছলাম জাপানী সময় রাত সাড়ে নটায়। ইন্দিরা ও আমি বিমান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছি—ও মা! "Please! Are you Mr. D. K. Roy?"—হাঁকলেন এক ছবি-তুলনেওয়ালা নিচে থেকে। কবুল করলাম। তৎক্ষণাৎ: "Please stand still!" টক্—জ্বলে উঠল সাদা আলো! ছবি উঠে গেল। পরদিন জাপানী কাগজে বেরুল—"বিখ্যাত সঙ্গীতকার দিলীপকুমার ও তৎশিষ্যা প্রসিদ্ধা নাট্যনৃত্যনিপুণা ইন্দিরা দেবী···" ইত্যাদি। ধুমধামের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ নয়। নিচে নামতেই ওভারকোট-পরা রাজদূত (Ambassador) ডাক্তার মহম্মদ আবদুল রাউফ সাহেব বললেন: I am Dr. Rauf, Mr Roy!" অথ করমর্দন-পর্ব। তৎক্ষণাৎ ছবিওয়ালা পুনরায় তারস্বরে: "করমর্দন করতে থাকুন।" আবার সেই হঠাৎ আলোর ঝলক—ফের ছবি! কাগজে বেরুবে শুনলাম (এটি এখনো চোখে দেখি নি নিজে): "Dr. Rauf greeting Mr. Dilip Roy" এই জাতীয় শিরোনামা।

আমেরিকা আরম্ভ হ'ল প্রথম জাপানে।

---

* এই সম্পর্কে পরে শুনেছিলাম এক ইংরেজ লেখকের কাছে একটি ভারি মজার চতুষ্পদী:

There was a lady called Mrs. White
Who believed that Einstein was right:
So she started one day
In a relative way
And came back the previous night!



# জাপান

# টোকিয়ো

ডাক্তার রাউফ একান্ন বৎসরের উৎসাহী বদান্য মানুষ। ছিলেন রেঙ্গুনে ভারতীয় রাজদূত, সেখান থেকে পদবৃদ্ধি হ'য়ে এসেছেন জাপানে রাজদূত হ'য়ে। তাঁকে চোখে তো দেখিই নি—এমন কি তাঁর বাঁশি পর্যন্ত শুনি নি। কিন্তু দেখা হ'তে না-হ'তে তিনি এমন সহজ সরল স্বরে ইন্দিরাকে ও আমাকে আপনার ক'রে নিলেন যে মনে হ'ল যেন কতদিনের আলাপী! সঙ্গে ছিল তাঁর দু'দুটি ভারতীয় সেক্রেটারি, জাপানী সারথি ও প্রকাণ্ড মোটর। সতের মাইল উজিয়ে এসেছেন ঐ ঠাণ্ডা রাতে আমাদের সংবর্ধনার্থে। দুদিন আগেও এখানে তুষারপাত হয়েছে—অনেক জায়গায় সে-তুষার তখনো গলে নি। কিন্তু এখানেই তাঁর সদাশয়তার শেষ নয়—তিনি এমন কথাকুশলী যে ধন্যবাদ দেবারও সুযোগ দিলেন না, মোটরে একথায় সেকথায় আমাদের মন্ত্রমুগ্ধবৎ আবিষ্ট ক'রে রাখলেন। জাপানের কত খবরই যে শুনলাম মোটরে এই প্রথম চল্লিশ মিনিটে। বিদেশে এমন স্বজন যে এত সহজে মিলতে পারে কে ভেবেছিল? অমায়িক, আলাপী অথচ একটুও অশোভন কিছুর আমেজ পেলাম না তাঁর সহজিয়া হৃদ্যতায়। বললেন সলজ্জে যে, শ্রীমতী রাউফ আসতে পারলেন না—হাঁপানির জন্যে। ইন্দিরা তো গ'লে গেল সমবেদনায়—সমানধর্মী ভালো, ততোধিক সমানমর্মী। ভাবলাম দেখা যাক, হাঁপানি প্রতিযোগিতায় দুজনের মধ্যে কে জেতে।

* * *

১৯২৭-এ শেষ গিয়েছিলাম কালাপানির পারে, এ-চব্বিশ বৎসরে জগৎ কতখানি বদলেছে তার প্রথম আভাস পেলাম বন্ধুবরের "দূতাবাস"-এ (Embassy) পৌঁছতে না-পৌঁছতে। বাইরে যখন জল পর্যন্ত বরফ হ'য়ে যাচ্ছে—ভিতরে তখন দিব্যি ধুতি চাদর ও একটি সাধারণ পিরান প'রে ব'সে থাকতাম। এ অতিরঞ্জন নয়—ধুতি প'রে ও একটি আলোয়ান মুড়ি দিয়ে তাঁর বাড়িতে দিনের পর দিন ডিনার খেয়েছি, প্রবন্ধাদি লিখেছি, গল্পগুজব করেছি। ভারতীয় গৃহকর্তা—ভারতীয় শিল্পী—ভারতীয় ধুতি পরা চলবে না কেন শুনি? অবশ্য বাইরে যাবার সময়ে আচকান ও চোগা পরতে হ'ত—কারণ অন্দরের

অবস্থা সুভদ্র হ'লেও সদরে ঠাণ্ডা তো আর ভেতো নয়, পুরোদস্তুর বাঘা, ঘরের বাইরে যেতেই দেখা যায় প্রাঙ্গণে জল জ'মে বরফের পাত হ'য়ে চিকচিক করছে।

জগৎ বদলেছে বৈকি! কই, পঁচিশ বৎসর আগে কোনো সরঞ্জামকে এ-হেন সমভাবে উত্তাপ-পরিবেশন করতে তো দেখি নি কোনো ভবনে। শুনলাম—আমেরিকায় আজকাল ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থা।

বলতে ভুলেছি—মোটরে রীতিমত গরম হচ্ছিল। মোটরের আভ্যন্তরীণ তাপ প্রায় পণ্ডিচেরির দোসর। বাড়িয়ে বলা নয়—বন্ধুবরকে অনুরোধ করতে হ'ল রাজরথের শার্শি একটু খুলে দিতে। তাপমান যন্ত্রে যখন বাইরের তাপ নাস্তির কোঠায় তখনও মোটরের ভিতরে বেজায় গরম। বিচিত্র নয়? ধন্য ডাক্তার রাউফের রাজরথ!

অন্যদিক দিয়েও ভাবতে আনন্দ। ভারতের দুর্দশা ভারতেই আবদ্ধ—বাইরে ভারতের আজ কী প্রতিপত্তি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। শোনা কথা ও চোখে দেখার মধ্যে সেই চিরন্তন প্রভেদ। Seeing is believing—বলে না সাহেব-পুরাণে? ভারত যে আজ স্বাধীন একথা সবচেয়ে সহজে উপলব্ধি করতে হ'লে ভারতের বাইরে কোনো রাজদূতের আতিথ্য-গ্রহণ গুরুর মতনই চক্ষুরুন্মীলক। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করব না—শত্রু বলবেঃ নিরন্নের সামনে রাজভোগ ধরলে তার এম্‌নি চিত্তচাঞ্চল্যই হয়। না, বাইরে কিছুতেই স্বীকার করা নয় যে এতখানি গৌরব পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি। ফরাসী ভাষায় বলে parvenu, ইংরাজি ভাষায়—upstart, আমরা হঠাৎ স্বাধীন হ'য়ে উদ্‌ভ্রান্ত হ'লে এই দুটি উপাধি যদি কেউ কপালে দেগে দেয়! কাজ কি?

* * *

ডাক্তার রাউফের শিরে কিন্তু রাজদূতের মুকুট সহজেই শোভা পায়। সম্ভ্রান্ত অভিজাত বটে! সঙ্গে মুসলমানী আদবকায়দা। মণিকাঞ্চন-সংযোগ বলে আর কাকে? আলাপী মনে প্রাণে, সুশীল সর্বান্তঃকরণে, সবদিক দিয়েই একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ, পার্সনালিটি। শ্রীমতী রাউফও অতি সুশীলা—সুদর্শনা। নয়টি সন্তানের জননী। ছেলেমেয়েগুলিও সুশ্রী ও মঞ্জুবাক্‌। মনে হ'ল যেন কতদিনের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি দূর বিদেশে। মন দেখতে দেখতে ভ'রে উঠল। বিধাতার ললাটলিপি নিয়ে অনুযোগ করার

আর পথ রইল না। এমন যোগাযোগ হ'য়ে গেল তো আঁতুড়ঘরে তাঁর সদয় লেখনীর করুণাবলেই।

বন্ধুবরকে বললাম: "এখানে থাকব তো মাত্র সাত আট দিন। 'সাইট-সীইং' চাই না—ও-বিড়ম্বনা চুটিয়েই করেছি। তবে জাপানী সংস্কৃতির কিছু চাক্ষুষ পরিচয় চাই—ছুটোছুটি না ক'রে যেটুকু পাওয়া যায় মাত্র সেইটুকু।" ডাক্তার রাউফ বললেন: "কিয়োতো, কোবে, য়োকোহামা দেখতে যাবেন? বন্দোবস্ত—" বাধা দিয়ে বললাম: "নৈব নৈব চ—যেটুকু টোকিয়োতে দেখা যায় সেইটুকুই আমাদের জন্যে বরাদ্দ করুন। একটু অলস হ'য়ে নিই এখানে। কদিন যা ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে—দিল্লিতে!"

তথাস্তু। পরদিন সকালে উঠে বন্ধুবর আলাপ করিয়ে দিলেন মাধবন নায়ার ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। এঁর একটু পরিচয় না দিলেই নয়—কারণ জাপানে ইনিই ছিলেন আমাদের প্রধান পথনির্দেশক তথা দোভাষী ব্যাখ্যাকার।

ইনি ত্রিবন্দ্রমবাসী—অতি সদাশয় বন্ধু। জাপানে ও চীনে পঁচিশ বৎসর কাটিয়েছেন। চমৎকার জাপানী বলেন। না বলবেন কেন—যিনি গৃহে নিত্য স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে প্রত্যহ জাপানী ভাষায় কথা কন?

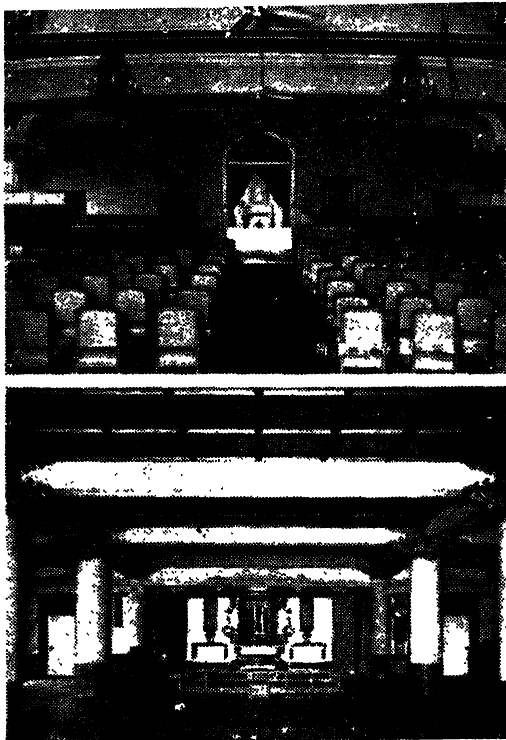
জাপানের বহু ঘরোয়া কথা এঁর কাছেই শুনলাম। যাঁর ঘরনী জাপানী, জাপানের ঘরোয়া কথা বলবার স্বাধিকার তো তাঁরই। তাছাড়া জাপানের বাসিন্দাও তো বটে। জাপানী-মার্কিন রাজনীতির সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বললেন, যা আমার অগোচর ছিল—কারণ সে সব কথা তো সংবাদপত্রে বেরোয় না। কিন্তু সে সব নাই বললাম। তাছাড়া আমি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি—জাপানের সাংস্কৃতিক দিকটাই তো আমার এলাকার মধ্যে পড়ে।

কেবল একটা কথা না ব'লেই পারছি না। নায়ার বহুদিন ছিলেন নেতাজি সুভাষের সহকারী, সহচারী—শুধু জাপানে নয়, সিঙ্গাপুরেও। ইনি মনে করেন সুভাষ ইহলোকে নেই, তবে একথাও বলেন যে সুভাষের দেহান্তের যে-রটনা পাওয়া গেছে তার সাক্ষ্যমূল্য বেশি নয়।

প্রথম দিন সকালেই গেলাম রেঙ্কোজি মন্দিরে—যেখানে সুভাষের অস্থি রাখা হয়েছে। সুভাষের ছবিও সেখানে দেখলাম। কিন্তু কে যে এ-অস্থি দিয়ে গেছে তার পুরোপুরি হদিস নাকি পাওয়া যায় না—বললেন নায়ার।

তবু মনটা ভ'রে উঠল, যখন জাপানী পুরোহিত দেখালেন সেই মঞ্জুষাটি যাতে সুভাষের অস্থি সুরক্ষিত।

সেখান থেকে গেলাম মেইজি মন্দিরে। এ-মন্দিরে রাখা হয়েছে জাপানের বর্তমান সম্রাট হিরোহিতোর পিতামহের অস্থি। একটি অতি চমৎকার জাপানী উদ্যানে এ-মন্দিরটি নির্মিত। দেখে ভালো লাগল। সেদিন রবিবার—তাই



টোকিয়োর বৌদ্ধ মন্দিরের অভ্যন্তর

সকালে বহু জাপানী নরনারী ও শিশুর দেখা মিলল। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই চলেছে মন্দিরে। সেখানে দেখি এক জাপানী পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছে—আর সামনে যে কত নরনারী ও বালক-বালিকা প্রণামী দিয়ে নিয়মিত হাততালি সহকারে রাজমঞ্জুষাকে অভিবাদন করছে! বলতে ভুলেছি, এরা মন্দিরে ঢুকবার আগে প্রত্যেকে মন্দিরের সাম্‌নে-রাখা একটি চৌবাচ্ছার

নির্মল জল থেকে হাতায় ক'রে জল নিয়ে আচমন ক'রে তবে মন্দিরে ঢোকে। আর একটি জিনিষ দেখলাম বড় বিচিত্র: একটি পল্লবহীন বামন গাছের নানা শাখায় সাদা ফুল। পাতা নেই—ফুল! নায়ার বললেন: "ফুল নয়—নানা প্রার্থনা সমেত লম্বা ফিতের মতন কাগজ প্রার্থীরা এসে বেঁধে দেয় গাছের নানা ডালে। রাজ-অস্থির প্রসাদে সে-সব প্রার্থনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনায় এরা অনেকে এখনো বিশ্বাস করে।"

জাপানের রাজপূজার কথা বইয়েই পড়েছিলাম—এবার চোখে দেখলাম। কোনো রাজার স্মৃতিসমাধিকে এযুগে শিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতাও যে এভাবে ভক্তিভরে প্রণাম করতে পারে—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। শুধু ভক্তি নয়—জাপান আজ দরিদ্র, অথচ এরা প্রত্যেকেই ৩০, ৫০, ৬০, ১০০ য়েনের নোট নিবেদন করছে—চাক্ষুষ করলাম। সাইট-সীইংএর বর্ণনা দিতে নয়—জাপানের নরনারীর একটি ব্যাপক মনোভাবের পরিচয় মিলল, তাই এত কথা বলা।

তারপর গেলাম ওকুরা জাদুঘরে। কী সুন্দর বুদ্ধমূর্তি যে দেখলাম সেখানে! আর কত সুন্দর সুন্দর জাপানী গালার বাক্স—চিত্রবিচিত্র কত রকমের যে অপূর্ব সুন্দর মঞ্জুষা! ছবির তো কথাই নেই। জাপানী ছবির সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত! জাপানী রেখারূপ নৃত্য করে, জাপানী রং-ঢং কথা কয়! তবে ছবির আমি কিছু বুঝি না—তাই এ নিয়ে বেশি বলতে গেলে অনধিকার-চর্চার অপরাধে অভিযুক্ত হব বা! কাজ নেই—জাপানী চিত্রকলা সম্বন্ধে আমাদের চিত্রীরা বহু লিখেছেন ও জেনেছেন···তাঁরাই সে সম্বন্ধে লিখুন, বলুন।

* * *

পরদিন ডাক্তার রাউফ নিমন্ত্রণ করলেন কয়েকজন জাপানী পণ্ডিতকে। এঁরা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক। ভারতীয় গান শুনে খুশি হ'য়ে উঠলেন, তবে সেটা কৌতূহলবশে না রসবোধের দরুন বলব কী ক'রে? এঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ জমালাম বেশি ক'রে। কারণ ইনি কথা দিলেন আমাকে একটি জাপানী বৌদ্ধমঠ দেখাবেন—যেখানে বৌদ্ধ মন্ত্রপাঠ ও সামগান হয়। আমার অনেক দিনের সাধ একটি জাপানের বৌদ্ধমঠের কিছু ঘরোয়া খবর পাওয়া: এরা কেমন ক'রে সাধনা করে, কী ভাবে থাকে, কেমন এদের মুখচোখের ভাব—এই সব। অবশ্য এসব দেখাই হবে উপর উপর দেখা—কিন্তু এর বেশি কীই বা দেখা যেতে পারে দুদিনে? জাপানী বন্ধু

বললেন—তুদিন বাদে নিজে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁর অভিভাবকতায় যে-মঠটি পরিচালিত হচ্ছে সেখানে। যদি দেখে মনে কোনো বর্ণনীয় ভাবোদয় হয় তবে লিখব। জাপানী অধ্যাপকদের সম্বন্ধে শুধু একটি কথা ব'লেই এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টান্‌ব। ভদ্রতা এঁদের যে শুধু মজ্জাগত তা নয়—ভদ্রতাতে এঁদের হৃদয় পর্যন্ত সাড়া দেয়। য়ুরোপীয় কোনো ভদ্রলোক যখন অভিবাদন করেন তখন তাঁর অভিবাদনের পিছনে হৃদয়ের তাপ থাকেনা। এঁদের প্রতি অভিবাদন, সম্ভাষণ, হস্তমর্দন, হাসি শুধু সুভদ্র নয়—অতি রমণীয়। মনে হয় ভদ্রতার কৌলীন্যে এঁরা বিশ্বাস হারান নি—শালীনতায় এঁদের সহজ আনন্দ।

একথা আরো ভালো তথা নতুন ক'রে উপলব্ধি করা গেল যখন এক জাপানী ভদ্রলোক ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করলেন যেতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি "রীতিমত জাপানী নর্তকীর" নাচ দেখতে—যে নাকি জাপানের শ্রেষ্ঠ নটীদের অন্যতমা।

গেলাম বিকেল বেলা। জাপানী ঘর—সুন্দর ফ্রেম-করা মাতুরের উপরে বসলাম। সাম্‌নে উনুন, উনুনের উপরে রাখা একটি চতুষ্কোণ ট্রে-মতন। ট্রের নিচে থেকে নেমে এসেছে লেপের ঝালর। বসতে হয় মাতুরের উপরে-রাখা কুশনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে—লেপের ঝালরে আজানু মুড়ি দিয়ে। পা চমৎকার গরম থাকে—আর ব'সেও চমৎকার আরাম। অপারগ সাহেবরা যদি পা মুড়ে বসতে পারত তবে বিলেতেও সহজেই কোচ চেয়ার ছেড়ে এভাবে বসার রীতি চালু হ'য়ে যেত। কিন্তু সে অন্য কথা—যা বলছিলাম। যিনি এ-নৃত্যবিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁর বাইশ বৎসরের মেয়ে নাচল কিমোনো ও ওবি প'রে, হাতে জাপানী পাখা তুলিয়ে। কতরকম ভঙ্গি সে! বেশ মনোজ্ঞ ভঙ্গি মান্‌ব, কিন্তু কোথায় তাল? সঙ্গে যে-জাপানী গীতিসঙ্গত হ'ল, তার না আছে সুর না তাল? অধিকাংশই "ও" স্বরবর্ণে গাঁথা। সঙ্গে বাজল জাপানী সামিসেন—খানিকটা ব্যাঞ্জোর মতন—কিন্তু শুনতে একটুও ভালো নয়, আদ্যন্ত বেসুরো লাগে আমাদের কানে। জাপানী গানের সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাদের ছবি, খোদাই প্রভৃতি এত চমৎকার তাদের নৃত্যগীত কেন উন্নত হ'ল না—কে বলবে? বোধহয় এক একটা জাতি এক একটা জমির মতন—যেখানে মাত্র তু'একটি শিল্পেরই চাষ হ'তে পারে—তার বেশি নয়। জাতিভেদকে আমরা সভ্রূভঙ্গে অর্ধচন্দ্র দিতে চাই, কিন্তু জগতে সংস্কৃতির গোড়াপত্তন জাতিভেদে—ওরফে শ্রেণীজাত বিশেষজ্ঞদের সুদীর্ঘ তপস্যায়। আমাদের ওস্তাদ, বীণকার, স্বরোদিয়া, তবলিয়া কত যুগ-যুগের সাধনার ফলে তবে আজ এত উন্নত! জাপানে না আছে তালের বাহার, না সুরের মাধুর্য, না নৃত্যের নিপুণ পদক্ষেপ।

শুধু হাত ঘুরিয়ে আর পাখা দুলিয়ে কি নাচ হয়? মাত্র এটুকু কৃতিত্বকে কেবল নাড়ু দেওয়া যায়—বাহবা নয়, শিরোপা তো নয়ই। তাছাড়া কী সাদা পেণ্ট! মুখচোখ ঠিক যেন হাতির দাঁতের মতন পালিশ-করা সাদা দেখায় এদের প্রসাধনে। ভালো লাগে শুধু এদের বেশভূষা। সে যে পড়ে চোখের কোঠায়। কানে এরা খাটো, কিন্তু চোখে তীক্ষ্ণ। সুমি হানায়াগি নামক বিখ্যাত নর্তকীর নাচও আমাদের ভালো লাগল না। নাচে তাল না-থাকা কেমন? না, কবিতায় ছন্দ না থাকলে যেমন: অপটু, ভ্রান্তিবিলাসী, নাবালক।

কিন্তু কী সুন্দর এদের অভ্যর্থনা! কী অপরূপ অভিবাদন, মিষ্ট হাসি, মধুর সম্ভাষণ! ভদ্রতা জানেন অনেকেই, কিন্তু ভদ্রতায় চরম মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছে



টোকিয়োর বিখ্যাত গাইশা নর্তকীর গৃহে দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী

এক জাপানী। সৌকুমার্য এদের ঘরোয়া নামাবলী—আর এমন নামাবলী যে অতি-ব্যবহারেও মলিন হয় না, পালিশ হারায় না। কারণ—ঐ যে বললাম—ভদ্রতায় এরা বিশ্বাস করে—তার জন্যে তপস্যা করে। গিয়ে শুনলাম সুমি হানায়াগি একটি যশস্বিনী গাইশা নর্তকী। গাইশা নর্তকীদের সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন বই, প্রবন্ধাদি। লিখবার আছেও অনেক। কিন্তু সব লিখতে গেলে এ-দিনপঞ্জিকা

হ'য়ে উঠবে মহাভারত। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই দাঁড়ি টানি যে গ্রীসে যেমন কোর্টেসান ছিল, জাপানে তেম্‌নি গাইশা রূপসী! এদের শেখানো হয় কথা বলতে, অতিথিদের সম্ভাষণ করতে, নৃত্যগীতে অভ্যাগতের চিত্তরঞ্জন করতে। বলাই বেশি: এ-শ্রেণীর চিত্তরঞ্জনের সমাপ্তি এইখানেই নয়—চিত্তের কোঠায় রূপসী স্বৈরিণী আসতে না-আসতে হ'য়ে ওঠে প্রেয়সী মোহিনী—যার ফল অনুমেয়। কাজেই গাইশা নর্তকী সহজেই ধাপে ধাপে নেমে যায়—অতিথি-সৎকার হ'য়ে দাঁড়ায় তাই যার নাম না দিলেও চলে। কিন্তু তা ব'লে এদের সাধারণ বিলাসিনী বললে একটু বেশি বলা হবে। এদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে, রূপ ও ভাবভঙ্গির চটকে পুরুষের চিত্তরঞ্জনে বিশেষজ্ঞ হওয়া। এক সময়ে জাপানে ছিল এ একটি মান্যগণ্য প্রতিষ্ঠান। এই কথাটি না বুঝলে জাপানী সংস্কৃতিতে গাইশা নর্তকীর ঠিক মূল্য দেওয়া সম্ভব হবে না। জাপানী কাগজে পড়ছিলাম গত কালই যে মিনেকিচি নাশিমোতো নামে একজন বৃদ্ধা গাইশা নর্তকী আজ "অল-জাপান ফেডারেশন অব গাইশা গার্ল"-এর প্রেসিডেণ্ট, সমাজে বিশেষ সম্মানিতা—মান্যগণ্য অভিজাতরা তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে বা গল্পালাপে অভিনন্দিত করতে গৌরব বোধ করেন। এই মহিলা দুঃখ করেছেন যে, জাপানে গাইশা নর্তকীরা পুরাকালে সৌকুমার্যের ও শালীনতার যে উচ্চ আদর্শ পোষণ করত, আধুনিক নর্তকীদের মধ্যে সে-বিবেকবুদ্ধি নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। এ নিয়ে আর বেশি বলার সময় নেই, সার্থকতাও না—কারণ দু'কথায় এদের সম্বন্ধে বেশি বলতে গেলে এদের স্বরূপ সম্বন্ধে উল্টো বুঝোনোই হবে।

উল্টো বুঝোনো হ'লই বা—বিশেষ যখন বিষয়টা অশুচি—গাইশা নর্তকী—এ ধরনের মন্তব্য হয়ত কেউ কেউ করবেন—বিশেষ যাঁরা মনেপ্রাণে আধ্যাত্মিক। তাঁদের সন্দিগ্ধতা আমি বুঝি না এমনও নয়। তবু বলব—আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন সাধকের কাছেও উচ্চ-বিকশিত সাংস্কৃতিক সৌকুমার্য—cultural refinement—আদরণীয় হওয়া উচিত। শ্রীঅরবিন্দকে আমি একসময়ে লিখতাম: যোগীরা অভদ্র হবে কেন, অপরিষ্কার হবে কেন? তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তার সার মর্ম এই যে—মানসিক সৌকুমার্য এক, ভগবদ্‌ভাবে-ভাবিত সাধুর সৌকুমার্য আর। ব'লে জুড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে কোনোদিনই বলেন নি যে, মানুষের বাহ্য প্রকৃতির রূপান্তর হওয়া অনাবশ্যক, শুধু আন্তর উপলব্ধি হ'লেই হ'ল। এ নিয়ে তর্ক হয়েছে অনেক, হবেও অজস্র। আমি এ-প্রসঙ্গ তুললাম শুধু এই কথাটি পেশ করতে যে, আমার কাছে জাপানী শালীনতা ও সৌকুমার্য

এত ভালো লেগেছে এই জন্যে যে, বহু সৌন্দর্যসাধনের ফলে জাপান পৌঁছেচে এ-কলা-সিদ্ধিতে, আর এ-সিদ্ধির চরম শিখরের মনোজ্ঞ হিল্লোল উপভোগ করতে হ'লে লক্ষ্য করতে হবে জাপানী রমণীর রূপপ্রসাধন ও সৌকুমার্য-সাধনা। জাপানী মহিলাকে আমাদের চোখে সুন্দরী মনে হবার কথা নয়, কিন্তু এদের হাবভাবের মাধুর্য বহুসাধনলব্ধ—এদের চালচলন, কথাবার্তা, অভিবাদন, ঘর-সাজানো—সবই পরিচয় দেয় এক আশ্চর্য ঐকান্তিকতার—যার নাম দেওয়া যেতে পারে লাবণ্যপূজা। এদের প্রতি পদক্ষেপ সুন্দর, প্রতি ঠাট তপোলব্ধ।

একথা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ হয়েছিল যখন গেলাম সেদিন এদের এক ধনী অভিজাতের বাড়ি। আমাদের দেশে বলে "সুখের ঘরে রূপের বাসা"। এদের দেশেও একথা সমান খাটে। নাওমি সাগাওয়ার ওখানে যেদিন গেলাম সেদিন একথা আরো বেশি ক'রে হৃদয়ঙ্গম করলাম। বলি সে-কথা। বলবার ম'ত।

নাওমি সাগাওয়া এখানে একজন মস্ত ধনী। তাঁর আবাসকে নাম দেওয়া যেতে পারে সৌন্দর্যপুরী। স্বর্ণলঙ্কার মাধুর্যের কথা পড়েছি রামায়ণে। কিন্তু লঙ্কায় গিয়ে রম্যতম প্রাসাদেও পাই নি এ-রটনার চাক্ষুষ প্রমাণ—পেলাম সব প্রথম জাপানে এসে। য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ পুরী সভা হোটেল আরামকুটীর দেখেছি। কিন্তু কোনো রাজমহলেই সে-নয়নানন্দদায়িনী শোভা প্রত্যক্ষ করি নি, যা করলাম এ-ধনীদম্পতির বাসভবনে।

সামনে সুন্দর জাপানী উদ্যান। খুব বড় নয় কিন্তু অপরূপ। ছোট ছোট গাছ, জলের উপর সেতু, বাগানে ছোট মন্দির—আরো কত কী! ঢুকেই মনে হ'ল—আশ্চর্য! তার পরে ঘরের দোরগোড়ায় জুতো খুলতে হ'ল। পরম-লাবণ্যময়ী গৃহস্বামিনী নিজে পরিষ্কার চটি পরিয়ে দিলেন। রাস্তার জুতো প'রে গৃহপ্রবেশ এখানে মানা। অতিথি অভ্যাগতের জন্যে দোরগোড়ায় সাজানো সার সার চটি। চটি প'রে উঠলাম এঁদের ম্যাটিং-করা ঘরে—ফ্রেমওয়ালা মাদুরের নরম ম্যাটিং। নরম, কেননা মাদুরের নিচে থাকে নরম তোশক মতন। কিন্তু তারপর—কী বলব? রবীন্দ্রনাথের লেখনীও হার মেনে যেতে বাধ্য। কেননা সে-সৌন্দর্য না দেখলে কল্পনা করা অসম্ভব, ব্যাখ্যা ক'রে বড়জোর তার কিছু আভাস মাত্র দেওয়া যেতে পারে—তার বেশি নয়।

ঘরের ফুলদানি—একটিতে দুটি ফুল মস্ত জলপাত্রের তলে বুরুশে আটকানো। ফুলগুলিও যেন শিখেছে গৃহকর্ত্রীর মতন আভূমিপ্রণত অভিবাদন করতে। ঘরে

ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—এসেছি রাজপুরীতে নয়—( কারণ ঘরগুলি এদের খুব বড় নয়—বড় ঘর হ'লে গরম রাখা যায় না ব'লে এরা ছোট ঘরেই থাকে )—কিন্তু কী ঘর, কী দেয়াল, কী কড়িকাঠ, কী জান্‌লা! যেদিকে তাকাই চোখ যেন মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়ে। আর একটি ফুলদানিতে সাজানো কয়েকটি তৃণজাতীয় লম্বা পাতা। দেয়ালে ঝুলছে অপরূপ একটি চিত্রিত রেকাবি। অতি অল্প অঙ্কন —মাত্র দু'একটি পাতা, কিন্তু কী অপরূপ তাদের বিন্যাস রঙ ভঙ্গি! ঘরে বড় বড় কয়েকটি উনুন—কিন্তু সে-উনুন দেখলে কোনো মেয়েকে আর কটূক্তি করা সম্ভব হ'ত না উনুনমুখী ব'লে, কেন না সে কটূক্তি হ'য়ে দাঁড়াত স্তবগান।

তারপর আর একটি ঐ-রকম মাদুর-বিছানো ঘর। এখানে ওখানে জাপানী ছবি—একটি বক, একটি পায়রা, একটি ছোট্ট জলাশয়। কিন্তু সে কী বক, কী পায়রা, কী জলাশয়! এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে। ইংরাজিতে বলে থ্রিল। রোমহর্ষণ বললে হয়ত ঠিক তর্জমা হবে নাঃ না, পুলকিত—পুলকিত। তনু মনে জাগল পুলক। ঐ কথাটিই খুঁজছিলাম—mot juste!

তারপর গৃহস্বামী ও স্বামিনী আমাদের বসালেন আর একটি ঘরে। ঐ একই মাদুর। তার উপর কুশন। আমি, ইন্দিরা, ডাক্তার রাউফ, শ্রীযুক্ত সাগাওয়া, বন্ধুবর নায়ার ও আর একটি জাপানী অধ্যাপক। ওঁরা ইংরাজি জানেন না কেউ-ই। নায়ার হ'লেন আমাদের দোভাষী কর্ণধার। তাঁর মাধ্যমেই আলাপ জম্‌ল। কিন্তু আলাপ মনে হ'ল অবান্তর, গৃহস্বামিনীর হাসি ও আহার্য-পরিবেষণ, পরিশেষে নৃত্য আমাদের চিত্ততোষণ করল।

খাওয়ার বর্ণনা করব? নাঃ—কী হবে ক'রে—যখন ভালো লাগে না জাপানী রান্না। না-রাঁধা মাছ খেতে হ'ল। খুব যে খারাপ তা নয়—তবু গা কেমন করে। যখন পরে রাঁধা গলদা চিংড়ি এল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। হ্যাঁ, মাশরুম, মাশরুম। বেশ লাগল। কিন্তু য়ুরোপীয় মাশরুম রান্নায় আমরা অভ্যস্ত। এ যেন কাঁচা কাঁচা লাগে। তারপর শামুক। না, আর না। জাপানী রান্নার নিন্দা করার অধিকার আমার নেই—যেহেতু রসনারুচি দেশে দেশে বিভিন্ন। মনে আছে আমার এক তামিল গীতি-শিষ্যার কলকাতায় গিয়ে "রাজভোগ" মুখে দিয়েই থু থু ক'রে ফেলে দেওয়া। রুচির কোনো সর্বজনীন মাপকাটি আছে কি না—কিন্তু মরুক্‌গে এ-দুস্তর গবেষণা। রান্না পর্ব ছেড়ে আসি আহারান্তে নৃত্য-পর্বে।

ভোজন সমাধা হ'লে গৃহস্বামিনী নাচলেন গ্রামোফোন সঙ্গীতের সঙ্গে।

জাপানী গায়কের গান তথা সামিসেন বাজনা। সে অশ্রাব্য। নৃত্য সুদৃশ্য, ভঙ্গি অনবদ্য, কিন্তু শুধুই ভাও-বাৎলানো। না আছে তাল, না নিপুণ পদক্ষেপ। ইন্দিরা যখন নাচে, আনন্দ ছেয়ে যায় বহু দর্শক ও শ্রোতার মনে। জাপানী নৃত্যে চোখ একজাতীয় তৃপ্তি পায় বটে কিন্তু সে শুধু রূপপ্রসাধনের তৃপ্তি। কী সুন্দর কিমোনো! শুনলাম আশি হাজার য়েন দাম—অর্থাৎ ১,২০০৲ টাকা। তার উপরে চিত্রিত কটিবেষ্টনী ওবি—দাম নাকি বিশ হাজার। হাতে দামী হীরের আংটি—এত বড় হীরের আংটি! এছাড়া আর কোনো গহনা নেই, না হাতে বালা, না কানে দুল, না গলায় হার। কিন্তু তা ব'লে সাজসজ্জার দৈন্য নেই। কত রকম অঙ্গাবরণী—রকমারি রঙের! আর এ প্রতিযোগিতা করছে ওর সঙ্গে অথচ সব জড়িয়ে একটি ছবি! না, এদের নৃত্য অপূর্ব নয়, গান অশ্রাব্য, কিন্তু তবু এদের নৃত্যগীতেরও আবহ রূপের, প্রসাধন তপস্যার। রূপকে যাঁরা সাধনীয় শিল্প মনে করেন তাঁদের আসা চাই সব আগে জাপানে, দেখা চাই জাপানী রূপসীর বেশভূষা, শোনা চাই তাঁর মধুময় হাসি, কণ্ঠস্বর, সম্ভাষণ।

ঘর থেকে বেরুতেই কিন্তু চম্‌কে উঠতে হ'ল ফের। গৃহস্বামিনী পুনরায় চটি পরিয়ে দিলেন নিজে হাতে। চুটিয়ে অতিথি-সৎকার বটে! আমাদের দেশে গৃহকর্ত্রী অতিথিকে বড়জোর পরিবেষণ ক'রেই ক্ষান্ত, কিন্তু এদেশে তিনি নিজের হাতে জুতো না পরিয়ে ছাড়েন না। কিন্তু এ যেন একটু আতিশয্যের কোঠায় পড়ে, নয় কি?

ঘণ্টা তিনেক লাগল ভোজন সমাধা হ'তে। তবে ডাক্তার রাউফ ও নায়ার গল্পগুজবে জমিয়ে রাখলেন। হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—সুরু এদের ওচা থেকে শেষও ওচায়। জাপানী সবুজ চা-এর নাম ওচা। আমাদের দেশের চা-এর নাম এরা দিয়েছে কোচা। তিনটি জাপানী গৃহে গিয়েছিলাম এখানে। প্রত্যেক গৃহেই ওচা ও কোচা দুই-ই দেওয়া হয়েছিল আমাদের। জানি না—আমরা বিদেশী ব'লে কিনা।

সব শেষে গৃহস্বামিনী পরিবেষণ করলেন ওচা—বাকায়দা—মানে, রীতি মেনে। কিসের রীতি? না, ওচা-নোয়ু-র। ইংরাজিতে এর তর্জমা—tea-ceremony; জাপানে ওচা-নোয়ু একটি বিশিষ্ট সামাজিক উৎসব। তাই এসম্বন্ধে দুটো কথা না বললেই নয়।

জাপানী জাতি স্বভাবে আধ্যাত্মিক নয়। অথচ মানুষ তো—পূজার প্রবৃত্তি তার যাবে কোথায়? কাজেই ভগবানের ধরা-ছোঁয়া না পেয়ে তারা সামাজিকতাকে

বরণ করল প্রতিমা ব'লে। সুশীলতা শালীনতায় এদের অত্যাসক্তি এই বধূবরণের ফল। কিন্তু রকমারি শাখাই তো গজিয়ে ওঠে মূল কাণ্ডের চারধারে। রূপপূজার একটি শাখা হ'ল এই ওচা-নোয়ু। চা'কে উপলক্ষ্য ক'রে এদের রূপপূজাপ্রবৃত্তির একটি পরম প্রকাশ হয়েছে সামাজিকতার প্রাঙ্গণে। চিত্রকলা আর একটি শাখা, গৃহসজ্জা আর একটি। কিন্তু ওচা-নোয়ু হ'ল একটি জীবন্ত প্রকাশ—গতিময় ব্যঞ্জনা। ছবি, আসবাব স্থির দাঁড়িয়ে। চা-পরিবেষণে গতির প্রকাশ। একটি একটি ক'রে পিয়ালা তুলে নিচ্ছেন গৃহস্বামিনী। পরম যত্নে, ভক্তিভরে ছোট ছোট তোয়ালে দিয়ে মুছছেন প্রতি পিয়ালাটি গরম জলে ধুয়ে। গরম জলে আগেই তো ধোয়া যেতে পারত—কিন্তু না, অতিথির সামনে করতে হবে একাজ—ঘটা ক'রে—যেমন পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ক'রে অঞ্জলি দেয় যজমানের সামনে। একলা ব'সে পূজা-তর্পণ ও পাঁচজনের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে সবাই মিলে কীর্তন—এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছেই। যাহোক, ভোজন-কক্ষ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ওচা-কক্ষে। সেখানে মাটিতে একটি গর্তে ফুটন্ত কেটলি বসানো, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। গৃহস্বামিনী আসন-পিঁড়ি, না থুড়ি, জাপানী ভঙ্গিতে পা মুড়ে মাদুরে ব'সে একটি পিয়ালা উঠিয়ে নিলেন; গরম জল দিয়ে ধুলেন; উষ্ণ, সিক্ত শুভ্র তোয়ালে দিয়ে অতি যত্নে মুছলেন; তারপর খুব ধীরচ্ছন্দে কেটলি থেকে ফুটন্ত জল একটি হাতা দিয়ে তুলে পিয়ালায় ঢাললেন; তারপর তাতে একটি চামচ দিয়ে সবুজ ওচা মেশালেন; তারপর আর একটি বুরুশাকৃতি চামচ দিয়ে সে-জল গুললেন। সর্বশেষে পার্শ্ববর্তিনী পরিচারিকাকে দিলেন, সে আমাদের দিল আভূমিপ্রণত অভিবাদন ক'রে। তারপর আমরা প্রত্যেকে পর পর অভিবাদন করলাম গৃহস্বামিনীর অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে। এতশত ঘটার পরে তবে চ-পান। আমরা মাত্র ক'জন অতিথি, কিন্তু এই অল্প ক'জনকে ওচা পরিবেষণ করতে সময় লাগল আধঘণ্টা। যদি চল্লিশজন অতিথি থাকতেন তবে এ-ওচা সেবনের সময় লাগত অন্তত দুঘণ্টা এবং এ-দুঘণ্টা সবাই প্রসন্নচিত্তে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন অপেক্ষা ক'রে। কেন? শুধু কি ঐ পিয়ালাটির জন্যে? না। এই সূত্রে জাপানী নরনারী এক ধরনের তর্পণ করে। আগে আগে জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নাকি এই ভাবে ওচা-নোয়ুর পুরশ্চরণ করত। আজকাল করেন ঘরে ঘরে গৃহস্বামিনী। পাদ্রী ওয়াল্টার ওয়েস্টন তাঁর বিখ্যাত "জাপান" গ্রন্থে লিখেছেন এই ওচা-নোয়ু তর্পণ-রীতি সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ে:

"Pending a loftier conception of a man's connection with the

spirit world, it is surely better for him, and happier to see divine influences touching his life at every turn through the simplest means, than to see nothing divine at all."

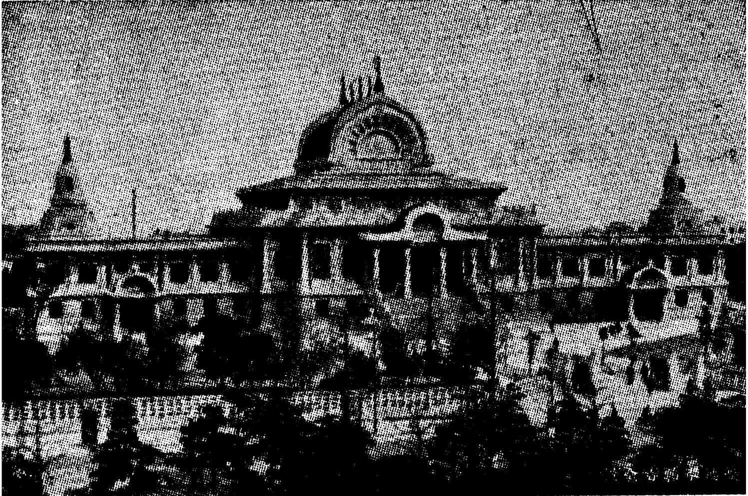
মন্তব্যটি অনুধাবনীয়। কারণ জাপানের সৌন্দর্য-অভীপ্সার মূলে আছে একটি অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা যা পূজার কোঠায় পড়ে। আমাদের দেশে পুরোহিত যজমানকে



টোকিয়োর জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

খুঁটিয়ে পড়ান কত কী মন্ত্র, দিতে শেখান কত রকমের পুষ্পাঞ্জলি—আচমন, স্তবন, অভিবাদনের সে কত ঘটা! আমরা হয়ত অধিকাংশই এ-ধরনের মন্ত্রাবৃত্তি বা দীপারতির মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতে পাই না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ-সব অনুষ্ঠান যে প্রাণহীন আচার-নিষ্ঠায় পর্যবসিত হয়েছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। তবু বলব যে, কোনো লোকাচারকে শুধু তার চলতি প্রাণহীন রূপে দেখলে ঠিক দেখা হয় না। দেখতে হবে কী আকূতি এসবের মধ্যে দিয়ে উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ চেয়েছে। জাপান ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করতে পারে নি ভারতের মতন, অথচ পূজার অভীপ্সা থাকেই প্রতি মরমীর মর্মে উপ্ত। কোনো গভীর আকাঙ্ক্ষাই

নিজেকে নিরুদ্ধ রাখতে পারে না। এভাবে না হ'লে ওভাবে সে করেই করে আত্মপ্রকাশ। জাপানে এই ঐকান্তিক পূজাবৃত্তি ছাড়া পেয়েছে—খানিকটা অন্তত —তার সামাজিক সদাচারের মঞ্জরণে। অন্তত এইভাবেই আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল ওদের রূপানুরক্তি ও সুশীলতার নিখুঁৎ কলাকারু। আর এ-কলাকারু এদের জাতীয় মনে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় মন্ত্রসিদ্ধির কোঠায়। কোনো জাতির নরনারীর মনে যে রূপানুরক্তি এতটা ব্যাপকভাবে প্রায় দেবভক্তির স্থান অধিকার করতে পারে ভাবতে পারা শক্ত। কিন্তু দেবতাকে এরা বরণ করে নি মনে প্রাণে, তাই রূপসিদ্ধিতে তূর্ণ হ'য়ে উঠল মহানুভব। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—বলে না ?

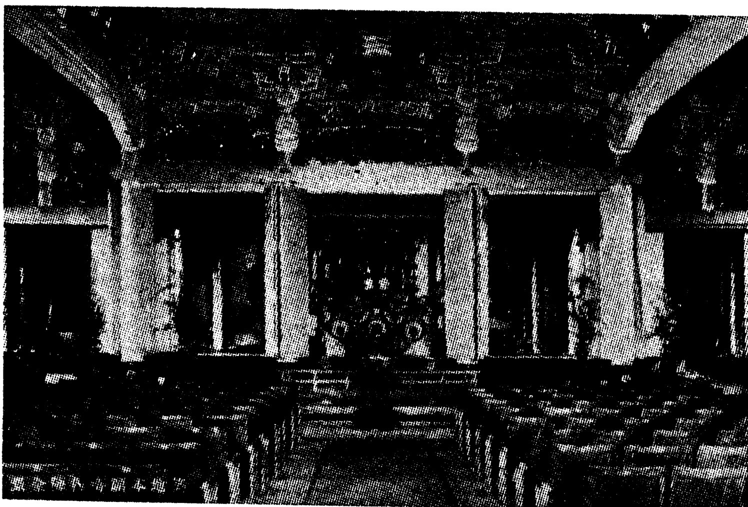


টোকিয়োর বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির ট্সুকিজি-হঙ্গানজি

একথা আর এক দিক দিয়ে উপলব্ধি করলাম—যেদিন গেলাম এদের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির দেখতে : ট্সুকিজি হঙ্গানজি। টোকিয়োতে নাকি এইটিই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরটি দেখে অভিভূত হ'তে হয়। য়ুরোপের গির্জা দেখেছি তো কত শত ! কিন্তু কোনো গির্জার স্থাপত্য-শিল্পই সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ জাপানী বৌদ্ধ-মন্দিরের কাছাকাছিও আসতে পারে না। ভিতরে বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত একটি বেদিকায়—সুরম্য স্বর্ণাভ কক্ষে। ট্সুকিজি হঙ্গানজি মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ণনা করার চেষ্টা বিড়ম্বনা—চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে কোনো মন্দির এত সুন্দর হ'তে

পারে। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরও এদের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের কাছে নিষ্প্রভ, যেমন আমেরিকান কুবেরদের ধনসম্পদের কাছে ভারতীয় ক্রোরপতির বৈভবও পাণ্ডুর। বামন ও মহাকায় মানুষের মধ্যে যে তফাৎ এদের মন্দির-সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের কীর্তির সেই তফাৎ।

কিন্তু তারপর? দেখলাম কয়েকটি চৈনিক পুরোহিত করছে মন্ত্রপাঠ। শূন্যগর্ভ প্রাণহীন লাগল। জানি না তাদের কাছে কি রকম লাগে এধরনের গতানুগতিক মন্ত্রজপ। আমাকে একজন বৌদ্ধ মোহান্ত, রেভারেণ্ড রিরি নাকায়ামা, নিয়ে গিয়েছিলেন এ-মন্দিরে। এ-মন্দিরের ভিতরে প্রকাণ্ড ফ্রেমে-টাঙানো অজস্র সাজানো ফুল দেখলাম। অপরূপ সে-পুষ্পসজ্জা। সারা মন্দিরটা যেন হেসে উঠল। কিন্তু হায় রে, ঐ পর্যন্তই। মৃত মন্দির। অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্ণাভ মূর্তি অপূর্ব, কিন্তু তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে কে?



ট্সুকিজি হঙ্গানিজি মন্দিরের অভ্যন্তর দৃশ্য

রেভারেণ্ড রিরি তারপর নিয়ে গেলেন গোকোকুজি নামক আর একটি বৌদ্ধ মন্দিরে। এ মন্দিরটি সৌন্দর্যে আগের মন্দিরটির প্রতিযোগী হ'তে পারে না, কিন্তু এখানে বৌদ্ধ সামগান শুনলাম। বহু নরনারী তালে তালে ঘণ্টা বাজিয়ে সমতানে গাইল স্তবগান বুদ্ধমূর্তির সাম্‌নে। জাপানে এই প্রথম শুনলাম এমন জাপানী গান যার সুর ও তাল আছে—যদিও সে-সুরের মাধুর্য বা বৈচিত্র্য বেশি নয়। না হোক

—তবু প্রথম সুরেলা গান শুনে মন যেন হাঁফ ছেড়ে বলল: আঃ, বাঁচলাম! সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম ভাবতে এদের কাবুকি নাট্যনৃত্যের বেসুরা অশ্রাব্য গান। কিন্তু সে-কথা যথাস্থানে।

বৌদ্ধ নরনারীদের স্তবগানের আগে মন্দিরের পুরোহিত আমার নাম ক'রে সবাইকে কি যেন বললেন। সঙ্গী বন্ধুবর বললেন—মন্দিরের মোহান্ত আমার নাম পেশ করছেন সবার কাছে। এর কোনো দরকারই ছিল না—কিন্তু সেই জাপানী শালীনতা। মোহান্ত বললেন স্তবের পরে তাঁদের মঠে বৌদ্ধ মধ্যাহ্নভোজন করতে। কিন্তু সে যাক।

গানের পরে এলেন এক এক ক'রে অনেকগুলি বৌদ্ধ পুরোহিত লাল নীল সবুজ লোহিত প্রভৃতি নানারঙা মহার্ঘ কিমোনো প'রে। যাঁরা বলেন ধর্মে বেশভূষার পারিপাট্য অচল তাঁদের দেখা দরকার এঁদের বেশভূষার চমক, ও কেমন ক'রে এ-আড়ম্বর চালু হ'য়ে গেছে এমন কি মন্দিররাজ্যেও। আমার ভালো লাগে সুন্দর বেশ—তবে একথা স্বীকার করব, এতখানি আড়ম্বরে মন যেন সায় দিতে চায় না। তবে হয়ত ওদের কাছে এ-সজ্জা খুব সরল প্রসাধনের মতনই মনে হয়। একথা মনে হয় এই কারণে যে, রূপকারুর বহু অনুশীলনের ফলে জাপানীর কাছে রূপরাগের দাবি খুব বেশি হ'য়ে উঠেছে। আমরা মন্দিরে "এঁটো" কিছু ফেলতে যেমন পিছপাও, এদের মোহান্তরা মন্দিরে কুরূপ সাজে স্তবগান করতে বোধ হয় ততখানি পিছপাও—কিন্তু যা বলছিলাম।

বৌদ্ধ পুরোহিতগুলি স্তবগানের পর সুর ক'রে আবৃত্তি সুরু করলেন যাকে ইংরাজিতে বলে incantation: সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চম্‌কে উঠলাম—ও কী? —প্রতি মোহান্ত এক হাতে তুলে ধরলেন আমাদের দেশের তালপাতায়-লেখা-চণ্ডীর-মতন এক একটি বই ও বইয়ের পাতা ঝ'রে পড়তে লাগল জলপ্রপাতের মতন নিচের হাতে। একবার ডান হাত উপরে ওঠে তখন বাঁ হাত নিচে থেকে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি ধরে, যেমন জাদুকর ধরে এক হাতে অপর হাত থেকে টানা তাস—তারপর বাঁ হাত উপরে ওঠে, তখন ডান হাত ধরে নিচে থেকে। বুঝলাম এও ওদের একটি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। কিন্তু তারপরে যখন ওরা প্রত্যেকে ঝঙ্কার সুরু ক'রে দিল মাঈ, আঈ-ই, আঈ-ই-ই ব'লে তখন আর পারলাম না। পিতৃদেবের গান মনে পড়ল, দিলাম "চম্পট পরিপাটি"।

মোহান্ত বন্ধুকে কিছু বললাম না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল—কেন এ-ধরনের প্রাণহীন মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি তাঁরা জীইয়ে রেখেছেন। বাড়ি এসে বন্ধুবর রাজদূতকে বললাম যে, জাপানে দেখলাম দুটি জিনিষঃ সৌন্দর্যপূজা অতিজীবন্ত, তথা দেবপূজা মৃত না হোক জীবন্মৃত। অথচ মনে হয় এক সময়ে এ-সব মন্ত্রপাঠের পিছনে ছিল প্রাণশক্তি—যখন অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসুর দল ভগবানকে উপাসনা করত অন্তরকে অঞ্জলি দিয়ে, বাইরের আনুষ্ঠানিকতাকে এত বড় ক'রে না দেখে। তবে এ-বিষয়ে আমার ধারণা ভুল হ'তে পারে। তাই যেন হয়। কারণ ভাবতে খারাপ লাগে—মন্দির আছে, প্রতিমা আছে, পুরোহিত আছে, মন্ত্রপাঠ আছে—নেই কেবল হৃদয়ের কোনো বালাই। ধর্ম যে আজকের দিনে অধিকাংশ চিন্তাশীল তথা সচেতন মনের কাছে অগ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে তার একটি মস্ত হেতু নিশ্চয়ই এই প্রাণহীন আবৃত্তি, গতানুগতিক মন্ত্রপাঠ, অর্থহীন পুষ্পাঞ্জলি—এক কথায় শুষ্ক লোকাচার। কিন্তু তবু বলব ভারতে এখনো ধর্ম জীবন্ত—নানা তিথিতে স্নানার্থীর ভিড়, কুম্ভমেলায় সাধুসন্তের সমাবেশ, নানা মন্দিরে নানা উৎসবে বহু ভক্তের সাগ্রহ অভিযান, তীর্থযাত্রায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারও পদব্রজে বহু কষ্টে সুদূর-প্রয়াণ ইত্যাদি কোন্ বাণী জ্ঞাপন করে? না, লোকাচার বহুক্ষেত্রেই প্রাণবত্তাকে নিষ্প্রভ করলেও বহু ধর্মার্থীর অন্তরে ধর্মানুরাগ এখনো বেঁচে আছে। আমি একথা প্রমাণ করতে পারব না, তবে মনে হয় কোনো চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ মানুষ যদি আজকের দিনেও নিস্পৃহভাবে চোখ চেয়ে দেখেন জাপানের ধর্মাচার ও আমাদের দেশের ধর্মানুরক্তি তাহ'লে তিনি মানবেনই মানবেন যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা শোচনীয়, জীবন্মৃত—যেখানে ভারতে এই অধঃপতিত যুগেও সে বেঁচে আছে…এমন কি বাইরে যাঁরা দেখতে অবিশ্বাসী তাঁদের মধ্যেও সবাই না হোক্ অনেকেই সত্য সাধু দেখলে মাথা নোয়ান। শক্তি ও ধনের প্রতিপত্তি অন্য দেশে যে ভাবে সমীহ পায় তার চেয়েও বেশি সমীহ পায় আমাদের দেশে খাঁটি সাধু, নির্ভেজাল ঋষি, আন্তরিক ভক্ত। জাপানে এসে যেন ভারতবর্ষকে একটা নতুন চোখে দেখতে শিখলাম। মনে হ'ল শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দ নিছক দেশভক্তিবশেই এ-ঘোষণা করেন নি যে, ভারতের প্রাণপুরুষ আজও বিরাজ করছে তার শিল্পে নয়, কলকারখানায় নয়, বৈভবে নয়, এমন কি বুদ্ধিবাদী দর্শনের গবেষণায়ও নয়—ভারতের প্রাণপুরুষ আজও ধুক ধুক করছে তার অন্তরাত্মায় নিহিত বৈরাগ্য ও ভক্তির মণিকোঠায়। য়ুরোপে মঠ-আদি প্রতিষ্ঠান জীবন্মৃত, জাপানে পূজারতি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত, কিন্তু ভারতে ধর্ম আজও জীবন্ত—ভক্তি জ্ঞান নিষ্ঠা তপস্যায় শ্রদ্ধা আজও

দীপ্তিময়ী না হ'লেও প্রাণের উত্তাপে সমাদৃত, বিশ্বাসের সিঞ্চনে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

* * *

বন্ধুবর রাউফকে বললাম: জাপানী অভিনয় ও নৃত্যগীত দেখতে হবে। তিনি টোকিয়োর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল থিয়াটারে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতবড় থিয়েটারে একটিও আসন খালি ছিল না। তবু ওরা রাজদূতকে খাতির করল বৈকি। চারটি স্পেশাল চেয়ার এনে সামনে বসাল। আমি, ইন্দিরা, ডাক্তার রাউফ ও নায়ার। নায়ার জাপানী জানেন ব'লে একটু সুবিধা হ'ল।

নাটকটির নাম য়ুকি গুমি, মানে তুষার-পরিষৎ। নাটকটির গল্প ছেলেমানুষি! জাভার স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটি অতি বাজে প্লট। অভিনয় ভালো লাগল, কিন্তু তাকে য়ুরোপীয় অভিনয়ের নিপুণ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেবল আমি একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম: জাপানীরা খুব হাসে। একটি দৃশ্যে কেবলই হাসির গররা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখি ওরা কান্নাও সমান ভালবাসে! নায়িকা কী কান্নাই না কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—আর যখন তখন! আর শুধু কি নায়িকা? অমন যে পাষাণ গোয়েন্দা—যে মেরে ফেলল নায়িকাকে—সে-ও কেঁদে ভাসিয়ে দিল! মেলোড্রামা বলতাম, যদি নাটিকাটির প্রায় গাছ-পালাও না নাচত। উঃ, কথায় কথায় নাচ! সঙ্গে নির্ভেজাল য়ুরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীত ওরফে অর্কেস্ট্রা। জাপানী নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত য়ুরোপীয় হার্মনি—য়ুরোপীয় ঢঙের পরিচালনা—পিয়ানো বেহালা বাঁশি—সব য়ুরোপীয়। কেবল পোষাক ও ভাষা ছাড়া জাপানী কিছুই নেই এদের আধুনিক গীতিনাট্যে। বইয়ে পড়েছিলাম জাপানী সঙ্গীত ব'লে বিশেষ কিছু নেই, মানে যা আছে সে না থাকলেই জাপানের মর্যাদা বাড়ত। কিন্তু বইয়ে পড়া এক, চোখে দেখা আর। এ-সস্তা নাট্য-নৃত্যটি যে আদ্যন্ত য়ুরোপীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউজিকাল কমেডির তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ! অবশ্য বেশভূষার চমক, আলোর জৌলুষ, দৃশ্যের নৈপুণ্য—যেমন একটি ঝড়ের দৃশ্য, সমুদ্রের ধারে—মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু কোথায় নাটকীয় সংঘাত, অভিনয়-চাতুর্য, নৃত্যগীতের বৈশিষ্ট্য? নাঃ। জাপানী অভিনয় মনকে আবিষ্ট করতে পারে না। সবচেয়ে আক্ষেপ হ'ল দেখে যে, জাপানী গানবাজনা ব'লে কিছুই নেই জাপানী নাট্যনৃত্যে। চোখ বুঁজলে এ-গানবাজনা শুনতে শুনতে মনে হয় কোনো য়ুরোপীয় শহরে ব'সে আছি বা! মানুষের বুদ্ধিরও হয়ত নানারকম সংস্কার আছে, হয়ত কোনো চিন্তাই পুরোপুরি স্বাধীন নয়, কিন্তু

তবু একটা কথা বোধ হয় বলা চলে: জগতে সব জাতির আচার, সংস্কৃতি, বেশভূষা, চালচলন, প্রকাশরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু একই ধরনের হ'লে তাতে ক'রে বিশ্বমানবের ক্ষতি বৈ লাভ নেই। তাই জাপানী গৃহসজ্জা, সদাচরণ, চিত্রকারু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যে ও সৌন্দর্যে যে-পরিমাণে মুগ্ধ হয়েছিলাম জাপানী নাট্যনৃত্যে তথা সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যহীনতায় সেই পরিমাণেই নিরাশ হ'তে হ'ল।

ডাক্তার রাউফ তথা নায়ার বললেন, জাপানী কাবুকি নৃত্যে মিলবে যা আমি চাইছি—জাপানের জাপানিত্ব। তথাস্তু: গেলাম কাবুকি নাট্যালয়ে কাবুকি নাট্যানন্দ উপভোগ করতে।

কিন্তু ও মা! এ কী কাণ্ড! কোথায় নাটক, কোথায় সঙ্গীত, কোথায় অভিনয়! আছে শুধু দৃশ্য ও আলোর বাহার। ব্যস্। যেমন অসহ্য ন্যাকামি-ভরা এদের সেকেলে অভিনয়, স্বরভঙ্গি, প্রসাধন, সর্বোপরি দুঃসহ জাপানী গান ও সামিসেন বাদন—তেমনি অর্থহীন এদের নাটকীয় গল্প বা প্লট। একটি মাত্র একাঙ্কিকা নাটিকার গল্প সংক্ষেপে বলি। এক যে ছিল জাপানী কুমারী। ভালোবাসলো এক জাপানী বীরবংশীয় অভিজাতকে। প্রণয়ীর ভালোবাসা সত্য কি না পরখ করতে চেয়ে কুমারী ভেঙে ফেললেন তাঁদের বাড়ির একটি রঙিন রেকাবি। প্রণয়ী বিরক্ত হ'লেও ক্ষমা করলেন অসাবধান প্রণয়িনীকে। কিন্তু পরে যেই প্রণয়িনী বললেন তিনি প্রণয়ীর প্রণয়কে পরখ করতেই রেকাবি ভেঙেছেন অমনি বীরপুরুষ তাকে কেটে ফেলে সাম্‌নের আঙিনায় একটি কুয়োয় কবরস্থ ক'রে ছুটলেন কোথায় লড়াই হচ্ছিল সেখানে। সাবাস জোয়ান! নারীকে এক সময়ে নর হয়ত এই চোখেই দেখত—নগণ্য খেয়ালের পুতুল—কিন্তু এখনো সে-ভাব কি রঙ্গমঞ্চে দেখতে পারে কেউ?

আর একটি নাটিকারও অম্‌নিতরই প্লট। মন থই পায় না—এরি নাম বিখ্যাত কাবুকি! এ যে উন্মাদের প্রলাপ গো! বহু চেষ্টা করলাম এসব কুলীন সেকেলে অভিনয়কে ঠিক চোখে দেখতে। কিন্তু পারলাম না। দুটি একাঙ্কিকা নাটিকা দেখে বললাম ডাক্তার রাউফকে: আর বরদাস্ত হচ্ছে না—চলুন।

আমরা যতই বড়াই করি না কেন পুরাকাহিনী নিয়ে, একটা কথা বোধ হয় কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবেন না যে কালিদাস মিথ্যা বলেন নি: "পুরাণ-মিত্যেব ন সাধু সর্বম্"। যেমন একালেরও সব কিছুই সাধু নয়, তেমনি সেকালেরও

সব কিছু প্রশস্ত ছিল না। কিছু পাই কিছু হারাই দিনে দিনে, কিন্তু তবু যা ছিল তাকে পুরোপুরি বজায় রাখা যায় না। আধুনিকতা আমাদের ঠেলে, অতীত ডাকে। চাই এই দুয়ের সামঞ্জস্য। জাপানী নাট্যনৃত্যে সর্বত্র পরিত্যক্ত হয়েছে অতীত ঃ কাবুকিতে অস্বীকৃত হয়েছে আধুনিকতা। অতীত অমর—মানি। কিন্তু শুধু প্রেরণায়। মানি আনন্দের একটা অংশ আছেই শাশ্বত, সনাতন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিকে হ'তেই হবে চলমান, নিত্য-পুনর্নব। জাপান আজ একটা আদর্শ-সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে। য়ুরোপীয় সভ্যতা তার উপর চড়াও হ'য়ে এসেছে তাকে বদলাতে। হয়ত তার অনেক কিছু বদলাতেই হবে। অথচ জাপানে দেখি



টোকিয়োর কাবুকি মিউজিয়ম

কাবুকি নৃত্যে জাপানীর কী উৎসাহ! কাবুকি জাদুঘরে গিয়েছিলাম একদিন। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে, কিছুদিন আগে জাপানীর কাবুকি-উৎসাহে ভাঁটা প'ড়েছিল কিন্তু ফের সে-উৎসাহ উজিয়ে উঠেছে। এক কথায় দুটো স্রোত তাকে চালাচ্ছে। একটা বলে ঃ "ছাড়ো অতীতকে পুরোপুরি, ধাও ধাও সাম্‌নে দ্রুতগতিতে।" আর একটা বলে ঃ "সাধু, সাবধান! সাবেকী কৌলীন্য বজায়

রাখো। যা কিছু জাপানী, তার আদর করতে শেখো। দেশের কুকুরও বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে বরেণ্য।"

আমাদের চরকা-প্রীতির সঙ্গে জাপানের কাবুকি-প্রীতির যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে কত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকও তো চরকা বলতে আত্মহারা! তেমনি ওদের। "কাবুকি! আহা মরি মরি!"—এই মনোভাব দেখলাম বহু জাপানীর মধ্যেই দৃঢ়মূল। পূর্বপুরুষ-পূজাবৃত্তি নেই কার মধ্যে? কিন্তু হায় রে, যেমন কোনো পিতাই চিরদিন বাঁচেন না, বাঁচতে হ'লে জন্মগ্রহণ করেন পুত্রের মধ্যে—তেমনি অতীতকে জীইয়ে রাখা যায় না তাকে পুরোপুরি বজায় রাখতে চেয়ে। সাম্‌নের দিকে এগুনো মানেই পিছনকে খানিকটা অন্তত বিদায় দেওয়া। যা কাল ছিল তা আজ অবিকল অবিচল থাকতে পারে না। অতীতের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব, সম্ভব কেবল নবজন্ম। তাই না শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "Traditions of the past are great in their own place—that is, in the past. But that is no reason why we should go on repeating the past. A great past ought to be followed by a greater future."

জাপান মস্ত জাত। জাপানী চরিত্রের গুণাবলী অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই ভরসা রাখার পথ আছে যে, জাপানী জ্ঞানী ও ভাবুকরা জাপানকে যথাযথ পথনির্দেশ দেবেন, যার ফলে যেমন অতীতের মধ্যেও তারা কারারুদ্ধ থাকতে পারবে না, তেম্‌নি আধুনিকতাও তাকে পারবে না মোহমুগ্ধ ক'রে রাখতে।

* * *

১৪ই জানুয়ারি ডাক্তার রাউফ বললেন: "চলুন য়োকোহামা দেখিয়ে নিয়ে আসি।" ও বাবা! য়োকোহামা বলতেই কেন জানিনা মনে পড়ে ভ্‌লাডিভস্টক! কিন্তু ভয় পেলাম না, গেলাম দুর্গা ব'লে।

সেদিন কিছু দেখলাম তবু জাপানের। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যার বর্ণনা করতে মন উজিয়ে ওঠে। কেবল এই সূত্রে দেখলাম একটা জিনিস: আমাদের দেশের কত ব্যবসায়ী আছে যারা জাপানে আছে সেইভাবে যাকে বলা যায় পিতৃদেবের গানের ভাষায়:

"আমরা খাসা আছি।
হাস্য পেলেই হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি
আর চন্দ্রমুখে আহার করি দুগ্ধ সর চাঁচি।"

য়োকোহামায় "সৈন্ধব" বণিকদের দেখলে তিনি জুড়ে দিতেন :

আর হয় রেডিও নয় বা বোতল খুলে তবেই বাঁচি।

যাক। এঁরা খাসা আছেনই বটে। তবে আমার অত হররা সইল না—ডাক্তার রাউফকে বললাম : "দেখা হ'ল, এবার চলুন প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরি মানে মানে।"

কিন্তু বণিকরা খুব যত্ন করলেন মানতেই হবে। আমার গান নিলেন টেপ-রেকর্ডিং গ্রামোফোনে। দিলেন আমাকে ভরসা যে হনোলুলুতে রাম ওয়াটুমল নামক অভিজাত বণিককে তার ক'রে দেবেন আমাকে সেখানে দেখতে শুনতে।

১৭ই জানুয়ারি টৌকিয়োর বিখ্যাত সংবাদপত্র "আসাহি"-র কর্তৃপক্ষের হল-ঘরে আমার গানের সঙ্গে ইন্দিরার নাচ। লোক হয়েছিল অজস্র। বহু লোক বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েই ছিল সমস্তক্ষণ। জাপানী রাজকুল, শিল্পি-কুল, নানাদেশীয় রাজদূতবৃন্দ, মান্যগণ্য বহু জাপানী নরনারী ছিলেন উপস্থিত। নৃত্যগীতের শেষে বহু লোকই নিজে থেকে এসে আমাদের উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানালেন অভিনন্দন। তাই আশা করা যায় জাপান ভারতীয় নৃত্যগীতে সাড়া দিয়েছিল। এক জাপানী ইংরাজি কাগজে লিখল পরদিন : "A concert of Indian music was presented on Saturday evening under the auspices of the Indian Embassy at the Asahi Building, Tokyo. The concert featured the playing and singing of Shri Dilip Kumar Roy and a display of Indian dancing by Shrimati Indira Devi. Roy sang six selections, Miss Devi dancing to three of these. Several songs were sung in English as well as in their original words, Roy explaining their moods and significance. The music, although somewhat strange to the uninitiated, was stirring and beautiful. Miss Devi danced very gracefully, conveying the meaning and mood of each song with great skill."

আরও নানা কাগজেই ওরা খুব উপহাস করেছিল আমাদের নাচগান সম্বন্ধে।

জাপানে জাপানীদের মধ্যে আমাদের নৃত্যগীত এতটা সমাদর পাবে তা সত্যিই ভাবি নি, কিন্তু মনে হয় আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে

তার মর্মবাণীটি হৃদয়ের আবেগের মাধ্যমে ওদের হৃদয়ের দরবারে পৌঁচেছিল— যে-ভাবেই হোক। নৈলে আমাদের ভক্তিসঙ্গীত বা নৃত্যসঙ্গীত ওদের হৃদয়কে এভাবে স্পর্শ করতে পারত না কখনই।

স্পর্শ যে করেছিল তার প্রমাণ পেলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। জাপানী রাজবংশের এক অভিজাত এসেছিলেন। ইন্দিরা যখন নৃত্যবেশ পরছিল তখন তিনি এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করলে সে রাজপ্রাসাদে নাচতে রাজি আছে কি না। ইন্দিরা বলল যে আমরা পরদিনই আমেরিকান বিমানে হনোলুলু রওনা হচ্ছি, কাজেই রাজপ্রাসাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব।



টোকিয়োর 'আসাহি' হলে দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী

এছাড়া আরো অনেক প্রমাণ পেলাম। ফরাসী রাজদূত, আমেরিকান রাজদূতের স্ত্রী-কন্যা সাগ্রহে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যে-ভাবে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ দিতে এগিয়ে এলেন তার মধ্যে শুধু লোকাচারের সুশীলতা ছাড়াও কিছু প্রকট হয়েছিল। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী নোগুচির পুত্র সস্ত্রীক এসেছিলেন ত্রিশ মাইল মোটরে ক'রে। গান শুনে তিনি গভীর তৃপ্তি প্রকাশ করলেন।

কিন্তু এই আসরে আমি নিজে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এক বর্ষীয়সী জর্মন মহিলার প্রশংসায়। আমি পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানটি চারটি ভাষায় গেয়েছিলাম সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি ও জর্মন ভাষায় সব শেষে। তিনি সোচ্ছ্বাসে তারিফ করলেন আমার জর্মন উচ্চারণের। এ-প্রশস্তিকে অবশ্য লৌকিক বলা চলতে পারত যদি না পরদিন তিনি বিশ মাইল মোটরে ক'রে আসতেন বিমানঘাঁটিতে আমাদের বিদায়-



টোকিয়োর 'আসাহি' হলে দিলীপকুমার ও ফরাসী রাজদূত

সম্ভাষণ জানাতে। তাঁর এতখানি উচ্ছ্বাসে আর্দ্র হ'য়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: "এই শীতে এতদূর ধাওয়া ক'রে এলেন কেন এত কষ্ট ক'রে?" তিনি বললেন: "আপনার কাছে যা পেয়েছি তার প্রতিদান দেওয়া আমার অসাধ্য, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানানোর আর কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না।"

রোলাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল : "তোমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে যে বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের আবেদন আছে তা সুকুমারহৃদয় সঙ্গীতরসিক মাত্রেরই হৃদয়ে অনুরণন তুলবেই তুলবে—দেখে নিও। আর এ-সঙ্গীতের প্রচার তোমাকেই করতে হবে—একথা তুমি যেন না- ভোলো।" এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা এমন কি তর্কাতর্কিও করেছি এক সময়ে। পত্রেও তাঁকে লিখেছি একাধিকবার যে, আমার মনে হয় না আমাদের স্বাতন্ত্র্যপন্থী সঙ্গীতে বিদেশীরা রস পেতে পারে। কিন্তু তার পরে বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি যে তাঁর কথাই সত্য, আমার ধারণাই ছিল, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি ভ্রান্ত। জাপানে বিমানঘাঁটিতে হঠাৎ একথা মনে পড়ল এই নাম-না-জানা জর্মন মহিলার গভীর উচ্ছ্বাসে। মনে মনে নমস্কার করেছিলাম তখন সেই অসামান্য সঙ্গীতদ্রষ্টাকে। কারণ যে-কোনো উচ্চবিকশিত সঙ্গীতের শ্রোতা মিলতে পারে অনেক, কিন্তু বোদ্ধা বিরল—সব দেশেই। তবে শুধু সঙ্গীতেই বা বলি কেন ? সব কিছুতেই দৃষ্টিবর পায় 'কোটিতে গোটিক জনা'।

টোকিয়োতে এবার যে-আমেরিকান বিমানে উঠলাম তাকে বলে ডবল্-ডেকার—মানে দুতলা—জাহাজের মতন, উপর থেকে নিচে নামা যায়। আর নিচে এলে—ও মা! চমৎকার বৈঠকখানা! সেখানে ব'সে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি মহা উৎসাহ প্রকাশ করলেন আমি গায়ক শুনবামাত্র। তাঁর নামধাম দিলেন—সানফ্রান্সিস্কোয় আমাদের আসরে যেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে না ভুলি।

জাহাজে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়—যদিও জলের আলাপী স্থলে পুনর্দর্শন দেন কদাচিৎ। কিন্তু এই বিমানে স্টিফেন শোয়েবেল নামে এক আমেরিকান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল যে ইউ-এন-ওর কাজে ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরছিল—তাকে বলা যেতে পারে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত চারটেয় বিমান নামল "ওয়েক দ্বীপে"। এখানে শুধু বিমান নামে ব'লেই কয়েকশো লোক মোতায়েন করা হয়েছে। টোকিয়োর দারুণ ঠাণ্ডার পর শেষ রাতে যখন সবাই মিলে এ-দ্বীপে নামলাম তখন দেহ মন যেন জুড়িয়ে গেল স্বদেশী মলয় হাওয়ায়। শীতের দেশে হাওয়া অস্পৃশ্য। অথচ মন্দানিলের কী অপরূপ আদর! মনটা হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বাসী হ'য়ে ওঠে আর কি—মনে হ'ল যেন স্বদেশের স্পর্শ পেলাম পবনদেবের এ-পরিচিত স্নেহসম্ভাষণে! সেখানে নেমে সরবৎ খাচ্ছি এমন সময়ে শোয়েবেল

এসে গল্প জুড়ে দিল—একথা সেকথা কত কথা! পুলকিত হ'লাম শুনে যে সে আমার Among the Great পড়েছে। হনোলুলুতে তথা সানফ্রান্সিস্কোয় ও আমাদের খুব সমাদর তথা উপকারও করেছিল নানা ভাবে। ছেলেটি বড় অমায়িক ও ভদ্র। কিন্তু মানুষের নৈতিক ধারণা কত বদ্‌লে গেছে হঠাৎ টের পেলাম তার একটা কথায়। কথাটা সে এমন ভাবে বলেছিল যে ভারি মজা লেগেছিল। বলি।

ইন্দিরাকে কথায় কথায় সে বলল: "দেখুন! ভারতীয়রা ভারি চমৎকার লোক—কিন্তু তাদের ধরন ধারণ একটু যেন অদ্ভুত?"

"অদ্ভুত? কেন?"

"আর কেন? আমি ছিলাম একটি হিন্দুপরিবারে। সেখানে একটি তরুণীর সঙ্গে ভাব হ'ল। তাকে একদিন বললাম আমার সঙ্গে দু'চারদিন কোথাও বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু সে গেল না। অদ্ভুত নয়?"

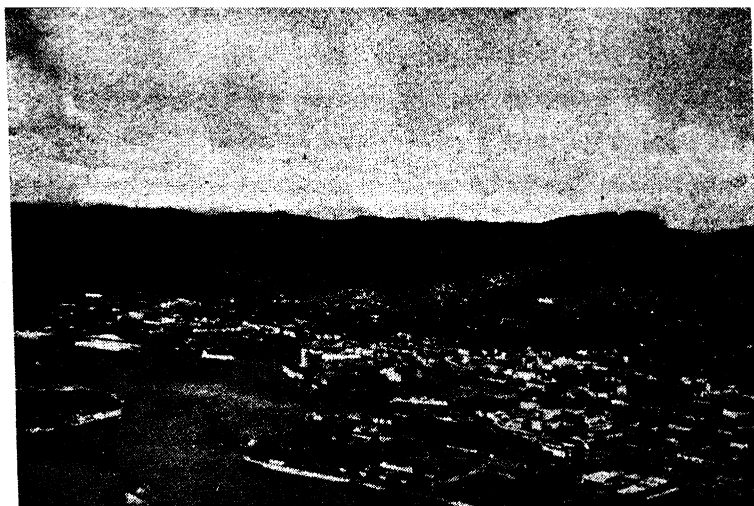
ইন্দিরা শুনে খুব হেসেছিল। কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ সে যে এতে অবাক হয়েছিল, ভাবতে আমার যেন আরো বেশি অবাক লেগেছিল। মনে জেগেছিল প্রশ্ন: "তবে কি বলব এক যুগ আর এক যুগের মনোভাবকে কখনোই বুঝতে পারে না পুরোপুরি? পুত্রকে পিতা ভালোবাসতে পারেন, কিন্তু চিনতে পারেন না? আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের চলার ছন্দ এখনো মন্দাক্রান্তাই বলব। তাই না ভাবনা! ওদেশে গিয়ে কী দেখব কে জানে? আমরা কী বলব আর ওরা কী বুঝবে?"



# হাওয়াই

# হনোলুলু

হনোলুলু। হনোলুলু! কী কাণ্ড! মনে পড়ে বাল্যকালে প্রথম যখন ভূগোল পড়ি তখন খুব মজা লাগত দুটো নাম শুনে। যদি কালাপানির পারে যাই, কোথায় যেতে সাধ সব আগে? না, হনোলুলু ও মাদাগাস্কার। এসব দেশে যে মানুষ সত্যি সত্যি যেতে পারে এমন কথা কল্পনা করতে পারলেও বাস্তব ব'লে মনে হয় নি। সেই হনোলুলু! আর কী হনোলুলু! জর্মন ভাষায় যাকে বলে und wie!



বিমান থেকে হনোলুলুর দৃশ্য

সত্যি কী দেশ! গন্ধর্বলোকের কথা কানে শুনেছি, চোখে দেখি নি। শুনেছি বড় বড় যোগী ধ্যানীরা নাকি ধ্যানের পাখায় সে-রাজ্যে টহল দিয়ে আসেন কখনো কখনো। একদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে এও শুনেছিলাম যে, আমাদের মর্ত্য রাজ্যে সৌন্দর্যের অনেক প্রেরণা আসে নাকি গন্ধর্বলোক থেকে। ১৯২৭ সালে পল রিশার

আমাকে বলেছিলেন: রবীন্দ্রনাথ গন্ধর্বলোক থেকে এসেছিলেন। জানি না, এসব উক্তির মর্ম। একসময়ে হয়ত স্রেফ অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু গুরুদেবের দেহাবসানের পরে এই দুবছর ইন্দিরার মাধ্যমে এত শত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে আমার জীবনে যে অবিশ্বাসকেই এখন বেশি অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাই যদি বলি হনোলুলু দেখে মনে হয়েছিল যে, গন্ধর্বলোকের ছিটেফোঁটা এদেশের গায়ে লেগেছে এ-হেন জনশ্রুতিকে অবিশ্বাস করার আর জোর পাই না, তাহ'লে হয়ত খানিকটা বোঝানো হবে আমার মনোভাব, বা উচ্ছ্বাসের পরিমাণ। অবশ্য এদেশবাসীরা যে রূপে গন্ধর্ব কিন্নর তা বলছি না, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য এদেশে সৌন্দর্যের এমন একটা শিখরে পৌঁছেছে যে বলতে সাধ হয়:

শ্যামল কান্তি পরম শান্তি
আনন্দ উছলিল!
রূপে অতুলন এ-হেন ভুবন
কে কেমনে কল্পিল!

রূপ ব'লে রূপ! কত তৃণ, কত তরু, কত ফুল, কত ফল, কত লতা, কত পাতা আর সবার উপরে সবুজের সে কী চেক্‌নাই! ফুটপাথ যে-ফুটপাথ সেখানেও ঘাসের বাহার! একটি বড় রাস্তার মাঝে ফুটপাথ—নবীন তৃণাস্তৃত—দুধারে চলেছে মোটর—একদিকে মোটর সারি সারি তিনটি কলামে উধাও এমুখে, অন্যদিকে ছুটেছে—ওমুখে। একটি রাস্তায়, ভাবুন, ছয়টি সারে মোটরের শ্রেণী চলতে পারে স্বচ্ছন্দে, পাশাপাশি! মাঝের ফুটপাথে দাঁড়ালে উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হয়। তবে অদৃশ্য পুলিশ দাঁড় করায় লাল আলোর তর্জনে, তখন পার হ'লে বিপদ্ কোথায়? কিন্তু এ তো হ'ল ওদের ব্যস্ততার কথা, ধনবৈভব যানবাহনের কথা—ফিরে আসি প্রাসঙ্গিকতায়—হনোলুলুর নিসর্গশোভার কথা বলছিলাম না? অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি! সমুদ্র মিশেছে শৈলমালার সঙ্গে। যদি শুধু এইটুকু হ'ত তাহ'লে অবশ্য "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" বলা চলত না। গাছ-পাতার শোভা—এ-ও অন্যত্র দেখা যায়। সবুজ মাঠের অজস্রতা—এও মেলে ধরাধামে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি জুড়ে দেওয়া যায় রাস্তাঘাটের একান্ত মসৃণতা তথা পরিচ্ছন্নতা? যদি জুড়ে দেওয়া যায় মশামাছি পতঙ্গের একান্ত বিরলতা (শুনলাম সর্পাদিও নাকি এখানে নির্বংশ!)? যদি জুড়ে দিই সমুদ্রের জলের নানা রূপ একই সময়ে—এখানে নীল, ওখানে সবুজ, ওখানে পাটল, ওখানে নীল-লোহিত? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—

মণিমালা পরি কে সাজে গো মরি ! নিত্য-দীপালি রাগে
আকাশের তারা আনন্দে সারা—দেখে কি মুখ সোহাগে ?

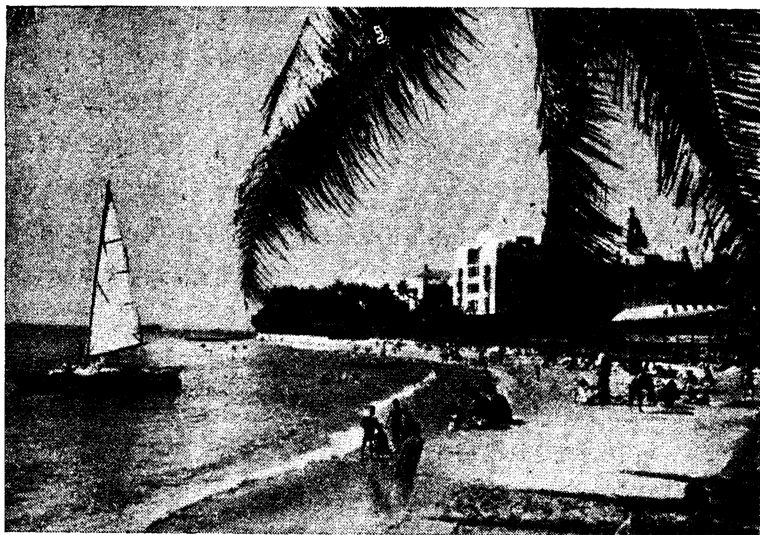
যদি জুড়ে দেওয়া যায় সোমবৎসর এখানে চিরবসন্ত—সত্তর থেকে পঁচাশি ডিগ্রি এখানে উত্তাপ—মধ্যাহ্ন লগ্নেও এতটুকু উত্তাপ দেহকে উদ্ব্যস্ত করে না ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—রাস্তার দুধারে বিপণিশ্রেণীর মধ্যেও চোখকে আহত করে এমন একটি দোকানও মেলে না ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—বৎসরে সব ঋতুতেই এখানে ফুলের মৌসুম থাকে ? যদি জুড়ে দেওয়া যায় এখানে নিবাস-গুলি প্রায় সর্বত্রই ছবির মতন দেখায়—প্রতি কুঞ্জে একটি ক'রে রঙিন কুটীর—যার এপাশে শ্যামল গাছ, ওপাশে সবুজ ঘাস—অথচ রাস্তায় ঘাটে অজস্র ট্রাম বাস চলা সত্ত্বেও শহর প্রায় নিঃশব্দ ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথেও এতটুকু ধুলোর চিহ্ন নেই কোথাও ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—কিন্তু না, আর থাক্। পাঠকপাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি হ'লে আখের নষ্ট হবে যে ! এক কথায় মনে হয় যে, ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্য থেকে যখন পুরাকালে নির্বাসিত হ'তেন তখন বুঝি-বা এই দ্বীপটিতে এসেই লুকিয়ে থাকতেন, আর ওঁর অনুগত অনুচর-বৃন্দ হারানো রাজ্যের পত্তন করত এদেশে—দেবরাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো ! যাক্, এবার উচ্ছ্বাস ছেড়ে বাস্তবের কোঠায় ফিরে আসি—যদিও পদ্যের পরে গদ্য—রসভঙ্গের দায়ে পড়ব হয়ত ! নিরুপায়। পালা গান সুরু করলে, সারা না হ'লে থামা যায় কি ?

হনোলুলুতে পৌছতেই সেই বণিক-বন্ধু—রাম ওয়াটুমল প্রকাণ্ড মোটর নিয়ে এসে হাজির।

ইনি ধনী। এখানে এঁদের তিনচারটি দোকান আছে। চমৎকার বাড়ি—এদেশের স্টাইলে তৈরি ও সাজানো। যাহোক, আমাদের স্বদেশীয় বণিক যে এভাবে থাকতে পারেন, ধনাগমে যে তাঁর রুচিরও বিকাশ হয়েছে—ভাবতেও আনন্দ। সিন্ধুদেশীয় কাউকে এত ভালো স্টাইলে থাকতে দেখি নি। চমৎকার বাড়ি, চমৎকার বাগান, চমৎকার আসবাবপত্র ! বারান্দার মাঝখানে লতা-পাতার বিতান—সামনে সবুজ মাঠ—ওদিকে শুধু দীপকণ্ঠী শৈলবালা ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। ইনি আমাদের পৌছে দিয়ে গেলেন নিয়ুমালু হোটেলে।

হোটেলটি ধনীদের জন্যে। কিন্তু অচেনা জায়গায় মধ্যবিত্তদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সস্তা আবাসে যেতে মন সরল না—আরো এই জন্যে যে, ইন্দিরা ১৮ ঘণ্টা বিমানে চ'ড়ে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। দিনে সাড়ে সাত

ডলার প্রত্যেকের জন্যে—শুধু ঘরভাড়া। এর সঙ্গে খাওয়া জুড়ে দিন। সবই আক্রা। একটা কোর্সের ডিনার বা লাঞ্চ অন্তত দুডলার, কিনা দশটাকা। একদিন রাতে এ-হোটেলে নৃত্যগীত ছিল, সে-রাতে তিন ডলার ক'রে পড়ল প্রত্যেকের। তিন দিন ছিলাম এ হোটেলে, দাম নিল ষাট ডলার অর্থাৎ তিনশো টাকা—তাও অনেকগুলি ডিনার লাঞ্চ বাদ দিয়ে—মানে বন্ধুরা করেছিলেন নিমন্ত্রণ। কিন্তু জিনিসপত্রের দরদামের কথা যাক। কলকাতায় কে না আলোচনা করে আজকাল : "ভাই, আগে টাকায় মিলত চার সের দুধ, আজ আধ সের। চাল মিলত আট টাকা মণ, আজ চল্লিশ টাকা"—ইত্যাদি। এ-আক্ষেপের মধ্যে দুঃখের অনেক কিছু থাকলেও বৈচিত্র্য কিছু নেই। কেবল



ওয়েকিকি তীরবর্তী হাওয়াইআন হোটেল—হনোলুলু

একটি জিনিসের দামের কথা বলি : একটি খাটো বহরের নকল রেশমের শার্ট কিনতে হ'ল এখানে—দাম নিল পাঁচ ডলার, কিনা পঁচিশ টাকা। তা দেবরাজের দেশে থাকতে হ'লে তার টেক্স দেবার রেস্ত না থাকলে চলবে কেন ?

দ্বিতীয় দিন এখানকার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক চার্লস মূর এলেন দেখা করতে। দুর্ভাগ্যবশে সেদিন আমরা বেরিয়েছিলাম ট্যাক্সি ক'রে শহর

দেখতে—কাজেই দেখা হ'ল না। তিনি লিখলেন তার পর দিন আসবেন—তাঁর মোটরে ক'রে শহর দেখাবেন আমাদের। চমৎকার মানুষ! মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তাঁর স্নেহময় ব্যবহারে। তিনি বললেন ভারতীয় দেখলেই তাঁর মন গ'লে যায়। শুনে আনন্দ হ'ল বৈ কি। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম তাঁকে: "সে আপনার নিজগুণে।"

গুণ যারই হোক, মানুষটি বড় চমৎকার। যেমন বিনয়ী তেম্‌নি তেজস্বী, যেমন পরোপকারী তেম্‌নি স্পষ্টবক্তা, যেমন বিদ্বান্ তেম্‌নি প্রফুল্ল। নানাগুণের এহেন সমাবেশ খুব বেশি দেখা যায় না। মূর দর্শনের নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন কিনা ঠিক জানি না তবে দুখানি দার্শনিক বই সম্পাদন করেছেন যাতে নানা জাতের লেখকের (জাপানী, চৈনিক, ভারতীয়) প্রবন্ধ আছে। ওখানে পৌছতেই আমার হাতে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ দিলেন—আর্য থেকে উদ্ধৃত। আনন্দ না হ'য়ে পারে? গুরুদেবের সম্বন্ধে বহু কথা ব'লে ফেললাম দরদী পেয়ে। ইন্দিরার নানান্ অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা প'ড়ে ইনি মোটেই অবিশ্বাস করেন নি। ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ইন্দিরাও কত যে সারগর্ভ কথা বলল নানা প্রসঙ্গে!

মূর নিয়ে গেলেন, হনোলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দিলেন আলাপ করিয়ে। তিনিও অতি চমৎকার লোক—ভারতের প্রতি ভক্তি অগাধ, শ্রীঅরবিন্দের লেখাও পড়েছেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, কতটা বুঝেছেন তা অবশ্য আলোচনা ক'রে ঠাহর পাবার সময় ছিল না। মূর বললেন: ভারতের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির উপর প্রেসিডেণ্টের শ্রদ্ধা অপরিমেয়।

তারপর দেখতে দেখতে এ-বিদেশী সহৃদয় ভাবুক মানুষটির সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন স্থাপিত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন তিনি কতদিনের পরিচিত! যেখানে হৃদয়ের তাপ লাগে সেখানে এ-ধরনের অঘটন অতি সহজেই ঘটে—না জানে কে? তবু প্রতি ক্ষেত্রেই যেন নতুন ক'রেই পাওয়া যায় এ-পরম উপলব্ধিটি—যে, হৃদয় যেখানে সাড়া দেয় সেখানে বাইরের বেড়াজাল তেম্‌নি সহজেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, যেমন যায় সূর্যোদয়ে কুয়াশা। যেদিন আমরা আকাশপক্ষীর ডানায় আরূঢ় হ'য়ে সানফ্রান্সিস্কো রওনা হ'লাম সেদিন ইনি নিজে থেকে আমাদের নিয়ে এলেন হোটেল থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে বিমানঘাঁটিতে। পথে দুটি ফুলের মালা কিনে পরিয়ে দিলেন আমাকে ও ইন্দিরাকে। একলাই থাকেন এ-দার্শনিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান দর্শন; যখন

ডলার প্রত্যেকের জন্যে—শুধু ঘরভাড়া। এর সঙ্গে খাওয়া জুড়ে দিন। সবই আক্রা। একটা কোর্সের ডিনার বা লাঞ্চ অন্তত দুডলার, কিনা দশটাকা। একদিন রাতে এ-হোটেলে নৃত্যগীত ছিল, সে-রাতে তিন ডলার ক'রে পড়ল প্রত্যেকের। তিন দিন ছিলাম এ হোটেলে, দাম নিল ষাট ডলার অর্থাৎ তিনশো টাকা—তাও অনেকগুলি ডিনার লাঞ্চ বাদ দিয়ে—মানে বন্ধুরা করেছিলেন নিমন্ত্রণ। কিন্তু জিনিসপত্রের দরদামের কথা যাক। কলকাতায় কে না আলোচনা করে আজকাল: "ভাই, আগে টাকায় মিলত চার সের দুধ, আজ আধ সের। চাল মিলত আট টাকা মণ, আজ চল্লিশ টাকা"—ইত্যাদি। এ-আক্ষেপের মধ্যে দুঃখের অনেক কিছু থাকলেও বৈচিত্র্য কিছু নেই। কেবল



ওয়েকিকি তীরবর্তী হাওয়াইআন হোটেল—হনোলুলু

একটি জিনিসের দামের কথা বলি: একটি খাটো বহরের নকল রেশমের শার্ট কিনতে হ'ল এখানে—দাম নিল পাঁচ ডলার, কিনা পঁচিশ টাকা। তা দেবরাজের দেশে থাকতে হ'লে তার টেক্স দেবার রেস্ত না থাকলে চলবে কেন?

দ্বিতীয় দিন এখানকার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক চার্লস মূর এলেন দেখা করতে। দুর্ভাগ্যবশে সেদিন আমরা বেরিয়েছিলাম ট্যাক্সি ক'রে শহর

দেখতে—কাজেই দেখা হ'ল না। তিনি লিখলেন তার পর দিন আসবেন—তাঁর মোটরে ক'রে শহর দেখাবেন আমাদের। চমৎকার মানুষ! মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তাঁর স্নেহময় ব্যবহারে। তিনি বললেন ভারতীয় দেখলেই তাঁর মন গ'লে যায়। শুনে আনন্দ হ'ল বৈ কি। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম তাঁকে: "সে আপনার নিজগুণে।"

গুণ যারই হোক, মানুষটি বড় চমৎকার। যেমন বিনয়ী তেম্‌নি তেজস্বী, যেমন পরোপকারী তেম্‌নি স্পষ্টবক্তা, যেমন বিদ্বান্ তেম্‌নি প্রফুল্ল। নানাগুণের এহেন সমাবেশ খুব বেশি দেখা যায় না। মূর দর্শনের নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন কিনা ঠিক জানি না তবে দুখানি দার্শনিক বই সম্পাদন করেছেন যাতে নানা জাতের লেখকের (জাপানী, চৈনিক, ভারতীয়) প্রবন্ধ আছে। ওখানে পৌঁছতেই আমার হাতে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ দিলেন—আর্য থেকে উদ্ধৃত। আনন্দ না হ'য়ে পারে? গুরুদেবের সম্বন্ধে বহু কথা ব'লে ফেললাম দরদী পেয়ে। ইন্দিরার নানান্ অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা প'ড়ে ইনি মোটেই অবিশ্বাস করেন নি। ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ইন্দিরাও কত যে সারগর্ভ কথা বলল নানা প্রসঙ্গে!

মূর নিয়ে গেলেন, হনোলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দিলেন আলাপ করিয়ে। তিনিও অতি চমৎকার লোক—ভারতের প্রতি ভক্তি অগাধ, শ্রীঅরবিন্দের লেখাও পড়েছেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, কতটা বুঝেছেন তা অবশ্য আলোচনা ক'রে ঠাহর পাবার সময় ছিল না। মূর বললেন: ভারতের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির উপর প্রেসিডেণ্টের শ্রদ্ধা অপরিমেয়।

তারপর দেখতে দেখতে এ-বিদেশী সহৃদয় ভাবুক মানুষটির সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন স্থাপিত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন তিনি কতদিনের পরিচিত! যেখানে হৃদয়ের তাপ লাগে সেখানে এ-ধরনের অঘটন অতি সহজেই ঘটে—না জানে কে? তবু প্রতি ক্ষেত্রেই যেন নতুন ক'রেই পাওয়া যায় এ-পরম উপলব্ধিটি—যে, হৃদয় যেখানে সাড়া দেয় সেখানে বাইরের বেড়াজাল তেম্‌নি সহজেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, যেমন যায় সূর্যোদয়ে কুয়াশা। যেদিন আমরা আকাশপক্ষীর ডানায় আরূঢ় হ'য়ে সানফ্রান্সিস্কো রওনা হ'লাম সেদিন ইনি নিজে থেকে আমাদের নিয়ে এলেন হোটেল থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে বিমানঘাঁটিতে। পথে দুটি ফুলের মালা কিনে পরিয়ে দিলেন আমাকে ও ইন্দিরাকে। একলাই থাকেন এ-দার্শনিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান দর্শন; যখন

বিমানঘাঁটিতে বিদায় নিলাম তখন মন আমাদের আর্দ্র হ'য়ে উঠল। পরিণত বয়সে ভাবের উচ্ছ্বাস সহজে জমতে পায় না—সবাই জানি, কিন্তু যেখানে জন্মায়—মনেহয় কত কী! মনেহয় মানুষ এক মুহূর্তে মানুষের কত কাছেই না আসতে পারে দেশ কাল রীতি নীতি আচার বিচারের গণ্ডী পেরিয়ে! তবু মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজ প্রীতির ঐক্যসূত্র ছেড়ে আপন-পর সংস্কারকেই একান্ত ক'রে ধরে কিসের মোহে—কে বলবে? হয়ত যা সুন্দর তাকে নিখিলের নিয়ামক বিরল ক'রে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরের মহিমা বাড়াতে। তবু মনের কোণে আক্ষেপ একটু জমেই যে, সুন্দর যদি আরো একটু সুলভ হ'ত, মানুষের সঙ্গে মানুষের লেনদেনে যদি ঐক্যবোধের অনুভবটি আরো একটু সহজে অর্জন করা যেত! হায়রে, সেই চিরন্তন চিন্তা—What might have been!

তারপরের দিনে সেই রাম ওয়াটুমলের বাড়িতে বৈঠক হ'ল আমাদের নাচ-গানের। সেখানেও ফের ঐ একই সত্যকে যেন নূতন ক'রে পেলাম—এবার সঙ্গীতের সূত্রে—যে, বাইরের ব্যবধান সহজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসতে পারে নৃত্যগীতের অবদানে। আসরে ছিলেন মূর ও আর একটি অধ্যাপক, ছিলেন হাওয়াই আমেরিকা ইতালীর নরনারী। ছিল একটি হিন্দুস্থানী ছাত্রও। আরো কত অতিথি। বক্তৃতা করতে হ'ল একটু—শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে, আমাদের গানের সম্বন্ধে, মীরাবাইয়ের বৈরাগ্য সম্বন্ধে, পিতৃদেবের জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে, ইন্দিরার মীরা-ভজন শোনা সম্বন্ধে ইত্যাদি। গাইলাম নানা ভাষায়ঃ সংস্কৃত, ইংরাজি, হিন্দি, জর্মন, বাংলা। সবাই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন, গৃহকর্তা অনুরোধ করলেন আর একটি ইংরাজি গান গাইতে—বললেন, আমার ইংরাজি স্বরভঙ্গি ও উচ্চারণ অনেকেরই হৃদয়কে বিশেষ স্পর্শ করেছে। খুশি হ'য়ে প্রথমে হিন্দিতে গাইলাম মীরাবাই-রচিত 'চাকর রাখোজি'-র ইন্দিরা-শ্রুত নব সংস্করণ ইন্দিরার নৃত্যগীতের সঙ্গে, পরে ইংরাজিতে একা। ইন্দিরা আরো একটি গানের সঙ্গে নাচল—"শান্ত গগনমে কুঞ্জনবনমে"—তার স্বরচিত গান এটি। এ গানটিতে নানারকম তালফের সার্গম ছিল তাই গানটি জ'মে উঠতে দেরি হ'ল না। গানের শেষে সবাই ইন্দিরার নৃত্যের সম্বন্ধে কী উৎসাহেই যে কথা বললেন! বললেন আরো কিছুদিন কেন থাকি না—এ-নৃত্যগীত আরো অনেকে দেখুক না! কিন্তু আমাদের থাকা সম্ভব হ'ল না নানা কারণে। এজন্যে দুঃখ হ'ল বৈ কি। কিন্তু আনন্দও হ'ল ওদের আগ্রহ দেখে। আমাদের সঙ্গে এসেছিল শোয়েবেল—সে তো নৃত্যগীত শুনে ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত

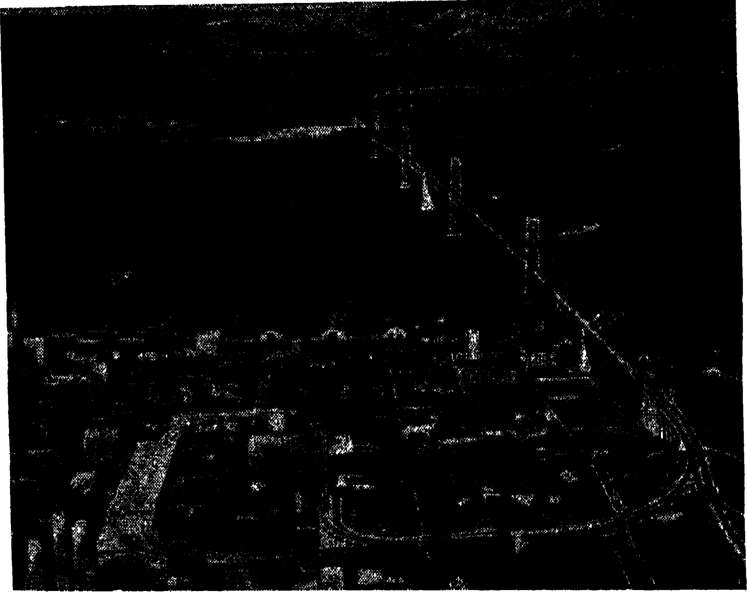
হ'য়ে উঠল। ও ইউ-এন-ও-র সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত, নিজে বক্তা। হয়ত ওর মধ্যে দিয়ে আমাদের গানের মহিমা সম্বন্ধে কিছু জানবে বাইরের শ্রোতা। এম্‌নি ক'রেই তো সঙ্গীতের, কাব্যের, শিল্পের বীজ বোনা হ'য়ে থাকে—আর কার হৃদয়ে যে কোন্ বীজে কী ফসল ফলে কেউ কি জানে? যুবকটি পরদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করল ও বলল আমেরিকায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবেই করবে। সানফ্রান্সিস্কো ও নিউইয়র্কে ওর সঙ্গে ফের দেখা হবে ভাবতে ভালো লাগল আরো এই জন্যে যে, ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে ও অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন আমাদের ও ছোট ভাই। কত যে ফাই ফরমাস খাটত আমাদের—পরমানন্দে!



# আমেরিকা

# সানফ্রান্সিস্কো

সানফ্রান্সিস্কো পৌছলাম আমার জন্মদিনে, ২২শে জানুয়ারি। বৈদেহী স্বর করল আশীর্বাদ : "যেন কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছু না চাও।" তবে কোথায় কৃষ্ণ, আর কোথায় সানফ্রান্সিস্কো! মন প্রায় উদাস হ'য়ে আসে আর কি এমন সময়ে



বিমান হ'তে সানফ্রান্সিস্কো—ওকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু এবং নগর

চোখে পড়ল বিমানঘাঁটিতে বেড়ার বাইরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর স্নেহভাজন শ্রীমান হরিদাস চৌধুরী, তজ্জায়া বীণা, ডাক্তার স্পীগেলবার্গ দম্পতি ও মিস টাইবার্গ। স্পীগেলবার্গ আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলেন মাত্র দুদিনের জন্যে, তাঁর সঙ্গে সেই থেকে পত্রালাপ চালিয়ে এসেছি বটে কিন্তু তাঁর মুখ আমার মনে ছিল না। যাই হোক হরিদাসের কাছে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়ে তাঁকে এমন ভাব দেখালাম যেন আমি তাঁকে ঠিক তেমনি সহজে চিনে নিয়েছি যেমন তিনি আমাকে। মিস টাইবার্গকে চিনতে বেগ পেতে হয় নি

কেননা ইনি আশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। আনন্দ-সম্ভাষণ সারা হ'লে আমি ও ইন্দিরা আরূঢ় হলাম স্পীগেলবার্গীয় মোটরে, হরিদাস ও বীণা—টাইবার্গীয় মোটরে। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। এক নিগ্রো ভারবাহী আমাদের পাঁচ ছয়টি ভারি বাক্স এমন অবলীলাক্রমে তুলে নিল দুটি হাতে—দুমণেরও বেশি ওজন—যে আশ্চর্য না হ'লে তার উপর অবিচার করা হ'ত।

বলবই এবার আশ্চর্য হওয়া সম্বন্ধে দুএকটি দার্শনিক কথা—যা থাকে কপালে।

জগতে মানুষ রকমারি—না জানে কে? কিন্তু যদি বলি—একটু বাড়িয়েই হয়ত—যে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ একদল যারা আশ্চর্য হবার মতন কিছু দেখলেই আশ্চর্য হয় অননুতপ্ত ভাবে, আর একদল যারা কোনো কিছু দেখেই "আশ্চর্য হয়েছি" কবুল করতে চায় না। এই দ্বিতীয় দলের মনোভাব এই যে, "আশ্চর্য হয়েছি" বলা হ'ল "হার মেনেছি" বলার সামিল। আমার মনে হয় এরা জীবনের একটি প্রধান রস থেকে বঞ্চিত হয়। এডগার অ্যালেন পো বলতেন, "It is a happiness to wonder." একথায় আমার মন সাড়া দিয়েছে আশৈশব। তাই পাঠক-পাঠিকা দয়া ক'রে অন্তত ক্ষমা করবেন যখন আমার এ-ও-তা নানা কিছুতেই আশ্চর্য হওয়ার অকপটোক্তিতে তাঁরা সাড়া দিতে পারবেন না। হাসেন হাসুন—ইংরাজি সান্ত্বনা-পুরাণ বলেনঃ he wins who laughs last—কিন্তু রাগ যেন না করেন এই মিনতি। এই ধরুন না কেন, হনোলুলুতে দেখলাম ট্রাম চলছে কখনো বা নিচে লাইনে গড়িয়ে উপরে তার বিনা, কখনো বা উপরে তারের সঙ্গে আঁকশির যোগসূত্র আছে কিন্তু নিচে ট্রামের লাইনের চিহ্নও নেই। দেখে ভারি আশ্চর্য হলাম। সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছতে না-পৌঁছতে আশ্চর্য হলাম আরো কত কিছুতে! বল্‌ব?

পয়লা নম্বর বলেছিঃ ঐ নিগ্রো ভারবাহীর আশ্চর্য বলিষ্ঠতা, মাথা ব্যবহার না ক'রে দেহের নানা স্থানে নানা বিন্যাসে পাঁচ ছয়টি ভারি বাক্স বগলদাবায় ক'রে অবলীলাক্রমে মোটরে স্থাপন!

দোসরাঃ ভোর সাতটায় স্পীগেলবার্গীয় মোটরে হু হু ক'রে উধাও হ'তে হ'তে—ও মা! এ কী কাণ্ড! পথে চলেছে বায়ুবেগে অজস্র মোটর অথচ একটিও পথিকের দেখা নেই!! সত্যি বলছি সারা পথে প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম মাত্র দুটি পথিক যারা চলমান ব্রজবাবুর জুড়ি ক'রে (কি না—পদব্রজে)! পরে অবশ্য পথিক বেরোয় অনেক, কিন্তু ভাবুন ভোর সাতটা থেকে আটটার মধ্যে

প্রায় বিশমাইল পথে মোটর যদি দেখে থাকি কম ক'রে চার পাঁচ হাজার, পথিক দেখেছি বড় জোর চারটি কি পাঁচটি! হবেন না আশ্চর্য? না-ই হ'লেন। আমি হবই আশ্চর্য—তা আমাকে আপনারা যতই কেন না পাড়াগেঁয়ে ভাবুন।

তেসরা: অবাক্! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা এই উঁচু, এই নীচু—আর সে কী নিচু! জ্যামিতিতে পড়েছিলাম খাড়া হ'ল নব্বই ডিগ্রি। এ-ঢালু প্রায় বিশ-পঁচিশ ডিগ্রিরও বেশি হবে, জায়গায় জায়গায় অঙ্গ শিহরিত হয় হু-শ্ ক'রে উঠেই সে কী দারুণ ভ-শ্ ক'রে নামা! পাঠক বলবেন হেসে: "বাঃ, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বুঝলে না—সানফ্রান্সিস্কো রাজধানী শৈলচারিণী—পাহাড় কেটে পথ বানানো।" মানি। কিন্তু ভাবুন কী অজস্র ও বিশাল পথ কাটতে হয়েছে! আর শুধু কি পথ কাটা, দাদা? সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গ। ইংলণ্ডে সুড়ঙ্গ কেটে ট্রেনের পথ করা হয়েছে দেখে যথারীতি আশ্চর্য হয়েছিলাম ১৯১৯ সালে। এও সেখানে দেখেছি যে "উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর"। কিন্তু এখানে দেখলাম:

চৌঠা নম্বরের বিস্ময়: বিরাট ও প্রশস্ত সুড়ঙ্গের যুগলবাহার, এপাশের সুড়ঙ্গে চলে মোটর একদিকে, ওপাশে অন্যদিকে। আর প্রতি সুড়ঙ্গেরই উপরে সে কী মসৃণ বাঁধানো ডোম—মাঝে লম্বা সাদা আলো। সারা সুড়ঙ্গ যেন মনে হয় দিনের আলোয় হাসছে। এত বড় সুড়ঙ্গে এত আলো দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন তবে জেনে রাখুন—দেখলে হয় আশ্চর্য হ'তেন আমার মতন, নয় আশ্চর্য না হ'য়ে ব্যাখ্যা করতেন যেমন বৈজ্ঞানিক রামধনু দেখে ব্যাখ্যা করে: ও আর আশ্চর্য কী—ডিফ্রাক্‌শন—বেগুনি, অতি-নীল, নীল, হরিৎ, পীত, কমলা, লাল ইত্যাদি।" সবই জানি দাদা, কিন্তু তবু হংকং-এর কাছে এই চিরপরিচিত রামধনু দেখেও হয়েছিলাম ফের অবাক্। কারণ সে-সময়ে রামধনু শুধু যে নিচে ছিল তাই নয়—আমাদের আকাশ-পক্ষী যেন চলেছিল তার বক্ষ ভেদ ক'রে। এহেন দৃশ্য হয়ত বিমানে আরো অনেকেই একাধিকবার দেখে থাকবেন। কিন্তু আমি দেখেছিলাম মাত্র একবার—৮ই জানুয়ারি। ভালোই হ'ল সলজ্জে এ সব নানান্ আশ্চর্য হওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম। ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষ পাঠক-পাঠিকা যখন পড়বেন তখন বলবেন হেসে: "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কী সরল, ওরফে অজ্ঞ!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাদের অশরীরী আত্মা তখন পোপের ভাষায় সান্ত্বনা আহরণ করবে:

We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser children will, too, think us so !

"আমেরিকান আকাডেমি অফ এশিয়ান স্টাডিস্" গৃহে নিয়ে গেলেন স্পীগেলবার্গ দম্পতি। বলতে ভুলেছি শ্রীমৎ স্পীগেলবার্গ মোটরে চালালেন রসনা, শ্রীমতী কেবল মোটর। আমেরিকায় মোটর চালানো যে কী ব্যাপার আমাদের দেশ থেকে কল্পনা করা শক্ত। যদিচ কোথাও পুলিশের চিহ্ন নেই, কিন্তু মোড়ে মোড়ে অটোমেটিক লাল নীল পীত বাতি জ্ব'লে উঠছে ঘড়ি ঘড়ি—একটার পর একটা। সেই অনুসারে গাড়ি চালাতে হয়। এ ছাড়া কতবার যে মোটর দাঁড় করাতে হয় সাম্‌নের গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার দরুন ! ডাক্তার স্পীগেলবার্গ হঠাৎ গাড়ির মধ্যে এক ম্যাপ খুললেন। "কী ব্যাপার ?" "দেখছি শর্টকাটের রাস্তা।" "কাট্‌টা" "শর্ট" হ'ল বটে কিন্তু সময় লাগল "লং"। কারণ আকাডেমিতে পৌঁছে দেখি ঘোরানো রাস্তায় এসে হরিদাস দম্পতি আমাদের অনেক আগে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন। যাক্।

ওখানে আকাডেমির সিংহলী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বুঝি মালালাশেখর। আর একটি অধ্যাপক বুঝি শ্যামদেশের। আর একজন—কি যেন পড়ান : ত্রিপিটক, না কোরান, না জেন্দাবেস্তা, ভুলে গেছি।

* * *

ভারতীয় কনসালের ওখান থেকে এলেন সেক্রেটারি "লাল" : "কী করতে পারি আমরা ? দেশ থেকে চিঠি এসেছে আপনাদের দেখাশুনো করা আমাদের কর্তব্য"—ইত্যাদি। "লাল" অতি সজ্জন, মঞ্জুবাক্। বললাম : "কনসালের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বলব।"—"দুটোর সময় ?"—"খাসা কথা। মিস টাইবার্গের সঙ্গিনীর ওখানে ভোজন সমাধা করেই হাজির হব।"

মিস টাইবার্গ থাকেন একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস ডার্লিং-এর দুটি বড় বড় ছেলে। বিধবা হ'য়ে তিনি একাই থাকেন, পিয়ানো বাজান। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'তে হ'ল। খাওয়ার পরে এল এক চমৎকার বর্তুলাকার প্রকাণ্ড কেক। তার উপরে চকোলেট-অক্ষরে লেখা Happy birthday to Dilip. কেকটি আমার সামনে পেশ ক'রেই গান ধরলেন দুটি মহিলা : "Happy happy birthday to Dilip !" মনটা ভ'রে উঠল। শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল :

মা বোন আমাদের কোথায় নেই? বিদেশে এই আন্তরিক স্নেহস্পর্শ—প্রায় সেণ্টিমেণ্টাল হ'য়ে উঠি আর কি!

খাওয়া শেষ হ'লে মিসেস ডার্লিং বললেন: "আপনারা যদি চান তো আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন।" মিস টাইবার্গ তাঁর ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়ে একটি ছোট ঘরে থাকবেন—ইত্যাদি। কিন্তু এ-ব্যবস্থায় আমরা রাজি হ'লাম না। কনসাল হুসেন সাহেবের ওখানে গিয়ে বললাম: "সব আগে চাই একটা মাথা গুঁজবার জায়গা—খুব বেশি আভিজাত্য বরদাস্ত হবে না আমাদের। চলনসৈ গোছের আরামে থাকতে পারলেই হবে।" হুসেন সাহেব অতি মিষ্টভাষী। বললেন: "সার সি. পি. রামস্বামীকে যে-হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলাম তাদের চার্জ খুব বেশি নয়।" লাল নিয়ে গেলেন সেই হোটেলে—হোটেল স্টুয়ার্ট। দুটি ঘর পাশাপাশি—মাঝে একটি স্নানের ঘর। চমৎকার ব্যবস্থা। ঘর ভাড়া মাথা পিছু সাড়ে তিন ডলার। দুটি ঘরে দিন সাত ডলার অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ টাকা। খাওয়া-দাওয়া আলাদা। এই ব্যবস্থাই এখানে চালু হয়েছে।

এখানকার হোটেলবাসীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার কথা বলি—কারণ ব্যবস্থাটি খুবই ভালো লাগল। আমেরিকা যন্ত্রপ্রধান দেশ। মানুষের করণীয় তথা সাধনীয় কাজ যতটা পারে এড়িয়ে চলে এরা যন্ত্রের দৌলতে। ফলে গ'ড়ে উঠেছে কাফেটারিয়া। হোটেলে পরিচারক তথা পরিবেষকের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হয় ব'লে এই ব্যবস্থার উদ্ভাবনা। এতে পরিবেষক নেই, আছে খাদ্যদাতা—থুড়ি, দাত্রী। কি রকম—বলি। কাফেটারিয়ার ভোজনালয়ে এসে প্রত্যেককে এক একটি সুন্দর ট্রে হাতিয়ে তার উপর দরকার মতন কাঁটা ছুরি চামচ ন্যাপকিন পাশ থেকে নিয়ে পরিবেষকদের সামনে দাঁড়াতে হয়। খাবার অজস্র—সাজানো থরে থরে। শুধু বলার অপেক্ষা অমুক ডিম মাছ মাংস, অমুক রুটি, অমুক সালাড, অমুক পাই, ফলের রস, কেক, স্যাণ্ডউইচ—পরিশেষে কফি কিম্বা চা। ওপাশে দণ্ডায়মানা খাদ্যদাত্রী নক্ষত্রবেগে ট্রের উপর বাঞ্ছিত খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে দেন। ট্রে চলে রেলের উপর শাঁ শাঁ ক'রে—পরের কাউণ্টারে ক্যাশিয়ার মহিলা—তিনি খাবার দেখেই বিল দেন—তৎক্ষণাৎ নগদ বিদায়। কী ক'রে এঁরা একটি চকিত কটাক্ষে খাদ্যসম্ভারের মূল্য নির্ধারণ করেন ভাবতে ধাঁধা লাগত। ফের সেই অবাক্ হওয়া! যাক্।

প্রাতরাশ আমাদের পড়ত এক ডলার ক'রে। লাঞ্চ বা ডিনার দেড় ডলার থেকে দুডলার।

এ ব্যবস্থায় সুবিধা এত যে মন ভারি আরাম বোধ করল। কী খাবার চাই খাদ্যতালিকা দেখে ঠাহর করতে হয় না, চোখে দেখে চেয়ে নিতে হয়। ক'নের নাম বা বংশপরিচয় শুনে বিবাহ করা এক ও ক'নের রূপগুণের পরিচয় পেয়ে আংটিবদল করা আর। এতক্ষণে বুঝলেন কি "কাফেটারিয়া" কী বস্তু ?

কিন্তু যেটা সবচেয়ে অভিভূত করে সেটা হ'ল এদের দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য। যে কোনো হোটেল রেস্তরাঁতে খাদ্যসম্ভার বহুবিধ ও অজস্র। রেশনিং কী বস্তু এরা শুধু খবরের কাগজেই পড়েছে ও সম্ভবত হেসেছে আত্মপ্রসাদের হাসি—যেমন আমরা হাসি যখন শুনি কোনো পাশ্চাত্য মহিলাকে বলতে ( এ আমার স্বকর্ণে শোনা ): "ঠোঁটে আলতা না দিয়ে বেরুনো আর নগ্ন হ'য়ে বেরুনো সমার্থক।" অভ্যাসো নাতিরিচ্যতে।

* * *

সন্ধ্যাবেলা গেলাম আকাডেমিতে। দেখলাম হরিদাস তার ক্লাসে পড়াচ্ছে। বলল: "বাংলা শেখাচ্ছে"। পরে স্পীগেলবার্গ নিয়ে গেলেন তাঁর সংস্কৃত ক্লাসে। আমাকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ধ'রে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন আমার গুণপনা সম্বন্ধে। পরে বললেন আমাকে সংস্কৃত আবৃত্তি কিছু শোনাতে। ওদের হাতে ছিল গীতা। আমার মুখস্থ ছিল একাদশ অধ্যায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অনেকগুলি শ্লোক স্মৃতি থেকে আবৃত্তি ক'রে শোনালাম: "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে"…একটু গেয়ে শোনালাম: "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা… সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।" ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে গীতা খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে শুনতে লাগল। পরে আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে। বললাম: "অনেকে ভুল ক'রে ব'লে থাকেন সংস্কৃত আমাদের দেশে মৃত ভাষা। এ ধারণাকে ভুল বলছি এই জন্যে যে সংস্কৃত ভাষা এখনো ভারতের সংস্কৃতিকে শুধু যে ধারণ ক'রে আছে তাই নয়—প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিকতা-সম্ভব মনোবৃত্তির একমাত্র জীবন্ত প্রতিষেধক এই অপরূপ অতি-প্রাদেশিক দেবভাষা। ভারতের অন্তরাত্মার মণিকোঠায় প্রবেশ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার চাবির দরকার। ভারতের পরমতম ঐতিহ্যের তথা আধ্যাত্মিকতার ধারয়িত্রী সর্বাগ্রে সংস্কৃত

ভাষা। তাই না শ্রীঅরবিন্দকে যৌবনে বিলেত থেকে ফিরে এসে সব আগে শিখতে হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা।"

ওরা প্রশ্ন করলে গীতা সম্বন্ধে। আমি বললামঃ "গীতা আমাদের কাছে তেম্‌নি আদরণীয় যেমন খৃশ্চানের কাছে বাইবেল্‌। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আজো অনেক প্রেরণা পেয়ে থাকি গীতার বাণী থেকে। আমাদের জীবনে নিত্যনিয়ত যে রকমারি আদর্শ-সজ্ঘাত দেখা দেয় তার প্রত্যক্ষ সমাধান আমরা পেয়ে থাকি গীতার বিধান থেকে। অর্জুন গীতায় স্থান নিয়েছেন বিশ্বমানবের, শ্রীকৃষ্ণ দেবমানবের তথা জগদ্‌গুরুর। মানুষ যুগে যুগে বহুবিধ প্রশ্ন পেশ করেছে বিধাতার দরবারে। গীতা তার একটি জীবন্ত সাক্ষ্য। ভগবানের বাণী মানুষের কাছে নানা সময়েই মনে হয় স্বতোবিরোধী—যেমন অর্জুনের মনে হয়েছিল যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে মিনতির সুরে বলেছিলেনঃ

ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেব বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্‌॥

অর্থাৎ প্রভু, আর উল্টো পাল্টা কথা ব'লে বিপাকে ফেলো না আমার বুদ্ধিকে। বলো সোজাসুজি কী করলে উত্তীর্ণ হব ভ্রান্তি থেকে শান্তির শ্রেয়োলোকে।" ব'লে শেষে বললামঃ "একটু চোখ চেয়ে দেখলে দেখা যাবে আজো এ-প্রশ্নের নিত্য নবজন্ম হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর মনেই—তাকে ছুটতে হচ্ছে সমাধানের জন্যে কৃষ্ণের কাছে না হোক—(তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, তাঁর জুড়ি মিলবে কোথায়?)—সদ্‌গুরুর কাছে, ঋষিকল্প জ্ঞানীর কাছে, নিরভিমান আত্মবিৎ-এর কাছে।"

আমার বক্তৃতার শেষে ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাসিত মুখে আমাকে নানা প্রশ্ন সুরু করল—অমি সাধ্যমত উত্তর দিতে লাগলাম। ফলে স্পীগেলবার্গের সংস্কৃত ক্লাসে জেগে উঠল এক বিচিত্র উৎসাহের সাড়া। ভালো লাগল দেখে যে, আমাদের দেশের আপ্তবাক্যে এ-দূর বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের কী আন্তরিক শ্রদ্ধা। এ-বিদেশে আমি এসেছি হয়ত এই বিশ্বাসটির স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ পেতে যে, সরল আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বললে সবাই না হোক কেউ কেউ অন্তত সাড়া দেয়, ভক্তিভাবের অনুপ্রেরণায় গান করলে কয়েকটি হৃদয় অন্তত ভাষা, লোকাচার ও সভ্যতার ব্যবধান সত্ত্বেও আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এ নিয়ে নানা তর্কের অবতারণা করা যেতে পারে অবশ্য—(এমন কোন্‌ উক্তি

আছে যা নিয়ে তর্ক কর! না-চলে?)—কিন্তু সব তর্কাতর্কির অন্তেও একটি প্রত্যয় মানব-হৃদয়ে বোধকরি আজও তেম্‌নি জেগে আছে: যে, হৃদয়ের একটি গভীর অনুভব-লোকে মানুষ ভেদবুদ্ধির বাধা ডিঙিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মানুষেরো কাছাকাছি আসতে পারে।

একথার স্বপক্ষে আর একটি প্রমাণ পেলাম পরদিন বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরীর বাড়িতে ভজন গান ও নামকীর্তন ক'রে। এখানে একটি ছোট দলের সঙ্গে আলাপ হ'ল—হরিদাসই তাদের নিয়ে এল—যারা চাইছে একটি শ্রীঅরবিন্দ বাণীমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। এদের মধ্যে দুতিনটি লোকের সঙ্গে গেলাম হরিদাসের ওখানে। হরিদাস থাকে রুডল্‌ফ শেফার নামে চমৎকার শিল্পাধ্যক্ষের সঙ্গে। এখানে শিল্পকলা সম্বন্ধে নানারকম চর্চা হয়। বাড়িটি বড়, ক্লাসও হয় নানা ঘরে, দুতিনটি ঘরে থাকেন অধ্যক্ষ ও হরিদাস গৃহিণী বীণাকে নিয়ে। সেখানে মাঝে মাঝে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে বক্তৃতা দেয়, মাঝে মাঝে ধ্যানচক্র বসে। আমি গেলাম ভজন শোনাতে। গাইলাম মীরা-ভজন—ইন্দিরার শ্রুতিলব্ধ—"তু গায়ে জা হরী হরী"—(প্রেমাঞ্জলি ১৮০ পৃঃ)-এর মৎকৃত বাংলা অনুবাদ ও সব শেষে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" নামকীর্তন। অনেকদিন বাদে বিদেশে নামকীর্তন করতে পেয়ে মন ভ'রে উঠল। শ্রোতৃবর্গ সোচ্ছ্বাসে সাড়া দিলেন। একটি মার্কিন মহিলা, একটি সুইড ভদ্রলোক ও শিল্পাধ্যক্ষ শেফার এমন কম্প্রকণ্ঠে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন যে মনে হ'ল তাঁদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোথাও বা একটু কাঁপন জেগে থাকবে। শেফার বললেন: "যখন ইচ্ছা আমার এখানে আসবেন। আমার গৃহদ্বার আপনার জন্যে খোলা রইল।" ঠিক হ'ল ইন্দিরার নাচের মহলা এখানেই হবে। ভাবনায় পড়েছিলাম এ-বিদেশে মহলা দেওয়া যায় কোথায়? সংকটতারণ ক'রে দিলেন সমাধান। বৈদেহী স্বরের কথা মনে পড়ল: "তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখো। বিপাকে ফেলবার জন্যে প্রভু তোমাকে এতদূরে টেনে আনেন নি বলছি আমি।" জয় হোক দৈববাণীর!

* * *

হঠাৎ এলেন এক পিয়ানো-বাদক ও সুরকার—লস এঞ্জেল্‌স্‌ থেকে। আমাদের কথা শুনেছিলেন। এসেই বললেন তিনি চান আমাদের শোনাতে তাঁর পিয়ানোতে-তোলা ভারতীয় রাগরাগিণী। লোকটি দেখতে বেশ ভারিক্কি, কথাবার্তাও খুব নরম। কিন্তু কোথায় একটা আত্মাভিমান আছে যার নাম

দেওয়া না গেলেও ধামের হদিস পাওয়া যায়। তাই আমাদের রাগ ভালো ক'রে আয়ত্ত না-ক'রেই শোনাতে এত আগ্রহ—বাহবার লোভ। তবে যখন বললেন: আমি মনে প্রাণে ভারতীয়, এদেশে জন্মেছি কেন, কে জানে?—তখন মনের কোণে একটা দরদ বোধ করলাম। এখানে ভারতীয় কয়েকটি শিল্পী নিয়ে ইনি কন্সার্ট আদি দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা—আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেই। ভাবটা—আমি তোমাদের গ'ড়ে পিটে নেব আমাদের সভার জন্যে। একলা চললে তোমরা নাগাল পাবে না সাফল্যের, কিন্তু আমার সহযোগী হ'তে না হ'তে পাবে বাহবা। আমি বললাম শান্তস্বরেই: "আমরা আমেরিকার জনসভায় বাহবা পেতে আসি নি—তবে আমাদের যা আদর্শ তার সঙ্গে মিললে একটা কন্সার্ট দিতে পারি।" তারপর অনেক কথা হ'ল। তিনি তাঁর প্রোগ্রাম দেখালেন। বোঝা গেল ভারত থেকে (যেমন এদেশে প্রায়ই হয়) কয়েকজন বাজে শিল্পী এসে বুঝিয়েছে তারা ভারতীয় নৃত্যগীতের শিখরসঞ্চারী। তাঁকে বললাম: "বন্ধু! আপনার প্রচেষ্টা তথা অমায়িকতার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু ইন্দিরা ও আমি অজ্ঞাতকুলশীল মন্দশিল্পিযশঃপ্রার্থীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাম কিনতে রাজী নই। যদি আমরা যে-টুকু ও যতদূর পর্যন্ত দিতে পারি আপনাদের আমেরিকান হাটে পুরোদামে না বিকোয় তবে সস্তা দরে বিকিয়ে চতুর বণিক উপাধি পেলে আমরা হব ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট। আদর্শের ক্ষেত্রে কানা মামার চেয়ে নেই মামাই শ্রেয়ঃ।" লেকচার দিতে এসে লেকচার শুনতে হবে বোধহয় তিনি ভাবেন নি। তাই হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে ইন্দিরার নৃত্য দেখে সুর তাঁর আরো বদলে গেল। বললেন: "না না—বাজে শিল্পীর সঙ্গে আপনারা মিশবেন কেন? আমি বলি কি—আমি কয়েকটি হাল্কা নৃত্যগীত দেব—আপনারা সে-আসরে তারকাশিল্পীর মতন ভাবের নৃত্যগীত যোগান দিন!" মনে মনে বললাম: পথে এসো দাদা। প্রকাশ্যে: "আচ্ছা ভেবে জবাব দেব।" দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

* * *

একটি পার্টিতে গেলাম—খাস আমেরিকান পার্টি যাকে বলে। উঃ, সে কী কাণ্ড! কত যে নরনারী—আর প্রত্যেকেই এসে যে কী অজস্র কথা উদ্গীরণ করেন! কত হোমরাও চোমরাও সংবাদ নিলেন আমাদের—করলেন কতই সমাদর! "নাম শুনেছি—আসুন একদিন আমাদের ওখানে।"...ইত্যাদি।

কিন্তু যাব কোথায়? এধরনের পার্টিতে? সবাই কথা কইছে সবার সঙ্গে,

অথচ কারুর কথাই কারুর কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করছে না। হট্টগোল এখানকার বাদী স্বর। সর্বোপরি, যুবক যুবতী পান করছে রকমারি সোমরস। আর পান ব'লে পান, দাদা! একজন এমন পান করলেন যে একটি গ্রামোফোন বাজছিল মাইক্রোফোন সমেত—সেই মাইক্রোফোনটির উপর ঢ'লে পড়লেন, মাইক্রোফোন অচল! এহেন পার্টির খুরে নমস্কার। পিতৃদেবের বাণী স্মরণ ক'রে "বুঝিবা এখন শ্রেয়ঃ মানে মানে পলায়ন" বলতে বলতে গান না গেয়ে গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধুবর শেফারের মোটরে চম্পট।

*　　　　*　　　　*

কিন্তু ইংরাজিতে বলে "It is an ill wind that blows nobody any good" এহেন উদ্দাম আসরের বেলায় একথা খাটল বিচিত্রভাবে। সেখানে এসেছিলেন ডেভিড ওয়েস্টন হাণ্টার। তিনি বললেন তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতে চান। পরে এই মানুষটিই হ'য়েছিলেন আমাদের একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু তাঁর কথা যথা স্থানে।

সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছেই কনসালের কাছে শুনলাম, এখানে রামকৃষ্ণদেবের দুটি মন্দির আছে, অধ্যক্ষ অশোকানন্দ স্বামী। অশোকানন্দকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলাম: তিনি সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন মন্দিরে। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সেক্রেটারিকে—মিষ্টভাষিণী আমেরিকান মহিলা।

প্রকাণ্ড মোটর। কার মোটর জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীমতী বললেন তাঁর নিজের। ইনি কত যে করেছেন মিশনের জন্যে! ঠাকুরের কাজ এই ভাবেই হ'য়ে থাকে। "গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ" সবাই এগিয়ে আসে দেবকার্যে যোগান দিতে, মানুষ তো কোন্ ছার!

শ্রীমতী আমাদের নানা কথাই বললেন: অশোকানন্দ স্বামীকে কত কর্ম করতে হয়েছে। আজ একুশ বৎসর তিনি প্রবাসী—কিসের জন্যে? না, ঠাকুরের কাজে। স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়—অত্যধিক পরিশ্রমে খানিকটা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছেই বল্‌ব। কিন্তু মুখে তাঁর অনুযোগ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম: "দেশের জন্যে মন কেমন করে না?"

"করে বৈ কি! কিন্তু ঠাকুরের কাজ যে!"

অলডাস্ হাক্সলির একটি চিঠির কথা মনে পড়ল—আমাকে অনেক দিন আগে লেখা। তাতে তিনি লিখেছিলেন এই ভাবের একটি কথা যে,

আমেরিকায় রকমারি কসরৎদার আসে সত্যের নাম নিয়ে—কিন্তু তবু সত্য সাধু বিরল হ'লেও আছে এখনো। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু।*

এঁরা সত্যই সাধু। যাঁরা আজকের দিনে ধর্মের নামে হাসেন, বলেন ধর্ম হ'ল মেকি টাকা—তাঁদের ব্যঙ্গ অনেক সময়ে তীক্ষ্ণ হ'লেও লক্ষ্যবেধে অপারগ। কারণ হসনীয় হ'ল অধর্ম—ধর্ম বরণীয়—যেহেতু সে-ই থাকে ধারণ ক'রে। যেখানে শুভকর্মের আন্তরিক প্রয়াস সেখানে ধার্মিক পানই পান অন্তরদেবতার আশীর্বাদ। আর একথার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ—বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তা ব'লে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের পথ যে কুসুমাস্তৃত এমন কথা বলা যায় না। অশোকানন্দ বলছিলেন: "প্রথম দিকে লোক আসত না, কিম্বা যারা আসত তারা ধর্মার্থী নয়—ভোজবাজি-অর্থী। তবু বলব একদল লোক আছেই এখানে যারা চায় সত্যের দিশা, ধর্মের বরাভয়। এ যদি না হ'ত তাহ'লে এখানে কিছুতেই আমরা আপ্তকাম হ'তে পারতাম না।"

আর আপ্তকাম হয়েছেন বৈকি। স্বচক্ষে দেখে এলাম কী সুন্দর দুটি আশ্রম। একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোয় আগেই হয়েছিল, বুঝি ১৯০৫ সালে—সেটির সমাপন হয় ১৯০৮-এ। আর একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোর প্রতিবেশী শহর বার্কলিতে।

প্রথমে অশোকানন্দ নিয়ে গেলেন বার্কলিতে। সেখানে দেখলাম একটি খুব বড় না হ'লেও বেশ বড় বাড়ি। হাল আমলের চমৎকার আসবাব-পত্র, হীটিং, চেয়ার, ঝাড়লণ্ঠন, লাইব্রেরি, লেকচার হল, সুন্দর বাগান—কী নয়? লেকচার হলের একদিকে দোতলায় ছোট একটি ঘর মতন, সেখানে মস্ত পিয়ানো। প্রতি মাসে এখানে ধর্মসঙ্গীত হয় বক্তৃতার আগে বা পরে। নিচে হলের সামনেই মঞ্চ ও বেদী। মঞ্চে বক্তা বক্তৃতা করেন বেদীর সামনেই। বেদীর উপরে একদিকে ঠাকুরের ছবি, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের। মধ্যে সুন্দর ক'রে ওঁ আঁকা বড় হরফে।

ঠাকুরের ছবির সামনে ইন্দিরা, অশোকানন্দ ও আমি প্রণাম করলাম—বেদীমূলে। মন ভ'রে উঠল। বললাম অশোকানন্দকে: "এখানকার আব-হাওয়াই আলাদা।"

---

* "But there are also a few genuinely knowledgeable and spiritual people—Hindus of the Vedanta Mission and some Americans and Europeans who know something about genuine mysticism and try to practice it."
(July 8th, 1942)

অশোকানন্দ বললেন গাঢ়কণ্ঠেঃ "দিলীপবাবু, যখন এ-মন্দিরটি গ'ড়ে তুলি তখন প্রথমদিকে যে হৃদয়ে সংশয়গ্রন্থি ছিল না এমন কথা বলব না। কারণ মনে হয়েছিল ঠাকুরের মূর্তি তো স্থাপন করা হ'ল—কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তো? কিন্তু তারপরেই গ্রন্থিমোচন হ'ল—স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর আবির্ভাব। আর শুধু আমি নই অনেকেই শিহরিত হ'য়ে উঠলেন সে আবির্ভাবের অপার দাক্ষিণ্যে। শুধু বাহ্য প্রসাদ নয়—সে-প্রসাদ স্বাদন করবার সময় মনে হ'ল সত্যিই প্রসাদ—জীবন্ত প্রসাদ!"

ইন্দিরা বলল: "সত্যের প্রতিষ্ঠা এম্‌নি ভাবেই হ'য়ে থাকে। সুরু হয় ধীরে ধীরে—কিন্তু যা গ'ড়ে ওঠে সে-বস্তু বালুচরে তাসের স্তূপ নয়—খৃষ্টদেব যাকে বলতেন পাষাণভিত্তির 'পরে নির্মিত নিলয়। আপনারা ধন্য যে ঠাকুরের মহিমা রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন নিঃস্বার্থ কর্মযোগে। জগতে নানা ভেক নিয়ে নানা দল নানা মন্ত্রপাঠ করে। সত্য নিষ্ঠা ভক্তি ও জ্ঞানের বাণী প্রচার করেন যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে সত্যের মহিমা নির্ণয় করা যায় না। ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে যাঁরা কাজে এগোন তাঁদের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী কাজই হয়, ক্ষণিক আড়ম্বরের জাহিরিপনা নয়।"

ধর্ম-সম্বন্ধে মন্দিরে অনেক কথা হ'ল। মন ভ'রে উঠল এ আবহে ধর্মালোচনা করতে পেরে। মনে হ'ল বিদেশে পেয়েছি স্বদেশের আস্বাদ—সাত সাগরের পারে ঠাকুরের পরিচিত কৃপাস্পর্শ।

তারপর অশোকানন্দ নিয়ে এলেন সানফ্রান্সিস্কোর মঠে। এখানে কয়েকজন ব্রহ্মচারী থাকেন। বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার এ-অট্টালিকাটি। ভিতরেও শান্তির আবহ। দেখলাম, সেখানে আরো দুটি আমেরিকান মহিলাকে—তাঁরা মিশনের ছাপা খাম নিয়ে ব'সে কর্মনিরত। সাদর অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। সেখানে ব'সে আরো অনেক কথাবার্তাই হ'ল। অশোকানন্দকে বললাম কথায় কথায়: "আমাকে আপনাদের একজন মনে করবেন—বাইরের লোক নয়।"

অশোকানন্দ বললেন: "তা জানি দিলীপবাবু।" আমি বললাম: "শুনুন। তের বৎসর বয়সে আমি প্রথম পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। প্রথম বেরিয়েছিল তিনটি খণ্ড। পরে চতুর্থ খণ্ড। আরো পরে পঞ্চম খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ড আমি অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশবার পড়েছি, চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বোধহয় বিশ ত্রিশবার। এখনো সময় পেলেই পড়ি। আমার ধর্মজীবনের সূচনা হয়

এই মহাগ্রন্থ থেকে। আমার কাছে তাই এ-গ্রন্থ গুরুগ্রন্থই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যেতাম স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে, শ্রীম-র কাছে, স্বামী সারদানন্দের কাছে, শ্রীমা সারদামণির কাছে, শিবানন্দের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। আর একথা আমি প্রমাণ করতে না পারলেও বলবই বলব যে তাঁদের সে-পরম আশীর্বাদ আমাকে দুঃসময়ে দিয়েছে বল, মনঃকষ্টে সান্ত্বনা, শঙ্কায় অভয়, নির্ভরসায় বিশ্বাস। তাই কোনো সময়ে আমাদের আশ্রমে পরমহংসদেব-সম্বন্ধে কোনো গুরুভাইয়ের মুখে অশ্রদ্ধার কথা শুনে আমি হয়েছিলাম মর্মাহত। তিনি বলেছিলেন—না, সে কথা উচ্চারণও করতে পারব না। আমি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে—শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে আপনার উচ্চধারণার কথা আমি পড়েছি আপনার 'সিন্থেসিস্ অব্ যোগ' বইটিতে। আপনার সে-ধারণা কি বদ্‌লে গেছে—নৈলে আপনার শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধার কথা বলেন কেমন ক'রে? তাতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেনঃ "আমার সে ধারণা বদলায় নি একটুও। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার টোনে (tone) আমি কথা বলব কেমন ক'রে? ধর্মের সঙ্গে কি আমার বর্ণপরিচয়ও হয় নি? শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মজগতে ছোট করা হবে এই কথা বলার সামিল যে শেক্ষপীয়র তৃতীয় শ্রেণীর কবি; নিউটন একজন গড়পড়তা অধ্যাপক।"

চিঠিটা হাতের কাছে নেই—স্মৃতি-শক্তির উপরে ভর ক'রে তার মর্মার্থ দিলাম অশোকানন্দকে।

বিদায় নিলাম যখন তখন মন ভরে উঠেছে আমার। মনে হ'ল ভারত অধঃপতিত বলে কে, যেখানে আজও মহাপুরুষদের জন্ম হয়, যাঁরা ধারণ ক'রে আছেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে? সানফ্রান্সিস্কোয় এসে যেন ভারতের ধর্মবাণীকে শুনলাম নূতন শ্রুতি দিয়ে। মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণীঃ

"অন্য অনেক ধর্ম আসবে যাবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সনাতন।"

এক শনিবারে এখানে একটি "মেটাফিসিকাল হল" নামে একটি কেন্দ্রে বক্তৃতা দিতে হ'ল। এখানে কত যে বই দেখলাম ধর্ম সম্বন্ধে! গুরুদেবের বই ও ছবিও দেখলাম। এমন কি রমণ মহর্ষির ছবিও এরা রেখেছে দেখে ভারি আনন্দ হ'ল। মনও উঠল উজিয়ে গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে, ঘর ভ'রে গিয়েছিল যদিও বেশি বড় তো নয়—তাই সব জড়িয়ে ৭০।৮০ জন শ্রোতা ও শ্রোত্রী শুনল আমার বক্তৃতা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে। আমি বললাম

প্রায় এক ঘণ্টা পনের মিনিট। বাংলায় তর্জমা ক'রে মর্মটুকু মাত্র দিই সংক্ষেপে।

"আপনাদের কাছে আমি আসি নি আজ বক্তা হিসেবে—এসেছি আপনাদেরি একজন হ'য়ে, মানে জিজ্ঞাসু সত্যার্থী। যা বলতে যাচ্ছি তার কিছুই হয়ত আপনাদের অজানা নেই, তবু যদি কেউ কিছু অনুভব ক'রে বলে তবে সেই অনুভবের তাপে জানা কথাও হৃদয়গ্রাহী হয়। এইটুকুই যা আমার ভরসা।

"ভারতবর্ষে একটি কথা হয়ত অন্য দেশের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত তথা গ্রাহ্য হয়েছে: যে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ-কথা আমরা বহুদিন থেকে শুনে ও প'ড়ে আসছি এবং এক সময় ছিল যখন এ-বাণীতে অবিশ্বাস করার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দীক্ষার প্রভাবে আমরা ভাবতে সুরু করেছি: এও কি সম্ভব? এক তো প্রথমত ভগবান আছেন কি না এই গোড়া ধ'রেই টানাটানি। তারপরে যদি বা ধ'রে নেওয়া যায় যে, এ জগতের এক নিয়ন্তা আছেন—যিনি অনাদি অশেষ 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ'—তখনও নিস্তার নেই, প্রশ্ন ওঠে: অণোরণীয়ান্ কীটাদপিকীট মানুষ কি এমন মহতো-মহীয়ান্‌কে পেতে পারে? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবীর বলেছেন হেসে যে, সিন্ধুতে বিন্দু দেখতে পায় সবাই, কিন্তু বিন্দুতে যিনি সিন্ধু দেখেন সেই বিরল দ্রষ্টারই উপাধি—জ্ঞানী।

"কিন্তু এ-দর্শন যে আমাদের সাধনলভ্য একথা জানব কার কাছে? না, তাঁদের কাছে যাঁরা দেখেছেন, যাঁদের নাম জ্ঞানী বা ঋষি বা মহাপুরুষ। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন এহেন মহাপুরুষের দেখা, প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে: 'আপনি কি দেখেছেন তাঁকে?' উত্তরে হেসে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব: 'শুধু যে দেখেছি তাই নয়, তোমাকে দেখাতে পারি যদি তুমি চাও সে-পথের পথিক হ'তে—যে-পথে চললে তাঁর দেখা মেলে।' ঠিক এই কথাই ব'লে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাজারো লেখায়, বাণীতে, পত্রে। আমাকে তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে: 'বাস্তব? কাকে বলছ তুমি বাস্তব? মধ্যাহ্ন সূর্যকে বাস্তব বলবে তো? যদি তাঁকে দেখতে পাও, যদি তাঁর শান্তি রসে আপ্লুত হ'তে পারো, যদি তাঁর আনন্দ হিল্লোলে তোমার দেহের প্রতি অণু হয় রসস্নিগ্ধ, সুধাসিক্ত, হিল্লোলিত তখনও কি এ-প্রশ্ন উঠতে পারে ভাবো যে

তাঁর দর্শন স্পর্শন বাস্তব কিনা? আমার জীবন্মুক্ত কবিতাটিতে আমি দিয়েছি খানিকটা আভাস—কিন্তু শুধু কণিকা আভাস মাত্র—যে, তিনি কি রকম প্রত্যক্ষ প্রেমাবেশে ভক্তকে ধারণ ক'রে থাকেন, কেমন তাঁর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন।'

"কিন্তু এজন্যে চাই তাঁর শক্তির শরণাপন্ন হওয়া, বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে:

'O mortal, bear this great world's law of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul's support on Heaven's strength
Make of thy daily way a pilgrimage.'

'হে মানব! এ-বিশ্বের অঙ্গীকারি' বেদনা-বিধান
ক্লিষ্ট জগতের সুদুর্গম পন্থে আত্মারে তোমার
করো ন্যস্ত আজ সর্বধারয়িত্রী দৈবশক্তি 'পরে···
দৈনন্দিন পথ তব হোক তীর্থযাত্রি-পথ সম।'

"কিন্তু এ-শর্ত পূরণ মুখের কথা নয়। তাই মেলে না তাঁর ধারয়িত্রী শক্তির দেখা। পাবার মতন কিছু পেতে হ'লে শিখতে হবে চাওয়ার মতন চাওয়া। আমরা চাই না পরম স্পর্শমণি, কাঞ্চন ছেড়ে থাকি কাচ নিয়ে ভুলে। ইন্দিরার একটি মীরাভজনে আছে 'তু সীপকা ন মোল কর অমোল রতন ছোড়কে— ঝিনুক নিয়ে দর কেন আর ছেড়ে অমূল মুক্তাধনে?' (শ্রুতাঞ্জলি, ১১৪ পৃঃ)

"জগতে আজ দুঃখ কষ্ট নিষ্ঠুরতা অবিশ্বাস—এরাই সর্বেসর্বা। যেদিকেই তাকাই, দেখতে পাই মুক্তা ছেড়ে শুক্তির জন্যে কাড়াকাড়ি। এ-পথে মেলে না পরম চেতনার পরশমণি। যদি সত্যি চাই এ-মণি—যেতে হবে তাঁদের কাছে যাঁদের করায়ত্ত হয়েছে এই মণির মণি। তাই গীতায় বলেছে:

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ'।

অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চাই তিনটি জিনিস, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাঁকে করা চাই প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা। তা'হলে তাঁরা দেবেন জ্ঞানের বর।

"এ-বাণী ভারতীয় সন্ধানীদের মনে ঠাঁই পেয়েছে প্রথম থেকেই। তাই বহুদিন থেকেই ভারতে শরণীয় ও বরণীয় ব'লে গণ্য হয়েছেন জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ভাবুক ভক্ত। কারণ সত্যিকার উপদেশ দিতে পারেন কেবল তাঁরাই, আর কেউ নয়। পাশ্চাত্য

দেশে আজকের দিনে এ-উপদেষ্টার সিংহাসন অধিকার করেছেন ঋষি মুনি জ্ঞানী যোগীরা নন—এখানে পরমশরণ্য হ'লেন বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, রণবীর। অনেকে হয়ত আজো পুরোপুরি টের পান নি একথা যে, পাশ্চাত্য দেশে আজ খৃষ্টধর্মের পুরোহিতরা নামে-মাত্র উপদেষ্টা, আসল দীক্ষাদাতা আজ বুদ্ধিবাদী তথা বৈজ্ঞানিক—যাঁরা বলছেন হেঁকে যে, চোখে-দেখা-যায়-না, ভেবে-পাওয়া-যায় না, একটু যদি বা ছুঁই, ধরতে গেলেই যায় ফ'স্কে—এমন সত্যকে ডিশমিশ ক'রে যাকে ধ'রে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় তাকে নিয়ে ঘর করাই সুবুদ্ধির কাজ। অন্য ভাষায়, বুদ্ধি ও যুক্তি যার নাগাল পায় তার কাছেই হাত পাতো।

"কিন্তু চলতি বুদ্ধি হাজার ধারালো হ'লেও পায় না অচিন্ত্যের দিশা, কারণ—সে-পরমমণি শুধু বিশ্বাসের কাছে প্রেমের কাছে নিরভিমানের কাছেই ধরা দেয়—আর কারুর কাছে নয়।

"তাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শীরা ব'লে এসেছেন বরাবরই যে, বুদ্ধির অভিমান ছেড়ে হাত পাততে শেখো এই বিশ্বাসের কাছে যে, তাঁকে পাওয়া যায় যদি চাওয়া যায়। বলেছেন: আধ্যাত্মিক পথের তীর্থযাত্রী এ-বিশ্বাসের পারানি বিনা দুস্তর অজ্ঞানাম্বুধি পার হবার চেষ্টা করলে মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি হবে। আগে চাই জানার আগে মানা—দীনতার সুরে চাই বলতে শেখা: 'আমি জানি না তুমি জানাও। আমি চিনি না, তুমি দাও চিনিয়ে।'

"পাশ্চাত্য জগৎ রুখে উঠে বলল: 'না। আমরা কিছুই মেনে নেব না। আগে দেখব তবে মানব।' একথা শুনতে মন্দ লাগে না হয়ত, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে এ-দাবি করে' আমাদের আত্মম্ভরী মন তার অজ্ঞানকে নিয়েই ঘর করতে চেয়ে। তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন ১৯২৪ সালে (যখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন?) যে, মানুষের সব আধিব্যাধির মূলে আছে তার অজ্ঞানাসক্তি। জ্ঞানকে যে চাইবে তাকে ছাড়তেই হবে এই আত্মাভিমানের, অজ্ঞানের দাসত্ব।

"এই-যে পরম বাণী, এ আমরা শুনে আসছি কবে থেকে! কিন্তু মুস্কিল এই যে, জগতে আমরা হাজার দুঃখ পেলেও চাই না জাগতিক দুঃখ থেকে অব্যাহতি। আমাদের মধ্যে আছে এক বিচিত্র দুঃখাসক্তি। আর এ-দুঃখাসক্তিই দেব-দ্রোহিতার জননী তথা ভরণী। আমরা চাই না নিজের চেতনার রূপান্তর। যাতে অভ্যস্ত তাকে নিয়ে ঘর করতে ভালো লাগে, অথচ অতৃপ্তি যখন ছেয়ে যায় মনে প্রাণে, তখন হ'য়ে উঠি অতিষ্ঠ। আসে বৈরাগ্য—একদিন না একদিন

আসবেই সবার মনে এই বৈরাগ্য—নিছক ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণা। তখনই আসে ডাক—মন বলে 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।' এ-বৈরাগ্য দু'রকম। এক, যে বলে এ-জগৎ মায়া সুতরাং পরিত্যাজ্য। এ-শ্রেণীর বৈরাগ্য সূচনায় কিছুদূর এগিয়ে দিলেও অন্তিমে আনে আংশিক অসাফল্য—কেন না এ-জগৎ ভগবান সৃষ্টি করেছেন শুধু দুঃখের ছায়াবাজি দেখাতে নয়—নব নব পরিবেশে তাঁর আনন্দের নব নব লীলা ছন্দ সুর তাল মূর্ত ক'রে ধরতে। তাই শ্রীঅরবিন্দ চান না বিশ্ববিমুখ বৈরাগ্য।

"কিন্তু আর এক আছে সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। সে বলেঃ 'আমি চাই সেই সুখ, যা আমাকে করে অমৃত—যে-সুখে অমৃতস্বাদ নেই—কী করব সে সুখ নিয়ে—সে তো সুখের ছদ্মবেশে দুঃখ, সুরু যার অলীক অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগে, কিন্তু সারা—অবসাদে অতৃপ্তিতে হাহাকারে।' বৃহদারণ্যকে তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে যে গ্রাম্য সুখে তাঁর না আছে রুচি, না আস্থা—তিনি চান অমৃতকে :

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?···
যাতে অমৃত হব না, তাকে নিয়ে কী করব!'.

"আজকের দিনে আমাদের সব আগে বরণীয় এই অমৃত-বাণীতে পুনর্বিশ্বাস, গভীর শ্রদ্ধা, অনিত্য বস্তু ছেড়ে নিত্য বস্তুর কাছে হাত পাততে শেখা, আর এ-দীক্ষা দিতে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দের মতন ঘোষণা করতে পারেন যে 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—যাঁরা দেখেছেন যে মানুষ তার মানবত্বেই পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না—উঠতে হবে তাকে মানবতা ছেড়ে ভাগবতী চেতনার কোঠায়—উত্তীর্ণ হ'তে হবে অতিমানব লীলায়। এ-উত্তরণের ফলে কী হবে প্রচার করেছেন এ-যুগের মহা ঋষি তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে :

When superman is born as Nature's King
His presence shall transfigure Matter's world ;
He shall light up Truth's fire in Nature's night,
He shall lay upon the earth Truth's greater law ;
Man too shall turn towards the spirit's call...
A divine force shall flow through tissue and cell
And take the charge of breath and speech and act
And all the thoughts shall be a glow of suns
And every feeling a celestial thrill···
Nature shall live to manifest secret God,

The spirit shall take up the human clay,
This earthly life become the life divine.

যেদিন অতিমানব হবে প্রকৃতির অধিরাজ,
রূপান্তরিত হবে বস্তুবিশ্ব আবির্ভাবে তার।
সত্যের জ্বালিবে অগ্নি সে বিশ্বের গভীর নিশীথে
স্থাপিবে ধরার 'পরে ধর্মের বিধান মহত্তর ;
সত্যের আহ্বান-মুখে ফিরিবে মানবও সেই দিনে···
প্রবাহিবে দিব্য শক্তি প্রতি অণু-পরমাণু-কোষে,
নিয়ামক হবে সে-ই প্রতি শ্বাস বাণী ও কর্মের,
প্রতি অনুভব হবে স্বর্গের পুলক শিহরণ,
প্রকৃতি প্রবহমানা হবে প্রমূর্তিতে গূঢ় দেবে,
মানব লীলার রশ্মি অন্তরাত্মা করিবে ধারণ,
এ-মর্ত্যের লীলা হবে ছন্দায়িত অমর্ত্য জীবনে।

* * *

কয়েকদিন বাদে হল-এর অধ্যক্ষ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন খামে ক'রে কিছু দক্ষিণা। বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরীকে বললাম। হরিদাস বললে: "এখানে সব কিছুর জন্যেই এরা টাকা দেয়। এমন কি ধরুন আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলতে এল—যদি দরকারি কথা হয় তবে কথাবার্তার পরে দেবে দক্ষিণা।" ইন্দিরা হেসে বললে আমাকে: "আমাদের সাভয় হোটেলের কথা মনে পড়ল। একজন বলেছিল আমার পিতৃদেবকে: 'ক্যাপ্টেন সাব্! আপনি যে-হোটেলের পাট বসিয়েছেন সে অতি নিদারুণ। এখানে একটিবার হাঁচলেও কয়েকটি চাকতি বেরিয়ে যায়।' কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কী আছে—যখন মার্কিন জাত স্বভাবে সুপার-হোটেলবাসী!"

এক দেশের ধরনধারণ অপরের কাছে বিচিত্র লাগে অনেক সময়েই। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে—বলে না? ধরুন, এখানে মোটর রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "পার্কিং"। এখানে যে কী মুস্কিল মোটর "পার্ক" করা! এখানে পার্কিং নৈব নৈব চ, ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়, সেখানে আধ ঘণ্টা দাঁড় করালেও দেড় ডলারের বিল। একটি সুড়ঙ্গ দেখলাম আমাদের হোটেলের কাছে—একটি মনোরম উদ্যানের নিচে দুর্দান্ত সুড়ঙ্গ। কী? না, মোটর "পার্ক" করা যেতে পারে—প্রতিদিন এখানে নাকি ৬৩০০ মোটর

দাঁড়ায়! এক চিঠি দেখালেন এক বন্ধু—লস এঞ্জেল্‌সে কোথায় গান্ধিজি সম্বন্ধে বক্তৃতা—কার্ডে লেখা: "Cars can be parked." মিস টাইবার্গ আমাদের নিয়ে যান নানা জায়গায় তাঁর মোটরে—অনেক জায়গায় প্রায় পাঁচ মিনিট হেঁটে তবে গন্তব্য স্থানে পৌছতে হয়—যেহেতু অন্যত্র মোটর পার্ক করা যায় না। সব চেয়ে মজার খবরটা বলি রসিয়ে! কনসালের বাড়ি তাঁর আপিস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে! রোজ তাঁকে আপিসে আসতে হয় কিন্তু মোটর ফিরে যায় তাঁর বাড়িতে—কেন না আপিসের কাছাকাছি কোথাও মোটর পার্ক করতে হ'লে দিন পিছু পাঁচ ডলার খরচা। অন্য পক্ষে ২০ মাইল আসতে পেট্রোল খরচ এক ডলার। সুতরাং বুদ্ধিমানে কী করে? উত্তরের কি প্রয়োজন আছে?

* * *

আতিথেয়তা ও বদান্যতারও চূড়ান্ত! মিসেস ডার্লিং ছাড়েন না, প্রায়ই ধ'রে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে—মধ্যাহ্ন-ভোজন না ক'রে নিস্তার নেই। গেন্‌স্‌-বরো সাহেব ইন্দিরার হাঁপানি আছে শুনেই নিজের খরচে ভালো ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন। আর একজন টেলিফোন করলেন: "সানফ্রান্সিস্কো দেখবার মতন দেশ—চলুন মোটরে ঘুরিয়ে দেখাই চার ঘণ্টা।" চার ঘণ্টা ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া মানে তো প্রায় দেউলে হওয়া। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম: "আচ্ছা"। আর একজন বললেন: "দিনের বেলা আমার কাজ। তবে যে-কোনো দিন সন্ধ্যায় টেলিফোন করলেই আমি আসব মোটর নিয়ে—নানা জায়গায় নিয়ে যাব, যদি চান।" এবার ধন্যবাদ দিয়ে বলতেই হ'ল "না"। কারুর কাছ থেকে ক্রমাগত সেবা নিতে বাধে—বিশেষ যখন দেখি প্রতিদানে আমাদের কিছুই দেবার নেই। এরা হাঁ হাঁ ক'রে আপত্তি করে: "দিচ্ছেন না? সে কি কথা? আপনার কাছে আমরা যে কী পাচ্ছি তার কতটুকু খবর রাখেন মহাপ্রভু?"

* * *

মোটর নিয়ে এলেন সজ্জন। সত্যিই অতি সজ্জন—নাম ওয়েস্টন ডেভিড হাণ্টার—যাঁর নামোল্লেখ করেছি একটু আগেই। এখানে থিয়েটারের ডিরেক্টর। কোনো থিয়েটারে দুর্নীতির বাড়াবাড়ি দেখে ইনি সেখানে জীবিকা অর্জন ছেড়ে অন্যত্র যান। অর্থাগম ইনি চান কিন্তু সদুপায়ে। ধর্মভীরু মানুষ আজকের দিনে যে খুব বেশি দেখা যায় না একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। ধর্মভীরু—ওরফে God-fearing—বিশেষণটি উচ্চারণ করতে না করতে মনে

পড়ে ভীরু বিশেষণটি। অর্থাৎ অধর্ম করতে যারা ভয় পায় তারা কাপুরুষ। তাছাড়া নৈতিকতার নিয়মকানুনও বদ্‌লে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু এই মানুষটি দেখলাম আধুনিক হ'য়েও অত্যাধুনিক নন। তাই বুঝি ধর্মভীরু? মোটরে নিয়ে ঘোরালেন প্রায় চল্লিশ মাইল। সানফ্রান্সিস্কোর বিখ্যাত "স্বর্ণদ্বার" Golden Gate বাগান দেখলাম। বাগান না ব'লে বোধ হয় নন্দন কানন নাম দেওয়াই ভালো। কী সুন্দর সবুজ মাঠ, বীথিকা, উঁচু নিচু রাস্তার বাহার! এদিকে ফুলের পাতার অজস্রতা, ওদিকে বিশাল প্রশান্ত মহাসমুদ্র লক্ষ ফেন বাহু তুলে অভিনন্দন করেছে ধরণীকে। এক এক জায়গায় খাড়াই উঠেই দেখি ওমা!—সমুদ্র একেবারে আমাদের পাদমূলে মাথা কুটছে! তারপরেই ফের হূ-শ্‌ ক'রে নেমে সমতল সৈকতে বিচরণ।

এই মঞ্জু পরিবেশে কত গল্পই হ'ল যে! ইন্দিরা সহজে কারুর সঙ্গে এত মন খুলে কথা কইতে চায় না, কিন্তু এই নবলব্ধ বন্ধুটি পেয়ে সে যেন উজিয়ে উঠল। বলল তাকে অনেক কিছু—পাশ্চাত্যের আত্মাভিমান সম্বন্ধেও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। বলল: এখানে ওখানে নানা শুভার্থীরই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে প্রকট হ'য়ে ওঠে তাঁদের মার্কিন সভ্যতার সম্বন্ধে গভীর অভিমান, আত্মপ্রসাদ—আমরা কী পরোপকারী! পতনোন্মুখ কত যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে সর্বদাই প্রস্তুত! "কিন্তু"—বলল ইন্দিরা হেসে—"আমাদের দেশের সাধুসন্ত জ্ঞানীদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি একটু অন্যধরনের দীক্ষা: যে, অপরকে তুলবার আগে একটু নিজেকে তুললে ভালো হয়।"

বন্ধুবর হেসে বললেন: "আপনি আমাদের আত্মাভিমানের গোড়ায় গলদের কথাটি বলেছেন চমৎকার। এ আমি নিজেও বহুসূত্রেই অনুভব করেছি। তাই তো আমি শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছি…" ইত্যাদি।

আরো কত কথা হ'ল পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে। ইনি বললেন একদিন আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁদের নবতম নাটকের মহল্লায়—ফ্রান্সিস টমসনের বিখ্যাত কবিতা "হাউণ্ড অফ হেভ্‌নের" নাট্যরূপ। ফেব্রুয়ারি মাসে এ-নাটকটি এখানে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। ফ্রান্সিস টমসনের "হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন্" কাব্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ উচ্চধারণা প্রকাশ করেছেন। আমি এ কবিতাটি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে পরমানন্দে। বন্ধুবর ক্ষিতীশ সেন বম্বেতে আমাকে বলেন—সে কবে—যে এই বইটির ছন্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দের প্রেরণা পেয়েছিলেন। যদিও এখানে ব'লে রাখি—অবান্তর হ'লেও—যে ঐতিহাসিকতার

দিক থেকে একথা সত্য নয় যে বলাকার ছন্দে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এ ছন্দে প্রথম কবিতা লেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আর্যগাথায়। কিন্তু সে যাক্—বন্ধুবরের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এ-বন্ধুটির মধ্যে ভাবুকতা দেখে বড় ভালো লাগল। ইনি একলাই থাকেন ও সারাদিনের কাজকর্মের পরে হৈ-চৈ না ক'রে অন্তর্মুখীনতারই সাধনা করেন—ধ্যান ধারণা পাঠ এই সব নিয়ে। আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধা তথা প্রবেশ এঁর সহজাত। আর একটি যুবক, Page, একদিন টেলিফোন করলেন: সেদিন রাতে আমার বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছে—দেখা করতে চান। ইনি এলেন একটি তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে। বুঝতে দেরি হ'ল না যে বান্ধবী বন্ধুর প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যা হয়—ইনি চান ধর্মজীবন স্বকীয় তৃষ্ণায়, উনি চান ধর্মজীবন এঁর জন্য: বল্লভের ধর্মতৃষ্ণায় সাড়া দেন দরদী হ'তে চেয়ে, যাকে বলে at one remove.

সে যাই হোক পেজ সাহেবের কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত হ'লাম। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine শুধু চার চার বার প'ড়েই ইনি ক্ষান্ত হন নি—তার সূচীপত্র তৈরি করেছেন। এঁর মধ্যে দেখলাম স্বাধীন চিন্তার অভাব নেই। বললেন: "অনেকে মিলে ধ্যানধারণা—ওতে তাঁর বিশ্বাস নেই। ধ্যান হয় একান্তে।" ইনি আরো বললেন: "আমেরিকা আজব দেশ। যে-কোনো বুদ্ধিমান্ মানুষ ভারতবর্ষে দুদিন কাটিয়ে এখানে এসে বক্তৃতা দিতে পারে ভারত সম্বন্ধে—বলতে পারে বড় বড় কথা—আর পাঁচজনে শোনে উৎসুক হ'য়ে। ধর্মবুদ্ধির স্ফুরণ হ'তে পারে না এই ধরনের পাঁচমিশেলি লেকচার বা প্রপাগাণ্ডায়।" সাধু, সাধু।

* * *

একটি অতি সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল: নাম—Mario Velez: আর্জেন্টিনা থেকে এসেছে। আমার বক্তৃতা শুনে এসে বলল: "বলুন আমাকে আরো। আমি চাই ধর্মজীবন। উপায় কি? আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়—শুনেছি ধর্মজীবনের একটা চাপ আছে—কেবল বলিষ্ঠ দেহ সে-চাপ সইতে পারে।"

আমি বললাম: "এ নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল বছর কয়েক আগে। তিনি লিখেছিলেন আমাকে যে, খাঁটি মানুষ যখন খাঁটি ধর্মজীবন চায় তখন ভগবান্ তাকে রক্ষা করেনই করেন—এর অন্যথা হ'তেই পারে না।"

ইন্দিরার নৃত্য দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। কতভাবে যে আমাদের সেবা করত সে কী বলব? ইন্দিরার হাঁপানির ওষুধ চাই—পাঠিয়ে দিল—আমার ডাকটিকিট চাই অমুক অমুক—দিল কিনে নিজে থেকে। কোথায় টাইপরাইটার? বলল—আমারটা নিন। তার সুন্দর মুখ ও নম্র ভাবের মধ্যে কিন্তু কেমন একটি বিষণ্ণতা ছিল। বলত প্রায়ই: "বলুন কী ভাবে যাপন করব আমার জীবন।" বললাম: "এসো একলা, যা জানি বলব বৈ কি।" দেখতে দেখতে খুব ভাব হ'য়ে গেল। ফের সেই মামুলি অনুভূতি—স্নেহের মাধ্যমে পর কত সহজেই না আপন হয়!

* * *

আকাডেমিতে সুরু হ'ল আমার বক্তৃতা ২৬শে জানুয়ারি—শুভদিনে, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে। পর পর তিন দিন বক্তৃতা দিয়েছি। কী ভাবে একটু বলি। বলবার ম'ত।

ক্লাসে গিয়ে দেখি দশ-বার জন ছাত্রছাত্রী—বলাই বেশি, আত্যন্ত আমেরিকান। কী ভাবে সুরু করি? ক্লাসে বক্তৃতা আমার সাতপুরুষে কখনো দেয় নি। তার উপর নির্জলা বিদেশী—তার উপর আমেরিকান। মনকে শুধালাম: "ভোলা মন! এবার মনস্ক হ'তে হবে যে! কী করা যায়?" ভোলা মন হঠাৎ রাজি হ'ল মান বাঁচাতে, বলল: "প্রভু! থিওরির কচকচি ছেড়ে আগে প্র্যাক্টিক্যাল কিছুর অবতারণা করুন—চাই আগে ওদের ঔৎসুক্য জাগানো। নৈলে দেখবেন দুদিনে মক্কেল ভাগবে।"

তথাস্তু। প্রথম বিলাবল ঠাট—অর্থাৎ শুদ্ধ ঠাটের—একটি গান গেয়েই বললাম আমার সঙ্গে তাল দিতে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক। ওরা দিল—ইন্দিরা পাশে ব'সে তাল দিচ্ছিল ওদের দেখাতে কোথায় কোথায় ঝোঁক পড়ছে। তারপর, ওদের একটু স্তম্ভিত করাও তো চাই—নৈলে ভাববে: "এঃ! এ তো জলের মতন সাফ!" যে কথা সেই কাজ, ধরলাম বিষমপদী তেওরা। খানিকক্ষণ তাল দিয়ে দেখাতে দেখাতে ওরা ধরল তালের মূল ঝোঁক তিনটি। আর সঙ্গে সঙ্গে কী পুলক ওদের! কী আশ্চর্য তাল! কী চমৎকার কদম!—ইত্যাদি। তখন বললাম জলদমন্দ্রে: "বন্ধু! বোঝ কী ভাবে আমাদের সঙ্গীত বিকশিত হয়েছে!" তারপর ইমন রাগের ঠাট বুঝিয়ে ধরলাম তাল। এবার রোমহর্ষণে ওদের প্রায় দশা হয় আর কি!

তারপর বললাম: "এবার নেওয়া যাক্ একটি পরম সুন্দর রাগ যার ঠাট

তোমাদের সঙ্গীতে নেই আদৌ—কিনা ভৈরবী। গ্রীস দেশে একে বলত Phrygian mode—কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নেই এর দোসর”…… ইত্যাদি। ব'লেই ধ'রে দিলাম শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব রচনা ( অনিলবরণের মহালক্ষ্মী গানের অনুবাদ ) :

In lotus groves thy spirit roves
Where shall I find a seat for thee ?

গানটি আবৃত্তি করলাম, ওরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মতন প্রত্যেকে খাতায় টুকে নিল। তারপর বললাম : “গাও আমার সঙ্গে। প্রথমটায় হার মানবে অবশ্য, কিন্তু সাঁতার দেওয়া শিখতে হ'লে শ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল ঝুপ্ ক'রে জলে নেমে হাবুডুবু খাওয়া। এই ইংরাজি গানটি বিশুদ্ধ ভৈরবী সুরে বসানো। তাই যা পারো গাও সঙ্গে সঙ্গে।”

মিনিট পনের গাইতে গাইতে ওরা উচ্ছ্বসিত! কী সুন্দর সুর! কী সুন্দর ঢং এর ছন্দের—ভঙ্গির!……ইত্যাদি।

যখন ভজনখানি আমেরিকান নরনারী একতানে গাইতে লাগল আমাদের ভৈরবী সুর ইংরেজী গানে—তখন গায়ে আমার যাকে বলে কাঁটা দিয়ে উঠল সত্যিই। মনে হ'ল “আহা রে! যদি কলকাতার কোনো আসরে এই কোরাস শোনাতে পারতাম!”

সত্যি, ভাবুন আমার মনের অবস্থাটা। এসেছি কোন্ বিভূঁয়ে—যেখানে না জানে কেউ আমাদের ভাষা, না জানে আমাদের সুর, না জানে আমাদের রীতি নীতি চালচলন। এহেন পরিবেশে চুটিয়ে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে ইংরাজিতে আমাদের ভারতীয় রাগ রাগিণী সম্বন্ধে, গাইতে হচ্ছে ভারতীয় সুর—তা আবার ওদের ইংরাজি ভাষায় বসিয়ে—আর গাইতে না-গাইতে কিনা গান যাচ্ছে জ'মে—শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী সমান আনন্দে আত্মহারা! ভগবান্ দুঃখ দেন বহু, কিন্তু আবার এমন আনন্দও তো দেন!—কেবল ( মামুলি ) খেদ এই যে এমন শিহরণের আবির্ভাব হয় কদাচিৎ—কালে ভদ্রে : Rarely rarely comest thou, spirit of delight! বলেছিলেন কে? শেলি না?

* * *

পরের দিন মালকোষ গাইলাম খাস বাংলায় ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গাওয়া গান—ঝাঁপতালে :

“রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়!

ইন্দিরা নৃত্যযোগে তাল দেখাল। ওরা আরো উচ্ছ্বসিত! হাতে তাল দিতে লাগল ওর পায়ের নূপুরের সঙ্গে মিলিয়ে। ভাবুন অকরুণ পাঠক পাঠিকা! একটু করুণ হ'য়ে ভাবুন কী অঘটনটা ঘটছে অঘটনঘটন-পটীয়সীর ইঙ্গিতে!

কাল যাব ফের শেখাব পিতৃদেবের ঝিঁঝিট গান:

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই
আলোর মতন হাসির মতন কুসুমগন্ধ রাশির মতন
হাওয়ার মতন নেশার মতন
ঢেউয়ের মতন এসে যাই।

কিন্তু ওরা গাইবে এটি অবিকল ঐ সুরে—ইংরাজিতে:

We come and float past homing...
Even as light and even as laughter...
Even as the heart-ache's questioning after···
Even as the breeze's mystic thrill
And even as the shimmer of gloaming.

এ গানটি বন্ধুবর হাণ্টারও শিখলেন ও সানন্দে গাইতেন প্রায়ই।

বললাম ওদের: "প্রথম গানটি হ'ল নিছক ভক্তির গান, এটি হ'ল ভাবের গান খানিকটা রহস্যময় ওরফে মিস্‌টিক।"

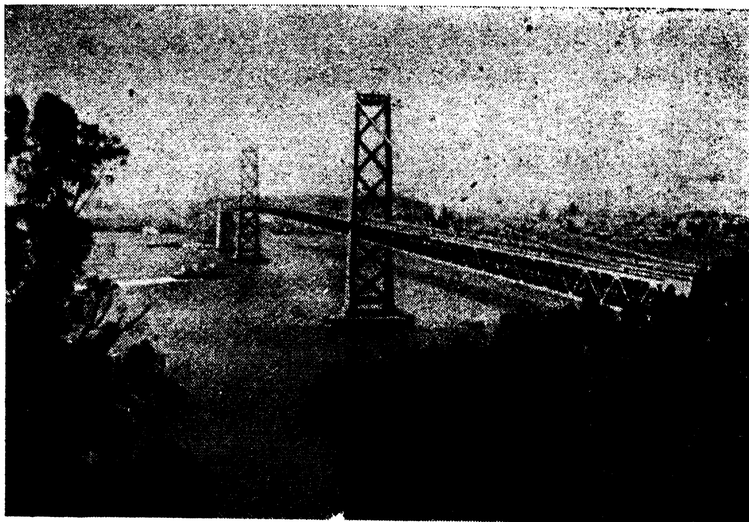
তারপর···কিন্তু পরের কথা পরে।

* * *

ভৈরবী শেখানোর পরদিন হাণ্টার তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন ফের বহুদূরে, প্রায় ত্রিশ মাইল। গেলাম হু হু ক'রে "স্বর্ণদ্বার সেতু"-র (Golden Gate Bridge) উপর দিয়ে। সানফ্রান্সিস্কোর সবচেয়ে লম্বা সেতুর নাম বুঝি ওকল্যাণ্ড ব্রিজ—সাড়ে আট মাইল লম্বা সমুদ্রের উপর দিয়ে। "স্বর্ণদ্বার সেতু"-ও প্রকাণ্ড এবং দীর্ঘতায় বোধ করি মাইল দুই তিন। বন্ধু বললেন এর পরের দিন নিয়ে যাবেন দীর্ঘতম সেতুর উপর দিয়ে।

কিন্তু উনদীর্ঘতম সেতু দেখেই যারা অস্থির, দীর্ঘতম সেতু দেখলে না জানি কী হবে তাদের অবস্থা! ভাবুন, সাক্ষাৎ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছে ত চলেইছে প্রশস্ত সেতু—এত প্রশস্ত যে পাশাপাশি ছয়টি মোটর ছুটতে পারে এবং প্রায়ই ছুটে থাকে—একদল এদিক থেকে ওদিকে, আর একদল ওদিক থেকে এদিকে—যাকে বাংলা ভাষায় বলে আপ অ্যাণ্ড ডাউন।

দুঃখ এই যে, পাদমূলে সমুদ্র দেখতে পেলাম না—কুয়াশা সাধল বাদ। যাহোক ওপারে গিয়ে হু হু ক'রে চলছি তো চলছিই—আর সেই প্রথম দিনের দৃশ্য—ছুটেছে মোটর অগুন্তি অথচ পথে পথিক নেই একটিও!



সানফ্রান্সিস্কো—ওকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু—দৈর্ঘ্যে ৮½ মাইলের বেশি

হঠাৎ, ও মা! পাহাড়ে ওঠা সুরু হ'ল। একেবারে জলজ্যান্ত পাহাড়—আঁকা বাঁকা, উঁচু নিচু—দেখতে দেখতে দুধারে গভীর খট্টা ও উপত্যকা জেগে উঠল। কী সুন্দর! সুইজর্লণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিল। সবুজ পাহাড়ের ঢেউ খেলছে বাঁদিকে, ডানদিকে প্রতিবেশী—তুঙ্গ পাহাড়ের অচলায়তন! চোখ জুড়িয়ে গেল।

তারপর, ও মা! আচম্বিতে হু হু ক'রে মোটর নামতে সুরু করল! দেখতে দেখতে Muir wood বা Red-wood forest!

এখানে কী অপরূপ যে বিটপিকুঞ্জ তথা বীথিকা! আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ রেডউড গাছগুলির অজস্রতা ও তুঙ্গতা। এর চেয়ে চওড়া গাছের গুঁড়ি দেখেছি, যথা বট। কিন্তু এত লম্বা গাছ কখনো দেখিনি। সত্য মিথ্যা জানি না, তবে জনশ্রুতি: এত লম্বা গাছ আর নাকি নেই ধরাধামে। সবচেয়ে লম্বা গাছটির উচ্চতা ২৪৬ ফিট, বেড় ১৭ ফিট।

কিন্তু শুধু দৈর্ঘ্যে অদ্বিতীয়তাই নয়, কী সুন্দর! চিরহরিৎ এই গাছগুলি শীত-গ্রীষ্মে যোগীর মতনই সমভাব—সমপ্রফুল্ল—অচলপ্রতিষ্ঠ। পাদমূলে সাথী চলেছে কলধ্বনিময়ী শ্রান্তিহীনা নির্ঝরিণী। অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে সোনার রোদ—সবার উপর হান্টারের মতন বন্ধুর স্নেহসঙ্গ! আর চাই কী?

বন্ধুবর সুস্বাদু আহার্য নিয়ে গিয়েছিলেন—ইন্দিরা বেশি কিছু খেল না, কিন্তু আমরা দুজনে সানন্দেই পিকনিক করলাম।

* * *

আর একটি হলে নিমন্ত্রণ মিলল। এখানে আধঘণ্টা ধ'রে বললাম শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের কথা ও জেলে ভগবদ্দর্শনের কথা। তার পরে পিতৃদেবের স্বদেশী গানের কথা ব'লে গাইলাম প্রথম "ভারত আমার ভারত আমার" ও শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত ইংরাজি অনুবাদ। তারপর গাইলাম ইন্দিরার রচিত গান "ইকদিন জানা ইকদিন জানা হৈ পীকি নগরিয়া জানা"—অবশ্য আগে এ-গানটির অনুবাদ ক'রে গানটির ভাব বুঝিয়ে দিয়ে তবে।

গানান্তে ওরা সোচ্ছ্বাসে ধন্যবাদ দিয়ে হাতে গুঁজে দিল দক্ষিণা—খামে লেখা "with appreciation." দুদিনে ব্রাহ্মণ-বিদায় হ'ল মন্দ কী—বিশেষ যখন না-চাইতে পাওয়া—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে windfall!

পয়লা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা গেলাম রুডল্‌ফ শেফারের সুন্দর বিদ্যালয়ে। নাম—School of Design. সেখানে বন্ধুবর হরিদাসকে প্রথম দিনই দেখলাম—ধুতি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। আমরা এদেশে ধুতি পরি বেশ একটু সলজ্জভাবে—তাছাড়া সবাই তাকায়, ভাবে: কোন্ চিড়িয়াখানার চিড়িয়া ছাড়া পেয়েছে গো! তাই ধনুর্ধরতম দেশপাণ্ডাও এখনো পর্যন্ত বড়গলা ক'রে বলতে সাহস পান না যে এদেশে বাঙালিবাবু বাবুটি সেজে বেরুবে না কেন? কিন্তু যদি বলি—এদেশে ধুতি পাঞ্জাবি অচল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে—তাহ'লে তাঁরা তর্ক করবেন কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি অনেকদিন থেকে এই দুঃসাহস পোষণ করছি যে এদেশে যে-কাজটি কেউ করে নি, আমিই করি না কেন সর্বপ্রথম? চোগা-চাপকানও তো এদেশে "নতুন কিছু করা" নয়। সত্যিকারের অসমসাহসিক কাজ হবে এদেশে প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে ধুতি পাঞ্জাবি প'রে বেরুনো। এ ঠাণ্ডা দেশ, এখানে ধুতি পরলে মারা পড়বে যে—এ ধরনের নিষেধ-বাণী সর্বতোভাবে অসিদ্ধ। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়—বিশেষত দিনের বেলা। দিল্লিতে জানুয়ারি মাসে ঠাণ্ডা এখানকার চেয়ে বেশি। তবে? দিল্লিতে যদি ধুতি পরা

চলে, এখানে চলবে না কেন শুনি ? যা ভাবা সেই কাজ। দেখতে দেখতে সাহস জেগে উঠল। মরীয়া হ'য়ে বেরুলাম ধুতি চাদর প'রে প্রথম দিন ভারতীয় কনসালের ওখানে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবসে—২৬শে জানুয়ারি। কই—কেউ তো কুকুর লেলিয়ে দিল না ? তারপর থেকে ধীরে সুস্থে ধুতি প'রে বেরুতে লাগলাম—বিশেষ ক'রে বড় বড় হলে গান-বাজনার আসরে। ইন্দিরা নাচত শাড়ি প'রে, আমি গাইতাম ধুতি প'রে। কই, কেউ তো বলল না অশোভন! বরং অনেকেই বলতে লাগল: "কী সুন্দর বেশ—এই ধুতি পাঞ্জাবি!" এতে করে আরো সাহস বেড়ে গেল—প্রায়ই সময়ে অসময়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এখানে ওখানে ধুতি প'রে। সবাই চেয়ে চেয়ে দেখত, তা সে তো চোগা-চাপকান প'রে বেরুলেও দেখে। দেখুক। কত দেখবে ? যাই হোক, যা বলছিলাম বলি।

পয়লা মার্চ শেফারের মস্ত হলে হরিদাস বক্তৃতা দিল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে। বড় সুন্দর বলল। তাকে আমি বললাম তার বক্তৃতার সারমর্ম আমাকে দিতে, আমার ভ্রমণ-কাহিনীতে জুড়ে দেব। সজ্জন হরিদাস বলল হাসিমুখে: তথাস্তু। শুধু বলা নয়, কথা রাখা—পাঠানো। পেশ করি আগে সেটুকু—কার না ভালো লাগবে এমন সুন্দর ভাষা, এমন পণ্ডিতের লেখনীজাত ? অবশ্য এ-সারমর্মটুকু ওর ইংরাজি বক্তৃতার তর্জমা।

হরিদাস বলল: "আমি আজ আপনাদের কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু বলব। যোগ সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এখানে অনেকেরই নানা রকম অদ্ভুত ধারণা আছে। যোগ বলতে অনেকেই এখানে মনে করেন ম্যাজিক জাতীয় কিছু, অথবা অলৌকিক কোনো শক্তিপ্রদর্শন, যেমন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, অথবা কাঁচের টুকরো খাওয়া, অথবা পদ্মাসনে ব'সে শূন্যে ওঠা ইত্যাদি। কিন্তু এ যে কতবড় ভুল তা' হিন্দুদর্শনের যে-কোনো ভাল বই পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন। "যোগ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুইটি: union এবং control, সংযোগ এবং সংযম। সুতরাং যোগ কথাটির নিহিতার্থ হ'ল আত্মসংযম, অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সচেতন সংযোগ, অসীমের সঙ্গে সসীমের সংযোগ, শিবের সঙ্গে শক্তির সংযোগ, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ। এই সংযোগের ফলে আসে চিত্তের সমতা ও বুদ্ধির সমদর্শিতা, যা নাকি পরম জ্ঞানের লক্ষণ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে 'Integration of personality,'' অর্থাৎ মানুষের মনের ও সত্তার সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস আত্মবিকাশ, যোগ সেইরূপ আত্মবিকাশের প্রণালী ও উপায়ের নির্দেশ দেয়।

"হিন্দুদর্শন বলতে অনেকে মনে করেন অবাস্তব কল্পনাবিলাস ও কর্ম-বিমুখতা। এ-ধারণা যে কতবড় ভ্রান্তি তা' আপনারা বুঝতে পারবেন যদি হিন্দুধর্মের বাইবেল স্বরূপ "গীতা" পাঠ করেন। গীতার মূলমন্ত্র হ'ল কর্ম, ভাগবত কর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের ভিত্তিতে দিব্যছন্দে লীলায়িত কর্ম। আমেরিকা কর্মে বিশ্বাস করে, তাই কর্মের নেশায় মেতে উঠেছে। কিন্তু কর্ম যখন শুধু কামনা ও ভোগলিপ্সায় পরিপুষ্ট হয় তখন বন্ধনের-ই কারণ হয়, সমাজে অশান্তি আনে, অন্তরের শূন্যতা ও হাহাকার বাড়িয়ে তোলে। কর্মযোগ হ'ল জ্ঞাননিষ্ঠ নিষ্কাম কর্মের গুহ্যরহস্য, যা অন্তর ভ'রে দেয় ভাগবত-সম্পদে এবং সমাজ-জীবন শান্তি, প্রেম ও সুষমায় সমুজ্জল ক'রে তোলে। নবজাগ্রত ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী গীতার এই কর্মযোগ থেকেই নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আর বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ গীতার শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জগতকে শিখিয়েছেন—কী ক'রে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব এবং কী করে এই সমন্বয়ের মধ্যেই পৃথিবীতে ভাগবত-জীবন রচনার চাবিকাঠি নিহিত আছে। আমার পরবর্তী বক্তৃতায় আমি এই সমন্বয়ের মূল ধারাটি আলোচনা করবো।

"খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ আমাদের মধ্যে ভারতের দুইজন খ্যাতনামা কবি ও মনীষী উপস্থিত আছেন—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। আপনাদের যা প্রশ্ন আছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দিলীপকুমার দুটো ভক্তি-মূলক গান গাইবেন এবং ইন্দিরা দেবী গুরু নানকের মূল গ্রন্থ থেকে আপনাদের কিছু পড়ে শুনাবেন। আগামী রবিবার রাত্রি ৮টার সময় তাঁরা এখানে একটি কন্সার্ট দেবেন।"

তারপর ইন্দিরার পালা এল—গুরু নানক ও গুরুগ্রন্থের মহাবাণী প'ড়ে শোনাবার। সে অনেক কথাই বলল—প্রথমে সংক্ষেপে গুরু নানকের জীবন সম্বন্ধে, পরে গুরুগ্রন্থ থেকে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি ক'রে সুন্দর ইংরাজিতে ব্যাখ্যা ক'রে। এখানে একটু থেমে গুরু নানক সম্বন্ধে একটু উপক্রমণিকা না করলেই নয়, কারণ এ-মহাপুরুষের মহিমা সম্বন্ধে খুব কম বাঙালিই জানার মতন কিছু জানেন।

আমরা জানি—বা শুনেছি বলাই ভালো—যে গুরু নানক শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কেউ কেউ দেখেছি অমৃতসরের স্বর্ণচূড় মন্দির—"গুরুদ্বার", যেখানে "গ্রন্থসাহেব"কে বিগ্রহ ক'রে শিখ পুরোহিতরা পূজা ও পাঠ করেন। শিখদের দশগুরুর কথাও শুনেছি যাঁদের শেষ গুরুর নাম গুরুগোবিন্দ সিং। এও আমরা

লোকমুখে শুনে একটা ধারণা ক'রে রেখেছি যে, মোগলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখনামক বীরজাতির গঠন-প্রেরণা দেন এই মহাবীর গুরু নানক—যাঁকে শিখ সম্প্রদায় অবতারের পদবী দিয়েই পূজা করে। কিন্তু এর বেশি আমরা বিশেষ কিছু জানি না বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

ইন্দিরা যখন আমার শিষ্যা হ'য়ে পণ্ডিচেরি আসে, তখন ওর মুখে গুরু নানকের জীবন-কাহিনী তথা গুরুগ্রন্থের বহু উদার বাণী শুনে আমি গভীরভাবে মুগ্ধ হই। সেই সূত্রে গুরু নানক সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য আহরণ করি যা ইন্দিরা পরে আমেরিকায় বলেছিল কয়েকটি বক্তৃতায় ও পাঠচক্রে। তার একটু চুম্বক মতন দিলে সব দিক দিয়েই আমার এ-বইটির গৌরব ও সমৃদ্ধি বাড়বে।

ইন্দিরা বলল : "মহাগুরু নানক ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় কিন্তু স্বধর্মে ব্রাহ্মণ, কারণ শৈশবেই তাঁর চিত্তে ধ্যানের স্ফুরণ হয় ও ভগবদ্‌ভাব জেগে ওঠে। তাঁর পিতা ছিলেন দোকানী। একদিন এক ক্রেতা এসে চাল না ডাল কিনতে চায়। তখন বালক নানককে দোকানে বসিয়ে পিতা গিয়েছিলেন অন্যত্র। বালক উচ্চৈঃস্বরে গণনা ক'রে চাল মেপে দিচ্ছিলেন ক্রেতাকে—'এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছে, সাত, আট, নও, দশ, এগারা, বারা, তেরা,—' 'তেরা' বলতেই তাঁর ভাবাবস্থা—তারপর যত কুনকেই দেন না কেন বলেন গদ্‌গদকণ্ঠে : 'তেরা তেরা তেরা—সব্‌হী তেরা—সব্‌হী তেরা।'

"আর একবার," বলল ইন্দিরা, "গুরু নানকের পিতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন পাশের এক গ্রামে 'সৌদা' করতে ( মানে খরিদ )। বালক নানক সেখানে বাজারে গিয়ে দেখেন অনেকগুলি সাধুকে। অম্‌নি তাঁর কাছে যত টাকা ছিল সব তাদের দিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরে আসেন। পিতা আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন—কী ব্যাপার ? বালক হেসে বলল : 'যা সৌদা ক'রে আনলাম—সে পারের কড়ি, অক্ষয়—সাধুকে দান করার পুণ্য।'

"গুরু নানক ছিলেন জাতিভেদ-পরিপন্থী। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ছিল দুটি। একটি মুসলমান, নাম—মর্দানা। অন্যটি হিন্দু, নাম—বালা। তাঁর জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনীই লিখে রেখে গেছেন 'বালা'।

"জন্মসাথী'* ও 'গুরুগ্রন্থ' আদ্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন এই মহাজীবনীকার। তাঁর জীবন সম্বন্ধে কত চমৎকার চমৎকার কথাই না আমরা জানতে পেরেছি এঁর

* গুরু নানকের জীবনীর নাম জন্মসাথী, মানে জন্মসাক্ষ্য। বইটি আদ্যন্ত উর্দু হরফে লেখা, ইন্দিরা মাঝে মাঝেই প'ড়ে শোনাত এ-বইটি থেকে।

প্রসাদে। ধরুন, মোগলসম্রাট বাবরের সঙ্গে নানকের দেখা। ব্যাপারটা বলি সংক্ষেপে :

"নানকের গান শুনতে চেয়ে বাবর তাঁর কাছে দূত পাঠান। দূত বলে : 'সম্রাট সেলাম দিচ্ছেন'। নানক বলেন : 'আমি এখন সবার সম্রাটের দরবারে ভজন করছি—বলো গিয়ে তাঁকে।' বাবর শুনে কৌতূহলী হ'য়ে নানকের কুটীরে আসেন ও তাঁর ভজন শুনে খুশি হ'য়ে তাঁকে হাতের পিয়ালার সুরভিত সিদ্ধির সরবৎ পান করতে নিমন্ত্রণ করেন। তাতে নানক হেসে বলেন :

'যে-সিদ্ধি করেছি পান—শিবের পানীয়
নেশা তার চিরন্তন—অপূর্ব স্বর্গীয়।'

বাবর চমকে যান। বলেন : 'আচ্ছা কী চাও বলো ? আমি দান করব।' তাতে গুরু নানক বলেন :

'কী আমারে দিবে দান ?—ক্ষুধা যে আমার
শুধু তাঁর দর্শনের—যিনি সারাৎসার।
কে বা দেয় ভিক্ষা রাজা, কে করে গ্রহণ ?
এক দাতা এ-সংসারে—ভুবনমোহন :
প্রসাদভিখারি তাঁরি যত বিশ্ববাসী।
তাই মূঢ় সে—যে হ'য়ে মুষ্টিভিক্ষা-আশী
মায়া-সম্রাটের দ্বারে এসে ভিক্ষা চায় :
ভিখারি কি ভিখারির দ্বারে ভিক্ষা পায় ?

গুরু নানকের সম্বন্ধে বলবার কথা আছে অজস্র। এখানে শুধু সামান্য একটু উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হ'তে হবে। ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে ইন্দিরার সহযোগিতায় নানকবাণী সম্বন্ধে একটি বই লিখব। কিন্তু লেখা সহজ নয় কারণ গুরু নানকের মহাবাণীর বৈচিত্র্য এত বেশি ও চমকপ্রদ যে সংক্ষেপে লেখা অসম্ভব। বিপুলকায় "গুরুগ্রন্থে" তাঁর অগুন্তি জ্ঞানবাণী মণিমুক্তার মতনই ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। ইন্দিরা আমেরিকায় কয়েকটি পাঠচক্রে কয়েকটি বাণী আহরণ ক'রে উপহার দিয়েছিল আমেরিকান শ্রোতাদেরকে। ডাক্তার স্পীগেলবার্গ, হরিদাস, হাণ্টার প্রমুখ অনেকেই চমৎকৃত হ'য়েছিলেন গুরু নানকের বাণীর গভীর মহিমায় ও মহান্ ঔদার্যে। এখানে সে-বাণীর কয়েকটি মাত্র কবিতায় গেঁথে বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে ক্ষান্ত হব—শুধু ইন্দিরা কি ধরনের গুরুবাণী ওদেশে প্রচার ক'রে এসেছে তারি নমুনা হিসেবে।

গুরুগ্রন্থ, ৭৯৭ পৃষ্ঠায় :

যত উচ্চে আরোহণ করো গিরিপথে—তত হয়
প্রবল পবন বাধা সম্মুখে তোমার। যারা রয়
সানুমূলে নিম্নে, মনে করো—সুখী তারা, করে বাস
নিরাপদ আরামের বুকে। কিন্তু দর্শনের আশ
মিটে কি তাদের? তারা দেখিতে কি পায় কভু হায়,
যে-উদার দিক্‌চক্র গিরিচূড়া হ'তে দেখা যায়?
নহে প্রেম সে তো—যদি নিবেদন না করি বল্লভে
সর্বস্ব আমার।
নহে সে তো অর্ঘ—যদি সঁপিয়া মঞ্জুষা রাখি কাছে
কুঞ্চিকাটি তার।

গুরুগ্রন্থ, ১৯২ পৃষ্ঠায় :

শক্তি কীর্তি প্রতিভার অনুপাতে হয় না তো হায়
সাধুর মহিমা-পরিমাপ বসুধায়।
দিব্য করুণার অনুপাতে তার মহিমাবিচার—
যে করে অবতরণ আধারে তাহার।

গুরুগ্রন্থ, ৩৩৪ পৃষ্ঠায় :

"আমার গুরুর মহাযোগ উচ্চ সর্ব যোগ হ'তে,
যে নহে সাধক হেন শ্রেষ্ঠ সাধনের—সত্যব্রতে
পাবে না সে মুক্তিদীক্ষা"—একথা যে বলে, অন্ধ সে-ই।
চক্ষুষ্মান্ সে—যে গায় : "যে যেথায় খোঁজে সে-পথেই—
আমার গুরুর কৃপা পথে তার ধরিবে বর্তিকা :
যে যেথায় চায় দিশা—আঁধারে লভিবে দীপালিকা।
জ্ঞান ল'য়ে যায় ঊর্ধ্বে—জ্ঞানার্থীরে দিতে পরেশের
পরম প্রজ্ঞার মুক্তিস্বাদ :
ভক্তির আহ্বানে আসে ভগবান্ নামিয়া ভক্তের
কুটীরে করিতে আশীর্বাদ।
কাঁদিনা কাদিনা আমি—যার তরে কাঁদে এ-জগতে
ভোগবাদী—কায়াভ্রমে আলিঙ্গন করে যারা ছায়া :

সে-সুখ—বিলাসভ্রান্তি। আমি কাঁদি দেখি'—শুভব্রতে
নহে তারা ব্রতী আজো—চাহে দেখি' মরীচিকা মায়া।
কেন করো হেন ভুল ? কেন চাও—জেনেছ জীবনে
তুমি যাহা সত্য বলি'—অপরেও মানিবে তাহারে ?
তোমার রসনা যেথা পায় মধুস্বাদ—জনে জনে
বরিবে মধুর বলি' কেন তারে ? তপস্যায় যারে
পেলে—সে তোমারি স্বাধিকার। ধ্যানী যাঁরে দেখে ধ্যানে
মূর্খ করে ব্যঙ্গ—গভীরের মর্ম জানে কি অজ্ঞানে ?
শিব সত্য কোন্ পথে মিলে জীবনের জিজ্ঞাসায়
মন পারে দিতে দিশা তার :
শুধু আছে সীমা তার নির্দেশের, পরিধির—মানে
এ-গণ্ডির বাহিরে সে হার।
ধায় দেখ রাজরথ রাজপথে স্বাধীন উল্লাসে,
শুধু যবে শেষ হয় পথ
সাগরসৈকতে—হয় তরণীরে করিতে আহ্বান :
জলপথে চলে না তো রথ।

ইন্দিরা এত সুন্দর ক'রে বলল গুরু নানকের কথা—এমন সরল আন্তরিক ভঙ্গিতে যে, সবাই খুশি হ'য়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। পরিশেষে শ্রোতৃবৃন্দ তাকে যে ধন্যবাদ দিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতার আমেজ পেয়ে আনন্দ হ'ল। পরিশেষে আমি গাইলাম একটি মীরা ভজন—পিয়ানো বাজিয়ে।

গান সারা হ'লে ভোজনের পালা। সেফার সাহেব পরম অমায়িক। বীণার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে তাকে সাহায্য করা সুরু করলেন। বললেন : তাঁর এখন বৃহৎ পরিবার, ভাই হরিদাস, বৌমা বীণা, দু দুটি ভ্রাতুষ্পুত্রী। বড় সদাশয় মানুষটি। হরিদাস বিদেশে পেয়েছে এমন বন্ধু যাঁর মধ্যে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হয়েছে—অর্থাৎ শেফারের হৃদয়ের মণি ও কোষাগারের কাঞ্চন। নৈলে এ-দারুণ আক্রাগণ্ডার দেশে হরিদাস সপরিবারে এমন সুখে বাস করতে পারত কি না সন্দেহ। তবে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—বলে না ? হরিদাস বিদ্বান্, সজ্জন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাগ্য কাঁধ মেলালে যা হয় তারই তো নাম সোনায় সোহাগা। ইন্দিরা শেফারের স্বভাবে মুগ্ধ হ'য়ে বলল তাঁকে : "জানেন—আমি দাদাকে একবার বলেছিলাম যে শেফার ভাগ্যবান্ যে হরিদাসের মতন ভাই

পেয়েছেন। কিন্তু এখন ঠিক করতে পারছি না—হরিদাস আরো বেশি ভাগ্যবান্ কিনা এমন দাদা পেয়ে।" তবে আমার মনে হয় ভাগ্য বেশি প্রসন্ন হরিদাসেরই। কারণ বিদেশে এমন বিদ্বান্ মনস্বী তথা ধনী বন্ধুর শুধু স্নেহস্পর্শই নয় প্রত্যক্ষ আতিথেয়তা পাওয়া! তবে একটা কথা আছে: It is more blessed to give than to receive." এখানে দুজনের মধ্যে কে বেশি দিচ্ছে? এ-প্রশ্ন ক'রেই আজ ক্ষান্ত হই, সমাধানের ভার চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার উপর ন্যস্ত ক'রে।

রাতে হোটেলে ফিরে মনে এক বিচিত্র ভাবোদয় হ'ল। কালাতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনসংগ্রাম জটিলতর হ'য়ে আসছে—হয়ত নানা বিষয়ে নৈতিকতার শিথিলতা তথা ভ্রষ্টাচারও বাড়ছে। কিন্তু—মনে হ'ল—এদিক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে এটা যদি মেনেও নিই, তাহ'লেও কি বলা চলে না যে অন্য একদিকে লাভের কোঠায়ও কিছু অন্তত জমা হচ্ছে: অর্থাৎ মানুষ নানা বাহ্য ব্যবধানকে ডিঙিয়ে আন্তর-মৈত্রীর অঙ্গনে পরস্পরের কাছে আসছে? শেফার মহৎ মানুষ, হরিদাসও অতি সজ্জন। কিন্তু আগেকার যুগে এ-ধরনের দুটি বিদেশী কি এভাবে ঘরকন্না করতে পারত শুধু প্রীতি ও স্নেহের মূলধন খাটিয়ে?

* * *

কনসাল হুসেন সাহেব টেলিফোন করলেন, প্রেস কনফারেন্স হবে আমাদের কেন্দ্র ক'রে। জনশ্রুতিতে শোনা ছিল প্রেস-কনফারেন্স মানে হচ্ছে—সাদা বাংলায়—প্রেস প্রতিনিধিদের হাজারো রোমহর্ষক প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কাজেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম বৈকি, আরো এই জন্যে যে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে না গিয়ে আমেরিকায় এসে বহু আমেরিকানদের ইংরাজি উচ্চারণ শুনতে শুনতে খেদ বাড়ে—বনমর্মরের বাণী অন্তত এর চেয়ে বেশি বোধগম্য হ'ত। যাহোক স্বয়ং সাহেব-পুরাণে যখন বলেছে "যা বুনবে তেম্নি ফসল ফলবে" তখন নিরুপায়। ভরসা ছিল আমার শ্রুতি ক্ষীণায়মান হলেও ইন্দিরার শ্রুতি তীক্ষ্ণ—প্রাণ যদি বা যায়, মানটা হয়ত টায় টায় বেঁচে যাবে। ফলেন পরিচীয়তে।

গভর্মেন্টের প্রতিনিধি হ'য়ে প্রেস-কনফারেন্সের জমিতে আমার কথামৃতের বীজবপনের ফসল ফলল বৈকি—যার নাম পাবলিসিটি। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে। উপস্থিত, কনসালের ওখানে যেতে না-যেতে এল সশরীরে তিন তিনটি প্রেস-রিপোর্টার। শুনলাম week-day ব'লেই পার পেলাম, নইলে হাজিরি দিত আধাডজন।

ওদের একজন এসেই ফ্ল্যাশ লাইটে নিল আমাদের ফটো। আমি চোগা চাপকান প'রে, ইন্দিরা শাড়ি। তারপর সুরু হ'ল প্রশ্নের তীরন্দাজি। তখন ভাগ্যকে ধিক্কার দেব, না ধন্যবাদ দেব ভেবে পেলাম না—যেহেতু তাদের প্রশ্নের আধাআধি আমার কানেই ঢুকল কিন্তু মরমের নাগাল পেল না। যাহোক ইন্দিরা এগিয়ে এল অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে। আমাকেও কিছু বলতে হ'ল বৈকি। যোগ কী বস্তু, আশ্রমবাসের অর্থ কী, আমেরিকা কেমন লাগছে, স্পিরিচুয়ালিটি বলতে কী বোঝায়—আরও কত কী সাত সতের। যা পারি বললাম। যথা-কালে কাগজে বেরুল আমাদের ছবি সমেত—উপরে জাজ্বল্যমান শিরোনামা মোটা হরফে "YOGA EXPONENTS TO TEACH, GIVE CONCERT" তার পরে ক্ষুদ্রতর মোটা হরফেঃ Two Pursuers of the 'Inner Light' Here from India."

শিরোনামা দেখে একটু স্তম্ভিত না হ'য়ে উপায় কি? তবে বাকিটুকু প'ড়ে ঈষৎ আশ্বস্ত হওয়া গেল। পেসিমিস্ট বলে তাকে যে বলে—ভালো হ'ত আরো ভালো হ'লে। অপ্টিমিস্টের মন্ত্র: "মন্দের ভালো।" মনকে বোঝালাম: "ভোলা মন, অপ্টিমিস্ট হ'তে বাধা কি? এ হ'ল আমেরিকা—ভাবো ওরা আরো কত কী লিখতে পারত যা লেখেনি, গুরুর কৃপায়ই বলব।" তবে একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করি রসিকদের কাছে রস-পরিবেষণ করবার মহদুদ্দেশ্যে। আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের যোগের উদ্দেশ্য কী। আমি বলেছিলাম, যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর ভাষায় যে, শ্রীঅরবিন্দ চান চেতনার রূপান্তর—Transformation of consciousness. চেতনা ওরফে consciousness সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে-ছিলাম যা লিপিবদ্ধ হ'লে হয়ত অনেকেই ঠাহর পেতনা কী বলছি, কিন্তু এটুকু অন্তত মানত যে, কথাগুলি গালভরা, থুড়ি কানভরা। কিন্তু ওরা—(হয়ত এদেশে consciousness শব্দটি ওদের কাছে mysticism শব্দটির মতন শ্রুতিকটু লাগে ব'লেই)—রিপোর্টে শুধু এইটুকু লিখেই ক্ষান্ত হ'ল যে আমি বলেছি: "We start by trying to transform ourselves. If we do, then we have enough light to give to others"—তা একথার নিহিতার্থ যাই হোক। হায়রে, এটুকু ব'লে থামলেও বা কথা ছিল, কিন্তু ওরা লিখল তার পরেই: "Roy has been transforming himself at the Ashram for twenty-four years, Miss Indira, for three."

হা হতোস্মি বললে হয়ত আমার মনোভাব ব্যক্ত হ'ত, কিন্তু ভেবে দেখলাম

যে ওরা সত্যিই নির্দয় হ'তে চায়নি। ঐ যে বললাম, আরো কত কীই তো লিখতে পারত! নিশ্চয় পারত—কিন্তু লেখেনি, মানতেই হবে। কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের আকৃতি ওদের খুব খারাপ লাগেনি। কারণ মনে হয়, ওরা দরদী হ'তে চেয়েই লিখেছিল আমার বর্ণনা "grey-haired, benevolent-smiling, respectable plumpish man of fifty-six," এবং ইন্দিরার: Miss Indira Devi, thirty-two, blue-eyed and with the red-spot of the Brahmin on her forehead." এরা এক একটি কথা হঠাৎ বুঝে ফেলে, যথা "ব্রাহ্মণ" বা "আসন"। এর পরেই দেখলাম বিখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহিনের ছবি—তিনি "আসন" শিখছেন কোন্ এক যোগীর কাছে—জিভ বের ক'রে ব'সে—সত্যি বলছি। আর সে কি সোজা জিভ! শরৎচন্দ্রের রামের সুমতিতে রক্ষাকালীর জিভ—"এই এতো বড়"! তখন ভগবানকে পুনরায় ধন্যবাদ দিলাম: প্রণমামি কৃপাময়মন্তহীনম্—আমাদের ছবি অন্তত ওরা ঈদৃশ রোমহর্ষক ভঙ্গিমায় ছাপেনি।

কিন্তু আমেরিকা তো! এই এক ছবি ও ইনটার্ভিউ-এতেই যেন লোকখ্যাত হ'য়ে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজার খাতির করতে লাগল বেশি: "সার্! আপনাদের ছবি যে!" একদিন রাতে Promoter নামে একটি ছায়াছবি দেখতে গেলাম—ছবিটির সুনাম শুনে। গেটে ঢুকতে না-ঢুকতে এক দীর্ঘকায় পুরুষ বেরিয়ে এলেন, বললেন, ইংরাজিতেই অবশ্য: "স্বাগতম্। আপনাদের ছবি দেখেছি কাগজে। আসুন—টিকিট কিনতে হবে না।" আমরা "না না, সে কি—দুঃখিত হব—টিকিট কিনলাম ব'লে" আরো কত কী বললাম, মনিব্যাগ পর্যন্ত বার করলাম—কিন্তু কে কার কথা শোনে—অধিকারীর আরদালি ধ'রে নিয়ে গিয়ে চমৎকার আসনে বসিয়ে দিল। সেখানে ব'সে গুনগুনিয়ে গাইলাম মনে মনে:

আজব দেশের আজব কথা বল্‌ব ও ভাই কত!
যতই দেখি—ভাবি—ভাবি যতই—মজি তত!

* * *

কিন্তু তারকা যখন উঠতি-মুখে তখন তাকে রোখে কে? সহৃদয় বন্ধু শেফার এলেন এগিয়ে, বললেন আমাদের সংবর্ধনা করবেনই করবেন। চমৎকার কার্ড ছাপানো হ'ল "In honour of Dilip Kumar Roy and Indira Devi"…… ইত্যাদি।

এ ধরনের সংবর্ধনা কালাপানির এপারে কখনো পাইনি। তাই একটু ভাবিত হলাম বৈকি—কী জানি কী আছে কপালে? ইন্দিরাকে বললাম কাছে কাছে থাকতে, কিছু শুনতে না পেলে খেই ধরিয়ে দেবে। কিন্তু হায় রে, সে জনতার অরণ্য-কল্লোলে কোথায় পাব তাকে? এ আসে এগিয়ে—আলাপ করিয়ে দেন গৃহকর্তা: "ইনি একজন নাম-করা চিত্রী···উনি দার্শনিক···তিনি ভাস্কর···উনি কবি···উনি অধ্যাপক···" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুধু সমাদরের প্রাচুর্যই নয়; বিলক্ষণ জলযোগও তার সঙ্গে। আহার্যের অপর্যাপ্তির দেশে মিষ্টান্ন, আইসক্রীম, আরও নাম-না-জানা কতরকম রসনাতৃপ্তির উপকরণ! বলেছি কিনা মনে নেই, মার্কিন ভোজ্য অতি সুস্বাদু তথা বলকারী তথা বহুবিচিত্র। চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম কেবল এই জন্যে যে সদাশয় শেফার সোমরস পরিবেশন করেননি—তাহ'লে কিছু-আগে-বর্ণিত সভার মতন হয়ত অনেক সভাসদই বেচাল হ'য়ে বলতেন আমাকে কত শত কথা—যা ব'লে ভদ্রসমাজে তাঁরা যদি বা মুখ দেখাতে পারতেন, শুনে আমি পারতাম না বিচরণ করতে। "সবাই কি সব পারে মণ্টু!" বলতেন শরৎচন্দ্র।

তবে সলজ্জে স্বীকার করব যে, আত্মপ্রসাদকে রুখতে পারিনি যখন শেফার বললেন: "এত লোক আসবেন আপনাদের সংবর্ধনায় আমিও ভাবি নি।"

আমাদের অগণ্য শত্রুবৃন্দ হয়ত কিছুতেই মানবেন না যে এ-ধরনের সংবর্ধনার ইন্দ্রধনু রঙিন বাষ্পধনু বৈ আর কিছু। কিন্তু কতিপয় মিত্রও তো আছেন আমাদের। তাঁরা হয়ত সাধুবাদ দেবেন—তীব্র নিখাদে না হোক অন্তত কোমল গান্ধারে। বলবেন হয়ত: "সুনামের কিছু মূল্য থাকেই—খতিয়ে।" তবে উত্তরে হয়ত শত্রুবৃন্দ ফের বলবেন তারস্বরে: "এ কিছুই নয়—কাগজে নাম বেরুলে 'হুজুগেরা' হাজিরি দেয়ই।" কিন্তু তাঁদের মনে দুঃখ দিতেই হবে—যেহেতু সভায় এসেছিল বহু মানী, ধনী, চিত্রী, শিল্পী, অভিজাত। এঁদের সবাই হুজুগে—তাঁদের চিত্ততোষণের খাতিরেও একথা মানা সম্ভব নয়।

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবরের সুরম্য হলে আমাদের নৃত্যগীতের আসর বসল। টিকিট করা হ'ল। নৈলে ঘরে স্থান-সংকুলান হ'ত না কিছুতেই। টিকিট করা সত্ত্বেও ঘরে স্থানাভাব হয়েছিল। অনেকে শেষটায় মাটিতেই বসেছিলেন—যাঁদের মধ্যে শেফার অন্যতম।

সুরুতে শেফার আমাদের সংবর্ধনা করলেন একটি উপাধি দিয়ে: "এঁরা ভারতের সংস্কৃতির রাজদূত—cultural ambassador—আমরা ধন্য হয়েছি…" ইত্যাদি কত শ্রবণমঞ্জুল কথা!

তারপর আমি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে। রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধেও কিছু বললাম। বললাম আমাদের সুর ইংরাজি, তথা জর্মনেও গাওয়া যায় শ্রুতিমধুর ক'রে এবং একথার প্রমাণ প্রয়োগ করলাম পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গানটি যথাবিধি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ও জর্মন ভাষায় গেয়ে। ওরা খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। বলল—এ-ধরনের গান আরো গাইতে। কিন্তু প্রোগ্রাম ছিল মাত্র দেড়ঘণ্টার—তাই গাওয়া হ'ল না ফরাসি, রুশ কি ইতালিয়ান গান।

তারপর ইন্দিরা দিল একটি ছোট বক্তৃতা। বুঝিয়ে দিল মীরার কথা, মীরার বাণী—কী ভাবে তাঁর গানের সঙ্গে নৃত্য করবে। লোকে খুব নিল ওর নৃত্য—যখন আমার গাওয়া ইন্দিরার রচিত মীরাভজনের সঙ্গে ও নাচল নানা রকম 'ভাও' দিয়ে। সকলে খুব উচ্ছ্বসিত।

তারপর আমি একটি ভজন গাইলাম প্রথমে হিন্দিতে "ধীরে ধীরে সঙ্গ সমীরে," পরে বাংলায় ওর অনুবাদ—"আজ কে প্রেমের তীরে এল সখী ধীরে ধীরে" —যে গানটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। এ গানটিতে বহু তান ছিল—ওরা বলল তানগুলি শুনে ওরা মুগ্ধ হয়েছে। অন্তত বলল তো জনে জনে—জানি না সে-উচ্ছ্বাস মেকি না খাঁটি। অন্তর্যামী তো নই। তবে ওদের মধ্যে অনেকেই যখন প্রস্থান ক'রেও করতে চান না—কেবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন করমর্দন ক'রে বলতে—"কী অপরূপ নৃত্য, কী অপরূপ গান"—পরে চিঠিও আসতে লাগল—আমাদের নামে—একটি অভিজাতবংশীয়া তাঁর সাল -তে আর একটি সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করলেন—তখন কী ক'রে বলি এদের উচ্ছ্বাসের ষোলোকড়াই কানা? এই অভিজাতবংশীয়া বিবেকানন্দ স্বামীকে জানতেন—তাঁর স্বামীর মুখে শুনলাম। আরো শুনলাম যে তিনি না কি উদয়শঙ্করকে অর্থানুকূল্য করেছিলেন। ইনি খুব স্পষ্টভাষিণী—বন্ধু হাণ্টারকে বলেছিলেন: "ওঁদের আমি আমার এখানে সংবর্ধনা করতে চাই, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় আমার না আছে প্রবেশ, না ঔৎসুক্য।" এহেন মহিলা নৃত্য দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন যে এ-ধরনের ভক্তিভাবের নৃত্য তিনি কখনো দেখেন নি। ইন্দিরাকে ও আমাকে বললেন: "আপনাদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল ব'লেই করেছি আপনাদের

সংবর্ধনার ব্যবস্থা।" এঁর ওখানে আমাদের সংবর্ধনায় ইনি শুধু যে নিমন্ত্রণ করলেন অনেক খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নীকে তাই নয়, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের নামধাম ইতিহাস টাইপ ক'রে যাতে ক'রে আলাপ ভালো জমে। এ-ধরনের নিমন্ত্রণপদ্ধতি কখনো চোখে পড়ে নি। মনে হয় বিদেশীকে নিমন্ত্রণ করলে তাকে আগে থাকতে এ-ভাবে অভ্যাগতদের নামধাম কীর্তিকলাপ জানিয়ে দিলে উভয়পক্ষেরই বেশ একটু সুবিধা হয়। ইনি এঁর চিঠিতে মিসেস পাওয়েলকে শেষে লিখলেন : "As you know, I teach international relations at the San Francisco State College—for more than 25 years now, so I am a pioneer in this field...I hope to have everyone here by 4-30, so that we can get down to earnest talk."

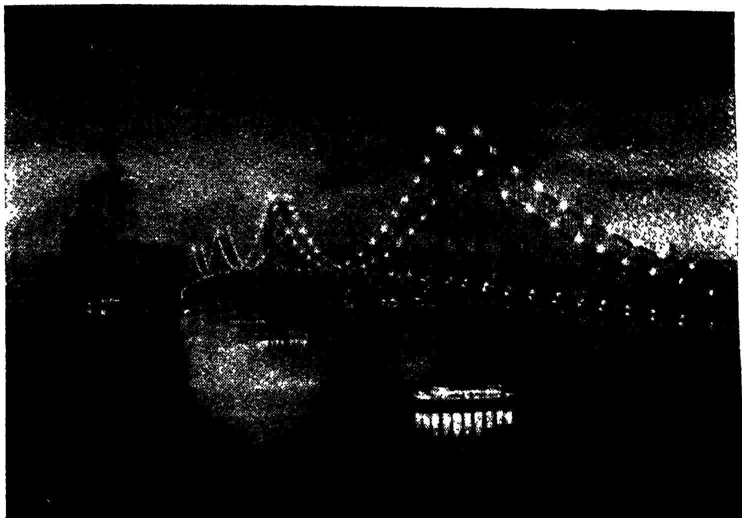
এ-ব্যাপারটি এত ঘটা ক'রে বর্ণনা করলাম এই জন্য যে, আজকের দিনে earnest talk বা সদালাপের সুযোগ বড় একটা ঘটে না বিশেষ ক'রে বড় শহরে—আমেরিকায় তো নয়ই। এখানে সকলেই ধায় দ্রুত, কাজ করে দ্রুত। একমাত্র ককটেল সেবন করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। কাজেই আলাপের যে প্রধান শর্ত অবসর, তার এখানে দেখা পাওয়া ভার। এ-ছাড়া ইনি আমাকে অনুরোধ জানালেন আলাপের প্রথম অঙ্কের পূর্বে গানের উপক্রমণিকা জমাতে। দেখা যাক কিরকম হয় এখানকার আলাপচক্র।

*        *        *

এর দুদিন পরে কনসাল সাহেবের ওখানে হ'ল আমাদের একটি সংবর্ধনা—তথা রাত্রিভোজন। গৃহকর্তা আমাদের পাঠালেন তাঁর বিরাট্ মোটর—সেক্রেটারি সমেত। তাঁর বাসভবন আমাদের হোটেল থেকে অনেক দূরে—সমুদ্রের ঠিক উপরেই। চমৎকার দৃশ্য সেখানে। খানিকটা গ্রামের শোভা—অথচ পুরোদস্তুর ফিটফাট শহর—"রুরাল তথা অর্বান"। কনসাল সাহেবের বৈঠকখানা ঘরের গবাক্ষ দিয়ে "স্বর্ণসেতু" দেখায় চমৎকার—সমুদ্রের একটি খাড়ির উপরে দোদুল্যমান বক্রাভ ছন্দে! উপরেও নানারঙা আলো! বাস্তবিক, কী আলোরই ছড়াছড়ি! এক এক সময়ে কিন্তু চোখ বলে দুঃসহ। গেটে মৃত্যুকালে বলেছিলেন : "আরো আলো, আরো আলো।" এখানে এলে এমন কথা বলবার মুখ থাকত না—উল্টো গাইতেন নিশ্চয়। যাক।

কনসালের ওখানে কয়েকজন চিন্তাশীল অধ্যাপক-জাতীয় অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে খুব ভালো লেগে গেল, কেন না ইনি চমৎকার কথা বলেন—রীতিমত পণ্ডিত যাকে বলে—তার উপর ধার্মিক কি না জানি না

কিন্তু ধর্মজ্ঞ, অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে জানেন অনেক তথ্য। তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম। তিনি একবার কথায় কথায় বললেন—আলাপ আলোচনা ক'রে এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষকে অনেক কিছু বোঝাবে এটা



সানফ্রান্সিস্কো—ওকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু—রাতের দৃশ্য

বাঞ্ছনীয়। বলতে বলতে বৌদ্ধদের "জেন" সম্প্রদায়ের কথা উঠল। তাতে আমি বললাম হেসে: "জেন সম্প্রদায়ের কথা যখন উঠলই তখন বলি শুনুন ওদের এক গল্প। এক যে ছিল জেন প্রচারক—মস্ত জ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সত্যিকার জ্ঞানী। নাম গো-সান। একদিন তাঁর শিষ্যবর্গকে তিনি একটি ভারি রসাল কথা বলেছিলেন: 'সদাশয় মানুষ যাঁরা তাঁদের অনেকের মুখেই শোনা যায় কোনো প্রাণীকেই নাকি হত্যা করতে নেই। একথা আমিও মানি। কিন্তু শুধু প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রেই থামো কেন তোমরা? যারা সময়কে হত্যা করে, অপচয় ক'রে অর্থকে হত্যা করে, সমাজের অনেক সৌন্দর্যকে কদাচারে হত্যা করে তারা কি কম ঘাতক? সর্বোপরি, জ্ঞানলাভ না ক'রে যারা জ্ঞানের বাণী প্রচার করে তারা? এরা যে বৌদ্ধধর্মকেই করছে হত্যা'!

রস পেয়েছিলেন বন্ধু, যদিও আমাদের গুরুগম্ভীর আলোচনা হয়ত এ-লঘুহাসে একটু তরল হয়ে এসে থাকবে।

এখানে এক আমেরিকান মহিলা ইন্দিরাকে বললেন একটি দুর্দান্ত কথা। বললেন: "আমি নানা পুরুষের সঙ্গে ঘর করি। আমার স্বামী বোঝেন না—কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমি তাদের সহবাস করি। ভগবান আমাকে দিয়েছেন রূপ-যৌবনের সঙ্গে অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আমি দেহস্পর্শের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করি আমার আশ্চর্য প্রাণশক্তি।"

এরকম সাংঘাতিক কথা যে, কোনো মহিলা এমন অম্লানবদনে একজন সদ্য-পরিচিতাকে বলতে পারেন ভাবা হয়ত আমাদের পক্ষে একটু কঠিন, কিন্তু এদেশে এ-ধরনের কথা তরুণ সাহসিকেরা অবাধে ব'লে থাকেন, অনেক সময়ে উচ্চাঙ্গের বেপরোয়া হাসি হেসে। এতে হয়ত সত্যভাষণের কোঠায় কিছু লাভ হয়, কিন্তু ফলে-যে সমাজে শীলাচারের কোঠায়ও স্থায়ী সম্পদ বাড়ে এমন বিশ্বাস হয়ত আমাদের মনে ঠাঁই পেতে পারবে না এখনো। তবে দিনাতিপাতে নৈতিকতা সম্বন্ধে যে মানুষের ধারণা বদলে যাচ্ছে এ-সত্য এত অতিপ্রত্যক্ষ যে, আমর



শীল রক্—সানফ্রান্সিস্কো

হয়ত অতীত যুগের কোঠায় প'ড়ে যাচ্ছি—আর অতীত কবে বুঝেছে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকে? সেই চিরন্তন বিরোধ যুগের সঙ্গে যুগের, লোকাচারের সঙ্গে লোকাচারের। প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের সন্ধি কি সম্ভব? কি জানি?

প্রাণস্রোত চলেছে উদ্দাম—কোথাকার জল কোন্ খালে গিয়ে কোন্ সংঘাতের সৃষ্টি করবে—কেউ কি বলতে পারে আগে থেকে ?

হাণ্টার নিয়ে গেলেন একদিন সাগর-সৈকতে না হোক সাগর-তীরে। নেওয়া হ'ল এক মোটর বোট। বন্ধুই চালালেন। কথাবার্তা হ'ল জলবিহারের তালে। আর সে কত কথা—অফুরন্ত! কিন্তু শেষে যখন হাণ্টার জিজ্ঞাসা করলেন —মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী ও মহাকালীর কী কী রূপ ও বিভূতি, তখন আমাকে বলতেই হ'ল: "আমার উর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষের কেউই এঁদের কারুর সম্বন্ধে কিছু জানতেন ব'লে আমার জানা নেই—আমি নিজে তো জানিই না। তাছাড়া আমি বলতে চাই না শুধু শোনা বা পড়া কথা। তবু যখন শুনতে চাইছেন তখন বলি।" ব'লে যা পারি বললাম—শ্রীঅরবিন্দের কাছে যা যা শুনেছি। কিন্তু যতই বলি মনের মধ্যে ওঠে দীর্ঘনিশ্বাস: কথা কথা কথা! মনে পড়ে দৈববাণীর পরিহাস: "বাকপটুরা কী করেন? না, শূন্য আকাশে কথা দিয়ে জ্বালান তারার দীপালি। দেখতে দেখতে কথার যাদুতে হয়ত লক্ষ তারা ওঠে ঝিকমিকিয়ে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যে—তার পরেই দেখতে দেখতে নিভে যায় এ অলীক দীপালি, তখন আরো গাঢ় হ'য়ে ওঠে অনুপলব্ধির স্থায়ী অন্ধকার।" বললাম বন্ধুবরকে যে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি উপলব্ধি-বিহীন কথার ফুলঝুরিতে। ও মায়া-আনন্দ। আজ আমি দাঁড়াতে চাই উপলব্ধির ভিত্তিতে। তাই খানিক বুলি উদ্‌গিরণ ক'রেই বললাম: "আর থাক বন্ধু, এবিষয়ে আরো যদি জানতে চান যাবেন কোনো পণ্ডিতের কাছে। আমি কথা বলতে চাই সেই বিষয়ে যার সম্বন্ধে আমার কিছু অপরোক্ষ অনুভূতি বা জ্ঞান আছে: যথা সাধুসংগ। যদি শুনতে চান বলতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, শ্রীঅরবিন্দের কথা, রমণ মহর্ষির কথা, রামদাসের কথা।" বলতে বলতে মন একটু আরাম পেল এইটি ভেবে যে, অন্তত যা জানি না তার সম্বন্ধে জানি এমন ভঙ্গি একবারও করি নি। কাজেই আমি অন্তত দেবদেবীদের "হত্যা" করছি না। জ্ঞানের বর্ণপরিচয়ও আমার হয় নি এতবড় মিথ্যা কথা কেমন ক'রে বলি? কিন্তু জ্ঞানের বাণী বেশি বলতে ইচ্ছা করে না। মনে পড়ে স্মরণীয় নিষেধোক্তি: "সবচেয়ে বড় প্রচার হ'ল সত্যকে জীবনে পালন করা—তোমার নিজের জীবন যেন হ'য়ে ওঠে সত্যের বাণী—রসনা যেন সে-বাণীর প্রচারে বেশি তৎপর হ'য়ে না ওঠে।" অথচ মুস্কিল এই, এরা চায় শুনতে—সত্যিই চায়। যা কিছুই এদের বলা হোক না কেন—শোনে এরা পরম উৎসাহে। এ হেন মানসিক অবস্থা ভালো না মন্দ—কে বলবে?

সত্যি, ভেবে বলতে গেলে দেখি—না-ভেবে যা বলা যায় সে-সব আবোল তাবোলের সাড়ে পনর আনা না হোক অন্তত বার আনা বাদ দেওয়া চলে—তাতে মানও বাঁচে, সময়ের অপব্যয়ও কমে। তার চেয়ে গান করা ভালো। কারণ গান যে-প্রচার করে সে জ্ঞানের মাধ্যমে নয়, আনন্দের মাধ্যমে। আর আনন্দের রসায়নে অসার্থকও হ'য়ে ওঠে সার্থক, নয় কি ? ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম—গালভরা জ্ঞানের বাণী নাই বা পারলাম প্রচার করতে, গানের মধ্যে দিয়ে আনন্দ পেতে ও পরিবেষণ করতে তো পারি—অন্তত খানিকটাও।

* * *

ফের গুরুগম্ভীর থেকে নেমে আসি হাল্কামিতে—আপনাদের আবার একটু আশ্চর্য করি ? লাভ—বাহাদুরি—যথা, কী কাণ্ডই চোখে দেখে এলাম, কানে শুনে এলাম ! ট্যাক্সি রেডিও টেলিফোন সবই আপনারা শুনেছেন—কিন্তু—না, গোড়া থেকেই বলি।

হ'ল কি, আকাডেমিতে সপ্তাহে তিন দিন আমি গান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেই ও ও গান শেখাই, ইন্দিরা—নাচ সম্বন্ধে। আকাডেমির ডিরেক্টর গেনস্‌বরোর সেক্রেটারি আমাদের হাতে একটি পুস্তিকা দিলেন হলদে টিকিটের। এখানে আছে নানা রকম ট্যাক্সি—( থুড়ি, ক্যাব, ক্যাব—ট্যাক্সিকেও এখানে ওরা সংক্ষেপ ক'রে ক্যাব দাঁড় করিয়েছে যেমন yes-কে ya ! )—yellow cab, red and white cab, veterans' cab ইত্যাদি: প্রত্যেকের বর্ণ ও নামাবলী স্বকীয়। রাশি রাশি "পীত যান" চলেছে রাস্তায়—যে কোনো পীতযানকে আমরা নিতে পারি, গন্তব্যস্থলে গিয়ে কেবল ঐ পুস্তিকার একটি টিকিট ছিঁড়ে সারথির হাতে দেওয়ার অপেক্ষা। এক কথায়, আমাদের ট্যাক্সি বা ক্যাবের ভাড়া আকাডেমি বহন করলেন এই শোভন উপায়ে। হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, দরকার হ'লে রাস্তার প্রায় যে কোনো মোড়ে হলদে বাক্স আছে—সেখানে শুধু টেলিফোন করতে না করতে হলদে ক্যাব এসে হাজির। এখনো আপনারা আশ্চর্য হ'তে রাজী নন—জানি, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। যাতে নিজে অবাক্ হয়েছি তাতে আপনাদেরও অবাক্ করবার চেষ্টা অন্তত করব—তাতে যদি ব্যর্থকামও হই তবে আপ্তবাক্যের সান্ত্বনা তো মজুদ রয়েইছে—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ?" এবার শুনুন মন দিয়ে।

গতকাল—১১ই ফেব্রুয়ারি—সন্ধ্যায় পীতযান ডিপো থেকে আমাদের হোটেলে ট্যাক্সি এসে হাজির—টেলিফোন এল নিচে থেকে উপরে, আমাদের

ঘরে। আমরা গেলাম আকাডেমিতে। সেখানে ইন্দিরা ওর ছাত্রীদের শেখালো নাচ, আমি আমার ছাত্রদের শেখালাম একটি নতুন গান, ইন্দিরার রচিত "When day is done and shadows fall" যেটি শ্রুতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। ছাত্ররা ভারতীয় রাগে ইংরাজি গান গাইতে খুব ভালবাসে ও কোরাসে গানগুলি চমৎকার শোনায় ব'লেই স্থির করেছি একের পর এক গান শিখিয়ে যাব এই ভাবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

গান শেষ হ'ল রাত নটায়। আকাডেমির একটি ছাত্রকে বললাম, পীতযান আসতে যখন দেরি হচ্ছে টেলিফোন করলে কী হয়? সে তৎক্ষণাৎ "বেশ হয়" ব'লেই টেলিফোন করল পীতযান-ডিপোতে। সেখান থেকে দেখতে দেখতে এল একটি পীত রথ। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি পীতযান—যেটি আসার কথা ছিল, অর্থাৎ টেলিফোন না করলেও আসত—সেটিও এসে হাজির।

মহামুস্কিল! কোন্‌টাতে যাই? দুইজনেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু লাভ ছাড়ে কে কোন্ দেশে? ওদের মধ্যে তকরার হ'ল। অবশেষে যে-পীতযানটি টেলিফোনের উত্তরে এসেছিল তাকে আমরা সিকি ডলার দিয়ে বিদায় দিয়ে প্রথম যানে আরূঢ় হলাম। হঠাৎ দেখি, ওমা! সারথি একটা টেলিফোনে কথা কইছে ও সামনের একটা ফানেল থেকে তারস্বরে জবাব আসছে। সারথি বলছে কি কি ঘটেছে, উত্তর আসছে কিং কর্তব্যম্। পরিষ্কার শুনছি দুটো কণ্ঠ। টেলিফোনের সামনে যদি কেউ থাকে সে কথা শুনতে পায় একতরফা—মোটরে চ'ড়ে আমরা শুনলাম দুতরফা টেলিফোনিক কথা। কেমন ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল—জিজ্ঞাসা করতে সারথি বলল, ওদের প্রতি মোটরে থাকে রেডিও-টেলিফোন যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো স্থান থেকে ওরা হেড অফিসের অধিকারীর সঙ্গে বা যে-কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারে। অর্থাৎ সারথি চলতি মোটরে টেলিফোনে আলাপ করতে পারে তিন ভুবনের সঙ্গে না হোক এ-ভুবনের যে কোনো আলাপীর সঙ্গে। আর যে-কথা সে বলে তার উত্তর আসে টেলিফোনের কর্ণকুহরে নয়—সামনের ফানেল থেকে। এবার ন'টে গাছটি মুড়োলো—কিন্তু হয়ত এত শত বলা সত্ত্বেও আপনারা কেউ অশ্চর্য হ'তে রাজী হবেন না। নাচার। আমরা হয়েছিলাম।

* * * *

ডাক্তার স্পীগেলবার্গ বললেন: স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। সানফ্রান্সিস্কো থেকে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশ মাইলেরো

বেশি দূরে। কী ক'রে যাওয়া যায়? চিরসদয় বন্ধু হাণ্টার এগিয়ে এলেন। বিদেশে যখনই অকূল পাথারে পড়েছি কোত্থেকে যে এগিয়ে এসেছেন কাণ্ডারী!

বেরুলাম দুপুর বেলা। কী সুন্দর পথ—উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা—কখনও বা এধারে শৈলশোভা কখনও বা ওধারে সেই আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা কন্যা যাঁর কোলে! আর এক আশ্চর্য—এতক্ষণ বলা হয় নি—এত অজস্র মোটরে ঘুরলাম এদেশে, কখনো কোনো রাস্তা অমসৃণ দেখি নি—চাকায় ধাক্কা লাগার কথা তো দূরে থাক্। ভালো রাস্তা আমাদের দেশে নেই এমন কথা বলতে চাইছি না, কিন্তু অজস্র রাস্তার প্রত্যেকটি ধূলিশূন্য, সর্বত্র মাঝ বরাবর পরিষ্কার সাদা লাইন কাটা যাতে এমুখের গাড়ির পথের সঙ্গে ওমুখের গাড়ির পথনির্দেশ সম্বন্ধে মনে সন্দেহের লেশও ঠাঁই না পেতে পারে এবং সর্বোপরি, ঐ যে বললাম, কোথাও নেই এতটুকু বেমেরামত, গর্ত বা গর্তাভ কিছু! হাণ্টারকে বললাম: "বন্ধু! আমেরিকাকে ধিক্কার দেবার লোকের অভাব নেই—কত শত লোকই তো উচ্চাঙ্গের হাসি হাসে আমেরিকানিস্‌ম্ নিয়ে—আমি নিজেও আমেরিকার সব কিছুর সঙ্গে সায় দিতে পারি না। কিন্তু কোত্থেকে পেলে তোমরা এ আশ্চর্য গঠননৈপুণ্য, বিধিনিয়ন্ত্রণ তথা শৃঙ্খলাপরিকল্পনা? হোটেল, রেস্তরাঁ, ট্যাক্সি, বিপণি, আলো, জল, পরিচারণ—সর্বত্রই দেখতে পাই এক অবিশ্বাস্য সুব্যবস্থা—ডলার দিলে তার পরিবর্তে চেঞ্জ গড়িয়ে পড়ে যন্ত্র থেকে তৎক্ষণাৎ—প্রতি ট্যাক্সিতে সারথি যে কোনো মুহূর্তে কথা কইতে পারে হেড আপিসের সঙ্গে ও নির্দেশ পায় তখনি তখনি—একটি লিফ্‌টও দেখিনি অচল, একটি সারথিকেও দুবার বলতে হয়নি কোনো ঠিকানা!—এ কী ব্যাপার! কেমন ক'রে এ-আশ্চর্য কর্মকৌশল তোমরা আয়ত্ত করলে বলতে পারো? নানা জাতির লোক এসে রচেছে আমেরিকান সভ্যতা—কিন্তু যেসব জাতির লোক এ-সভ্যতার ভারবাহী তাদের সবার সভ্যতার সমষ্টি তো নয় তোমাদের সভ্যতা। মানতেই হবে—তোমরা একটি বিশিষ্ট জাতি—অখণ্ড জাতি, যার জীবনের বোধহয় তিনটি মূল মহামন্ত্র: শৃঙ্খলা, উদ্ভাবন ও অনলসতা। তোমাদের দেশে অলস আমেরিকান বোধহয় তেম্‌নি অভাবনীয় যেমন অভাবনীয় আমাদের দেশে কর্মিষ্ঠ যোগী।"

বন্ধুবর প্রসন্নমুখে হেসে বললেন: "আমাদের দেশে সুব্যবস্থা ও সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করার মূলে আছে দৃষ্টি। তোমরা হয়ত জানো না আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে নামবার আগে বহুদিন ধ'রে কি ভাবে শিক্ষা-নবিশি করতে হয় দেখার—বুঝে নিতে হয় কোথায় কেমন ক'রে কী ভাবে কাজে

এগুলে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি কাজ হাসিল হয়। তাছাড়া এ তো কী দেখছ? যুদ্ধের সময়ে যদি থাকতে এদেশে, দেখতে এ-কর্মনৈপুণ্যের অতিকায় বিকাশ ও ব্যাপ্তি। কর্মের গতিবেগ বেড়ে যায় তখন বহুগুণ, ঝগড়াঝাঁটি হ'য়ে যায় প্রায় অদৃশ্য, প্রত্যেকে দলাদলি মনকষাকষি ভুলে জপে একটি অদ্বিতীয় মন্ত্র—তার হাতে যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সে-কাজ কী ক'রে সবচেয়ে কম সময়ে সুনির্বাহিত হবে। তাছাড়া এসবের পিছনে তখন চলে প্ল্যানিং। মাত্র একটা দৃষ্টান্ত দেই তোমাকে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে ছিল নানা ছোট দ্বীপ। প্রত্যেক দ্বীপ অধিকার করা হবে কী ভাবে, কখন ও কোন্ পর্যায়ে—সমস্ত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যালোচনা ক'রে তবে আমাদের সেনা ও সেনানী এগিয়েছে। আর চড়াও হয়েছে তারা তখনি তখনি নয়—ছমাস বাদে অমুক ছোট দ্বীপটি দখল করতে হবে—এইভাবে আগে বিমান ফেলবে বোমা, পরে ওদিক থেকে আসবে জাহাজ, সেদিক থেকে প্যারাশুটী—ইত্যাদি—সে যে কী অজস্র খুঁটিনাটির তোড়জোড়—কী বলব?"

কী? শিবের গীত গাইতে ধান ভানা? ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার আরামই তো ঐখানে। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন পরমানন্দে "চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্" —আমি বলি "কথানন্দরূপঃ সখাহং সখাহম্"—অর্থাৎ যাঁরা সখাভাবে কথা শুনতে চান তাঁদের জন্যেই ভ্রমণকাহিনী লেখা—যাঁরা চান জ্ঞানগম্ভীর, সুসংবদ্ধ পরম নৈতিক গবেষণা—না তাঁরা আমার গ্রাহক, না আমি তাঁদের পরিবেষক।

* * * *

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে আরো ভালো লাগলো। বড় সুদর্শন কলেজটি। চারদিকে সবুজের অখণ্ড রাজত্ব, গাছপালা ঝলমল ঝলমল করছে—ওদিকে পাহাড়, এদিকে সমুদ্র। অপরূপ পরিবেশ।

ঘরে ঢুকেই দেখি বহু ছাত্র ছাত্রী। স্ট্যানফোর্ডের পত্রিকায় বেরিয়েছিল আমার ছবি ও স্পীগেলবার্গ-লিখিত পরিচয়। তাই ক্লাস ভরতি।

স্পীগেলবার্গ আমার পরিচয় দিলেন উপাধি দিয়ে "ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক রাজদূত"। বললেন আরো অনেক শ্রুতিমধুর কথা—কিন্তু সে যাক্।

তারপরে আমি উঠলাম বক্তৃতা দিতে সঙ্গীত সম্বন্ধে। বললাম: "ডাক্তার স্পীগেলবার্গ আমাকে প্রথম বলেছিলেন শুধুই বক্তৃতা দিতে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে নির্জলা বক্তৃতার বিড়ম্বনা কেন—যখন গাইতে পারি? হাত থাকতে মুখোমুখি কেন? বক্তৃতায় স্বর থাকে মন্দ্র না হোক বড় জোর মধ্যগ্রামে।

শুধু গানের সাম্রাজ্যেই তারস্বরে কণ্ঠবিজ্ঞপ্তি। এরকম আরো কয়েকটি কথা বলতে ওরা হেসে কুটিকুটি।

তারপর বললাম রাগরাগিণী সম্বন্ধে আমাদের বংশকৌলিন্যের কথা, আদিম ধারণার কথা—পৌরাণিক পরিকল্পনার কথা—আমাদের কণ্ঠসাধন, সুরবিহার, তালবৈশিষ্ট্যের কথা—আরো কত অবাস্তব কথা। কিন্তু ঘুরে ফিরে শুধু গান শোনাতে। যতগুলি পারি গান শুনিয়ে যাবই—এই ছিল আমার দুষ্ট সংকল্প। বক্তা হ'য়ে এসে বক্তৃতার ছদ্মবেশে গানই হোক ক্লাসে।

ফল ফলল, যদিও ওরা টের পেল কিনা সন্দেহ যে, আমি মালকোষ ভৈরবী ঝিঁঝিঁট প্রভৃতি নানা রাগই শোনালাম—ঝিঁঝিট ও ভৈরবী গাইলাম বাংলায় ও ইংরাজি অনুবাদে, মালকোষ বাংলায়। শোনালাম তান প্রাণের মায়া ছেড়ে। দেখলাম তাল বিষমপদী ঝাঁপতাল ধা গে দা ঘি না, তে টে তা ঘি না। প্রকট করলাম সার্গম। কী না করলাম—শুধু কুরুক্ষেত্রের পুনঃপ্রবর্তন ছাড়া? শেষে বললাম: "আপনারা হয় ত আমার পিতৃদেবের 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই' গানটি বাংলায় শোনার পর ইংরাজিতে শুনে বলবেন: 'কই, আমাদের সঙ্গীতের থেকে তো খুব আলাদা শোনাচ্ছে না!' (একথা বলছি কেন না আমার কোনো কোনো পাশ্চাত্য বন্ধুর কাছে এই ধরনের মন্তব্য শুনেছি যখন গেয়েছি আমাদের নানা বাংলা বা হিন্দি গানের ইংরাজি অনুবাদ বাংলা সুরে।) তার উত্তরে আমি বলব জাতিতে জাতিতে যেমন অমিল আছে তেমনি মিলও তো আছে। গানের ক্ষেত্রে এ-মিলের বেশি পরিচয় পাই অনেক সরল মেঠো সুরে। যেমন ধরুন নানাদেশের লোকসঙ্গীতে।" ব'লে কালবিলম্ব না ক'রে ধ'রে দিলাম কুর্শমানের প্রণীত জর্মন ঘুমপাড়ানি গান খাস জর্মন ভাষায়—ওরা শুনে ভারি পুলকিত—ওদের মুখচোখে আনন্দ উছলে উঠল—কেন না এবার ওদের আর "চিনি চিনি করি" বলারো পথ রইল না—এ যে দস্তুরমত নিজের পায়ে কাটা রাস্তা—অন্ধকারেও চেনা যায়। কিন্তু ওদের মুখে আনন্দের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে ধ'রে দিলাম আমার স্বরচিত "ঘুম যাই মা" অবিকল ঐ সুরে।

ধনুর্ধর না-ই হলাম—তাই ব'লে তীরন্দাজি করতে বাধা কি? মনে পড়ে বহু বৎসর আগে রংপুরে গিয়ে এক পুলিশ সাহেবের অতিথি হয়েছিলাম। তিনি বললেন: "নদীতীরে চলুন, বন্দুক ছোড়া শেখাই।" সেখানে গিয়ে দেখি দূরে এক নিরীহ বক দাঁড়িয়ে এক পায়ে। বন্ধু দেখিয়ে দিলেন কেমন ক'রে বন্দুক

ধরতে হয় ও ট্রিগার টিপতে হয়। ভাবলাম দেই টিপে বককে তাক্ ক'রে—মরবে না তো। কিন্তু, ওমা! বন্দুক ছুঁড়তে না-ছুঁড়তে বক বেচারি ধপ্ ক'রে প'ড়ে ম'রে গেল। তারপর সে আমার কী অনুশোচনা! সেই আমার প্রথম বন্দুক ধরা এবং ( আশা করি ) শেষ।

আমার বলবার কথাটা এই যে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েও অনেক সময় কাজ হাসিল হয় যদি ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হন। এখানেও হ'ল তাই, বাংলা থেকে ইংরাজি গান শোনার পরই জর্মন থেকে বাংলা শুনে ওরা কেমন যেন হতভম্ব মতন হ'য়ে গেল। এর পরেও আর বলবে কোন্ মুখে: "ভারতীয় সঙ্গীত তেমন কিছু নয়— যে-সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের এমন হুবহু তর্জমা হয়!" রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রসিকতা মনে পড়ে: "বিদ্যার জোরে নয় দিলীপ, বুদ্ধির জোরেই ক'রে খাচ্ছি।" দোহাই ধর্ম, আপনারা যদি আমার প্রতি অতি-অপ্রসন্নও হন তাহ'লেও আশা করি বলবেন না যে আমি এতবড় অর্বাচীন যে এই ছলে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মেলাতে চাইছি। কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি কিছুতেই তাঁর সঙ্গে আমি পাল্লা দেবার স্পর্ধা করি না। কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, দেশবিদেশে ঘুরে হয়ত তাঁর উপলব্ধ এই মন্ত্রটির মর্ম বুঝতে পেরেছি যে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। নইলে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তা হ'য়ে গিয়ে বিনা পাণ্ডিত্যে এতটা সাধুবাদ পেতাম না মাত্র ঘণ্টাখানেকের সাঙ্গীতিক বাহ্বাস্ফোটে।

বন্ধুবর হাণ্টার বসেছিলেন একটি চেয়ারে। বললেন: "যখন তুমি গাইছিলে শ্রীঅরবিন্দের 'In lotus grove' গানটি তোমাদের সুরে, তখন আমার সামনে দুটি আমেরিকান ছাত্রী বলাবলি করছিল: "Lovely song!"

এরপরই নিমন্ত্রণ এল খাস আকাডেমী থেকে—১৩ই ফেব্রুয়ারি। বহু লোককে ওরা নিমন্ত্রণ করেছিল ভারতীয় নৃত্যগীত উপভোগ করতে। অবশ্য এখানেও বিজ্ঞপ্তি ছিল—বক্তৃতা হবে গান সম্বন্ধে। এখানে বক্তৃতার নামে, যে-কারণেই হোক, খুব ভিড় জমে—তাই বোধহয়। যারা এসেছিল তাদের অধিকাংশের মনেই ধারণা ছিল যে, ভারতীয় গান ও নাচ সম্বন্ধে তথ্যবহুল নানান্ অনবদ্য কথা শুনে তারা বাড়ি ফিরবে—কী জ্ঞানের চালকলা মনের গামছায় বেঁধে কে জানে? আমি প্রমাদ গণলাম সর্বপ্রথম এখানে। এরা তো ছাত্রছাত্রী নয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের, গণমন—গণমন যে! আর সে কি একটা জাতের? জর্মনি, ইংলণ্ড, আইরিশ, ইহুদি, দক্ষিণ আমেরিকা—ভারতের নানা প্রদেশের লোক—বাঙালি, পাঞ্জাবী, সিংহলী—আরো হয়ত কত জাত ছিল যাদের

সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ হয় নি। এ-হেন বর্ণসঙ্করের আবহাওয়ায় কোন্ সাংস্কৃতিক আভিজাত্য সার্বজনীন স্বীকৃতি পাবে ?

ধন্য পিতৃদেব! কত বিপদেই যে তাঁর গান মান রেখেছে! প্রথমেই ধ'রে দিলাম তাঁর "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।" তার পরেই গাইলাম এর মৎকৃত ইংরাজি ও সংস্কৃত অনুবাদ, সর্বশেষে ইন্দিরা-কৃত হিন্দি অনুবাদ "পুষ্পরতনমে মঢ়ী"—যেটি কলকাতায় এক প্রেক্ষাগৃহে তার নৃত্যসঙ্গতে আমি গেয়েছিলাম গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে। এ-গানটির সুর য়ুরোপীয়রা সহজেই বুঝতে পারে—তাছাড়া এর ভাবের সরল বিশ্বজনীন সৌন্দর্যে তাদের দেশভক্ত হৃদয় সহজেই সাড়া দেয় এ বহুবার দেখেছি।

তার পর ওদের বললাম: "দেখুন, নানা জাতির সব গানের না হ'লেও গানের সুরের মধ্যেই সময়ে সময়ে একটা আশ্চর্য সরল আবেদন ফুটে ওঠে—যাতে সবাই না হোক বহু মন একযোগে সাড়া দিতে পারে। বহুদিন থেকেই আমরা শুনে আসছি মানুষে মানুষে কত প্রভেদ। ফলে ভেদবুদ্ধি আমাদের মনে শিকড় গেঁথেছে। কিন্তু তবু বলব মানুষে মানুষে এই বৈসাদৃশ্যই নয় মানবতার পরমবাণী। দৃশ্যতঃ ভেদের অন্তরালে অন্তঃশীলা ফল্গুধারায় মতন চলেছে এক অপরূপ একতা—ইউনিটির গঙ্গোত্রী। এর প্রমাণ উল্টো দিক থেকেও দেওয়া যায়।" ব'লে একটি জর্মন গান গেয়ে তার মৎকৃত ইংরাজি তথা বাংলা অনুবাদ গাইলাম—এক সুরে এক তানে।

এ-গানটির পরে ওদের করতালি এত বেড়ে উঠল যে গান করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। ওরা যেন সবাই শিহরিত হ'য়ে উঠল। কারণ, মনে রাখবেন, এসেছিল বক্তৃতাই শুনতে—হঠাৎ এ কী কাণ্ড। মন্তব্য আর বাড়াব না।

তারপর বললাম: "শুনুন এবার ভারতের বিখ্যাত মীরাবাইয়ের অতুলনীয় কাহিনী। ভগবানের জন্যে মেবারের মহারাণী সব ছেড়ে পথে পথে ঘুরেছিলেন ভিখারিণী হ'য়ে…" ইত্যাদি। ব'লে গাইলাম জৌনপুরী তোড়িতে ইন্দিরার শ্রুতিলব্ধ গান "মন মেরা বৈরাগী রাজা" ও মৎকৃত অনুবাদ "মন যে আমার উদাস রাজা"—যে-গানটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে। ওরা তানালাপ সুদ্ধ গান শুনে চমৎকৃত হ'ল বৈকি—গানের শেষে বলতে লাগল এ-ধরনের গান ওদের কাছে কী অভাবনীয়, রোমাঞ্চকর……ইত্যাদি। সব শেষে আমি গাইলাম আমার নব পরিকল্পনায় "বন্দেমাতরম্" গান—যেটি কলকাতায় দুবার রঙ্গমঞ্চে নাট্যনৃত্যে রূপায়িত হয়েছিল। আমি গাইলাম, ইন্দিরা

নাচল। তার পর করতালি সুরু হ'ল কিন্তু সারা হ'তে চায় না সবাই জিজ্ঞাসা সুরু করল আর কোথায় হবে আমাদের নৃত্যগীত। জয় শেষরক্ষার নিয়ন্তা!

অতঃপর আসর, সেই অশীতিপর কবির "সাল"-তে যিনি বিবেকানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন সানফ্রান্সিস্কোতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ এল কিছু গান শোনাতে হবে ও কিছু বলতে হবে শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" মহাকাব্য সম্বন্ধে। বন্ধুবর হাণ্টার নিয়ে গেলেন তাঁর মোটরে। সমুদ্রের কাছেই কবির রম্য হর্ম্য—তরুবীথিকামর্মরিত—অতি সুন্দর! তাঁর সভায় অনেকের সঙ্গেই আলাপ হ'ল —শিল্পী, বণিক, লেখক আরো কত রকম মানুষ—কিন্তু একটি লোককে ভুলব না। ইনি চৈনিক অধ্যাপক। কী সুন্দর ব্যবহার এঁদের! স্বভাব-কুলীন যাকে বলে। আর এই প্রথম চৈনিক দেখলাম যিনি স্বচ্ছন্দে ইংরাজি বলতে পারেন। নয়া চীনের কম্যুনিস্‌ম্ এঁরও ভালো লাগে না বললেন। ফলে আলাপ জ'মে উঠল। শুধালাম: "পার্ল বাক্‌কে কেমন লাগে?"

"ভালো। তিনি চীনের সামান্যই দেখেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়টি বড় কোমল। লেখার চেয়ে লেখিকা ভালো।"

মনে পড়ল বলি কে এক বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ইংলণ্ডের এক নামকরা অভিনেতার অভিনয় দেখতে। অভিনয় তাঁর ভালো লাগেনি। তবে প্রিয়ভাষী ফরাসী হার মানবার পাত্র নন। তাঁর নিমন্ত্রণে বন্ধু যেই জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল অমুক অভিনেতার অভিনয়? অম্‌নি তিনি উত্তর দিলেন: "শুনেছি উনি চমৎকার মানুষ—এমন মাতৃভক্ত পুত্র এ'যুগে বড় একটা দেখা যায় না।" কিন্তু গল্পটি বললাম না—ভেবেচিন্তে।

গান করতে হ'ল। প্রথম গাইলাম ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত "Allons enfants"—পরে মৎকৃত বাংলা অনুবাদ "ভারতরাত্রি প্রভাতিল"···তারপরে গাইলাম ইন্দিরা-রচিত একটি গান—যে-গানটি সে ১৪ই তারিখে হরিদাসের ওখানে বলেছিল সমাধিভঙ্গের পরে ও বীণা লিখে নিয়েছিল। গানটির বাংলা অনুবাদও গাইলাম কারণ হরিদাস ও বীণা উপস্থিত ছিল। গানটি বড়, তাই মাত্র পাঁচটি লাইন উদ্ধৃত করি:

পথ চেয়ে রয় বঁধু তব পথ চেয়ে আজো দুনয়ন,
সন্ধ্যাসকাল পথ চেয়ে···দেখ, নিশীথ ছায় গহন!

চাহি না তো ধন, রূপ যৌবন যশোমান বৈভব
জানি না সাধন ধ্যান কি বা জ্ঞান—কী দিব চরণে তব ?
শুধু জানি নাম তোমার—মীরার বন্ধু চিরন্তন !

মীরাবাইয়ের জীবনী সম্বন্ধে কিছু ব'লে তবে গাইলাম গানটি ভৈরবী রাগিণীতে। ওদের আশা করি সত্যই ভালো লেগেছিল—কেন না ওরা অন্তত মুখে তো প্রভূত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। তবে সত্যি ভালো লেগেছিল কি না ? জানেন এক অন্তর্যামী।

তারপর ওরা বলতে বলল শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী সম্বন্ধে। আমি সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী ব'লে বললাম: "শ্রীঅরবিন্দ এই মহাকাব্যে চেয়েছেন এই পরম বাণী ঘোষণা করতে যে তপস্যার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়—এমন কি দুর্বার নিয়তির ললাট-লিখনও মুছে ফেলা সম্ভব।" একথা এ-যুগে সর্বগ্রাহ্য হইবে এতটা আশা করি না—বিশেষ যখন শ্রীঅরবিন্দ নিজে মহাপ্রয়াণ করলেন—তাই বললাম: "তাঁর এই বাণী যে এখনি এখনি সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হবে এমন আশাকে মনে ঠাঁই দিতে পারি না। শুধু এইটুকু বলা যে, ইতিহাসে বহুবারই দেখা গেছে যে একযুগের স্বপ্ন সফল হয়েছে অনেক পরে—আর এক যুগে। মানুষ মৃত্যুঞ্জয় ওরফে স্বেচ্ছামৃত্যু হবে এ-স্বপ্ন যুগে যুগে বহু দার্শনিকই দেখেছেন। আজ হয়ত আমরা বলতে পারি—এ হ'ল খতিয়ে ভাববিলাস বা স্বপ্নচারণ। কিন্তু কে বলতে পারে জোর ক'রে যে, ভাবী কালের মানুষ এ-স্বপ্নকে বাস্তবের কোঠায় টেনে আনবে না ? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উড়ো জাহাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে কবে ! সেদিনকার মানুষ এ-স্বপনী শিল্পীকে নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—কিন্তু আজ ?"

শুনে ওরা মুগ্ধ হ'ল, আরো এইজন্যে যে এদের স্বভাব হ'ল দিগ্বিজয়ী—বহির্জগৎকে জয় করেছে তো এরাই সব আগে—এবার অন্তর্জগতের দিকে ফিরবে—এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন বার বার। আর তখন এদের দুর্দম্য শক্তি ও অধ্যবসায় আমাদের ধ্যান ও তপস্যার সঙ্গে হাত মিলালে ঘটবে মণিকাঞ্চন-সংযোগ। আর সে-যুগ যে খুব সুদূর তাও নয়। কারণ এরা মুখে যতই কেন না বড়াই করুক, মনে তো পায় নি শান্তি। কী ক'রে পাবে ? বহির্মুখী সাফল্যতন্ত্রী চঞ্চলতায় কি শান্তি মিলতে পারে ? বলা যেতে পারে হয়ত যে শান্তি আমরা চাই না। কথাটা সত্য। অথচ সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, শান্তি নৈলে আমরা বাঁচতে পারি না। মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে

উঠছে নিচের বহির্মুখী স্তর থেকে উপরের অন্তর্মুখী শিখরে। যে যতটা উঠেছে সে ততটা উন্নত—আত্মিক ক্রমবিকাশে। আর এ-ক্রমবিকাশ অনিবার্য—মানুষ যতদিন না তার দেহে মনে প্রাণে ভগবানকে উপলব্ধি করবে ততদিন তার নিস্তার নেই। এখানকার একজন উন্নত নিগ্রো পাদ্রীর একটি বই পড়ছিলাম। সবাই নাকি তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তিনি লিখেছেন: "A modern poet suggests that God gave to man every gift but rest so that man would never be at ease, finally, except with God." কিন্তু মানুষ স্বভাবে আত্মম্ভরী—ভাবে সে তার খর্বদৃষ্টি মনশ্চক্ষু দিয়ে যতটুকু দেখেছে ও যা দেখছে সেইটুকুই তাকে পৌঁছে দেবে সার্থকতার গোলোকধামে। আত্মরূপান্তর চায় সে-ই যে বলে: "আমি জানি না—বুঝি না—চিনি না, আমাকে গ'ড়ে নাও, দাও তোমার সালোক্য।" যে ভাবে আমি যেটুকু বুঝি সেইটুকুই জ্ঞানের চরম ও পরম বাণী, তার অদৃষ্টে আসবেই দুঃসহ বেদনা যন্ত্রণা অশান্তি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: এই-ই হ'ল বেদনার আদিকথা। সেদিন-কার সভায় প'ড়ে শোনালাম ( সাবিত্রীর Book of Fate থেকে ):

Pain is the hammer of the Gods to break
A dead resistance in the mortal's heart...
Pain is the hand of Nature sculpturing men
To greatness : an inspired labour chisel
With heavenly cruelty an unwilling mould.

ব্যথা দেবতার গদা—বিচূর্ণিতে চাহে যে জীবের
আন্তর বাধা—যে রাজে অচলপ্রতিষ্ঠ শবসম।...
ব্যথা প্রকৃতির কর—ভাস্করের সম যে নিয়ত
জৈব প্রকৃতিরে করে মহত্ত্বের মহামূর্তিদান:
উর্ধ্বের প্রেরণা এক সাধনা-নিরত নিরন্তর
নিষ্ঠুর দেবতা সম রূপায়িতে বিদ্রোহী পাষাণে।

আরো অনেক কথাই বললাম—শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর নানা অংশ থেকে আবৃত্তি ক'রে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করলাম তাঁর ধ্যান দৃষ্টি বাণী যে, মানুষকে বিধাতা এ জগতে পাঠিয়েছেন নিয়তির কবলে প'ড়ে হা-হুতাশ করতে নয়—তিনি চান আমরা আমাদের তপস্যার বলে পার্থিব জীবনে এক অপার্থিব পরমানন্দের বেদী প্রতিষ্ঠা করব। শেষে বললাম: "শ্রীঅরবিন্দের এ-মহাকাব্য হয়ত এখনি

জগতের গণমনের কাছে সমাদৃত হবে না, কিন্তু একদিন আসবেই আসবে যে দিন মানুষ বুঝবে যে তাঁর ভাষা শুধু কাব্য-কুয়াশাই ছিল না—ছিল ভাগবত দর্শনের জলদমন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী।"

আমার বক্তৃতার পরে অনেকেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন—সাবিত্রী কোথায় পাওয়া যায়? কিছুদিন পরে শুনলাম যে-কবির গৃহে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম তিনি সাবিত্রী কিনেছেন। হাণ্টার বললেন, আমার ভাষণ শুনে অনেকেই সত্যিই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের প্রতি। আমি বললাম: "আমার ভাষণের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কীই বা হ'তে পারে?"

কিছুদিন পরে—আমরা তখন সানফ্রান্সিস্কো থেকে উড়ে সোজা লস এঞ্জেল্সে পৌঁছে নৃত্যগীত বক্তৃতার স্রোতে ভাসমান—হাণ্টার হঠাৎ আমাদের পাঠালেন বিখ্যাত পত্রিকা "সানফ্রান্সিস্কো একজামিনার" যার নাম ইতিপূর্বে করেছি। অবাক্!—কে ইনি? সুসান স্মিথ? দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ল না—অথচ তিনি আমার সম্বন্ধে বেশ একটু খোঁজখবর করেছেন দেখলাম। লেখিকার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে ব'লেই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত ক'রে আমাদের ভ্রমণের সানফ্রান্সিস্কো-অধ্যায় সাঙ্গ করি। সুসান স্মিথ লিখছেন:

## NOTED INDIAN POET HERE ON TOUR

If you happened to be walking along San Marcos Avenue on a recent Sunday, as dusk set in and the moon rose over the Forest Hill District of San Francisco, there was nothing to indicate that behind the walls of No. 171, the spiritual message of India was being brought to an audience of philosophers, musicians, poets and professors.

Olive Powell, professsor of International Relations at San Francisco State College, had gathered together a group of San Francisco's intellectuals to meet Sri Dilip Kumar Roy, noted singer and poet of India, and his lovely disciple, Indira Devi, Indian dancer, who have come to America as cultural ambassadors of the Indian Government. They have been giving concerts in Tokyo and Honolulu and are now bringing to the United States the spiritual message of India in songs, dance and words.

Born fifty-five years ago, Dilip Kumar Roy comes from one of the greatest and most cultured families of Bengal. His father

and grandfather were both singers and Dilip has long been recognised as a master in the art of spiritual music and one of the great intellectuals of the country.

After graduating from Calcutta University, he decided to devote his life to music at the suggestion of his friend, Bertrand Russell. After World War I, he went on a lecture and concert tour through which he met the "greats" of many lands.

Back in his native land, he toured the country with his "haunting tunes that create an atmosphere of spiritual fervour, sweetness, power and harmony." During his travels he met the late Mahatma Gandhi, Nehru, Tagore the poet, and Radhakrishnan. With his rich, vibrant voice "which flows like the surge of a mighty river", the greatest thing about Dilip's music is its spiritual appeal "that arouses in the listener a deep longing for the Divine."

In 1928, he made over his large fortune to the Ashram temple of Sri Aurobindo, Indian sage and philosopher, and for twenty-four years lived with the great man in an atmosphere of meditation and devotion.

With the world in dire need of spiritual food, Dilip decided he could do more good by coming out of his retirement and sharing the fruits of his labour with his fellowmen. After his visit to California he will leave for the East with the noted dancer, Indira Devi, where he will delight more American audiences.

Among the guests at Cowell House for the occasion, were Mr. and Mrs. Azim Hussain, Indian Consul at San Francisco; Dr. and Mrs. Haridas Chaudhuri, the author of the book : *Sri Aurobindo, the Prophet of Life Divine* ; Anahid Ajemian, violinist, who with his sister gave a concert recently at Town Hall in New York ; Mrs. Barbara Herbert, popular artist and hostess ; Dr. Charles McClelland, Director of the Institute of Indian-American Relations at San Francisco State College and Professor Shih Hsiang Chen, oriental language teacher at U. C.

এর পরের অধ্যায় সম্বন্ধে বিশদ ক'রে লিখব না ভেবেছিলাম। কিন্তু যে-ধরনের গোলমালের মধ্যে আমি প'ড়ে গিয়েছিলাম তার মূলে ছিল মানুষের

অহমিকা ও ভুলবোঝা। বিদেশে সময়ে সময়ে এই দুই কারণে কী ধরনের সংকটে পড়তে হয়—হয়ত অনেকে শুনতে চাইবেন। তাই বলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

হ'ল কি, এখানে আসতেই এক সদয়া মহিলা আমাদের কাছে নিয়ে এলেন আর এক সমোৎসাহিনী করুণাময়ীকে। বললেন, এঁরা দুজনে স্থির করেছেন (আমাদের না জানিয়েই) যে আমরা সানফ্রান্সিস্কোর বিখ্যাত আর্ট ম্যুসিয়মে (Musuem of Arts) নৃত্যগীতের আসর জমাব, টিকিট বিক্রয়ের ভার দ্বিতীয়ার। আমাদের ইচ্ছা ছিল না অজ্ঞাতকুলশীলাদের হাতের খেলার পুতুল হ'তে। কিন্তু প্রথমা আমাদের আগে থাকতে চিনতেন তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন, কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয়ার হাতে পড়তে হ'ল। ইনি আমাদের আমেরিকায়-পদার্পণ সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। সে যাক্।

আমরা প্রথমাকে বললাম যে আমরা ১৭ই তারিখে আর্ট ম্যুসিয়মে আসর জমাব কিন্তু আমরা চাই যে, ভারতীয় কনসাল আমাদের পরিবেষণ করেন। একথা সাতকান হ'য়ে দ্বিতীয়ার কানে পৌঁছল। কিছুদিন বাদে প্রথমা বললেন আমাদের এক বন্ধুকে যে, দ্বিতীয়া আহত হয়েছেন তাই আমাদের কন্সার্টের কোনো সংস্রবেই তিনি থাকবেন না। এদিকে আমাদের কন্সার্ট হবে কাগজে বেরিয়ে গেছে। তাহ'লে কী করা যায়? টিকিট বিক্রয়ের ভার নেয় কে? তারপর হাজারো গোলমাল—ভুলবোঝার মহাভারত—ফলে আমরা আর্ট ম্যুসিয়মের অধ্যক্ষকে টেলিফোন ক'রে দিলাম যে আমরা কন্সার্ট দেবই না—যেহেতু আর সময় নেই—এত অল্প সময়ে এ গোলমালের মধ্যে টিকিট বিক্রয় হবে না, শেষে হয়ত শূন্যপ্রায় ঘরেই আমাদের আসর জমাতে হবে। তখন মাত্র আর পাঁচ দিন আছে—কেউ কেউ জেনে ফেলেছে যে, কন্সার্ট স্থগিত করা হয়েছে। অথচ এ-দিকে খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে—অনেকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কী কারণে কন্সার্ট দেওয়া নাকচ করা হ'ল—আরও কত প্রশ্ন, অভিযোগ! না জানি কাকে কী বলব, কে কী বুঝবে, ফলে আবার কী ভুলবোঝার সৃষ্টি হবে এই ভয়ে যথাসম্ভব মৌনী হয়েই রইলাম। কিন্তু এদেশে বোবাও অজাতশত্রু নয়: আমাদের নামে রটল অপবাদ আমরা দায়িত্বহীন। শেষে আমাদের টেলিফোন করলেন আর্ট ম্যুসিয়মের সেক্রেটারি: "আপনারা আসুন, টিকিট বিক্রয় না ক'রে এমনিই আসর হোক—যেহেতু এখন আর টিকিট বিক্রয় করার সময় নেই অথচ কাগজে রটে গেছে—বহু প্রশ্ন তাগিদ আসছে......" ইত্যাদি।

অগত্যা রাজী হ'লাম। কারুণ ভেবে দেখলাম দ্বিতীয়ার দোষের ফল আমরা ভোগ করি সে এক—কিন্তু আর্ট ম্যুসিয়মের কর্মকর্তাদের কী দোষ? তাঁদের কাছে তো জবাবদিহি আছেই। প্রথমা ও দ্বিতীয়া প্রহৃষ্টা হ'য়ে উঠলেন যে তাঁদের যেমন আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি তেম্‌নি হয়েছে সাজা। কেমন? এখন করো গান শূন্যঘরে!—বললেন, এখানে কাগজেও কোনো বিজ্ঞাপন দিতে হ'লে ৫।৬ দিন আগে পাঠাতে হয়—এখন সময় আছে মাত্র তিন দিন।

যাহোক আর্ট ম্যুসিয়মের অনুরোধে ওরা ১৫ই সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্লে একটি ছোট্ট তিন লাইনের বিজ্ঞাপন ছাপালো—"দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী ১৭ই সন্ধ্যায় আর্ট ম্যুসিয়মে একটি ভারতীয় নৃত্যগীতের আসর করবেন। টিকিট করা হবে না। সবাই স্বাগত।"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া একটু মুস্কিলে পড়লেন। এ কী হ'ল? বিজ্ঞাপন বেরুল যে! তা হোক—এ-ছোট্ট বিজ্ঞাপন কারই বা চোখে পড়বে? ১৭ই সকালে অম্‌নি আর একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ল। ব্যস্‌। না প্রোগ্রাম, না ছবি, না পোস্টার, না কিছু। ক'জন জানল বা জানবে—আগে থাকতে জানবার কোনো উপায়ই নেই। শেষে সঙ্কটতারণকে ডাকলাম বিপদে প'ড়ে: "প্রভু, এদেশের হালচাল তো জানি না—অথচ জ্ঞানতঃ তো অন্যায় কিছুই করিনি। তবে কেন এ-বিপদ্‌? আর যদি ভুল কিছু ক'রেই থাকি সে অবোধের ভুল—ক্ষমা কোরো, দেখো যেন শেষরক্ষা হয়—শূন্য ঘরে গিয়ে হ'তাশ হ'তে না হয়।"

ওমা! বিশাল প্রেক্ষাগৃহ যে প্রায় ভরতি! সুদূরে শেষ বেঞ্চিতে কয়েকটি মাত্র আসন খালি ছিল। দেখে মন সে যে কী আরাম পেল!

তারপর? আসর জ'মে উঠল দেখতে দেখতে। কনসাল সাহেব আমাদের নিবেদন করলেন, প্রথমে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু ইতিহাস জ্ঞাপন ক'রে বললেন: "স্বাধীনতার একটি প্রধান লক্ষ্য দেশের সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন। দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী এসেছেন এদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হ'য়ে……" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর স্পীগেলবার্গ বললেন প্রায় দশ মিনিট। শেষে বললেন: "দিলীপ-কুমার ও ইন্দিরা দেবী এসেছেন আপনাদের শুধু চিত্তবিনোদন করতে নয়। তাঁরা এসেছেন ভারতের ধর্মজীবনের একটি পরম অমৃতফল—ভক্তিসঙ্গীত—পরিবেষণ করতে।"

আমি শেষে একথায় সায় দিয়ে বললাম: "আমরা আপনাদের কাছে এসেছি শুধু ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যের কলাকারু প্রদর্শন করতে নয়—আমরা এসেছি—যে-কথা ডাক্তার স্পীগেলবার্গ তাঁর সুন্দর অভিভাষণে আগেই বলেছেন—ভারতীয় ভাবসঙ্গীত তথা ভক্তিনৃত্যের রস পরিবেষণ করতে। কিন্তু এজন্যে যাজ্ঞা করি আপনাদের দরদ। মনের মানুষ নৈলে যেমন মনের কথা বলা যায় না, ভাবের ভাবী না পেলে তেমনি ভাবের স্ফুরণ হয় না। আমরা এ-পর্যন্ত এ-দেশে সমাদর পেয়েছি—সহানুভূতিরও অভাব ঘটেনি আমাদের অদৃষ্টে—ঘরভরা লোক দেখে আমাদের মন উৎফুল্ল। এখন শুধু আপনাদের সহানুভূতির প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা—কারণ তাহ'লেই ষোলোকলা সম্পূর্ণ হবে···" ইত্যাদি।

প্রেক্ষাগৃহে ঘন ঘন করতালি। মনে হ'ল half the battle won—যেহেতু শ্রোতৃবৃন্দের মন অনুকূল হ'য়ে উঠেছে—প্রথমা ও দ্বিতীয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মুখের ছবি ও মনের ভাব সহজেই অনুমেয়।

গাইলাম যথাপর্যায়ে "আমার জন্মভূমি" বাংলায়, ইংরাজিতে ও হিন্দিতে। তারপরে বন্দেমাতরম্—ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গীতে। তারপরে "চাকর রাখো জী" গাইলাম। সব. শেষে গাইলাম "শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ" হিন্দিতে—ইন্দিরা নাচল।

তারপর সে কী করতালি—কিছুতে থামে না।

পরদিন দুটি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে লিখল আমাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সে-সব আদ্যন্ত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন দেখি না। কেবল ইন্দিরার সম্বন্ধে একটি বিচিত্র মন্তব্য উদ্ধৃত করি। লেখক নাকি সানফ্রান্সিস্কোর একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ সমালোচক—নাম আলফ্রেড ফ্রাংকেনস্টাইন—লিখলেন "সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্লে":

"Except that Indira Devi possesses two arms instead of six, her dances are precisely like those of Indian sculpture, plus the warmth and delicacy of her own reserved, poetic personality...... The melodies of Mr. Dilip Kumar Roy were particularly fascinating because of their fabulous length, a length which had nothing to do with the time they consumed but rather with their constant joining of new motifs and their constant change of rhythmic patterns......This is not surprising, but it has not previously been demonstrated so strikingly in a San Francisco concert hall."

পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—"রিসার্ভড" বিশেষণটির তাৎপর্য কী? উত্তর না দিলেও চলত, কিন্তু দিলেও ক্ষতি নেই। হয়েছে কি, এখানে যখন সঘনে করতালি বাজে তখন গায়ক বা নটনটীকে বার বার ফিরে ফিরে আসতে হয় রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনেই—এবং যতক্ষণ না করতালি থামে, করতে হয় পুনঃ পুনঃ অভিবাদন। আমি অভিবাদন করতাম সাধারণতঃ তিন-চার বার—যথাবিধি। কিন্তু ইন্দিরা রোখালো মেয়ে, বললে, "অতবার অভিবাদন—ও আবার কী?" অনেকে ওকে বোঝালো—এ-ই এখানে দস্তুর। ও বলল: "না, আমি এখানে শুধু ওদের দস্তুর মেনে চ'লে পপুলার হ'তে আসি নি, আমি করব যা আমার শোভন মনে হয়—ব্যস্।" কথাবৎ কার্য—যতই করতালি পড়ুক ও একটিবার মাত্র অভিবাদন ক'রেই নিষ্ক্রান্তা। এহেন শিল্পীকে ওরা "রিসার্ভড" উপাধি না দিয়ে করে কী?

না। আর একটু আছে। যখন একজন সমালোচকের কথা লিখলাম তখন অন্যজনের কথাই বা বাদ দিই কেন? এঁর নাম আলেকসান্দার ফ্রীদ—লিখলেন সানফ্রান্সিস্কো এগজামিনারে:

"In native dress that picturesquely harmonized delicate yellow, orange and buff, Roy sat on cushions on the floor of the museum rotunda platform and chanted poetic, patriotic and religious melodies of his homeland. His songs had a plaintive Oriental tone. Their florid turns of melody, both decorative and emotional added to their grace. And the singer, by his intense but gentle ardour, brought to them, at length, an almost hypnotic appeal.

Some of the songs originated with Roy's own father who, like himself, was famous in Indian music and literature. It was doubly interesting to hear one proud song of India translated into English.

Indira Devi danced to several of the songs. Her visualisation of the Indian National Anthem, *Vande Mataram*, in particular, ran through a cycle of moods—from the mood of national subjection, through that of liberty and its first confusions, and finally to that of national realisation.

To draw conclusion about an immense national art from so brief a programme would of course be impossible. Yet it was

plain that the concert reached out a spiritual aura that its audience felt and welcomed warmly."

* * *

ইন্দিরা স্কেটিং করত এক সময়ে: ধরল: তুষার-স্কেটিং দেখতেই হবে এদেশে! যাদৃশী ভাবনা—হঠাৎ বিশ্ববিখ্যাতা তুষারনটীদের রানী (ইনি উপাধি পেয়েছেন "Queen of the Ice") সোনিয়া হেনি এলেন সানফ্রান্সিস্কোতে দুশো সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। আমাদের দেশে সিনেমার কল্যাণে "স্কেটিং" অনেকেই দেখেছেন—যদিও তাজা বরফের উপরে স্কেটিং বেশি লোক দেখেছেন ব'লে মনে হয় না। তাই বলি—ধাতব পাদুকা প'রে যাঁরা গড়িয়ে গড়িয়ে বরফের উপরে উধাও হন তাঁদের নাম "স্কেটার"। সবাই জানেন পাশ্চাত্য দেশে নানা তুষারাবৃত হ্রদ বা প্রান্তরে winter-sport হয় মোটামুটি দুরকমের: স্কী-ইং ও স্কেটিং। স্কী-ইং তথা স্কেটিং আমি এযাবৎ কেবল ছায়াছবিতেই দেখেছি। কারণ winter-sports বা summer sports দুই রসেই বঞ্চিত এ-গোবিন্দদাস। বলতে কি—যদিও ভয়ে ভয়েই বলছি—খেলাধুলোকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমার মন কেমন যেন মুখভার করে। মনে পড়ে বার্ণার্ড শর কথা:

বহুশত বৎসর ধ'রে
    অবোধ মানুষ ভেবে ভেবে
ফুলায়ে তুলিল ফুটবল,
    সে-দাপাদাপিতে উঠে ক্ষেপে।
বহুশত বৎসর পরে
    আরেকটু শিখিলে ভাবিতে,
ফুটবলে করি' পদাঘাত
    দিবে সে ফাটায়ে জনহিতে।

আমি এতদূর যেতে সাহস করি নে—যেহেতু যৌবনে ফুটবল নিয়ে আমিও দাপাদাপি করেছি বৈ কি—সলজ্জে স্বীকার করছি! তবু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পরিণত বয়সে অন্তত এটুকু বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি যে, খেলাধুলোয়ও আতিশয্য "অত্যন্তং গর্হিতম্।" তাই যখন, ধরা যাক্, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের নৌকাপ্রতিযোগিতা নিয়ে সারা ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতাকে ক্ষেপে উঠতে দেখতাম তখনও মনে পড়ত ঐ ইংরাজেরই সার্থক দীর্ঘশ্বাস:

"Zeal worthy of a better cause !" কারণ যতই কেন না আনন্দ পাই খেলাধুলো নিয়ে, একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া চলে না যে এ-আনন্দ নিম্নশ্রেণীর ছাড়া আর কিছু। অপিচ, মানুষ যখন উচ্চশ্রেণীর আনন্দে একবার রস পায় তখন নিম্নশ্রেণীর আনন্দে কিছুতেই আর তেমন পুলকিত হ'য়ে উঠতে পারে না। দেহের খেলার চেয়ে প্রাণের খেলার আনন্দ বড়, প্রাণের চেয়ে মনের, মনের চেয়ে বড়—এবার হয়ত তর্ক উঠবে কিন্তু নিরুপায়, কেননা কথাটা সত্য—মনের অতীত লোকের আনন্দ। এককথায়, এ হ'ল উদ্বর্তনের—ইভল্যুশনের—কথা। বালিকা পুতুল খেলে যে-আনন্দ পায়, তরুণী তাতে সে আনন্দ পেতে পারে না। শিল্পী শিল্পে যে-আনন্দ পায়, ঔদরিক ভোজনে সে-আনন্দ পেতে পারে না। এমন কি অমন যে তীব্র আনন্দ যৌনতৃপ্তিতে, সে-আনন্দেও মন ভরে না যতক্ষণ না মনের বাড়া হৃদয় এসে যোগ দেয়—অন্য ভাষায়, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পিছন থেকে প্রেম এসে রসদ যোগায়। আলোচনাটা হয়ত একটু বেশি গুরুগম্ভীর হ'য়ে পড়ছে, কিন্তু আজকের দিনে যে অনেক তথাকথিত চিন্তাশীল মানুষকেও বলতে শোনা যাচ্ছে যে ক্রীড়াৎ পরতরং নহি, মুখ বুঁজে থাকি কী ক'রে ?

না ক্রীড়াৎ পরতরং অস্তি—যদি ক্রীড়া বলতে বুঝি দেহের ক্রীড়া। কারণ দেহকে নিয়ে যতই কেন না উচ্ছ্বাস করি, দেহের আনন্দ তার স্বকীয় পাঞ্জায় কখনোই মনের প্রাণের আত্মার আনন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নি, পারবে না। দেহের আনন্দ নিয়ে রোখ ক'রে বাড়াবাড়ি করা কঠিন নয়—বলিষ্ঠ বলিষ্ঠারা তো অহরহই করছেন এ-অপকর্ম—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে—কিন্তু এ-বাড়াবাড়ির পর পর্বেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে অবসাদের প্রতিক্রিয়া। "হেথা নয় হেথা নয় আর কোনোখানে"—বলেই বলে বোদ্ধা মন, বিকশিত মন, উচ্চতর রসের রসিক মন। সেনিয়া হেনির তুষার-ক্রীড়া দেখতে দেখতে একথা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম।

কিন্তু তা' ব'লে যে তাঁর কৃতিত্বের মূল্য দিতে আমরা নারাজ একথা যেন কেউ মনে না করেন। প্রশংসা করতেই হবে তাঁর আশ্চর্য পদচালনার, বরফের উপর বিদ্যুদ্‌গতি ধাবনের, নানা রেখায় নৃত্যরস পরিবেষণের, এককথায় হাজারো অদ্ভুত সার্কাস-নৈপুণ্যের। দেখকে দেখতে মনে হয় মানুষ তার দেহকে নিয়ে সাধনা ক'রে দেহের জড়তাকেও বুঝি 'দুয়ো' দিতে পারে! তাছাড়া কত রকমের প্রযোজনা—বরফাবৃত বিশাল রঙ্গমঞ্চে কম ক'রে পঞ্চাশ ষাটজন নটনটী চলেছে যেন কখনো বা হাওয়ায় উড়ে, কখনো জলে সাঁতরে! এভাবে যে মানুষ

স্কেটিং-সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারে—একপায়ে বরফের উপর এমন বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে পারে যে সত্যিই মনে হয় (এ অতিরঞ্জন নয়) যে সে চতুর্মুখ হ'য়ে উঠেছে—এর সঙ্গে ও, তার সঙ্গে সে কত রকম লাফালাফি করছে, এ ওর কাঁধে চড়ছে, সে তার পা ধ'রে বর্তুলছন্দে ঘোরাচ্ছে, বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে ছুটতে সার সার ছোট মিনিয়েচার উড়ো জাহাজ ডিঙিয়ে যাচ্ছে লাফিয়ে—দেখতে দেখতে মনে হয় যেন এরা মানুষ নয় জাদুকর; মনে হয় এদের হাত-পা অস্থি-মাংস দিয়ে গড়া নয়, বায়বীয় কোনো উপাদানে নির্মিত; মনে হয়—আরো কত কী! যিনি চোখে না দেখেছেন এ-অবিশ্বাস্য ধাবন-নৈপুণ্য, নৃত্যকৌশল, বিদ্যুদ্বেগ, নানা রূপরেখায় ও সাজসজ্জায় বহু নরনারীর তুষারের উপর গতির ছবি-আঁকা—তাঁকে বর্ণনা ক'রে বোঝানো অসম্ভব এর ভঙ্গি-বৈচিত্র্য, গঠন-পরিকল্পনা। ইন্দিরাকে বলছিলাম দেখতে দেখতে: "যে-কোনো কিছুর উপরেই পূর্ণ কর্তৃত্বলাভের দৃশ্য বিস্ময় জাগায় একথা মানতেই হবে।" সময়ে সময়ে সত্যি অভিভূত হয়ে পড়তে হয়—মন বলে: "কী কাণ্ড!"

কিন্তু আধঘণ্টা পর্যন্ত। তারপরই মনে হয় একঘেয়ে। দেখা হ'য়ে গেছে, আর কেন? খেলা শেষ হবার অনেক আগেই আমরা প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে এলাম। দ্বিতীয়বার যাব না এ-খেলা দেখতে—এর নৈপুণ্যের গুণগান করব মন খুলেই কিন্তু এমন কথা বলতে পারব না "আ মরি!" কেন? না, এ-খেলা একান্ত ক'রেই দৈহিক বা প্রাণিক। মানে—প্রাণশক্তির উদ্দীপন। এর সঙ্গে নেই মন বা মনের উপরের কোনো চেতনার সহযোগ। তাই দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে যায়।

অবশ্য অল্প বয়সে ভালো লাগে এসবই। বলি নি—দৌড়ধাপ, ফুটবল তো ভালো লাগত? বেশি বয়সেও অনেকেরই তো দেখি এসব দারুণ ভালো লাগে। কিন্তু সে-ভালো লাগার তীব্রতা বেশি হ'লেও মূল্য বা গভীরতা খুব বেশি নয়। কারণ এ-সব নৈপুণ্যে রসের চেয়ে বেশি রসদ যোগায় চমক, শিল্পের চেয়ে বেশি অসাধ্য-সাধনের উত্তেজনা।

কথাটা হয়ত কেউ কেউ ভুল বুঝতেও পারেন। শিল্পের মধ্যেও চমক আছে—থাকবেই। যেখানেই সুন্দর পরম হ'য়ে ফুটে উঠেছে সেখানেই মন গেয়ে উঠতে বাধ্য: "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!" গুণী যখন স্বর-লহরীর ইন্দ্রজাল রচনা করেন তখন শ্রোতা বলবেনই বলবেন "তুমি কেমন ক'রে গান করো যে গুণী, আমি অবাক্ হ'য়ে শুনি কেবল শুনি।"

বটে, কিন্তু নিছক সৌন্দর্যের বিকশনে যে-চমক সে সুন্দরের অঙ্গাঙ্গী হ'য়েই রূপ নিয়েছে—নিজেকে আলাদা জাহির করে নি। তাই তো শিল্পকলা আজো বিশ্বমানব-মনের কাছে আদরণীয়। কিন্তু দেহসর্বস্ব খেলাধুলোর জাঁকজমকে সৌন্দর্যের বিকাশ গৌণ, চমকটাই মুখ্য। অন্যভাষায়, এ হ'ল সার্কাস—অঙ্গ-ভঙ্গির আত্মবিজ্ঞপ্তি, গতির সাজসরঞ্জামের আত্মগুণকীর্তন—"দেখ, কী কাণ্ড করছি আমি—কী দুরূহ এ সিদ্ধি"—এই মনোভাব জেগে আছে এ-শ্রেণীর আস্ফালন-বাহ্বাস্ফোটের পিছনে। একটি ভালো নাটক বা কন্সার্টে রসিক মন যে-ধরনের রস পেয়ে আবিষ্ট হয়—এ-ধরনের খেলার মধ্যে সে-ধরনের রস জ'মে উঠতে পারে না—পারলে ও পড়ত শিল্পের কোঠায়। গড়পড়তা মন এত শত ভেবে দেখে না—এখানে ওখানে একটু আধটু আনন্দ পেলেই সে খুশি। তাই তো এ-ধরনের খেলায় হাজার হাজার লোক যায় ও উচ্ছ্বসিত হাততালি দেয়। যে-কৃতিত্ব এ-ধরনের সার্কাসে দেখানো হয় সে পুরস্করণীয়—মান্‌ব। কিন্তু তাই ব'লে একথা মানতে পারব না যে এ-কৃতিত্বের রসমূল্য খুব বেশি। ছবি আঁকার শিল্পের আর ফটোগ্রাফির নৈপুণ্যের মধ্যে যে-তফাৎ, উৎকৃষ্ট রন্ধন-নৈপুণ্যের আর অপরূপ গৃহসজ্জার মধ্যে যে-তফাৎ, এককথায় নিছক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আর হৃদয়তৃপ্তির মধ্যে যে-তফাৎ, এ-শ্রেণীর প্রদর্শনীর আর কলাকারু-উদ্ভাবনার মধ্যে ঠিক্ সেই তফাৎ।

স্পোর্ট স্পোর্ট স্পোর্ট! না, মানুষের অন্তরাত্মার খোরাক আর যেই যোগাক স্পোর্ট যোগাতে পারবে না—তা যতই কেন না স্পোর্টের জয়গান করা হোক। সোনিয়া হেনি দেহকে নানাদিক দিয়ে আনুগত্য শিখিয়েছেন্ এবং সে-আনুগত্য বহু-সাধনালভ্য একথা মান্‌ব—তাঁর সাধনার অধ্যবসায়কে তার প্রাপ্য প্রশংসা দিতেও বাধা নেই; কিন্তু এ-শ্রেণীর প্রদর্শনীতে এখানকার মানুষ যেভাবে আত্মহারা হ'য়ে ওঠে সে-মনোভাব কোনো জাতির মনে চারিয়ে গেলে তাতে ক'রে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হবে একথা বলবার সময় এসেছে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে যেখানে স্পোর্ট নিয়ে মাতামাতি বহু মনকে ধীরে ধীরে যেন পেয়ে বসছে। মিছরিকে প্রশংসা করব ব'লে যে মুড়িকে তার প্রাপ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত করতেই হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু মুড়ি-মিছরির একদর হোক এ-মনোভাবের মূলে আছে যে-শোচনীয় অপ্রবীণতা তাকে নবীন বা তরুণ উপাধি দিয়ে জাতে তোলা সম্ভব নয়। রসিক মনের কাছে এ-ধরনের আনন্দ সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য এমন কথা বলব না, কিন্তু একথা

না বললে বেরসিকের তথমাই ললাটভূষণ হ'য়ে উঠবে যে জাতীয় জীবনের প্রগতিতে খেলাধুলা তথা অঙ্গচালনার নৈপুণ্যের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকলেও উচ্চতর শ্রেণীর আনন্দমেলায় সে চিরদিনই থাকবে অপাংক্তেয়।

* * *

আমার ক্লাসে এক শ্রীমতী শিখতেন গান। ইন্দিরার ক্লাসে নাচ। নাম মিসেস ফ্রে। তাঁর সঙ্গে আসত মাঝে মাঝে তাঁর একটি বড় চমৎকার পোষ্য-পুত্র—দশ বছরের ছেলে। শ্রীমতী বড় অমায়িক। আমাদের এখানে ওখানে মোটরে নিয়ে যেতেন, কখনো বা খাওয়াতেন বড় হোটেলে, কখনো দেখাতেন অপরূপ কোনো দৃশ্য। একদিন নিয়ে গেলেন এক পাহাড়ের উপরে—হু হু ক'রে—নিশীথ রাতে। কী অপূর্ব দৃশ্য যে দেখলাম শীতে হি হি করতে করতে! এদিকে চাঁদ মাথার উপর, ওদিকে দীপকণ্ঠী বিলাসিনী রূপনগরী কত রকম আলোর প্রসাধনে ভূষিতা—শ্বেত, লাল, নীল, সবুজ, সোনালি—কিন্তু ঐ উঁচু থেকে সব জড়িয়ে সে-আলোর মণ্ডল হ'য়ে উঠেছে এক নতুন পাঁচরঙা আলো—সাতরঙা হ'লে হয়ত সাদা দাঁড়াত! সে এক অভিনব আলোকসজ্জা বটে! একধারে সমুদ্রের উপর চাঁদের আলো চলেছে চলন্ত তুলি বুলিয়ে, অন্যদিকে যেন আলোকময়ী নগরী আনন্দে রঙিন হ'য়ে দেখছে চেয়ে চেয়ে!

এহেন শ্রীমতী একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর সুরম্য হর্ম্যে। আমি গাইব, ইন্দিরা নাচবে! শুনেছিলাম তাঁর আরামালয় ঈষৎ দূরে। কিন্তু এত দূরে কে জানত? বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর এক পুষ্টকায় বন্ধু এলেন প্রকাণ্ড মোটর নিয়ে। যাত্রী ওঠালেন জলজ্যান্ত ছ'টি—নিজেকে বাদ দিয়ে। এরমধ্যে পাঁচজন মহিলা—ইন্দিরাকে নিয়ে। নৈলে রথিবৃন্দকে সপ্তরথী বলা চলত!

রথী বলতে চাই কেন? উত্তর প'ড়েই রয়েছে। এই-চারটি মার্কিন মহিলা ইন্দিরাকে প্রশ্নবর্ষণ ক'রে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইলেন যেন। ইন্দিরা পিঠ পিঠ জবাব দিল—পাশুপতাস্ত্রের উত্তরে যেন নারায়ণাস্ত্র, নারাচের উত্তরে শতঘ্নী। একটু নমুনা দিলামই বা!

প্রশ্ন: আপনাদের ওখানে না কি দশবছরের মেয়ের বিয়ে হয়?

উত্তর: আগে হ'ত বৈকি। এখনো হয় কোথাও কোথাও। কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে আপনারা যখন এ-ধরনের সংবাদ পড়েন তখন বোধহয় আমাদের সম্বন্ধে এ-ধরনের তথ্য সংগ্রহ ক'রে শিউরে ওঠেন, না? কিন্তু

এ-শিহরণের সমর্থনে কিছু যুক্তি পেশ করা গেলেও যে-চিত্র এসব অঙ্কনে আপনাদের চোখে ফুটে উঠে সে খতিয়ে ভারতের স্বরূপ নয়। মানে, এছাড়াও ভারতের স্বরূপের আর একটা দিক আছে—আর সেইটাই তার বড় দিক্।

প্রশ্ন : তার মানে ?

উত্তর : ধরুন যদি আমরা ফিরে গিয়ে বলি আমেরিকান ললনারা অর্ধনগ্ন বা পূর্ণনগ্ন হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করেন তাহ'লে রটনাটি মিথ্যা এমন কথা আপনারাও বলতে পারবেন না। কিন্তু মানবেন কি যে, এই-ই হ'ল আমেরিকান মোহিনীদের চরম রূপসজ্জা ? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনাদের টুরিস্টরা সেই সব মুখরোচক কথাই শ্রুতিরোচক ক'রে বর্ণনা করেন যা আপনাদের বাজারে বেশি বিকোয়, যা শুনলে আপনারা আত্মপ্রসাদ বোধ করতে পারেন যে আপনারা কত উন্নত, ভারতীয়রা—হা, অধঃপতিত! প্রতি জাতির মধ্যে নানা স্তরে নানা ধরনের রীতিনীতি চালু হ'য়ে যায় নানা কারণে, কিন্তু একটি জাতিকে তার মাত্র দুএকটি স্তরের দৃশ্য দেখে বিচার করলে তাকে সুবিচার বলা চলে না।

প্রশ্ন : কিন্তু বালিকা বধূর 'পরে বর্ষীয়সী শাশুড়ী অনেক সময়েই যে অত্যাচার করে ? সে-অত্যাচারও কি সমর্থনীয় বলবেন ?

উত্তর : শুনুন। এ-ধরনের বিচার করতে যদি মুখিয়ে ওঠেন তাহ'লে আমাদেরও দোষ দিতে পারবেন না যদি আমরা পাল্‌টা প্রশ্ন করি : আমেরিকান মেয়েরা অনেক সময়েই যে কথায় কথায় একের পর এক স্বামীকে বরখাস্ত ক'রে অন্য স্বামীর অঙ্কশায়িনী হ'ন এ-ও কি সমর্থনীয় ? যদি বলেন—তথ্য দিয়েই তো কোনো জাতকে বিচার করতে হবে তাহ'লে উত্তরে কি বলা চলে না যে, খণ্ড খণ্ড ক'রে শুধু নিন্দনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে কোনো জাতির সুবিচার হ'তে পারে না ? মানুষ নানা অবস্থায় প'ড়ে নানা ভাবে সাড়া দেয়। সব জড়িয়ে দেখতে হবে তার ভালো মন্দ। তবেই হবে সে পরম দেখা।

ইন্দিরার মুখে এ-ধরনের রোখালো কথা শুনবে—ওরা ভাবে নি। পরে আর একটি সভায় একজন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে ওর মুখে এই ধরনের কথা শুনে একটু তটস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন একটি ডিনার পার্টিতে। তিনি বলছিলেন বেশ চটকদার ঢঙে যে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ আভরণ তাদের রূপই বটে, কারণ তাদের সঙ্গে সত্যিকার বাক্যালাপ তো আর হ'তে পারে না। ইন্দিরা ছিল পাশে। খানিক বাদে কথায় কথায় সে-ভদ্রলোক যেই বললেন :

"আমরা নানা দেশে দূত পাঠাই তাদের টেনে তুলতে", ইন্দিরা বলল টপ ক'রে: "আমরা পাঠাই না—কেন না আমরা বিশ্বাস করি আগে নিজেদের টেনে তুলতে না পারলে অপরকে টেনে তোলার চেষ্টা বিড়ম্বনা।"

ভদ্রলোক বললেন রুখে উঠে: "কিন্তু একজন যদি অপরের জন্যে কিছুই না করতে চায় তবে তার ফল দাঁড়ায় তামসিকতা।"

ইন্দিরা শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল: "হ'তে পারে। কিন্তু নিজে আলো না পেয়ে অপরকে আলো দেখাতে গেলে ফল দাঁড়ায় আত্মম্ভরিতা। তবে আত্মম্ভরিতা ভালো না তামসিকতা এ-নিয়ে তর্ক চলতে পারে—যার কোনো চরম নিষ্পত্তি অসম্ভব। কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন।"

কোণঠেশা হ'লে মানুষ যেভাবে সাড়া দেয় কোণঠেশা না হ'লে বোধহয় সেভাবে সাড়া দিতে পারে না। বাগ্‌বিতণ্ডায় সচরাচর লাভের অঙ্কে হয়ত বেশি জমা হয় না। কিন্তু মানুষের অহমিকা ঘা খেলে হয়ত সময়ে সময়ে একটু ভাবতে শেখে! অন্তত ইন্দিরার সেদিনকার কথা শুনে এক চিন্তাশীল ব্যাঙ্কার আমাকে বলেছিলেন: "আপনার শিষ্যা দেখতে তন্বী হ'লেও কথাবার্তায় আশ্চর্য বলিষ্ঠা। তাঁর কথাবার্তা শুনে শুধু যে মুগ্ধ হয়েছি তাই নয়—সত্যিই শিখলাম অনেক কিছু।" যাক্, যা বলছিলাম বলি।

মোটরে খানিকবাদে প্রশ্নের তীরন্দাজি থেমে গেল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম ঘণ্টাখানেক বাদে।

তারপরে খাওয়া দাওয়া—সর্বশেষে আমার গান ও ইন্দিরার নাচ হ'ল প্রফুল্ল চুল্লীর পাশে। ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ল জলন্ত চুল্লী দেখে। এ অবধি দেখে এসেছি গরম লোহনল—তারাই ঘরে উষ্ণতা বিতরণ করে। কিন্তু তাতে শুধু দেহের আরাম: ফায়ার প্লেসে গন্‌গনে বহ্নিশিখা—সেকেলে ব'লেই হয়ত আরো ভালো লাগল—মেয়েদের হাই হীল জুতো দেখে দেখে হঠাৎ কোনো আল্‌তাপরা পা দেখলে যেমন মনে আনন্দ হয়।

নৃত্যগীত প্রথম দিকে খুব জমে নি, কিন্তু শেষের দিকে জ'মে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের হাওয়াই যেন বদ্‌লে গেল। ইন্দিরাকে যাঁরা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই সব আগে এগিয়ে এলেন ধন্যবাদ দিতে: "কী সুন্দর নাচ…কী সুন্দর তাল…কী সুন্দর নূপুর!"…ইত্যাদি।

ইন্দিরা হেসে বলল: "কিন্তু এ ভারতীয় নৃত্য-নূপুর!"

আমাদের গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী ফ্রে বড় মঞ্জুভাষিণী সহৃদয়া। অথচ এদেশের

সহৃদয়াদের কী আশ্চর্য ধরনধারণ! এঁর তিন তিনটি বিবাহ। বর্তমান স্বামীর ঔরসে একটি মাত্র সন্তান। এ ছাড়া তিনটি শিশু তিনি পোষ্য নিয়েছেন। দুটি ছোট মেয়ে, একটি ছোট ছেলে। আরো বিচিত্র লাগল দেখে যে, তাঁর দ্বিতীয় স্বামী অতিথি হ'য়ে এসেছেন তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রীর বাড়িতে—তৃতীয় স্বামীর নিমন্ত্রণে! শুধু আসাই নয়—আইরিশ গান গাইলেন হার্প বাজিয়ে—তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর অনুরোধে।

ভাবলাম ইন্দিরার জেরাকারিণীদের বলি: "'আমেরিকায় একটি মহিলার নানা স্বামীর মধ্যে আশ্চর্য 'পারস্পরিক' মিতালিও বুঝি আমেরিকার একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য!" কিন্তু মনে মনে ব'লেই প্রাণ খুশি।

নৃত্যগীতের শেষে ইন্দিরাকে শ্রীমতী বললেন: "যে-কয়টি মহিলা ও ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মহিলাও আসেন নি তাঁর স্বামীর সঙ্গে, কি একটি ভদ্রলোকও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে! ঘরে কেবল একটি দম্পতি ছিল—সুখী দম্পতি—আমি ও আমার তৃতীয় স্বামী।"

ইন্দিরা যে ইন্দিরা সেও একথা শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিল বৈকি। জানি না তার ইচ্ছা হয়েছিল কিনা প্রশ্ন করতে: "এ-ও কি আধুনিক আমেরিকার সর্বাঙ্গীণ প্রগতির একটি বিশেষ অনস্বীকার্য অভিজ্ঞান?"

* * *

সানফ্রান্সিস্কোয় আমাদের শেষ নৃত্যগীতের আসর হ'ল দোসরা মার্চ। সন্ধ্যায় ডিনার হ'ল এক মহিলার ওখানে। তারপর আমাদের সংবর্ধনা হ'ল Council of World Affairsএর তরফ থেকে আর একটি মহিলার প্রশস্ত কক্ষে। কনসাল সাহেব ফের আমাদের পেশ করলেন যথারীতি—বললেন আমি একাধারে কবি, গীতিকার ও দার্শনিক ইত্যাদি। শেষে আমি উঠে বললাম:

"আমাকে কনসাল সাহেব রকমারি বাঞ্ছনীয় উপাধি দিয়েছেন। কিন্তু আমি চাই শুধু একটি উপাধি—'জিজ্ঞাসু'। কারণ এই জিজ্ঞাসায়ই আমি পেয়েছি যা কিছু আমার জীবনের পরম সম্পদ। গান কাব্য দর্শন এ সবেরই আমি চর্চা করেছি—গানে কাব্যে সাহিত্যে হয়ত কিছু সৃষ্টিও ক'রে থাকব—কিন্তু কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য আমার লক্ষ্য নয়। আমি চেয়েছি সত্যকে, প্রতি বিদ্যার প্রতি সাধনার মধ্যে দিয়ে।। এর ফলে খতিয়ে আমি পৌঁছেছি এই সিদ্ধান্তে যে, কোনো বিদ্যাই আমাদের পরম লক্ষ্যে উপনীত করতে পারে না, যদি সে-বিদ্যা একান্ত ক'রে না চায় বিদ্যার অতীত কোন বস্তুকে। এই পরম বস্তুর

নামই ভগবান। তাই আমি গান গাই, কবিতা লিখি, দর্শন চর্চা করি—তাঁর একটু কাছে পৌছতে—যদি পারি। কতটুকু পেরেছি জানি না—তবে—গানের মধ্যে দিয়ে যে-আনন্দ আমাকে ভাগবত সত্যের চরণমূলে পৌছে দিয়েছে তার কিছু পরিচয় দিতে আজ এসেছি আপনাদের কাছে। আপনারা বিশ্বজগতের চর্চা করতে আপনাদের সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি চাই এইটুকু জুড়ে দিতে যে, বিশ্বজগৎকে বোঝা যায় না শুধু বিশ্বের খবর রেখে। জানতে হবে বিশ্ব যিনি রচেছেন তাঁকে। আমাদের নৃত্যগীতে তাঁর বন্দনার মধ্যে দিয়ে তাঁর রসালতার কিছু আভাষ পরিবেষণ করবার প্রয়াস পাব। কিন্তু সে-আভাষ আপনাদের কাছে মূর্ত হ'তে বাধা পাবে যদি আপনারা পাশ্চাত্যের এই যুক্তি-বাদ আঁকড়ে থাকেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্য শিল্পকারুর সত্যের সভায় অপাংক্তেয়। ভারতে শ্রেষ্ঠ গুণী, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ শিল্পী গান বেঁধে এসেছেন, ছবি এঁকে এসেছেন, কবিতা গেঁথে এসেছেন যিনি গানের কাব্যের ছবির পারে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকেই ফোটাতে। প্রাচীন ভারতে মীরা, দাদু, কবীর, তুলসীদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সবাই ভগবান্‌কেই দিয়েছেন তাঁদের আন্তর আত্মপ্রকাশের মালা। অজন্তায়, এলোরায়, কোনারকে দেবদেবীর ছবিই পেয়েছে শিরোপা। এমন কি আমাদের শ্রেষ্ঠ মানস গবেষণাও আসলে মনের অতীত এক আলোক-লোকের ব্যাখ্যা, তাই সে নাম পেয়েছে দর্শন—কিনা ভগবানের সত্যস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা। ভারত সব কিছুর মধ্য দিয়ে চেয়েছে এই পরমতমেরই দর্শন স্পর্শন পেতে। তাই তার কাছে সাংসারিক সত্য আর পারমার্থিক সত্য স্বতন্ত্র ব'লে গণ্য হয় নি। এমন কি আহার বিহারও সে নিবেদন করতে চেয়েছে ভগবান্‌কে ঃ "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ—যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।" অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে এই বিধান দিচ্ছেন যে কর্ম অশন যজ্ঞ দান ও তপস্যার অন্তিমফল আমরা যেন ভক্তিভরে শুধু ভগবান্‌কেই নিবেদন করতে চাই, কোনো কিছুই আমাদের নিজের জন্যে নয়। তাই ভারতে আমরা পারি-বা-না-পারি নিরন্তর চেয়ে এসেছি যা কিছু করি তাঁকেই উৎসর্গ করতে। একথা যদি সত্য হয় তবে গানকেও ধন্য হ'তে হবে তাঁর স্মরণে। 'অবিস্মৃতি-স্বচ্চরণারবিন্দে'—নিরন্তর মনের স্মৃতিমন্দিরে তাঁর চরণ-কমলের প্রতিষ্ঠা আমাদের শুধু যোগজীবনের নয় ধর্মজীবনের তথা উচ্চতম শিল্পিজীবনেরও একমাত্র আদর্শ হ'য়ে এসেছে। তাই গানে আমরা চাই তাঁরই স্মৃতির পূজা। শিল্পের জন্যে নৃত্যগীতের ছায়াবাজি দেখাতে আমরা আসি নি সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে।

এসেছি—তাঁরই নাম শোনাতে যিনি বিশ্বের অতীত হ'য়েও বিশ্বের অন্তরবাসী, নয়নের অলক্ষ্য হ'য়েও সাধকের নয়নমণি, আশার অলভ্য হ'য়েও দুরাশীর পরমবাঞ্ছিত।"

ভাষণান্তে আমি গাইলাম ইন্দিরার বাঁধা একটি ইংরাজি গান যেটি "শ্রুতাঞ্জলি"-তে ছাপা হয়েছে:

When day is done and shadows fall,
Let this my prayer be :
O make my life a tender flame
That only burns for thee.

O make my speech one grateful hymn,
My heart of love thy throne :
My joy, my thought, my love, my life—
Make all, O Lord, thine own.

এটি ইংরেজিতে মিশ্র কল্যাণ রাগে গেয়ে পরে এর হিন্দি অনুবাদ গাইলাম ঐ একই সুরে—কেবল নানা তানালাপে ফলিয়ে। তারপরে গাইলাম "শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ"—আগে ইংরাজি অনুবাদটি আবৃত্তি ক'রে। ইন্দিরা এ গানটির সঙ্গে নাচল অতি সুন্দর। হিন্দি গানটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে।

সবশেষে গাইলাম দুটি জর্মন গান ও বাংলা অনুবাদ—তানালাপের সঙ্গে।

শাস্ত্রে বলেছে যারই আরম্ভ আছে তারই অবসান অবধারিত। সুতরাং সানফ্রান্সিস্কোয় সুরু হয়েছিল যে-অভিজ্ঞতার আদিপর্ব, তার শান্তিপর্ব পাঠ হবে যথাকালে এ আর আশ্চর্য কী? তবে শেষ পর্বটি পাঠ করলেন কোনো মার্কিন পুরোহিত না, জনৈক মেক্সিকোবাসী যুবক। ও আকাডেমিতে নাচ শিখত ইন্দিরার কাছে। পরে ভারতবর্ষে এসেও শিখেছিল—পণ্ডিচেরিতে। ওর ছিল আশ্চর্য নৃত্যপ্রতিভা। তাই ও চাইল ইন্দিরার নাচের কিছু নমুনা রাখতে। ওদেশে এ তো খুবই সহজ। বাড়ি বাড়ি আছে প্রাইভেট টকি। কাজেই ওরা সদলবলে এসে রুডল্‌ফ শেফারের বিদ্যালয়ে ইন্দিরার নাচের ছবি নিল আমার গানের সঙ্গে। কী রকম উঠল জানতে পারব না হয়ত কোনোদিনই—তবে আমেরিকার কেউ কেউ সে-ছবি দেখবে ও নাচের সঙ্গে শুনবে গান এই যা সান্ত্বনা।

আমাদের বিদায়লগ্ন আসন্ন হ'তে-না-হ'তে ওখানে আমাদের পরিচিত অনেকের

মধ্যে উচ্ছ্বাস জেগে উঠল—বিশেষ ক'রে ইন্দিরার কয়েকটি ছাত্রীর মনে। তারা ওকে কি রকম ভালবেসে ফেলেছিল তার একটিমাত্র নমুনা দিই। যুগপৎ উচ্ছ্বসিত বিদায়প্রণামী এল চার চারটি মার্কিন তরুণীর কাছ থেকে। তার মধ্যে একটি মাত্র উদ্ধৃত করি:

I have made thee the Polestar of my life.

Though my sea is dark and my stars are gone,

Still I see the path through thy mercy......ইত্যাদি।

এর পরে ইন্দিরা এ-ধরনের অর্ঘ্য আরো অনেক পেয়েছে। ভারতবর্ষে ফিরতেই পত্র এল মিসেস এলেন প্লানটিফের কাছ থেকে—যাঁর কথা পরে লিখেছি, নিউয়র্ক অধ্যায়ে। তিনি লিখেছিলেন (২২.৫. ৫৩ তারিখে):

Blessed little sister Indira,

Your letter evoked joy and a sort of *tristesse* in one. Hundreds of messages are remaining for you—unwritten...and...also remaining is a complete lack of understanding: why—because never have I been in more constant desperate need of your sincere firm counsel. Perhaps I was able to endure the waiting because somehow no separation was felt. Indeed, these are days for heroism. For you and Dilip Kumar Roy all Truth in your *poteau indicateur*. That was the message you brought us here. So may your Path be filled with Light......Also a conflict goes on with the burning longing to abide in the Self through direct experience while performing world-duties and naming them illusory.

আমার ছাত্রদের সঙ্গেও আমার হৃদ্যতারই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল বৈকি—কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি ছেলেরা পারে? কাজেই আমাকে কেউ-ই জানালো না এমন কোনো কাব্যোচ্ছ্বাস যা উদ্ধৃত করা চলে।

না-ই জানালো: তারা কয়েকটি বাংলা গান তো শিখল তথা ভারতীয় সুরে ইংরাজি গান। কখনো হয়ত ওরা ওদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে-গান গাইবে এবং কিছু আনন্দ বিতরণ করবে ওদের দেশের সঙ্গীতরসিকদেরকে। কত উড়ে-আসা বীজ পড়ে দূরের মাটিতে—সব বীজে চারাগাছ হয় না মানি, কিন্তু কয়েকটা বীজ তো ফলে। তাই আশা করা যাক আমার দুএকজন ছাত্র ভবিষ্যতে ভারতীয় গান আরো কিছু শিখবে।

একটু পুনশ্চ মতন দিয়ে ফের লিখে রাখি যা ঘটেছিল পরে—কেন না এর পরে

একটু অন্তত মনে মনে জপ করা চলবে যে, আমার আশাটি নিতান্ত দুরাশা না হ'তেও পারে। ব্যাপারটা এই :

আকাডেমিতে আসত একটি যুবক বেশ সুদর্শন, পুষ্টকায়, কণ্ঠস্বরও সুন্দর। আমাদের দেশের স্বর ও তাল শিখতে শিখতে সে খুব উৎসাহী হ'য়ে উঠেছিল। তাকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সে আমাদের ভোলে নি। দেশে ফিরে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তার একটি সুন্দর চিঠি পাই। চিঠির খানিকটা দিই নিচে :

San Jose, California
December 5, 1953

My dear Maestro :

Time, as we permit ourselves to conceive of it, has a sly habit of acceleration, and many months have slipped by since your classes and teaching in San Francisco. I do want you to know, however, that the loving work done by you and Indira is not only remembered with deep appreciation but is, in many ways, present as an enriching experience here and now. The tempos of Western life press upon the atmosphere to such a degree that one tends to forget the subtle but always insistent rhythms and melodies basic to our being. It is far too difficult to hear the strains of a flute in such a cacophony or to see in the mad swirl the pattern of a *rasa* dance.

I also want to tell you that I enjoy your book, *Sri Aurobindo Came To Me*, and treasure it for two reasons in particular. One is the ever-present touch of Sri Aurobindo found within and throughout it, and the other is the timeless quality that flows from your pen which, like an "inky" fountain of youth, refuses to allow you to be encrusted with those crystalline barnacles worn as diadems by the "stuffed-shirt" set.

Sincerely Mac (Jay R. McCullough)

এ-যুবকটিকে ডাকতাম ম্যাক্ ব'লে। ওর উৎসাহ কোনোদিন ভুলতে পারব না, বিশেষ তাল সম্বন্ধে ওর আশ্চর্য দক্ষতা : একটু শিখতে না-শিখতে আমাদের তেওরা ধামার ঝাঁপতালে গীত গানের সঙ্গে ও নির্ভুল তাল দিতে পারত! এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল এত সহজে তার আর একটি কারণের কথা বলব? খোলাখুলি ব'লে ফেললে হয়ত একটু সেকেলে—সেন্টিমেণ্টাল মতন—শোনাবে। তা শোনাক না। ভাবটা যখন ভাববার মত তখন্ প্রকাশ করলে ক্ষতি কি?

কথাটা এই যে ওরা স্পৃষ্ট হয়েছিল শুধু আমাদের গানের সৌন্দর্যের জন্যেই নয়। ওদের ভালো লেগেছিল আমার মুখে শুনে যে, প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে গুরু শিষ্যকে বিদ্যাদান করতেন শুধু যে পারিশ্রমিক না-নিয়ে তাই নয়—শিষ্যের গ্রাসাচ্ছাদনেরো ভার নিতেন তিনি। অন্যভাষায়, সে-সময়ে বিদ্যা এযুগের মতন "অর্থকরী" ছিল না।

একথা শুনে ওরা কেমন যেন অভিভূত হ'য়ে গেল। তাছাড়া সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে দু'মাস ওদের গান শিখিয়ে আমরা একটি ডলারও নিলাম না—এ যে আমেরিকায় এযুগেও হ'তে পারে ওরা ভাবে নি। ফলে ওদের সঙ্গে হৃদয়ের একটি সহজ যোগসূত্র গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের। এ অভিজ্ঞতাটি শুধু যে ওদের কাছেই বিচিত্র রঙে রঙিয়ে উঠেছিল তাই নয়—আমরাও যেন এই সূত্রে নতুন ক'রে আস্বাদ করেছিলাম একটি শাশ্বত নীতির রসের দিকটা—যে, বিদ্যাদান এম্‌নিই হওয়া উচিত—অর্থের সম্পর্কশূন্য। শিক্ষার্থী শিষ্যের সঙ্গে দানার্থী গুরুর সম্বন্ধ অর্থের নয়—শ্রদ্ধার, প্রীতির; এ দিল সানন্দে ও গ্রহণ করল সকৃতজ্ঞে—কী সুন্দর এ ব্যবস্থা! সে ব্রাহ্মণ্য যুগ হয়ত আর ফিরবে না এ-বৈশ্য পরিবেশে। হয়ত এ-আদর্শকে আধুনিক বুদ্ধিবাদী বৈশ্য ব্যবস্থাবিধায়করা "ননসেন্স" বলতেও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু তবু মনে গৌরব হয় যখন ভাবি: প্রাচীন ভারতে মানুষ বিদ্যা দান ও গ্রহণ করতে পারত অর্থের সংস্রব সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে। আমেরিকায় বৈশ্য সভ্যতা আজ উঠেছে তার চরম শিখরে—তাই হয়ত এখানে বেশি ক'রেই মনে পড়ে ভারতের অভাবনীয় ধনবিরাগ—বনগমনোন্মুখ যুধিষ্ঠিরের নিঃসংশয় বাণী:

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য বরং বাহস্পর্শনং নৃণাম্"
পঙ্ক করি' পরশ যদি চাই প্রক্ষালন,
তাহার চেয়ে ভালো—না-করা পঙ্ক-পরশন।

তবে এ-ধরনের আদর্শবাদী যে ওদেশে একেবারেই নেই এমন কথা বলব না। সংখ্যায় তারা কম, তবু ওদেশেও আছে এমন্ বিদ্বান্ যারা বিদ্যার জন্যেই বিদ্যার আদর করে—তার অর্থকরী বিভূতির জন্যে নয়। এ-শ্রেণীর মহানুভব ভাবুকের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই আজ এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব। কী বলতে চাইছি তা পত্রটি থেকেই প্রতীয়মান হবে: লেখক—আমাদের পরিচিত অধ্যাপক ডাক্তার চার্লস মূর। হনোলুলু থেকে তিনি লিখেছিলেন ঠিক যে-সময়ে আমরা সানফ্রান্সিস্কো থেকে বিদায় নেব:

"I can well understand how you and Indira both want to be back in India. However, I hope you will realise, during your work, that you are doing a great service to the western world by bringing them into direct touch with the beauty and significance of Indian spirituality through your songs and Indira's dances. Yours is an extremely effective way of reaching the minds and souls of non-Indians who are desperately in need of such inspiration. Think only of the great benefit you are bestowing upon your audiences and perhaps the burden will be lighter. Remember also that your audiences throughout the western world are in dire need of the message of India which you are bringing to them."

* * *

না। একটু ভুল ব'লে ফেলেছি ঝোঁকের মাথায়: পুরুষরাও উচ্ছ্বাসী হয় বৈকি। মেয়েরা অবশ্য একটু বেশি সহজে উজিয়ে উঠতে পারে। হয়ত—কালিদাসের উপমায়—"সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা-"র ম'তই তারা কম্পনে আমাদের উচ্ছ্বাসকে পরাস্ত করতে পারে। অন্য ভাষায়, হিল্লোলে হয়ত আমরা হার মানব, কিন্তু কল্লোলে? কে না জানে সহজে যাদের অসুখ করে তাদের চেয়ে দশা বেশি সঙিন হয় যখন বলিষ্ঠ নেয় শয্যা? তেম্‌নি, পুরুষ স্বভাবে নারীর চেয়ে কম উচ্ছ্বাসী ব'লেই যখন বিচলিত হয় তখন সে-আলোড়নের ঢেউ পৌছয় বেশি গভীরে। অন্তত পুরুষ একথা ভেবে একটু সান্ত্বনা পেতে চায় এবং পেয়েও থাকে। তবে আসলে উচ্ছ্বাসে কার মূল প্রকৃতিতে কতখানি টান পড়ে তার পুরোপুরি হদিস পাওয়া ভার বৈকি।

ভার—মানি। কিন্তু তবু বলব—সংযমীর উচ্ছ্বাস-দমনের মধ্যে একটি বিচিত্র মাধুর্য আছেই। সেদিন বন্ধুবর ডেভিড ওয়েস্টন হাণ্টার যখন তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের বিশ মাইল রাস্তা পেরিয়ে বিমানে তুলে দিলেন, তখন বিদায়-সম্ভাষণে কী-ই বা বলা হ'ল? বন্ধু চকিতে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলেন—উদ্‌গত অশ্রু গোপন ক'রে। সানফ্রান্সিস্কো থেকে লস এঞ্জেল্‌সে উড়ে আসতে আসতে সমস্তক্ষণই মনে হয়েছে—হাণ্টারের মতন অতিসংযমীর চোখেও জল! আর যতবার মনে হয়েছে ততবারই সে-নিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসের স্মৃতি আমার উচ্ছ্বাসকে অনিরুদ্ধ করেছে। পরদিন হলিউডের হোটেলে পৌছে তাঁকে চিঠি লিখতে ব'সে আমার প্রবীণ নয়নও ঝাপসা হ'য়ে এল। এমন

নিঃস্বার্থভাবে দিনের পর দিন কে আমাদের স্নেহসঙ্গ দিয়েছে, অক্লান্তভাবে আমাদের বোঝা বয়েছে, আমাদের গান শুনেছে, ইন্দিরার নাচ দেখেছে, আমাদের সঙ্গে আমাদেরি শেখানো গান গেয়েছে, যেখানে বলেছি নিয়ে গেছে তার মোটরে—শুধু বলে নি তার নিজের কোনো কথা! মনে তার গভীর ব্যথা—সংযমের ঢাকনা-দেওয়া: একটি মাত্র দশ এগার বৎসরের মেয়ে—সেও লালিত হয় তার মাতামহীর কাছে, কারণ মা চ'লে গেছে—কেন, কোথায় বলেনি সে কোনোদিন, করে নি একটিবারও কোনো অনুযোগ কারুর নামে। আমরা জানিয়েছি আমাদের কত গভীর বেদনার কথা—আমেরিকা সম্বন্ধে, ভারত সম্বন্ধে, আশ্রম সম্বন্ধে, তথাকথিত আধ্যাত্মিক আড়ম্বরের সম্বন্ধে: সে শুধু শুনে গেছে—দরদ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা পেয়েছে ঠিক কোথায় আমাদের বেজেছে ও কেন। এই শোনাটা কম কথা নয় এ-দারুণ ব্যস্ততার দেশে। কিন্তু একদিনো ও অধৈর্য প্রকাশ করে নি। আমাদের বলেছে কত গভীর কথা খৃষ্টের বাণী সম্বন্ধে! ও ধ্যানধারণা করে নিয়মিত—রোজ ভোরে চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত। থিয়েটারে সুলভ উপার্জন ছেড়ে দিয়েছে বিলাসিনীদের দুর্নীতি দেখে। ধর্মভীরু মানুষ—অল্প উপার্জনেই সন্তুষ্ট। ওকে ভেবে খরচপত্র করতে হয়—বহুদিন থেকেই ও অতি মিতাহারী, নিরামিষাশী, বেশভূষা পরে অতি সাধারণ অথচ মুখে সে কী উজ্জ্বল সদাপ্রসন্নতা! একটি অপরূপ খাঁটি মানুষ দেখলাম। ইন্দিরা ওকে একটি চিঠিতে লিখেছিল পরে:

"It was a privilege to have met you—a person who is strong enough to do what he wants and get what he wants."

উত্তরে ও লিখেছিল:

'What a blessing to my life to have my path touch yours in this wondrous journey thru so vast a universe!......It makes the journey here not so hard as it was.........Tho when you say I am strong enough to do what I want and get what I want, I can only take it in the sense in which it is true of us all potentially...... Only when my will is like the sword in the hand of the Lord...... so identified, so surrendered—what other strength is there to mention! And Oh, what do I yet know of that!'

যখন সানফ্রান্সিস্কোয় এ-হেন পরম বন্ধুকে বিদায় দিলাম তখন ইন্দিরাতে আমাতে কেবলই বলাবলি করেছি যে হয়ত আর কখনো দেখাই হবে না

আমাদের। কিন্তু এই কথা মনে হয়েই যে আমার বুকে উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছিল তা নয়। মনে পড়েছিল বারবারই দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ "প্রবাসে" কবিতার দুটি চরণ :

"পরের দুঃখে কাঁদতে জানা—তাহাই ভবে চরম নয় :
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়।"

তবে মনে হয় ও আসবে পরে ভারতে। ও ইন্দিরাকে লিখেছিল ঐ চিঠিতেই :

'Do please write often and say more. To hear from you and your Dada touches the deep chords within and makes my spirit yearn to be with you again. I ask that that may be my lot and the way may open. Pray for me in your hour of prayer, my sister! And wherever you go in your wide and distant flight may the angels companion you and the blessing of the Holy One be a garment for you!'

## হলিউড

হলিউড! আমেরিকার সাক্ষাৎ হলিউড! শুনতে না-শুনতে মন চম্‌কে উঠে! সে বয়স আর নেই বটে যে-বয়সে হলিউড শব্দটিকে নিয়ে নাম জপ করতে করতে চোখে ধারা, অঙ্গে পুলক জেগে উঠে—কিন্তু বহুদিন থেকে শুনে আসছি তো! বলেঃ কোনো নাম বারবার উচ্চারণ করতে করতে মনে সে-নাম এক ধরনের মোহ ঘনিয়ে তোলে। হয়ত এ-মোহ পেয়ে বসত আমাকেও, কিন্তু নাঃ সে-ভয় আর নেই। ফাঁড়া কেটে গেছে।



লস এঞ্জেলস্ এ জন, লী ও ইন্দিরা

একথা বুঝলাম আরো যখন বন্ধুবর জন টমাস তজ্জায়া শার্লি ওরফে লী-কে নিয়ে এল বিমান ঘাঁটিতে ৪ঠা মার্চ বিকেল বেলা। আশ্রমে যখন জন গিয়েছিল তখন তার গালপাট্টা দাড়ি ছিল, তাই চিনতে বেগ পেতে হয়েছিল প্রথমটায়! যাই হোক্ ওদের মোটরে চ'ড়ে সোজা গেলাম ওদের মনোরম কুটীরে—"ঈগল রক ভিউ"-এ। কাছেই একটা প্রকাণ্ড সাদা পাথর। কুটীর থেকে

দৃশ্য সুন্দর। অপরূপ সূর্যাস্ত দেখলাম। সামনের পাহাড়ের শিখরে রাঙা রবি নামছেন পাটে! জন বলল, লী রোজ হলিউডে গান শেখে মহোৎসাহে। ছোটখাট কন্সার্টেও নাকি গায়। বছরখানেক এদের বিবাহ হয়েছে। এখনো প্রায় 'মধুচন্দ্র' চলেছে বললেই হয়। আশা করি এ-স্নেহপ্রবণ দম্পতির দাম্পত্য-সম্বন্ধ কালাতিপাতে অটুট থাকবে। তবে যে দেশ—ভয় হয় বৈকি!

ওখান থেকে চা-আদি জলযোগ ক'রে এলাম হলিউড ড্রেক হোটেলে। কনসাল আমাদের এইখানেই থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। সামনে প্রকাণ্ড রাস্তা হলিউড বুল্‌ভার—হলিউডের শ্রেষ্ঠ রাজপথ।

সেই আলো আলো আলো—আর কতরঙা আলো সে! মোটর মোটর মোটর—আর সে কত মোটর! দোকান দোকান দোকান—আর সে কী দোকানের পর দোকান! সর্বোপরি মোড়ে মোড়ে সিনেমা! অগণ্য বললে হয়ত একটু বেশি বলা হবে—তবে অজস্র বললে সত্যের অপলাপ হবে না—একথা নিশ্চয়। আমাদের ঘর সাততলায়। সামনেই পাহাড়, নিচে রাজপথ, আলোর উৎসব! শান্তি সহজলভ্য নয়—তবে স্বস্তি মারে কে!—বিশেষ যেখানে দেহের আরামের উপকরণ অন্তহীন?

* * * *

পরদিন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রভবানন্দ তাঁর প্রকাণ্ড কাডিলাক মোটর পাঠালেন। স্বামীজির সেক্রেটারি এক আমেরিকান ভদ্রলোক, নাম কৃষ্ণচৈতন্য। এ-সদাশয় মানুষটি স্বামীজির শুধু সেক্রেটারি নন, তার উপর সারথি। আমাদের নিয়ে গেলেন বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে আইভার অ্যাভেন্যুতে। রাস্তাটি বড়, রাজপথ থেকে একটু দূরে—এদেশের গলিই বলব। কিন্তু কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গলি! ঢুকতেই দু'ধারে ঝাউ গাছের বীথিকা—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বাঁ-ধারে বৈঠকখানা ঘর। পিয়ানো আছে একটি। যথাবিধি সুসজ্জিত আরামকক্ষ। তার পরেই লাইব্রেরি ঘর—সেখানে বিক্রয়ার্থে বই সাজানো থরে থরে। তার পরের ঘরটি স্বামীজির নিজের। চমৎকার ঘর। মাথার উপরে চাকা মতন ভেন্টিলেটর: গ্রীষ্মে শৈত্য বিতরণ করে, শীতে তাপ। একই যন্ত্রের এহেন বিকল্প স্বভাব আগে দেখিনি। আমাদের দেশে ভগবানে বিরোধ ও সত্য মিশে থাকে একাধারে, এ দেশে—ভেন্টিলেটরে।

স্বামী প্রভবানন্দ বয়সে আমার চেয়ে তিন বৎসরের বড়। এই আশ্রম এঁরই হাতে গড়া। ১৯৩০ সালে ইনি প্রথম আসেন লস এঞ্জেলস্-এ। এক

আমেরিকান ভক্তিমতী তাঁকে উপহার দেন তাঁর একটি কুটীর। এই কুটীরটিকে কেন্দ্র ক'রেই রামকৃষ্ণ মিশনের মস্ত উদ্যানবাটিকা তথা মন্দির। এই ভক্তিমতীর নাম দেওয়া হ'ল সিস্টার ললিতা। কয়েক বৎসর আগে ইনি দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন মিশনকে। ধন্য পুণ্যবতী! আমেরিকাকে যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক ব'লে কথায় কথায় বিদ্রূপ করেন তাঁদের মনে রাখা ভালো যে, এ-ধরনের পুণ্যবতী এখানে এ যুগেও মেলে এবং সাক্ষাৎ হলিউডের পরিবেশে।

এখন এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মঠও আছে ষাট মাইল দূরে! সেখানে নাকি কয়েকটি ব্রহ্মচারী থাকেন। এ ছাড়া একশো মাইল দূরে সুরম্য সান্তা বার্বারা নগরীতে শ্রীমার নামে সারদা কন্‌ভেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—স্বামীজির পৌরোহিত্যে। এ সবই স্বামীজি দেখালেন নিজে সযত্নে। সে-সব বলব যথা-পর্যায়ে।

* * *

স্বামীজির ঘরে যেতেই তিনি আলিঙ্গন্ করলেন। ছোটখাট মানুষটি, কিন্তু মঠাধ্যক্ষ হয়েও একহারাই রয়েছেন। বলিষ্ঠকায় নন তবে স্বাস্থ্যবান্ বলা চলে। ইনি নিজে হাতে বাগানে মাটি পর্যন্ত কোপান। শুনলাম বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক জেরাল্ড হার্ড এঁর সঙ্গে যখন প্রথম দেখা করতে আসেন (পরে এঁর কাছে ধ্যানের উপদেশ নেন) তখন ইনি মালীর বেশে মাটি কোপাচ্ছিলেন।

এ-কথা সে-কথা—ঠাকুরের কথা, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কথা—মন ভ'রে উঠল বাংলা বলতে পেরে। ইন্দিরার সঙ্গেও ইনি বাংলাতেই কথাবার্তা চালালেন। ইন্দিরা বাংলা বোঝে—মস্ত বাঁচোয়া।

খানিক পরে স্বামীজি নিয়ে গেলেন ঠাকুরের মন্দিরে। সুন্দর প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি চেয়ার পাতা। উপরে তিনটি বৈদ্যুতিক ঝাড় লণ্ঠন। সামনে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে পরমহংসদেবের ও শ্রীমার মূর্তি;—একটু নিচে স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের ছবি। স্বামী প্রভবানন্দ ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর নিজের ঘরে ব্রহ্মানন্দ ওরফে রাখাল মহারাজের একটি চমৎকার বড় ছবি আছে—আত্মভোলা ভগবদ্বিলাসী মহাপুরুষ—যাঁর বাণী প'ড়ে প্রথম অলডাস হাক্সলি সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে ঝোঁকেন।

মন্দিরে তখন চার-পাঁচটি আমেরিকান সাধক-সাধিকা ধ্যান করছিলেন।

সরস্বতী নাম্নী একটি সুদর্শনা আমেরিকান ভক্তিমতী নিরত ছিলেন আরতিতে। আমি ও ইন্দিরা গড় হ'য়ে ছবির সামনে প্রণাম ক'রে ধ্যানে বসলাম। শান্তিতে মন ভ'রে গেল। এমন গভীর শান্তি আমেরিকায় এসে পর্যন্ত পাইনি একদিনো। পরে ভোগ-নিবেদনের সময়ে আমরা উঠে এলাম।

রোজই এখানে এইভাবে ঠাকুরের পূজারতি নির্বাহিত হয়, পরে ভোগ। সর্বশেষে এই প্রসাদ আশ্রমের সবাই গ্রহণ করেন। আমরাও করলাম যথাকালে। ভাত, ডাল, কপির তরকারি, বেগুন ভাজা, শাক, আইসক্রিম—শেষে চা। আহা, রামকৃষ্ণ মিশনের খাওয়া যদি আমাদের শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে চালু হ'ত তবে প্রত্যহ সমতা রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'ত না আহারের সময়ে! না, যিনি যাই বলুন, খাদ্য যদি পরিবেষণ করতেই হয় তবে তার স্বাদ থাকলে লোকসানের চেয়ে লাভই বেশি। প্রত্যহ খেতে বসবার সময়ে মন্ত্র জপ ক'রে বসব—"যাই কেন না আসুক, প্রসন্ন মনে খাব—মনে এই বিপুল বল দাও প্রভু!"—এ ব্যবস্থার চেয়ে এখানকার ব্যবস্থাই ভালো। সরল সুস্বাদু আহার—ভোজনে বিলাস নেই তবে স্বাদনে তালব্য সুখ আছে। আহারে অসংযম নিন্দনীয়—মান্‌বো (কোন্ অসংযমই বা অনিন্দনীয়?)—কিন্তু তাব'লে আহারে প্রাত্যহিক কৃচ্ছ্রসাধন না করলে আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রশস্ত হয় না একথা স্বতঃসিংদ্ধবৎ গ্রাহ্য করা চলে না। যাক্।

* * *

সন্ধ্যা আটটায় মন্দিরে নিয়ে গেলেন স্বামীজি নিজে। আমাদের পেশ করলেন ঘরভরা শ্রোতাদের কাছে। বললেন মাত্র এক মিনিট: "এঁরা দুজনে এসেছেন ভারতের ভাবসঙ্গীত ও ভাবনৃত্য আপনাদের পরিবেষণ করতে। এঁদের কলাকারু বা গুণপনা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। তবে আনন্দ আপনারা প্রত্যক্ষভাবেই পাবেন।" তারপর মাটিতে ব'সে প্রথম আমার গান হ'ল ভাগবতী গীতি—সংস্কৃতে। পরে ইন্দিরা নাচল আমার গানের সঙ্গে মীরার একটি গান গাওয়ার পরেই। সামনেই ঠাকুরের মন্দির, গান গাইবার সময় ঠাকুরের ছবি দেখতে পাচ্ছি—এমন সুযোগ বিদেশে পাব কবে ভেবেছিলাম? গানান্তে বহু নরনারীর উচ্ছ্বাস। শেষে স্বামীজি মোটরে ক'রে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন আমাদের হলিউড ড্রেক হোটেলে।

* * *

পরদিন বিকেল পৌনে চারটের সময় এল ফের স্বামীজির মোটর: অলডাস

হাক্সলি ও ক্রিস্টফার ইশারউড মন্দিরে আসবেন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে।

আশ্রমের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলাম সানন্দেঃ কতদিন থেকে আমি অলডাসের ভক্ত। এযাবৎ তাঁর যতগুলি বই বেরিয়েছে প্রত্যেকটি পড়েছি—অনেক বই-ই দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে! সেই অলডাস হাক্সলি আসবেন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে—আনন্দ হবে না? আমি কানে কম শুনি—তাই স্থির হ'ল অলডাস হাক্সলির পাশেই বসব এক আসনে।

যথাকালে এলেন অলডাস, সঙ্গে ইশারউড। ইশারউডের কথা পরে বলব। আগে বলি অলডাসের কথা—যাঁর সঙ্গে প্রথম পত্রালাপ হয় সে কবে—১৯৪২ সালে!

এত দীর্ঘকায় অলডাস! ছ'ফুট ছাড়িয়ে গেছে যে! একহারা ও দোহারার মাঝামাঝি। পরনে ছাইরঙের স্যুট। আমি গিয়েছিলাম পীতবাস প'রে—একেবারে বাঙালি বাবুটি—খাসা ধুতি পাঞ্জাবি—এখানে এ-বেশে আমাকে বেকায়দা করে কে? কে বলে এদেশে ধুতি অচল! সাহস বেড়ে গেছে। কাল মন্দিরেও গান গেয়েছিলাম তো ধুতি প'রে! ঠেকায় কে যদি রোজই ধুতি পরি? হয়ত পরব পরে—কে বলতে পারে! সাহসও তো ব্যসনের মতনই—দেখতে দেখতে বেড়ে যায়, নয় কি?

অলডাসের একটি চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—অন্য চোখটিও ঘোলাটে—হরিতাভ। অথচ মনে হয় এককালে চোখ দু'টির বাহার ছিল। ঈষৎ নতদেহ—"Writer's stoop" যার নাম।

কিন্তু কী চমৎকার ব্যক্তিরূপ—পার্সনালিটি!

Greatness শব্দটির বাংলা প্রতিরূপ নেই—মহত্ত্ব কথাটির ব্যঞ্জনা একটু আলাদা। অলডাস হাক্সলিকে দেখলে 'গ্রেট' উপাধি দিতে মন এতটুকু ইতস্তত করে না। ইন্দিরা তো মুগ্ধ হয়ে গেল। বললঃ "What a sensitive face, and what refinement!—great!" আমি বললামঃ "আর লক্ষ্য করবার বিষয়—কী ঔৎসুক্য!" আমরা কত কথাই যে বললাম দুজন মিলে! ইন্দিরা বলল জাপানের কথা, জাভা নৃত্যের কথা, আমেরিকান বৃদ্ধাদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অবোধ ঔৎসুক্যের কথা, আবালবৃদ্ধবনিতার দিনের পর দিন বক্তৃতা শোনার কথা—আরো কত কী অলোচনাই করল যে সে অলডাস হাক্সলির সঙ্গে! তার প্রত্যক কথাটি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। কথা বলতে একটুও

ব্যস্ত নন মানুষটি, বলতেও পারেন, শুনতেও জানেন। ক'জন নামজাদা মানুষ অপরের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন শুনি? মুস্কিল হ'ল এই যে তাঁর আসনের এপাশে আমি ওপাশে ইন্দিরা বসাতে যখন তিনি ইন্দিরার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলছিলেন তখন আমার বুঝতে বেগ পেতে হচ্ছিল। যাহোক খুব কাছ ঘেঁষে বসেছিলাম ব'লে টাল সামলে নিলাম।

তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা কথা। আমি বললাম আমাদের গানের সুরবিহারের কথা, হার্মোনিয়াম কেন সমর্থনীয়, আমাদের বীণায় মিড় কী বস্তু, আমাদের সঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের স্থান কোথায়, গুরু নানকের বাণী—আরো কত কী।

অলডাস শুনলেন প্রতি কথাটি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে। একটিবারও আমাদের কথার মধ্যে কথা কন নি। অথচ যখনই জবাব দেবার জবাব দিলেন, বক্তব্য প্রকাশিত হ'তে না হ'তে মন্তব্য প্রকাশ করলেন, কখনো বা রসিকতা। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন যেন লস এঞ্জেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আমাদের ভারতীয় নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করি। গুরু নানক ও মীরাবাই সম্বন্ধে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। ইন্দিরার নানা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁকে সানফ্রান্সিস্কো থেকে যে কাগজপত্র সেদিন পাঠিয়েছিলাম সেগুলি তাঁর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছে ব'লে বললেন: "আরো কিছুদিন রাখতে পারি কি লেখাগুলি?"

আমি শুধালাম তাঁকে—গুরু নানকের কথা তিনি কিছু জানেন কি না। অলডাস বললেন: না। তখন ইন্দিরা তাঁকে বলল গুরু নানক সম্বন্ধে অনেক কথা। অলডাস আগ্রহ প্রকাশ করলেন তাঁর বাণী সম্বন্ধে। ঠিক হ'ল একদিন আমরা তাঁর ওখানে যাব গুরু নানক ও মীরার কথা বলতে।

অলডাস হাক্সলি অনেক লোকের মাঝে বেশি কিছু বললেন না—আমাদের কথাবার্তা ও নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই যেন ক্ষান্ত হ'তে চাইলেন। তবে দুটি গল্প বললেন মজার। বলি।

আলোচনা হচ্ছিল কথা বলা সম্বন্ধে। অলডাস বললেন যাঁরা বেশি কথা বলেন তাঁদের কী ভাবে কথায় পেয়ে বসে। বললেন, ওয়েব্‌স্টার (কবি ওয়েব্‌স্টারই হবেন) মৃত্যুকালেও একগাদা কথা বললেন: এ করতে পারি, তা করা উচিত, ইত্যাদি। শেষটা বললেন: "Have I said anything which is unworthy of Webster? And then he died." ঘর ভরা লোক—পাঁচটি মহিলা ও আমরা ছয়-ছয়টি পুরুষ—সকলের মিলিত হাস্যে ঘরের বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠল।

কথায় কথায় আমি বললাম: "আপনার উচ্চারণ বুঝতে পারি কানে খাটো হওয়া সত্ত্বেও, কিন্তু আমেরিকান উচ্চারণ বুঝতে বেগ পেতে হয়। আমার দুর্ভাগ্য।"

অলডাস বললেন: "উচ্চারণ-ভঙ্গির পার্থক্যে কত রকম মুস্কিলে পড়তে হয় শুনবেন? প্রথম যুদ্ধের সময় ট্রেনে চলেছি আমি ও আমার এক বন্ধু। আমরা নিচু স্বরে বলাবলি করছি, একজনকে তার করতে হবে। সামনে ব'সে ছিল এক ল্যাঙ্কাশায়ারবাসী। সে সিদ্ধান্ত করল আমরা জর্মনির গুপ্তচর, জর্মন বলছি চাপা স্বরে। আমাদের উপর সে উঠল চড়াও হয়ে অথচ না পারি আমরা তার অভিযোগ বুঝতে—না পারে সে আমাদের সাফাই ধরতে।" ঘর ভরা লোক ফের হেসে উঠল।

বলতে ভুলেছি: অলডাস কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করলেন আমাদের বীণার স্বরবিহারের আর অজন্তার ছবির।

কথাবার্তার শেষে গাত্রোত্থান করার সময়ে অলডাস বললেন আমাদের হোটেলে টেলিফোন করবেন—তাঁর ওখানে নিরালায় ফের আলাপ হবে।

বিদায় নেওয়ার সময়ে ক্রিস্টফার ইশারউডকে বললাম যে তাঁর চারটি বই পড়েছি: Prater Violet, The Last of Mr. Morris, Good bye to Berlin ও গীতার ইংরাজি অনুবাদ। বললাম: "আপনার সঙ্গে বেশি কথা হ'ল না, আমি ওঁকেই চর্চা করতে ব্যস্ত ছিলাম—"

"তা তো বটেই—চর্চা করবার মতনই তো লোক উনি।"

"তা বটে, কিন্তু আপনার সঙ্গেও একটু কথা কইতে চাই।"

"নিশ্চয়। টেলিফোন রয়েছে। ব্যবস্থা করা শক্ত হবে না।"

হোটেলে ফিরে এসেই কলম ধরলাম—যা পারি টাটকা টাটকা লিখে তো রাখি—যদিও এবার অলডাস হাক্সলির সঙ্গে ঠিক কথোপকথন বলতে যা বোঝায় তা হয় নি। ঘরভরা লোক থাকলে কি আর মনের কথা বলা যায় মনের মতন ক'রে?

তাছাড়া নিজের দিকে চেয়ে একটু চমকে উঠলাম বৈকি: দিলীপ আর সে দিলীপ নেই তো! প্রথমতঃ কানে সে কম শোনে—দ্বিতীয়তঃ, নিজেও কিছু বলতে চায়—জানাতে চায়—তৃতীয়তঃ, অপরকে সে আজ সমান শ্রদ্ধা করলেও যেন যার তার কাছে ধরা দিতে চায় না। এটা ভালো পরিণতি না মন্দ—কে বলবে?

যাই হোক অলডাস হাক্সলির সঙ্গে দেখা করার পরে যে রেশটি মনের মধ্যে র'য়ে

গেল তার সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। তবে যদি বলি মন খুশি হয়ে উঠল অনেক দিন বাদে একটি মানুষের মতন মানুষ দেখলাম ব'লে, যার মধ্যে বিদ্যা, ভদ্রতা, ঔৎসুক্য, রসিকতা ও স্বচ্ছন্দ আলাপবৃত্তির সমাবেশ বিচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে —আর তার পৌরোহিত্যে ব্রতী একটি বলিষ্ঠ মানুষের সুন্দর ও মনোজ্ঞ বিকাশের পরিমণ্ডল, তাহ'লে হয়ত খানিকটা বলা হবে কী ধরনের অনুভব এই মানুষটির সঙ্গে ঘণ্টা দেড়েকের সংস্পর্শে মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছিল ৬ই মার্চ তারিখে হলিউডের সান্ধ্য পরিবেশে।

* * *

৭ই মার্চ সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন হলে স্বামী প্রভবানন্দ আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন 'শ্রীঅরবিন্দ ও অমর জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। সুন্দর হলটি। বহু শ্রোতৃবৃন্দ ব'সে শুনল ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে আমার গান ও পরে বক্তৃতা। সর্ব শেষে বললেন বিখ্যাত জেরাল্‌ড হার্ড। সে-কথা যথাস্থানে।

প্রভবানন্দ প্রথম বললেন আমার পিতৃদেবের কথা। উদ্ধৃত করলেন তাঁর বিখ্যাত "নূতন কিছু করো" হাসির গানটির দুলাইন ঃ

কিম্বা সবাই ওঠো টাউন হলে জোটো
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো।

স্বামীজি সরস ঢঙে মন্তব্য করলেন ঃ "দিলীপকুমারের পিতৃদেব হয়ত এ লাইন দুটি লিখতেন না যদি তিনি জানতেন তাঁর পুত্রের ললাটলিপি, অর্থাৎ এ-দুরন্ত কাজটির ভার তাঁর স্কন্ধেই পড়বে, হিন্দু ভাবধারা সম্বন্ধে আমেরিকায় তিনি আসবেন হিন্দুধর্ম প্রচার করতে না হোক চমকপ্রদ কিছু করতে—শিষ্যার নৃত্যের সঙ্গে নিজে গুরুরূপে গাইতে।"

ঘর হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

আমি প্রথমে "কৃষ্ণ বন্দনা" গাইলাম ভাগবত থেকে ঃ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

তারপর সুরু করলাম। বললাম এক ঘণ্টা পনরো মিনিটেরও উপর। কিন্তু ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা ছিল আপূর্যমান—অচলপ্রতিষ্ঠ। অদূরে পরমহংসদেবের ছবি—তার সামনে জ্বলছে বর্তিকা, গন্ধ বিতরণ করছে ধূপ, মন নির্মল আবেগে ভ'রে উঠল। যা বললাম তার মাত্র সারমর্মটুকু দেব, কারণ সব কথা লেখা সম্ভবও নয়—মনেও নেই।

বললাম: "প্রথমেই বলি, আমি বলব অমর জীবন বা অমৃত-হওয়ার সম্বন্ধে। ইংরাজিতে immortality শব্দটির নানা ব্যঞ্জনা আছে। তেমনি আমাদের "অমৃত"। অমৃত বলতে বোঝায় সেই সুধা যা পান ক'রে দেবতারা দেবত্ব পদবী অর্জন করেছিলেন। অসুর অমৃতের স্বাদ পায়নি—পেলে হ'ত দেবতা। তা'হলে এ-জৈবলীলার পত্তন হ'ত না। মানুষ অমৃতকে ডরায়—চায় না দেবত্বকে করায়ত্ত করতে—বলে: মানুষ আছি এই তো বেশ—দেবতারা আমাদের মাথায় থাকুন। মানুষের এ-অমৃতভীতি তথা মর্ত্যজীবনের-তুচ্ছতাবরণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বড় গভীর কথা লিখেছেন তাঁর সাবিত্রীর শেষ উল্লাসে:

Heaven's call is rare, rarer the heart that heeds ;
The doors of light are sealed to common mind...
Only in an uplifting hour of stress ;
Men answer to the touch of greater things :
Or raised by some strong hand to breathe heaven-air,
They slide back to the mud from which they climbed...
To be the common man they think the best,
To live as others live is their delight.

ডাকে স্বর্গ কয়জনে ? অভিসারী কয়টি হৃদয় ?
জ্যোতির তোরণ রয় রুদ্ধ গণমনের সম্মুখে
বেদনার ঊর্ধ্বমুখী উত্তরণ-লগ্নে শুধু নর
সাড়া দেয় মহত্ত্বের নিমন্ত্রণে—কিম্বা কভু কোনো
বলিষ্ঠ ধারয়িতার টানে উঠি', করিয়া গ্রহণ
স্বর্গের নিশ্বাস-বায়ু, পরক্ষণে পড়ে সে গড়ায়ে
ফিরে পঙ্কে—যেথা হ'তে উত্তীর্ণ সে হয়েছিল। দিন
যাপে সাধারণ জীব সম: সকলের জীবনের
দৈনন্দিন ছন্দ করে শ্রেয়ঃ বলি' সানন্দে বরণ।

"এমনিই হয়—তাই তো আমরা ডরাই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবকে বরণ করতে। কে জানে কিসে কী হয় ? সামান্যকে অভিনন্দন করার কর্মফল—অসামান্যে আস্থা হারানো। অমৃতে আমাদের জন্মস্বত্ব একথা কবি-কল্পনা নয়। কেবল একটি সর্ত আছে সুধালাভের: চাইতে হবে, চাইতে হবে—আর সে একটু আধটু চাওয়া নয়—তনুমনপ্রাণ উৎসর্গ ক'রে চাওয়া। তবেই আমরা পারব বলতে বড় গলা ক'রে যে আমরা 'অমৃতের পুত্র'।

"কিন্তু আমরা চাওয়ার ম'ত চাইতে ডরাই, তাই স্বল্পসুখী মনকে সান্ত্বনা দিই এই ব'লে যে 'স্বল্পের পসারী হওয়াই ভালো—নৈলে দেউলে হবার ভয়, বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়—র'য়ে স'য়ে।' কিন্তু হায়রে, নিরাপদ-পন্থীর আপদ ঠেকায় কে? তাই না আজ বিশ্বব্যাপী হাহাকার—অশান্ত কাড়াকাড়ির ফলে যখন বাঞ্ছিত ধন হয় করায়ত্ত তখন দীর্ঘশ্বাসই হয় সম্বল : যা কিছু চেয়েছি ভুল ক'রে চাই—যাহা পাই তাহা চাই না।

"আরো দুঃখ এই যে, যে-কতিপয় অমৃতের পুত্র আমাদের কাছে এসে অমৃতের বাণী শোনান তাদেরো আমরা ভুল বুঝি, যার মূলে আছে এই অনাস্থা—অমৃতে অবিশ্বাস। তাই তো বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—

"Hard it is to persuade earth-nature's change ;
Mortality bears ill the Eternal's touch...
It meets the sons of God with death and pain...
Their sun-thoughts fading, darkened by ignorant minds,
Their work betrayed, their good to evil turned,
The cross their payment for the crown they gave.

পার্থিব স্বভাব সে তো সহজে চাহে না রূপান্তর ;
মরতা সহিতে আজো পারে না যে স্পর্শ অমরার···
দেবতার দূতবৃন্দে দেয় সাজা মৃত্যু বেদনার,
সূর্য্যচিন্তা তাঁহাদের হয় কালো অজ্ঞান মানসে,
দেবকর্ম হয় ব্যর্থ, মঙ্গলের সমাপ্তি অশুভে,
মুকুট-বরদাতার শূলদণ্ডে হয় ঋণশোধ।

"তাই তো যেদিকে কান পাতি শুনতে পাই বিলাপ নয় প্রলাপ। বিলাপী বলে : অমৃতের বাণী কাব্যকথা, ছায়াজল্পনা ; প্রলাপী বলে : অনিত্যের কোলে যার জন্ম তার অবসানো সেখানে।

"কিন্তু এই কথাই যদি জ্ঞানের চরম বাণী হ'ত তবে যুগে যুগে এ-অনিত্যের শ্মশানপুরীতে নিত্যবস্তুর কীর্তন গাইতে আসতেন না কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, সক্রেটিস, খৃষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি, রামদাস। মানুষের চরম ও পরম বিচার তার গড়-পড়তা রূপে নয়—তার শ্রেষ্ঠ বিকাশে :

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।

শ্রেষ্ঠ মহাজনগণ করেন যে পন্থা-প্রবর্তন।
প্রামাণ্য তাহাই—চলে সে-পথেই জনসাধারণ।"

আমি আরো অনেক কথা বললাম শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, আইরিশ কবি এ-ই সম্বন্ধে, শ্রীঅরবিন্দের নানা লিপি সম্বন্ধে—আরও কত কী! সবশেষে বললাম: "হয়ত অবান্তর কথা অনেক এসে গেল। আমি না বক্তা, না দ্রষ্টা; কাজেই ভগবান্ সম্বন্ধে আমার হয়ত কোনো কথাই জোর ক'রে বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে আসিনি উপদেষ্টা হ'য়ে, এসেছি আপনাদেরই একজন হ'য়ে। আমি ভগবদ্দর্শন করি নি, তবে এটুকু যদি বলি, তা হ'লে আশা করি আপনারা ভুল বুঝবেন না যে, আমি ভাগবত-প্রধানদের অনেককেই দেখেছি ও পেয়েছি তাঁদের আশীর্ব্বাদ। ভাগবতে বলেছে যদি ভগবানে ভক্তি চাও তবে আগে গ্রহণ করো সাধুর পদধূলি, করো তাঁদের স্মৃতিপূজা। আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য মন্দিরে আমার এইটুকুই বলবার যে, তাঁর দর্শনলাভের ভাগ্য আমার হয়নি বটে, কিন্তু পেয়েছি তাঁর মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের তথা শ্রীমা সারদামণির পদধূলি, পেয়েছি শ্রীঅরবিন্দের বরাভয় স্পর্শ, পেয়েছি শ্রীরমণ মহর্ষির করুণা, শ্রীরামদাসের আশীর্ব্বাদ! তাই আজ আমি এসেছি আপনাদের কাছে নিবেদন করতে: এ-সব মহাপুরুষের প্রসাদে কী সম্পদ লাভ করা যায়। আর এই সম্পদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বর হ'ল অমৃতে শ্রদ্ধা। বলবেন কী এই হিংসাগরল যুগে এ-শ্রদ্ধার দাম কম?"

আমার বক্তৃতা শেষ হ'লে জগদ্বিখ্যাত মনীষী ও সাধক জেরাল্ড হার্ড উঠে করলেন আমার ভাষণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ প্রশস্তি। পরে আমি তাঁকে একটি চিঠিতে লিখলাম: "আপনি সেদিন যে সমাপ্তি-ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেটির সব কথা আমি ধরতে পারিনি। যদি একটু লিখে জানান তবে কৃতজ্ঞ হব।"

উত্তরে ১০ই মার্চ তিনি আমাকে লিখলেন স্বহস্তে:

"You were kind enough to ask that I would write out for you the unpremeditated reaction that I feel sure affected your audience last Sunday. It was a privilege to meet you and I am grateful that anything I have written may have been found by you stimulating.

With homage,
Gerald Heard.

যে-বাণীটি তিনি স্বহস্তে লিখে পাঠালেন সেটি এই :

"We have just had the privilege, and a rare one, of being present at a performance given by a master of the ancient art and the original tradition in which music, poetry, discourse and commentary, personality and spontaneity, the jewels of the ancient wisdom and flowers of a contemporary courtesy are combined. After such an experience, estimation of the elements that have so blended is impossible. And indeed to attempt to analyse such richness is not to heighten what has happened but to distract us from that mood of contemplation which it is the aim of such skill to produce in us. After a rich repast it is impertinent and, indeed, absurd to read over the menu again and try, by words, to recall the flavour not merely of each dish but of each ingredient. Now is the time for appreciative digestion. We bow in grateful silence before the Silence from which springs all thought, all feeling and all sound and sight and to whom our wayward and noisy natures have been brought back again by the multiform and, in the exact sense, inestimable gifts of Its messenger who, this morning has permitted It to sound through him."

সেদিন বিকেলে স্বামী প্রভবানন্দ এলেন আমাদের হোটেলে তাঁর মোটরে। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখতে গেলাম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি মঠ। হলিউড থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে এই শৈলাবাসটি গ'ড়ে তুলেছেন জেরাল্ড হার্ড ও স্বামীজি দুজনে মিলে। কী অপরূপ যে এর অবস্থান! চারিদিকে শ্যামল বীথিকা, অদূরে পর্বতমালা। এই সেদিনও নাকি এখানে তুষারপাত হয়েছে। হলিউডের চেয়ে এখানে শীত বেশি। স্বামীজি ঘরে আগুন জ্বালতে বললেন।

শকুন্তলায় পড়েছিলাম সে কবে—"শান্তরসাস্পদমিদমাশ্রমম্।" সত্যিই শান্ত সমাহিত নির্জন স্থানটি। স্বামী বিবেকানন্দ যখনই কোনো মনোজ্ঞ নিস্তব্ধ স্থান দেখতেন বলতেন: "ধ্যানের পীঠস্থান বটে!" এ-শৈলাবাস সম্বন্ধেও সেই কথা। বলিষ্ঠ মঠ বলতেই হবে। ঠুন্‌কো কিছু নেই। ছয়টি আমেরিকান ব্রহ্মচারী এখানে থাকেন—স্বামী অশোকানন্দকে নিয়ে সাতজন। স্বামী প্রভবানন্দ এখানে আসেন মাসে দুবার ও প্রতিবারেই এসে দুতিন দিন ক'রে থাকেন।

রাতে এ-মঠের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদীপালোকিত মূর্তির সামনে ব্রহ্মচারী কয়জন গাইলেন একটি বাংলা স্তব। আমেরিকান ও বাঙালি উভয় জাতির কণ্ঠস্বরে স্তবটি বড় চমৎকার শোনালো ঐ শান্তিগম্ভীর আবহের মধ্যে।

খানিকক্ষণ ধ্যান হ'ল, স্বামী প্রভবানন্দ আরতি করলেন—রমণীয় পরিচ্ছন্নতার পরিবেশে। রামকৃষ্ণ মিশনের সব অনুষ্ঠানের মধ্যেই দেখতে পাই এই সজাগ পরিচ্ছন্নতা। মালিন্য, অনাচার, ক্লেদ, আড়ম্বর প্রভৃতি বাহ্য ও অবাঞ্ছনীয় নানা রীতিকে বাদ দিয়ে এঁরা রেখেছেন সেই সব শাস্ত্রীয় পদ্ধতি যা যুক্তিবাদী মনকেও আঘাত দেয় না, কেন না সব জড়িয়ে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে নিটোল, সুন্দর। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম বিশেষ ক'রে জেরাল্ড হার্ডকে, কারণ শুনলাম এ-বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে তিনিই এ-মঠটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকায় ধর্ম ও খাঁটি আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠায় ক্রিস্টফার ইশারউড, অলডাস হাক্সলি ও জেরাল্ড হার্ডের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সাধুদের স্তবগানের পর আমি গাইলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রিয় গান: "নিবিড় আঁধারে মাগো, চমকে অরূপ রাশি।"

সব শেষে মঠের সরল ও সুস্বাদু ভোজ্যের সদ্ব্যবহার ক'রে মোটরে ফিরে এলাম হোটেলে। হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, পথে যে কী অজস্র কমলা-লেবুর বাগান দেখলাম! থোপা থোপা ফ'লে রয়েছে রাঙা ফল! ওরা যাই করে অজস্রের আমদানি না ক'রে ছাড়ে না! ধন্য অনলসতা! কুবের হয়েছে কি এরা সাধে?

* * * *

মাদাম রুথ সেণ্ট ডেনিসের নাম শুনেছিলাম—ভারতীয় নৃত্যের প্রচারে যিনি এদেশে বহু শ্রম স্বীকার করেছেন। এখানে একটি নাকি নৃত্যের স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহদাশয়া বলতেই হবে। কেন না আমাদের না চিনেও ইনি সংবর্ধনা করতে এগিয়ে এলেন তো! আমরা এঁকে একটি চিঠি পর্যন্ত লিখিনি—লেখবার কথা মনেও হয় নি। এঁর সুরম্য উদার নৃত্যকক্ষে ইনি নিমন্ত্রণ করলেন বহু গুণিমানিশিল্পীকে। শুধু তাই নয় তাদের চর্ব্য চুষ্য না হোক লেহ্য পেয় দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। এ-আক্রাগণ্ডার দেশে এতে নিশ্চয় এঁর বেশ দুপয়সা খরচ হয়েছিল।

কিন্তু শুধু খরচের জন্যেই নয়। ইনি আমাদের সমাদর করতে এগিয়ে

এলেন এম্‌নিই নিঃস্বার্থভাবে যে মুগ্ধ হ'তে হ'ল বৈকি! শুধু তাঁর ওখানে গুণীদের ডাকার জন্যেই নয়, আমাদের সঙ্গে অপরিচয় সত্ত্বেও যে-ঔদার্যের সঙ্গে আমাদেরকে তাদের কাছে পেশ করলেন তার জন্যে কৃতজ্ঞ না হ'য়ে উপায়? আমার গান ও ইন্দিরার নাচের পরে তুমুল করতালি থামলে মাদাম ডেনিস বললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে:

"আমি বহুদিন ধ'রে এদেশে ব'লে আসছি যে নৃত্য ও গীত হ'তে পারে ভাগবত পূজার অর্ঘ্য। আজ সেকথা প্রমাণ হ'ল দিলীপকুমারের গানে ও ইন্দিরা দেবীর নৃত্যে। আমার নৃত্যসভা আজ সার্থক হ'ল। আমি জন দি ব্যাপ্টিস্ট-এর মতনই যেন এতদিন এ-বধির অরণ্যে ঘোষণা ক'রে এসেছি ভারতীয় গুণীর ভাবী অভ্যাগম-সংবাদ। তাঁরা আজ এসেছেন অবশেষে। আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।" ইত্যাদি আরো অনেক সুন্দর মর্মস্পর্শী কথা।

স্বামীজির সেক্রেটারি বললেন: মাদাম ডেনিস সারা য়ুরোপে বহুদিন ধ'রে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর নৃত্যের আসর ক'রে এসেছেন বিদ্বান্ তথা রসিকের সভায়। ভারতের প্রতি এঁর শ্রদ্ধা আন্তরিক ও গভীর। তাই মনে হয় আমাদের সম্বন্ধে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তাতে উচ্ছ্বাসের ক্ষণভঙ্গুর ফেনিলতা মাত্রই ছিল না।

আমি এ-সভায় একটি ছোটখাট বক্তৃতা দিলাম। কবীর, মীরা, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির ভজন ও স্তব সম্বন্ধে যা কিছু মনে এল বললাম। মীরাবাইয়ের 'চাকর রাখো জি' গানটি গাইবার আগে তার অনুবাদ প'ড়ে শোনালাম। শেষে বললাম: "সানফ্রান্সিস্কোয় আসতে না-আসতে আমাকে কেউ কেউ বলেছিলেন আমেরিকায় সাফল্যের টিকা অর্জন করতে হ'লে প্রাণপণে আত্ম-গুণগান করতে হবে নানাছলে। ধর্না দিতে হবে প্রেসের ধনুর্ধরদের কাছে, টেলিভিসনের কাছে, রেডিওর শাস্ত্রীদের কাছে। আমি তাঁদের ব'লে এসেছি যে, বয়স যতই বাড়ে মানুষের পক্ষে ততই কঠিন হ'য়ে ওঠে নিজের স্বভাবের ভোল বদলানো। তার উপরে আমি এদেশে আসিনি নিজের কীর্তির জয়ঢাক পিটতে। যদি দরদী ও গুণগ্রাহী মানুষ পাই গাইব যা পারি, বলব যা মনে আসে। যদি না পাই, ফিরে যাব—মনে কোনো খেদ না রেখে। কিন্তু সূর্য যখন পাটে নামে তখন মনের তীব্রাভ উচ্চাশাগুলি হয়ে আসে ছায়াভ। সস্তা হাততালি বা জয়ধ্বনি কুড়োতে আমি আসিনি এদেশে। এ-কথায় তাঁরা

ভেবে চিন্তে। আমাদের তিনি বলেছেন যে, একদিন এ-সব গান ঘরে ঘরে গীত হবে। এরকম কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা যে এ-যুগেও হয় ভাবতে ভালো লাগে বটে, কিন্তু আশ্চর্য লাগে তার চেয়েও বেশি।"

অলডাস বললেন: "কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? কোনো বৈদেহী আবির্ভাব হয় কোনো perfection—পূর্ণতা-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তো? তা যদি হয় তবে আর্টের মাধ্যমে তো একাজ সহজতরই হবে—যেহেতু গানের শক্তি কথার চেয়ে বেশি।"

কথাটা ঠিক এদিক দিয়ে ভেবে দেখি নি। তাই হয়ত মন আরো খুশি হয়ে উঠল। ইন্দিরাও ভরসা পেয়ে যেন উজিয়ে উঠল। বলতে লাগল কেমন ক'রে গানের উপক্রমণিকা থেকে মীরা প্রথম নানা কথিকার ( parable ) আদি পর্বে অবতরণ করলেন—যেগুলি শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু শেষে বলল: "দাদার সঙ্গে আমার এক জায়গায় মিলে না। অবশ্য তিনি আমার গুরু, চান এ-সব প্রকাশ করতে, যাতে অপরে জানে ও এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে শেখেও কিছু কিঞ্চিৎ। কিন্তু আমার মনে হয় এ-সব ইতিহাস প্রকাশ করা উচিত নয়।"

আমি তাঁকে সালিসী মেনে বললাম: "আচ্ছা বলুন তো, অনুচিত হবে কেন? আমরা সচরাচর ফালতো কথারই কারবারী হ'য়ে পথ চলি মানি, কিন্তু বাঞ্ছনীয় বলব কাকে? তুচ্ছ কথার বেসাতি ক'রে অনিন্দনীয় ভাবে কাল কাটানো? না, লোকে কী ভাববে না-ভাববে সে পরিণাম-চিন্তা ছেড়ে গভীর সুরে গভীর কথা বলা—মানে যদি পারি অবশ্য? কী বলেন আপনি?"

অলডাস একটু যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন এ প্রশ্নে। বললেন: "আমি ঠিক ধরতে পারছি না—এ-সব কথা প্রকাশ করা অন্যায় কেন? কোনো লেখক তাঁর বইয়ে গভীর কথা লেখেন কেন? অন্ততঃ কয়েকজন মনের মানুষ মিলবে যারা সাড়া দেবে—এই আশায়ই তো?"

ইন্দিরা বলল: "কিন্তু ক'জন সাড়া দেয়? অধিকাংশই যে করে অবিশ্বাস।"

অলডাস বললেন: "করলই বা। দু' চারজন তো সাড়া দেয়। অবশ্য কেউই যদি সাড়া না দিত তাহ'লে সেটা ভাববার কথা হ'ত। তবে সেরূপ ক্ষেত্রে কেই বা কিছু লিখতে যেত বলুন?"

আমি বিজয়ী হাসি হেসে ইন্দিরাকে বললাম: "এবার? উনি তোমার দিকে নন, দেখলে?"

অলডাস অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন মীরার আবির্ভাবের কথা। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শুনলেন ইন্দিরার ইতিবৃত্ত—মীরার জীবনী—তাঁর মন দিয়ে এ-সব কাহিনী শোনাতে মনটা আমাদের কী যে আশ্বস্ত হ'ল!

আশ্বস্ত হবার একটু কারণ আছে। আধুনিক মনের পৌরোহিত্য করে বুদ্ধি—মানে, চলতি মনের ঘরোয়া যুক্তিজাল। কিন্তু অতিপ্রাকৃত ঘটন, অলৌকিক আবির্ভাব বা দৈববাণী-বর্গীয় অঘটনকে যাচাই করার সময়ে এ-চলতি যুক্তি পড়ে অথই জলে—যেমন গুরু নানকের ভাষায়, স্থলযান পড়ে জলের এলাকায়। তাই ইন্দিরা ও আরো অনেকে আমাকে বলেছে যে, আমরা যে-ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি সে-সব বাইরে প্রকাশ না করাই ভালো, যেহেতু বললে সুফল ফলবার সম্ভাবনা কম। কথাটা ভাববার। কারণ, মানুষ আর যাকেই বিশ্বাস করুক না কেন, পণ্ডশ্রমকে যথাসাধ্য পরিহার করতেই চায়। তাই যখন হঠাৎ চোখে পড়ে যে, এ-সব ঘটনাকে প্রকাশ করার ফলে কেউ কিছু পেল বা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল অলৌকিক আবির্ভাবকে—তখন মনে হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে এ-সব প্রকাশে কুফল ফললেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সুফলও তো ফলে। কুফল দিনাতিপাতে ক্ষ'য়ে যায়। সুফল দীর্ঘজীবী। তাই মন খুশি হয়েছিল এ-ক্ষেত্রে।

* * *

ঘণ্টা দুই বাদে যখন উঠতে চাইলাম অলডাস-দম্পতি ধরলেন আর একটু থাকুন। কফি খাওয়ালেন। তারপর কেবল করতে লাগলেন প্রশ্নের পর উৎসুক প্রশ্ন। সব শেষে ইন্দিরাকে মিসেস হাক্সলি বললেন: "আপনারা এসেছেন আমাদের জীবনের একটি বিশেষ লগ্নে—খুব দরকার ছিল আপনাদের আসার। ফের কবে আসবেন? আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই নানকের বাণী। কবে?"

ঠিক হ'ল এক সপ্তাহ বাদে—১৮ই মার্চ সন্ধ্যায় আমরা যাব, ইন্দিরা গুরুগ্রন্থ থেকে গুরু নানকের বাণী প'ড়ে প'ড়ে ইংরাজিতে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেবে।

অলডাস হাক্সলির সঙ্গে প্রথম দিনই কথা হয়েছিল এ-সম্বন্ধে। তাতে তিনি সাগ্রহে বলেছিলেন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে, গুরু নানকের কথা তিনি শোনেন নি এযাবৎ, কিন্তু এবার খবর নেবেন। সেদিন আমাদের বললেন,

ইতিমধ্যে নানা বইয়ে গুরু নানকের বাণী ও জীবনী সম্বন্ধে অনেক কিছু প'ড়ে ফেলেছেন—এনসাইক্লোপীডিয়া পর্যন্ত।

আমি হেসে বললাম: "কৃষ্ণমূর্তি আমাকে একবার বলেছিলেন, আপনার মন Encyclopædic, এও শুনেছি যে, আপনার একটি প্রিয় বই হ'ল Encyclopædia. আপনার নাকি ঐ বইটি মুখস্থ—এই রকম জনশ্রুতি।"

অলডাস হেসে বললেন: "জনশ্রুতি বলতে কী বোঝায় তা তো জানেনই। তবে এ-কথা কবুল করছি যে, ঐ বইটি পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। আর—" ব'লে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ঢঙে বললেন—"এও আমার মনে হয় যে, ঐ বইটি লোকে পড়বে ব'লেই লেখা হয়েছিল।"

"কিন্তু পড়ে ক'জন?"

"কিন্তু না পড়া কি ভালো? মানুষ কোথায় কী চিন্তা করেছে খবর রাখলে নিজের চিন্তা উদ্বুদ্ধ হয়। আলোতেই আলো জাগে, প্রাণেই প্রাণ।"

এক-থা সে-কথা—কত কথা···ঘুরে ফিরে আমি কেবল মীরাবাইয়ের কথা বলি—কেমন ক'রে আমার কাছেও তিনি এলেন অবশেষে ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে। বললাম: "মীরা আমাকে বললেন, ইন্দিরা আমার শিষ্যা হ'য়েই এসেছে—অথচ কি জানি কেন আমার মনে বড় কুণ্ঠা আছে, কেন না, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে ওর এমন আশ্চর্য সহজ প্রবেশ—আমি কেমন ক'রে ওর গুরু হ'য়ে বসতে পারি?"

অলডাস শুধালেন: "এ-কথা মীরাকে জিজ্ঞাসা করেন নি?"

ইন্দিরা হেসে বলল: "করেন নি আবার? জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে ক্লান্ত।"

অলডাস হাসলেন, বললেন: "কেন? উত্তর মিলল না?"

এবার ইন্দিরার পালা, বলল বিজয়ী হাসি হেসে: "দাদা ভাবেন মিলল না, আমি ভাবি মিলেছে। আমার মনে ভারি ধ'রেছে—মীরার একটি ছোট উপমা—তাতেই সব কথা বলা হ'য়ে গেছে।"

অলডাস উৎসুক নেত্রে ওর দিকে তাকালেন। ইন্দিরা বলল: "মীরা বললেন আমাকে: "এক যে ছিল হ্রদ, তার একটু উপরে পাহাড় থেকে নামছে এক নালী নির্ঝরিণীর জলের ধারা নিয়ে। হ্রদের জলের তুলনায় নালীর মধ্যে কতটুকুই বা জল? অথচ ঐ নালীটিই হ'ল হ্রদের জলের প্রাণ—নৈলে হ্রদ হ্রদই থাকত না—জল ছড়িয়ে পড়ত ছত্রাকার হ'য়ে। মীরা বলেন, গুরু হলেন এই নালী, শিষ্য—হ্রদ, যে নির্ঝরিণীর বর পায় ঐ নালীর মধ্য দিয়েই।"

অলডাস বললেন : "উপমাটি চমৎকার তো !"

আমি সোৎসাহে বললাম : "মীরার ঢঙই ঐ। উপমা যে কত দেন। আপনি পড়বেন শ্রুতাঞ্জলিতে তাঁর বাণী ?"

অলডাস বললেন : "পড়ব না ? নিশ্চয় পড়ব।"

আমি বললাম : "আমার ভারি মুস্কিল হয়েছে এই যে, ইন্দিরা মুখ ভার ক'রে মীরার কথা প্রচার করলে।"

ইন্দিরা বলল : "দাদা বাড়িয়ে বলছেন। মুখ ভার আমি করি না, তবে কি জানেন ? দাদার সঙ্গে এ-বিষয়ে কিছুতে আমার মতে মেলে না। তিনি চান যাকে তিনি সত্য ব'লে নিয়েছেন তা অপরকেও লওয়াতে। আমি বলি —একজনের তত্ত্বজ্ঞান বা উপলব্ধি আসে যে-তথ্যের বা প্রণালীর পথ বেয়ে সে তার নিজস্ব, অপরের কাছে সে-সব তথ্য পেশ করলে সে-তথ্যকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ঠিক সেই তত্ত্বে পৌছতে পারে কি ?"

অলডাস আমার দিকে চেয়ে বললেন : "অতি আশ্চর্য কথা বলেন আপনার শিষ্যা।"

আমি বললাম উৎসাহের ঝোঁকে : "জানেন ? মীরা বছর দুই আগে আমাকে বলেছিলেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি তোমার ডায়েরিতে লিখে রাখো যে, বিদেশে ইন্দিরা এত চমৎকার কথা বলবে যে, বহু লোকেই মুগ্ধ হবে।"

ইন্দিরা হেসে বলল : "আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, এ সম্ভব হবে দাদার গুণে। এ-হেন আদর্শ চারণ-গুরু—publicity officer—মেলে ক'জন শিষ্যার ভাগ্যে ?"

আমি বললাম : "কিন্তু এ-বিষয়ে ভাগ্য কার প্রতি প্রসন্ন বলা কঠিন হ'লেও একটা দুর্ভাগ্যের কথা বলতে পারি—সেটা আমাদের উভয়ের।"

অলডাস বললেন : "দুর্ভাগ্য ?"

আমি বললাম : "আমি এসেছিলাম সত্যিই আপনার কথা শুনতে। বিশ্বাস করবেন—আমি স্বভাবে একটি আদর্শ শ্রোতা। কিন্তু ইন্দিরার প্রসাদে আমার স্বধর্ম বুঝি বা বদলে যায়—আমি হ'য়ে উঠেছি বক্তা। তবে আপনার মতন শ্রোতা পেলে কার না বক্তা হ'তে লোভ হয় বলুন ?"

অলডাস-দম্পতি আমাদের হাসিতে যোগ দিলেন মন খুলে।

হাসি থামলে আমি বললাম: "কিন্তু এ হাসির কথা নয়। আমার মনে ভারি খেদ রয়ে গেল যে, আপনার কাছ থেকে তেমন কিছু আদায় করতে পারলাম না।"

অলডাস বললেন: "তাতে আপনার কতটা ক্ষতি হয়েছে বলতে পারি না, কিন্তু আমার যে না-চাইতে অনেক কিছু আদায় হ'ল এ-কথা বলতে পারি। শুনুন, আপনারা ফের কবে আসবেন?" ইন্দিরার দিকে চেয়ে: "নানকের বাণী শুনতে আমরা খুবই উৎসুক—বিশ্বাস করবেন।"

ইন্দিরা প্রসন্ন হ'য়ে বলল: "বেশ, কবে আসব বলুন?"

ঠিক হ'ল এক সপ্তাহ পরে—একদিন সন্ধ্যায় আসব।

পরদিনও মিসেস হাক্সলি ইন্দিরাকে টেলিফোন করলেন: "আরও কয়েকজন আসতে চায়। ক্রিস্টফার ইশারউড জানিয়েছেন তিনি আসতে চান তাঁর কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে—আপনার আপত্তি নেই তো?"

ইন্দিরা (টেলিফোনে) জবাব দিল: "না, আপত্তি থাকবে কেন?"

টেলিফোনে কথা বলা শেষ হ'লে ইন্দিরা বলল: "এদেশের লোকে কত ভেবেচিন্তে কাজ করে দাদা! নয়? কে আসবে না-আসবে তার জন্যেও অনুমতি চাওয়া?"

আমি বললাম: "এরা যে বড় শ্রদ্ধা করে মানুষের ব্যক্তিত্বকে। মনে নেই, মীরা একদিন বলেছিলেন যে, আমরা এ-দেশে এলে একদিক দিয়ে আরাম পাব—কেন না, এ-দেশে লোকে অপরের 'পরে চড়াও হ'তে চায় না—ভাবে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা।"

এর পরে মাঝে মাঝেই আমাতে ও ইন্দিরাতে কথাবার্তা হ'ত অলডাস হাক্সলি সম্বন্ধে। ইন্দিরা আমার মতে সায় দিল যে, হলিউডে এলে আর কিছু লাভ যদি না-ও হয় তা হ'লেও বলা চলে যে, শুধু অলডাস হাক্সলির ব্যক্তিস্বরূপের স্পর্শ পাওয়ার জন্যেও এখানে আসা সার্থক।

তারপর দিন ১২ই মার্চ হ'ল রামকৃষ্ণ মিশনে আমাদের নৃত্যগীতের একটি স্মরণীয় অধিবেশন। কেন না, সেদিন যে-ধরনের শ্রোতা পেয়েছিলাম সে-ধরনের শ্রোতা খুব বেশি মেলে না—সবার উপর অলডাস হাক্সলির উপস্থিতি। ইশারউডও ছিলেন।

স্বামীজি বিশেষ আলোকের বন্দোবস্ত করেছিলেন হাজারো স্বচ্ছ পিয়ালায় বাতি সাজিয়ে। মনে হ'ল সত্যিই—দীপাবলির রাত। সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি—ধূপগন্ধে মস্ত হল্-ঘর সুরভিত! ঢুকতেই মন ভ'রে গেল।

ঘরে লোক ধরে না। অনেক আমেরিকান নরনারী মাটিতেই বসেছিলেন স্থানাভাবে। এত ভিড় হবে কে ভেবেছিল?

আমি প্রথমে গাইলাম ভাগবত থেকে সংস্কৃতে কৃষ্ণবন্দনা:

"নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥
—ইত্যাদি।

তারপর মহাভারত থেকে:

"কৃষ্ণ এব হি ভূতানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং লোকং চরাচরম্॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
—ইত্যাদি।

তারপর ধরলাম ইন্দিরার শ্রুতিলব্ধ মীরাভজন (প্রেমাঞ্জলি ১৪৪ পৃঃ):

ফাগুনকী ঋতু আঈ আলী! কোয়েল গায়ে রাগ।
পিয়া গয়ে পরদেশ সখী, ময় কা সঙ্গ খেলুঁ ফাগ?

অবশ্য প্রথমে এই গানটির ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি ক'রে বুঝিয়ে দিলাম সংক্ষেপে মীরা কেমন গোপীভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গেয়েছেন তাঁর কৃষ্ণবিরহের এ-গানটি। তিনি যেন গোপী। গাইছেন উদাস কণ্ঠে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা চ'লে গেছেন ব'লে:

দেখ্ সখী এলো ফাল্গুন, মাতে কোকিল রাগমালায়!
বঁধু পরবাসে—কার সাথে বল্ খেলিব ফাগুয়া হায়!

তারপর গাইলাম মীরার আর একটি গান (প্রেমাঞ্জলি ১৪ পৃঃ):

কুঞ্জনবন সূনা কর মাধো, কহাঁ যাও গুণধাম?
নিকুঞ্জবন করি' শূন্য—আজিকে হরি কোথায় যাও হে গুণধাম?

সঙ্গে ইন্দিরা নাচল—ভারতনাট্য নৃত্যের খাঁটি বেশ প'রে।

তারপর আমি বললাম: "এবার গাইব যাকে আমরা বলি নামকীর্তন। এ-গানটি আমার পিতৃদেবের রচনা—সংস্কৃত ছন্দে গ্রথিত শুধু শিবের নানা

নাম ছন্দে মিলে গাঁথা ( "ভীষ্ম" নাটকে, তথা "গান" পুস্তকে আছে পুরো গানটি )।

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী
ভুজঙ্গ—ভৈরব বিষাণ ভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী।
—ইত্যাদি।

তারপর গাইলাম ইন্দিরার রচিত "শান্ত গগনমে……" ( প্রেমাঞ্জলি ২০ পৃঃ )। ও নাচল আমার গানের সঙ্গে।

বললাম: "এখানেই আসর শেষ করি ?"

স্বামী প্রভবানন্দ বললেন: "ঐ গানটি গাইবেন—নিবিড় আঁধারে মাগো ?"

আমি বললাম: "প্রায় দেড় ঘণ্টা হ'তে চলল। বিদেশে ভয় করে বেশিক্ষণ গাইতে। কারণ, আমাদের গান পাশ্চাত্য গানের মতন নয়—পাঁচ মিনিটে শেষ করা যায় না, অন্ততঃ পনের মিনিট লাগে।"

অলডাস হাক্সলি মহোৎসাহে হাততালি দিলেন। অন্য সবাই যোগ দিল। কাজেই গাইতে হ'ল পরমহংসদেবের সেই প্রিয় গানটি—যে প্রাচীন হ'য়েও চিরনূতন।

গানের শেষে কত লোকেই যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল! অনেকেরই চোখে ধারা।……

স্বামী প্রভবানন্দ টেনে নিয়ে গেলেন আমাদের তাঁর নিজের সুন্দর ঘরে।

অলডাস হাক্সলি, মিসেস হাক্সলি, ক্রিস্টফার ইশারউডও ছিলেন। আমাদের প্রত্যেককে এক পিয়ালা ক'রে চকোলেট পরিবেষণ করা হ'ল। কথাবার্তা চলতে লাগল। ইশারউড বললেন সোৎসাহে যে, আমাদের নৃত্যগীত এখানে যত বেশী হয় ততই ভালো। তারপর ইন্দিরাকে বললেন: "আপনার নাচ দেখে আমি কী রকম মুগ্ধ হয়েছি আপনি জানেন না। আমি খুব ভালো ভারতীয় নৃত্য দেখেছি। কিন্তু কোনো নাচে যে এ-ধরনের ভক্তিভাব কেউ পরিবেষণ করতে পারে"—ইত্যাদি। অলডাস হাক্সলি বললেন একটি চমৎকার কথা: "কাল আপনারা বলছিলেন, ভারতবর্ষে গুরু ও শিষ্য বলতে কী বোঝায়। আমি আজ বুঝেছি সেকথা আপনাদের নাচগানের পর।"

আগের দিন রাতে অলডাসের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল গুরু ও শিষ্যের গভীর সম্বন্ধ কেন য়ুরোপীয় আধ্যাত্মিকতায় গড়ে ওঠে নি। অলডাস একটু যেন কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন। বলেছিলেন: "ক্যাথলিক মঠ, নানারি প্রভৃতি আশ্রমে

শিষ্য-শিষ্যারা ডিরেক্টরের কাছ থেকে উপদেশাদি গ্রহণ করত, তাঁকে ভক্তি করত। তাদের মধ্যে কি খানিকটা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে নি?" আমরা তাতে বলেছিলাম: "না। গুরু শিষ্যকে শুধু ধর্মের সম্বন্ধে উপদেশ বা পথনির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না, তিনি শিষ্যের কাছে আসেন ভগবানের প্রতিনিধি হ'য়ে। এ-বিষয়ে 'শ্রুতাঞ্জলি'তে মীরার বাণী পড়লে হয়ত কথাটি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে।"

কথায় কথায় ইন্দিরা অলডাস হাক্সলিকে একটি প্রশ্ন করেছিল যা শুনে তিনি একটু চমৎকৃত হয়েছিলেন। অলডাসকে আমি দশ বার বৎসর আগে লিখেছিলাম, তিনি আগে আগে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে নিশানা ক'রে হানতেন চোখা চোখা বিদ্রূপবাণ, হঠাৎ তাঁর পরিবর্তন হ'ল কী ক'রে? অলডাস উত্তরে লিখেছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিকতার ফাঁপা হাঁড়ি হাটে ভাঙবেন (debunk করবেন) এই পণ নিয়ে প্রথমে শুরু করেন আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ভালো ক'রে পড়তে। শত্রুর অন্ধি-সন্ধি জানলে তবেই না তার দুর্বলতা কোন্‌খানে তার হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু—লিখেছিলেন তিনি—আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে পড়তে পড়তে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা জেগে ওঠে—সুরু হয় তাঁর জীবনের এক নূতন যুগ। ইন্দিরা তাঁর জীবনের এই যুগান্তরের উল্লেখ ক'রে বলেছিল: "আমাকে বলবেন একটি কথা? ধরুন, একজন লেখকের লেখার ধারা দেখলাম কোনো এক সময়ে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেল—ফলে তিনি লিখতে লাগলেন এমন সব গভীর কথা—নতুন কথা যা তিনি আগে ভাবতেও পারতেন না। এখন, তাঁর লেখা প'ড়ে কি এই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে যে, তাঁর লেখার এ পরিবর্তন হয়েছে তার আন্তর-জীবনের রূপান্তর থেকে? মানে, এও কি হ'তে পারে না যে, লিখতে লিখতে তাঁর লেখা খুলে গেল ব'লেই তিনি ক্রমশঃ গভীর কথা বলতে শুরু করলেন—কল্পনায় ভর ক'রে?"

অলডাস বললেন: "আপনার প্রশ্নটি ভাববার। কারণ, এ-ধরনের প্রশ্ন আমার মনে কোনোদিন উদয় হয় নি। তবে—" ব'লে আর একটু ভেবে—"শুধু লেখার বিকাশের ফলে কি সত্যি গভীর কথা বেরোয়? শুধু কল্পনার উপরে ভর ক'রে কি সে-ধরনের প্রেরণা পাওয়া যায় যে-প্রেরণা মেলে ভাবের রূপান্তরে?"

ইন্দিরা বলল: "তা হ'লে কি বলবেন যে, শেক্সপীয়র নানা সময়ে যে নানা কথা লিখতেন সে-সব কল্পনা থেকে লেখা সম্ভব নয়?"

অলডাস বললেন: "কথাটা আমি এদিক থেকে ভেবে দেখি নি। কিন্তু কোনো সত্যিকার বড় লেখক কি এমন কোনো কথা লিখতে পারেন শুধু কল্পনায়

ভর ক'রে যা তিনি বিশ্বাস করেন না অথচ শুধু লেখার মুন্সিয়ানার জোরে অপরকে বিশ্বাস করাতে পারেন ?"

ইশারউড হঠাৎ টিপ্পনি কাটলেন : "কেন পারবেন না ? ধরুন অমুক লেখক ?" ( অমুকের নাম করলাম না পাছে ডিফামেশনের চার্জে পড়ি—তাঁর নাম দিই C. M. )

অলডাস ধারালো হাসি হেসে বললেন : "C. M. ? ধিক্। C. M. writes atrociously and what he believes is even more atrocious than what he writes."*

এক আমেরিকান মহিলা শুনছিলেন এই আলোচনা, তিনি হঠাৎ কি ভেবে জানি না ব'লে বসলেন : "O Mr. Huxley ! I adore your books and C. M.'s !" †

অলডাস চম্‌কে উঠলেন, বললেন : "মাদাম ! আমি—আমি—দুঃখিত।" হাসব না কাঁদব ?

অলডাস আমাকে কথায় কথায় বললেন : "আপনার পিতৃদেবের শিবের নামকীর্তন গানটি অপূর্ব—চমক জাগায় ! এমন উদ্দীপনা ! আপনি কেন নিউয়র্কে রেকর্ড করেন না ?"

আমি বললাম : "গ্রামোফোনে ঢের গান গেয়েছি—ভালো লাগে না আর। তা ছাড়া, তিন-চার মিনিটে কি আর গান গাওয়া যায় ? বড় জোর—"

অলডাস বাধা দিয়ে বললেন : "না না। তিন-চার মিনিট কেন—আজকাল এমন রেকর্ড হয়েছে যা আধঘণ্টা ধ'রে বাজে।"

আমি বললাম : "কিন্তু আমার গান ওরা নেবে কেন ? একে তো ভারতীয় গান, তার উপর আমি ওদের অপরিচিত।"

অলডাস বললেন : "আমি ওদের ডিরেক্টরকে লিখে দেব। ওরা নিশ্চয় নেবে। এমন গান নেবে না—এ কি কথা হ'ল ?"

যৌগিক সমতা বজায় রাখতে পারলাম না—তুল্য-নিন্দাস্তুতির আদর্শ টলমল ক'রে উঠল, মন হ'য়ে উঠল খুশি—সলজ্জে স্বীকার করছি।

* ভাবানুবাদ : "সি. এম্. যা-তা লেখেন—আর যা ভাবেন বুঝি আরো যা-তা।"

† অনুবাদ : "শুনুন, আমি যে কী ভালোবাসি আপনার ও সি. এম্.-এর লেখা !"

কিছুদিন পরে অলডাস নিজে থেকেই মনে ক'রে আমার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন, কলম্বিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষকে : "This is to introduce Mr. Dilip Kumar Roy, one of the greatest musicians of modern India. He is to be in New York during April ; and while he is there I hope very much you will seize the opportunity to record some of his own and some of the traditional music which he sings with such extraordinary power and expressiveness."

*　　*　　*

১৩ই মার্চ এখানকার একটি ছোট দার্শনিক সংসদ আমাদের নিমন্ত্রণ করল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে। তারা চাঁদা আদায় ক'রে কিছু দক্ষিণাও দেবে বলল। গেলাম তাদের ওখানে।

সুন্দর একটি ঘর। চুল্লিতে চমৎকার আগুন জ্বলছে। গৃহকর্তা কফি ও কেক খাওয়ালেন। আমার এক তরুণ আমেরিকান বন্ধু, জন টমাস, আমাদের পেশ করলেন সংসদের কাছে। বলাই বেশি, সংসদে নরের চেয়ে নারীরই আধিক্য। এখানে সর্বত্র সভাসমিতি বক্তৃতাকক্ষে নারীরই প্রাধান্য। কারণ, বোধহয় অবসর তাদেরই বেশি। এদের মধ্যে একটি পনরো বছরের মেয়েও ছিল। তার সে কী উৎসাহ! সরলভাবে উদ্দীপ্ত মুখে কত প্রশ্ন যে করল : কী ভাবে চলতে হবে, কী ভাবে প্রার্থনা করতে হবে, যদি কারুর উপর রাগ হয় কী ক'রে রাগ যাবে, ইত্যাদি। তার সরলতায় মুগ্ধ হলাম। আমার ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতার পরে উজ্জ্বলমুখে বলল : "আমি ভুলব না কোনোদিন—যা শুনলাম।"

সেদিনকার ভাষণের সব কথা লেখা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলি—একটু আভাষ দিতে।

আমি বললাম প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের জীবন সম্বন্ধে প্রায় পনরো মিনিট—কী ভাবে তাঁর শিক্ষার শুরু ও দীক্ষার আরম্ভ—যে-দীক্ষা তাঁর আকুমার শিক্ষার পরিপন্থীই হয়ে দাঁড়াল ভারতে ফিরতে না-ফিরতে। যে মানুষ ভারতের একটি ভাষাও জানত না, আট বৎসর বয়স থেকে বাইশ বৎসর পর্যন্ত ইংলণ্ডে থেকে ইংরাজি ভাষা যার মাতৃভাষা হয়েই গ'ড়ে উঠেছিল, লাটিন, গ্রীক, জর্মন, ইতালিয়ান ভাষায় যাঁর সহজ প্রবেশ, য়ুরোপের উচ্চতম সংস্কৃতির রঙে যাঁর মন রঙিয়ে উঠেছিল নিটোল হ'য়ে, তিনি ভারতে এসেই ব'নে গেলেন দেশভক্ত; শিখলেন সংস্কৃত, বাংলা, গুজরাটি; ঝাঁপ দিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধযজ্ঞে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে; গেলেন জেলে, যেখানে ধ্যানযোগে উপলব্ধি করলেন বাসুদেবময়

বিশ্বকে! এর পরেও কে বলবে যে, মানুষ তার পরিবেশ বা আবহের সন্তান?..."

তারপরে বললাম: "শুধু যে আবাল্য তাঁর জন্মলব্ধ পরিবেশকে অস্বীকার ক'রেই তাঁর জীবনের বিকাশ হয়েছিল তাই নয়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যুদ্ধ করেছেন নিয়তির সঙ্গে—'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' ক'রে। অভয় ছিল তাঁর জীবনের নিত্য সহচর, দীপ্ত উপাস্য। তাই ফাঁসির মঞ্চ যখন অদূরে হাতছানি দিচ্ছে তখনো এ-অপরূপ মানুষটি নির্ভীক চিত্তে ক্লিন্ন কারাকক্ষে যোগাসনে আসীন—বীতরাগভয়ক্রোধ, স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মারাম! সেখানে উপলব্ধি করলেন জীবনের শিখরজ্যোতিকে নিরাশার অন্ধকার পাতাল থেকে। শুনলেন দৈববাণী: 'তোমার মুক্তি অবধারিত'। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন তাঁর এ-মহান দর্শনের কথা:

'I looked at the jail that secluded me from men and it was no longer by its high walls that I was imprisoned: no, it was Vasudeva who surrounded me. I walked under the branches of the tree in front of my cell, but it was not the tree, I knew it was Vasudeva, it was Sri Krishna whom I saw standing there and holding over me His shade...I looked at the prisoners in the jail, the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them I saw Vasudeva, it was Narayana whom I found in these darkened souls and misused bodies."*

ওরা চমকে উঠল এ-কথা শুনে। কারণ, ওদেশে ধর্মসম্বন্ধে সাধারণত মানুষ যা ভাবে, বোঝে বা বোঝায় তার মূলে আছে ওদের মনগড়া কয়েকটি সম্ভব-অসম্ভবের ধারণা। এই ধারণার নির্দেশেই ওরা সনাতন ভাগবত ভাব-উপলব্ধি অনুভূতিকে আধুনিক নানান্ গালভরা নাম দিয়ে ক'রে দিয়েছে নামঞ্জুর, বলেছে—এ-জাতীয় মনোভাব হ'ল মধ্যযুগীয়—'মিডীভাল'—ওরফে অজ্ঞানসম্ভব, কল্পনা-প্রসূত, এককথায়—ভ্রান্ত। ভগবান্ আছেন এ-বিশ্বাস মামুলি ঢঙে ওদেশের বহু নরনারীর মনে হয়ত এখনো ঠাঁই পায়, কিন্তু ভাগবত বা আধ্যাত্মিক জীবন বলতে আমরা যা বুঝি ওরা তা বোঝে না। আমরা শ্রেষ্ঠ বলি তাঁদের যাঁদের প্রাণমন ভগবদ্‌বিলাসী, উর্ধ্বকেন্দ্র। ওরা শ্রেষ্ঠ বলে সেই জীবনকে যে মোটামুটি নৈতিকতা মেনে চলতে চলতে শেষটায় সদাশয় হ'য়ে উঠেছে। স্পিরিচুয়াল

* **The Uttarpara Speech**—৪০ বৎসর আগে ছাপা।

শব্দটি ওদের কাছে—অন্তত সাড়ে পনরো আনা ক্ষেত্রে—এথিকাল বিশেষণটির সমার্থক না হোক্ কুটুম্ব। অর্থাৎ ভগবান্‌কে ডাকলে মন উদার হবে, প্রবৃত্তি অহিংস হবে, স্বভাব সংযত হবে, বিবেক বিপথ ছেড়ে সুপথে চলবে—এইই হ'ল ওদের অন্তিম আদর্শ। সুতরাং ভগবান্ যে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও ঠাঁই পেতে পারেন প্রত্যক্ষভাবে আর তাঁর আবির্ভাবে যে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" কিনা সর্বজীবে শিবকে চাক্ষুষ করা যায় এ-কথা শুনলে ওদের মন পড়ে কেমন যেন অথই জলে। তাই আমাকে একটু প্রাঞ্জল ক'রেই বলতে হ'ল ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায় বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি। বললাম: "এ-দর্শন হ'লে জগতের চেহারাই একেবারে বদ্‌লে যায়, শুধু-যে 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অশ্রান্ত ধারায় শুধু মধু ঝরছে—এই উপলব্ধি হয় তাই নয়, মনে হয় দুঃখ ব'লে কোনো জিনিসই নেই। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন অবাক্ হ'য়ে যে, যে-উকিল তাঁকে ফাঁসিকাঠে চড়াবার জন্যে যুক্তিজাল ফাঁদছে সে-ও যেমন বাসুদেব, যে-জজ বিচারাসনে ব'সে বিচার করছে সে-ও তেম্‌নি বাসুদেব—এমন কি যে-লালপাগড়ি তাঁকে টেনে আনল বন্দীভাবে সে-ও সেই একই বাসুদেব—মিত্রের মধ্যেও যে, শত্রুর মধ্যেও সে। শুনুন, কী দেখলেন উনি ওঁর নিজেরি ভাষায়: "He said to me: 'When you were cast into jail, did not your heart fail and did you not cry out to me: where is thy protection ? Look now at the Magistrate, look now at the Prosecuting Counsel.' I looked and it was not the Magistrate whom I saw, it was Vasudeva, it was Narayana who was sitting there on the bench. I looked at the Prosecuting Counsel and it was not the Counsel for the prosecution that I saw: it was Sri Krishna who sat there, it was my Lover and Friend who sat there and smiled."

ওরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনতে লাগল এ-অদ্ভুত মহাসাধকের অবিশ্বাস্য দর্শন ও অত্যাশ্চর্য পরিণতির কথা।

বললাম: "তারপরে ঘটল তাঁর জীবনে আর এক বিপ্লব। দেশমাতৃকাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি দিয়ে। এবার এল ডাক—দেশ-মাতৃকার যিনি অধিষ্ঠাতা তাঁকে দিতে হবে তাঁর হৃদয়ের ভক্তির অঞ্জলি, প্রাণের নিষ্ঠার নৈবেদ্য। গেলেন তিনি পণ্ডিচেরি, সেখানে বসলেন পুনরায় নবসাধনার নবাসনে। পেলেন আলো, বাসলেন ভালো তাঁকে যাঁর ভালোবাসা সব

ভালোবাসার আদিম উৎস। বললেন তখন তাঁর নবদর্শনের কথা, প্রচার করলেন অতিমানস চেতনার অবতরণ-বাণী: মানুষ তার মানস স্তরেই স্থির থাকতে পারে না—উঠতে হবে তাকে আরো উচ্চতর স্তরের আলোয়—মানতে হবে অতীন্দ্রিয় রূপাকে আর টেনে আনতে হবে তাকে এ-আধিব্যাধির জগতে। নৈলে মানুষ চলবে চিরকাল সেই চিরাচরিত আলোছায়াময় ছোট সুখদুঃখের পায়ে-চলা পথে—একটু আধটু সান্ত্বনা, গর্ব ও প্রেরণা কুড়োতে কুড়োতে। এই পথেই চ'লে এসেছে সাড়ে পনের আনা মানুষ সেই প্রথম দিন থেকে যেদিন আমাদের এই পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিল আদিম মানব। কিন্তু চিরাচরিত পথে সাড়ে পনের আনা মানুষ চললেও যুগে যুগে এমন এক আধটি মহামানব জন্মান, যাঁরা তাঁদের তপস্যালব্ধ দর্শনের আলোয় নবপথের সন্ধান পান। শ্রীঅরবিন্দ এই দীপ্তমণ্ডলীর অন্যতম পুরোধা। তাই পণ্ডিচেরিতে যোগাসনে বসতে না-বসতে শুনলেন তিনি নবপথের ঝঙ্কৃত নির্দেশ, বললেন—মানস লোকের আলো এ-যাবৎ মানুষের কাজ চালিয়ে এলেও তাকে দিয়ে আর কাজ চলবে না—তাকে আজ বহাল করতে হবে যোগ্যতর মন্ত্রীকে বর্তমান জগতের জটিলতর সমস্যার সমাধানে। তাঁর 'দিব্যজীবন' পুস্তকে তিনি ঘোষণা করলেন এই মহাবাণী যে, এ-যাবৎ মানব মন তার জীবনসংগ্রামে সারথি ক'রে চ'লে এসেছে যুক্তি ও বুদ্ধিকে। কিন্তু ক্রমশঃ জীবন-সমস্যা এমনই আবর্তসঙ্কুল হ'য়ে উঠেছে যে, আজ কাণ্ডারীরূপে বরণ করতে হবে আর এক সারথিকে যাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে অলোক-লোকের আলো—এমন আলো যা এ-পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের জীবনে সক্রিয় হয় নি, হ'তে পারে নি—আমরা তার নির্দেশ অনুসারে চলবার যোগ্যতা অর্জন করি নি ব'লে। আজকের যুগের মানুষ হয়ত তাঁর এ-নব ঘোষণায় কান দেবে না—হয়ত উপহাস করবে এ অভূতপূর্ব দ্রষ্টার অসম্ভাব্য নব-দর্শনকে। কিন্তু তিনি তাতে অণুমাত্রও বিচলিত হ'লেন না, বললেন:

"The high Gods look on man and watch and choose
To-day's impossibles for the future's base.
উর্ধ্ব দেবগণ দেখে মানবেরে, করে নির্বাচন
আজ যাহা অসম্ভব তারেই ভবিষ্য-ভিত্তি সম।"

—ব'লে উদ্ধৃত করলাম তাঁর পথনির্দেশ: "মানুষকে চাইতে হবে—শিখতে হবে ভগবানের বাহন হ'তে। নিজের মানস বুদ্ধি তাকে কাজ দিয়েছে এযাবৎ কিন্তু বিবর্তনে তাকে উত্তীর্ণ হ'তে হ'বে এ-চলতি বুদ্ধির অতীত দর্শনলোকে

—চিন্তা থেকে ধ্যানে, যুক্তি থেকে ভাবে, বাসনা থেকে প্রেমে। তাকে আবাহন করতে হবে তিনটি শক্তিকে: এক, অভীপ্সা—মানে উর্ধ্বতর লোকের আলোকচ্ছটা; দুই, বর্জন—মানে যা কিছু উর্ধ্বলোকের জ্যোতিকে অস্বীকার ক'রে নিচু দিকে চল্‌তে চায় তাকে ত্যাগ; তিন, আত্মসমর্পণ—ধীরে ধীরে নিজের কামনা-বাসনা বিচারবুদ্ধিকে ঢেলে-দেওয়া তাঁর পায়ে—যিনি সর্বাত্মীয় হ'য়েও সর্বাতীত, জ্ঞানগম্য হ'য়েও তর্কাতীত, প্রেমলভ্য হ'য়েও কামনার অনায়ত্ত।"

* * *

তার পরদিন আমাদের একটি বড় হল্‌-ঘরে বক্তৃতা দিতে হ'ল ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরির সুন্দর কক্ষে।

উদ্যোক্তা পেশ করলেন আমাকে ও ইন্দিরাকে। বললেন: "দিলীপ বলবেন শ্রীঅরবিন্দের কথা, ইন্দিরা—মীরার কথা।"

আমি প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকে কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি ক'রে শোনালাম—"ভিসান এণ্ড দি বুন" সর্গ থেকে।

তারপর ইন্দিরা উঠল। ও নানা সভায় দুচারজনের মধ্যে নানা প্রসঙ্গের গভীর আলোচনায় গভীর কথা বললেও প্রকাশ্য কোনো সভায় এযাবৎ বক্তৃতা দেয় নি। তাই আমি একটু ভাবিত হয়েছিলাম বৈকি। কিন্তু ও এমন সহজ ও সরলভাবে শুরু করল ওর ভাষণ যে আশঙ্কা দেখতে দেখতে উবে গেল। যেন ওর বসবার ঘরে ব'সে বলছে দুচারজন বন্ধুকে, এমনি ভঙ্গিতে আরম্ভ করল মীরার কথা। বলল:

"আমার গুরু আপনাদের বলেছেন জ্ঞানের কথা। আমি জ্ঞানী নই তাই ওদিকে না ঝুঁকে বলব দুচারটা কথা যা আমার খানিকটা জানা—প্রেমের কথা।

"প্রেম বলতে আমরা কী বুঝি? আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় পরিজনকে স্নেহ করি, তাদের কাছে ডাকি, তাদের আশ্রয় দিই বা আশ্রয় চাই। কিন্তু এ হ'ল আমাদের চলতি পথের পাথেয়। আমি প্রেম বলতে আজ বুঝছি ভগবৎ প্রেমকে। মানুষ ভগবানকে ভালোবাসতে না শিখলে পুরোপুরি বুঝতে পারে না কাকে বলে প্রেম। আমরা ভালোবাসি কিছু দিতে বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই ফিরে পেতে। এরই নাম মানবিক প্রেম। কিন্তু ভগবৎপ্রেমিক চান নিজেকে দিতে—যার নাম সর্তহীন প্রেম। এ-প্রেম কিছুই চায় না নিজের

জন্যে—চায় শুধু একটি জিনিস—নিজেকে দিতে প্রতিদান না চেয়ে। মীরার মধ্যে নেমেছিল এই প্রেমের আলো। তিনি ছিলেন এক মস্ত রাজ্যের মহারানী। তাঁর পরিচারিকা ছিল তিনশোর উপর। ছিল স্বামী, আত্মীয়, অনুগত পরিজন। সব তিনি ছাড়লেন। কেন?—না, না-ছেড়ে তাঁর উপায় ছিল না। তিনি ভালোবেসেছিলেন কৃষ্ণকে—যিনি সর্বহারা না ক'রে কাউকে প্রাপ্তিবর দেন না। কৃষ্ণ এসেছিলেন তাঁর কাছে প্রথম বন্ধু হ'য়ে, সাথী হ'য়ে। কিন্তু শুধু সে-ভাবে তাঁকে পাওয়াই সব চেয়ে বড় পাওয়া নয়। তাঁর সত্তায় নিজেকে বিলীন করার ভাব এল মীরার জীবনে। তাই তাঁকে ছাড়তে হ'ল —যা-কিছু মানুষের প্রিয় কাম্য, যা-কিছুর জন্যে সে জীবনকে আঁকড়ে ধরে, যা কিছু তাকে ধারণ ক'রে থাকে দিনের পর দিন।

"ছাড়লেন তিনি সর্বস্ব, প্রিয়পরিজন, রাজ্য, গৃহ, দেহসুখ সব। বেরুলেন একাকিনী কৃষ্ণের নামে ভিখারিনী—পথে পথে কৃষ্ণের নামে গান বেঁধে সেই নাম বিতরণ করতে করতে চললেন বৃন্দাবনে। কেন? না, কৃষ্ণ বলেছেন, তাঁকে গুরু বরণ করতে হবে—গুরুর মধ্যে দেখতে হবে ইষ্টকে। কবীর বলেছিলেন সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু না দেখে কে? কেবল দ্রষ্টা দেখেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে। সসীম দেহধারী মানবগুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে হবে বিদেহী সর্বব্যাপী ইষ্টকে—এই কৃষ্ণের আদেশ। তথাস্তু ব'লে এক কাপড়ে তিনি বেরুলেন পথে—রাজরানী হ'লেন ভিখারিনী—অনশনে অনিদ্রায় চীরধারিণী মীরা দ্বারে দ্বারে দৈনিক আহার্য ভিক্ষা ক'রে চললেন পরিব্রাজিকা হ'য়ে। কেন? না, কৃষ্ণের আদেশ।

"এবার এলো তাঁর জীবনে আর এক পরীক্ষা। ভগবানের যে যত প্রিয় তার পরীক্ষাও তত কঠিন। এযাবৎ মীরা কৃষ্ণের দর্শন পেতেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। মান অভিমানও চলত প্রিয়তম নিত্যসাথীর সঙ্গে। কিন্তু রাজ্য ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে না-করতে বল্লভ হ'লেন অদৃশ্য। এমন কি, স্বপ্নেও অন্তর্হিত। বিরহবেদনায় উন্মাদিনী শুধু তাঁর গান অভীপ্সাকে পাথেয় ক'রে চললেন পথে পথে—

"কুঞ্জ গলী বন প্রেম দিবানী গোবিন্দ গোবিন্দ গাউঁ
পথে পথে হরি নাম তব মরি' গাহি' প্রেমে উছসিয়া"

অনুযোগ না, অভিযোগ না, শুধু চাওয়া তাঁর নামগান করতে, নিজেকে তাঁর পায়ে নিবেদন করতে।

"কৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করতে মীরার ছিল শুধু এই গভীর প্রার্থনা :—

চাকর রাখো জী—আমায় রেখো হে তব অধীন।

"এ-প্রেমের কতটুকু বুঝি আমরা? মীরার প্রার্থনায় আমাদের হৃদয় সাড়া দেয়, মীরার কান্নায় আমাদের হৃদয়ে অশ্রু উথলে ওঠে—মানি। কিন্তু প্রেমকে যে না বরণ করেছে সব ছেড়ে, সে কি তাকে জেনেছে কোনোদিন? বড় জোর কল্পনা করেছে প্রেমের হর্ষ-বিষাদকে, আলো-আঁধারকে, আশা-নিরাশাকে। কিন্তু মীরার কাছে এ-প্রেম কল্পনা ছিল না—তিনি যে তাকে পেয়েছিলেন প্রতি রক্তবিন্দুর প্রবাহে, প্রতি নিশ্বাসের আহরণে, প্রতি হৃৎস্পন্দনের আনন্দে, তাই গেয়েছিলেন তিনি :

রাধেগোবিন্দ বোল তু মুখসে বোল তু রাধে শ্যাম।
রোম রোম তু হরী বসা লে স্বাস স্বাস লে নাম।

রাধে গোবিন্দ বল্ মন, তুই বল্‌রে রাধে শ্যাম
প্রতি রোমে হোক হরির আসন, প্রতি নিশ্বাসে নাম।"

ওর বক্তৃতার পরে—অনেকেরই চোখে জল ভ'রে এসেছিল। দু'চারজন চোখ মুছছিলেন। কথার পিছনে যখন হৃদয় যোগান দেয় তখন বুঝি এমনিই হয়!

* * *

জেরাল্‌ড হার্ড নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ওখানে বিকাল চারটেয়। স্বামী প্রভবানন্দ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সেক্রেটারি জ্যাককে তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের সেণ্টা মনিকাতে নিয়ে যেতে—হলিউড থেকে বাইশ মাইল দূরে। জেরাল্‌ড হার্ড সেখানে আছেন আজ চার পাঁচ বৎসর লেখা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে। এঁর বিখ্যাত Pain Sex and Time বইটি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। তারপর তাঁর আরো দু'তিনখানি বই পড়ি। তাদের মধ্যে 'প্রিফেস টু প্রেয়ার' প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম : এ-মানুষটি তাহ'লে তো শুধু পণ্ডিত ও চিন্তাশীল নন, তার উপর সাধক, নিয়মিত ধ্যান-ধারণা করেন! মাসে দুবার বক্তৃতা দেন রামকৃষ্ণ মিশন হলে। একটি বক্তৃতায় গিয়েছিলাম একবার। কী আশ্চর্য বলেন ইনি! শুনলাম জগতে ছয়জন শ্রেষ্ঠ বক্তার মধ্যে ইনি না কি অন্যতম। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার পিছনে ছিল শুধু বাগ্মিতা নয়—আশ্চর্য সহজ ভাব। যেন ঘরে ব'সে স্বচ্ছন্দে কথা ব'লে যাচ্ছেন। অলডাস হাক্সলি বক্তৃতা দেন না—বললেন : বক্তৃতা হ'ল জেরাল্‌ডের স্বধর্ম—"সবাই কি সব পারে?"—শরৎচন্দ্রের

দিচ্ছে, পেরেকটি ব'সে যাচ্ছে। অমনি চিত্রমুচি আর একটি পেরেক নিয়ে বসাচ্ছে। একটি দোকানে দেখলাম আঁকা কাগজের হাত—আঙুলে একটি ফিতে বা ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। হাতটি উঁচু থেকে নামছে জলের মধ্যে, আবার জল থেকে উঠছে—অথচ ফিতেটি পিছলে খসে পড়ছে না—কী আশ্চর্য ফিতে এদের তৈরি! আর একদিন দেখলাম আকাশে বিমান উড়ে উড়ে গ্যাসের রেখায় লিখছে বিজ্ঞাপন—কোকা কোলা বা উইলসনের হুইস্কি! আকাশকেও এরা রেহাই দিল না, প্লাকার্ডের কাজে বাহাল করলো! সত্যি, কী অধ্যবসায়ী জাত! হলিউডে আমাদের হোটেলের পাশেই একটি ছায়াছবির ঘর। দূর দূরান্তে ছবিটির বিজ্ঞাপন দিতে হবে। রাতে আমাদের সাত তলার ঘর থেকে দেখি কি একটি তীব্র সার্চ লাইট নিচে থেকে উপরে চক্রাকারে ঘুরছে নিরন্তর আর—সামনে একটি হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার বিমান দেখতে একটু অদ্ভুত, কাজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্ভাবনা বটে! এদের অশ্রান্ত কর্মের নিত্যসাথী এদের অফুরন্ত বিজ্ঞাপন-প্রতিভা।

কিন্তু অশ্রান্ত নির্লক্ষ্য কর্মের ঢেউ নিয়ে যায় কোথায়—শূন্য অবসাদের কোলে ছাড়া? আমেরিকায় অনেক নরনারীই আজকের দিনে ভাবতে শুরু করেছে—"চলেছি কোথায়?" প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে—কর্মেই কর্মের পরিসমাপ্তি কিনা। প্রগতির গতি-লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে অনেকেরই চিত্তে। কিন্তু কোন্ মুখে চলা বাঞ্ছনীয় এ-প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? জেরাল্ড হার্ড, অলডাস হাক্সলি, ক্রিস্টফার ইশারউড অধুনা ভারতীয় ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছেন এই জন্যেই—এই কথাটি উপলব্ধি ক'রে যে শুধু আত্মিক আলো এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে—কেননা শুধু সে-ই লক্ষ্যহীন গতিবাদের শোকাবহ পরিণাম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। সেদিন জেরাল্ড হার্ড বললেন এই কথাই নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সব কথা মনে নেই—তাছাড়া যে-কথা আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য—যে, অন্তর্জীবনের বিকাশ বিনা মানুষের আশ্রয় নেই—সেকথা বেশি ক'রে বলব কার কাছে? অথচ এহেন স্বতঃসিদ্ধ বাণীও এদের কাছে এখনো তর্কের বিষয়বস্তু মাত্র। দুচার জন ভাবুক মানুষ এখানে টের পাবার কিনারায় এসেছেন বটে যে, আত্মদর্শন, আত্মবোধ বিনা মানুষের মুক্তি নৈব নৈব চ—কিন্তু ক'জন? এদেশে ক'জন মানব অতীন্দ্রিয় লোকের পরম বাণীকে বুঝেছে? নিরন্তর ইন্দ্রিয়ভোগে শুধু যে ভোগ নেই তা নয়—উপচিত হয়ে ওঠে চরম দুর্ভোগ—হয় অশান্তি, না হয় যুদ্ধবিগ্রহ, নয় তো সবকিছুতেই বিতৃষ্ণা—একথা এদেশে মনে মানলেও কবুল করবে ক'জন?

জেরাল্‌ড হার্ড কিন্তু ভাবুক হ'লেও অলডাস হাক্সলির সমধর্মী নন। আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধা এঁর গভীর হলেও ইনি চিন্তাসাধক, মানবতার সম্বন্ধে এঁর ঔৎসুক্য তেমন আছে ব'লে মনে হ'ল না। অলডাস মানুষকে জানতে চান, শুধু চিন্তা নিয়েই তাঁর কারবার নয়। জেরাল্‌ড হার্ড পরম মনীষী হ'লেও কারুর সম্বন্ধেই তাঁর কোনো ঔৎসুক্য নেই। তিনি আমাদের সম্বন্ধে, ভারত সম্বন্ধে বা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই করলেন না। আমরাও বললাম না, কারণ তৃষ্ণা বিনা জলদান আর প্রশ্ন বিনা তত্ত্ব বা তথ্য জ্ঞাপন বিড়ম্বনা।

যাই হোক জেরাল্‌ড হার্ডের সরল সহজ জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণায় বিশ্বাস, আন্তরিকতা অমায়িকতা—সর্বোপরি আশ্চর্য বাগ্মিতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইনি যা পারেন করছেন এবং করছেন য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবসিদ্ধ অনলস ছন্দে—জোর দিচ্ছেন অন্তর্জীবনের দিকে, বলছেন আমেরিকানদের নানাভাবে, নানাসুরে : "বহির্মুখিতায় নেই বস্তুলাভ, বিলাসে নেই শান্তি, নিছক শ্রান্তিহীন কর্মে নেই লক্ষ্যসিদ্ধি। হ'তে হবে নিরভিমান, শিখতে হবে ধ্যানযোগ, চাইতে হবে অমৃত।" নমস্কার এহেন বাণীবাহককে—বিশেষ এদেশে যেখানে আধ্যাত্মিকতা বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করলেও লোকে প্রায়ই ভুল বোঝে—কেননা অন্তত সাড়ে পনরো আনা লোক ভোজবাজিকেই মনে করে যোগ।

* * *

কিন্তু তাই ব'লে কি প্রকৃত বোদ্ধা কেউই নেই? তা কখনো হয়, না হ'তে পারে? এদেশে এখানে ওখানে এক আধজন সত্যিকার ধার্মিকের দেখা মেলে—এমন মানুষ যিনি শুধু যে ধ্যানধারণা সম্বন্ধে খবর রাখেন তাই নয়, ধ্যানধারণায় কিছু পেয়েছেন—আন্তর সম্পদ। এদের কোঠায় পড়েন ফ্রাঙ্কলিন এম. উল্‌ফ্‌।

ইনি ছিলেন আগে গণিতের অধ্যাপক। কিন্তু আবাল্য অন্তর্মুখী। তাই শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য জীবন" পড়তে না-পড়তে সাড়া দিলেন। ফিলজফিক্যাল হলে ইন্দিরা ও আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম শুনে এঁর এতই ভালো লাগল যে সস্ত্রীক এসে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তৃপ্তি পেয়েছিলাম—শুধু ভোজনের আতিথ্য নয়—ভাবের আতিথ্য। শ্রীঅরবিন্দের লেখা শুধু পড়া নয়—মর্মগ্রহণ করায় ইনি কারুর চেয়েই কম নন। না হবে কেন? আধ্যাত্মিক জীবনের একটি অন্তর্দ্বার যে খুলে গেছে এঁর অন্তর্লোকে। কথা ক'য়ে এত তৃপ্তি কমই পেয়েছি এদেশে। মীরা সম্বন্ধে ইন্দিরার বক্তৃতার কথা বলতে উল্‌ফ দম্পতি

উচ্ছ্বসিত। আমাকে একশো ডলার উপহার দিলেন—এঁর স্বরচিত একটি দার্শনিক বইও দিলেন।

এঁদের ইচ্ছা আমি এখানে কয়েক বৎসর থাকি। এঁরা চান এখানে একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র গঠন করতে—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারা প্রচার করতে। এ-সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল এঁর সঙ্গে। আশা হয় এঁরা একটি সংসদ গ'ড়ে তুলতে পারবেন। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। সে আলোচনার সব কথা বলার প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু ব'লেই সমাপ্তি টানি যে আমেরিকায় নানাস্থানে এরকম আধ্যাত্মিক বা ধর্মপ্রবণ মানুষের মধ্যে যে শ্রীঅরবিন্দের বাণীবীজে চারাগাছ মাথা তুলতে শুরু করেছে তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, এহেন চিন্তাশীল মানুষ কেউ কেউ শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের ডাকে সাড়া দিতে শুরু করেছেন মনে প্রাণে।

* * *

আমেরিকায় একটি অতি মধুরস্বভাব বন্ধু লাভ হ'ল—তরুণ জন টমাস। এর কথা আগে একটু লিখেছি। আমরা যখন সানফ্রান্সিস্কোয়, তখন জন আমাদের নিমন্ত্রণ করে তাদের সুরম্য শৈলাবাসে আতিথ্য স্বীকার করতে। জন বিবাহ করেছে একটি গায়িকাকে। মিষ্টভাষিণী সহধর্মিণী পেয়ে ও খুব খুশি। দুজনেই ধর্ম সম্বন্ধে উৎসাহী। অবশ্য জনই বেশি। তার কারণ ১৯৫০ সালে ও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন ছিল। সেইখানেই আমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। শ্রীঅরবিন্দ ওর গুরু, কাজেই ও হ'য়ে দাঁড়াল আমাদের গুরুভাই। একথা শুনে ও ভারি খুশি।

জনের কুটীরটি অতি চমৎকার। কী সুন্দর দৃশ্য যে উপভোগ করা গেল ওর আতিথ্যে! ২১শে মার্চ হোটেল থেকে গেলাম ওদের ওখানে। রাত্রিবাস করলাম ওখানেই। কত কথাই যে হ'ল ওর সঙ্গে! ও আপাতত লেখক হ'য়ে জীবিকা অর্জন করবে স্থির করেছে, কিন্তু ওর লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জীবন—শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন। উল্‌ফের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। হয়ত এমনি ক'রেই গ'ড়ে উঠবে এখানে শ্রীঅরবিন্দ-বাণীমন্দির—কে বলতে পারে ?

* * *

লস এঞ্জেল্‌সে একটি বাগান আছে যার নাম দেওয়া যেতে পারে সমাধি-উদ্যান। জন ও লী আমাদের নিয়ে যায় সেখানে। বলল যীশুর একটি মস্ত ছবি আছে, নাম "ক্রুসিফিক্‌শন"।

য়ুরোপে—বিশেষ ক'রে ইতালিতে ছবি দেখে দেখে মন আমার তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল ১৯২১-২২ সালে। যেখানেই যেতাম সবাই বলত যাও অমুক জায়গায় অমুক অমুক ছবির প্রদর্শনী দেখতে। আইনস্টাইন বলেন তিনি ছবির বিশেষ কিছু বোঝেন না—ছবি নিয়ে মানুষ কেন এত বেশি মাতামাতি করে ঠাহর পান না। য়ুরোপে ছবি দেখতে দেখতে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম অথচ স্বীকার করতে লজ্জা পেতাম তখন একটি বইয়ে পড়ি আইনস্টাইনের এই অকপটোক্তি। পড়বামাত্র মন মরিয়া হ'য়ে উঠল, প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল, আত্মপ্রসন্ন হ'য়ে উঠল। এর পরে আমাকে 'ফিলিস্স্টাইন' বলবে কে?

না, ছবি আমি বুঝি না। অথচ অজস্র ছবি দেখেছি। ছবির সম্বন্ধে নানা বইও পড়েছি 'কালচার' অর্জন করতে। কিন্তু গান, নৃত্য, কাব্য, সুকুমার সাহিত্য ও দর্শনে আমার মন যেমন আর্দ্র হ'য়ে ওঠে ছবি দেখে তো তেমন হয় না। অবশ্য ছবি দেখে কখনো কোনোদিনই আনন্দ পাই নি একথা বলব না। রাফাএল-এর সিস্টীন মাদোনা, দা ভিঞ্চির লাস্ট সাপার, মনা লিসা, কত জাপানী, চৈনিক ও ভারতীয় ছবি ভাল লেগেছে—আরো অনেক ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছি যা চিত্রজ্ঞের কাছে অনাদৃত। কিন্তু কোন ছবি দেখেই মন বলেনি—যদি না দেখতাম খেদ থেকে যেত। নানা দেশের নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কতবারই তো মনে হয়েছে—বহুভাগ্য যে দেখতে পেলাম! কোথায় সুইজর্লণ্ড, কোথায় রাইন উপত্যকা, কোথায় নরওয়ের ফিয়োর্ড, কোথায় স্কটল্যাণ্ডের ট্রসাক! প্রতি স্থানেই গিয়ে মন ভ'রে উঠেছে টইটুম্বুর। কিন্তু ছবি দেখে কখনো তো এমন ভরে নি। এই প্রথম ভরল লস এঞ্জেল্সে—যীশুর ক্রুসিফিক্শন ছবিটি দেখে। তাই ছবিটির একটু বিবরণ দেব—যা থাকে কপালে—মানে, হয়ত চিত্রজ্ঞরা হাসবেন: "বেচারি দিলীপ, ছবির কিছু বোঝে না তাই এই ছবির বহর দেখে ভুলেছে! ছবির আর্টের দিক দিয়ে ও এমন কিছু নয়।"

হয়ত নয়। জানি না। বলেছি চিত্রজ্ঞ আমি নই, কাজেই ছবি সম্বন্ধে আমার মতামত অনভিজ্ঞের এজাহার—যার কোনো মূল্যই হয়ত নেই অভিজ্ঞের কাছে। কিন্তু আমি চলব নিরাপদ পথে—ছবির আর্ট কিরকম সে সম্বন্ধে কোনো অসমসাহসিক মতামত দেব না—আমার কেন ভালো লাগল বলব। ব্যস্।

এ-ছবিটি পোলাণ্ড-দেশীয় এক শিল্পী আঁকেন। তাঁর নাম জান স্টাইকা।

১৮৯৫ সনে যখন তাঁর এ ছবি আঁকা শেষ হয় তখন দেখা গেল কোনো প্রদর্শনী-গৃহেই এ-ছবিটি পুরোপুরি বিস্তৃত ক'রে মেলে ধরা যায় না। যেহেতু এ-ছবিটি দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফিট উঁচু, ও বিস্তারে ১৯৫ ফিট। ভাবুন কী বহরের ছবি! য়ুরোপে সব চেয়ে বড়ো স্টেজেও এ-ছবিটিকে খুলে বিস্তৃত ক'রে দাঁড় করানো যায় না। ১৯২৫ সালে যখন জান স্টাইকা দেহত্যাগ করেন তখন এ-ছবিটির কথা প্রায় লোকে ভুলেই গিয়েছিল—লিখছেন ঐতিহাসিক। সেই সময়ে এক আমেরিকান ডাক্তার হিউবার্ট ঈটন—( যিনি লস এঞ্জেল্‌সে 'ফরেস্ট লন' নামে প্রকাণ্ড সমাধি-উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করেন )—এ-ছবিটি শুধু কিনেই ক্ষান্ত হন নি, একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা প্রদর্শনী-গৃহ নির্মাণ ক'রে ফেললেন যেখানে এ-ছবিটি রাখা হ'ল।

এ ছবিটি সম্বন্ধে বর্ণনা করবার আগে একটু জল্পনা করলে মন্দ কী?

মানুষ আর্ট থেকে অনেক কিছু চায়—কিন্তু সবাই এক বস্তু চায় না। একথা শুধু আর্ট নয়—ধর্ম সম্বন্ধেও সমান খাটে। কেউ ধর্ম থেকে চায় শান্তি, কেউ চায় মুক্তি, কেউ ভক্তি, কেউ বা জ্ঞান। তেম্‌নি আর্ট থেকে কেউ চায় তৃপ্তি, কেউ চমক, কেউ উত্তেজনা, কেউ রুচিবিকাশ। আমি কোনোদিনই "আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক" মন্ত্রে দীক্ষিত হই নি। যে-আর্ট মনকে ভগবৎমুখী করে না তাতে ক্ষণানন্দ পেয়েছি, কিন্তু তার পরেই এসেছে ধূসর শূন্যতা বা অবসাদ। তাই হয়ত ছবি আমাকে তেমন মুগ্ধ করে নি, কেন না ছবি থেকে ক্বচিৎ পেয়েছি ঊর্ধ্ব অভীপ্সার, ভাগবত ভাবের প্রণোদনা। রাফাএলএর সিস্টীন মাদোনা দেখে যে ভুলতে পারিনি সে তার আর্টের জন্যে নয়—খৃষ্টের দেবভাব সে-ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে ব'লে। ঠিক সেই জন্যেই অভিভূত হয়েছিলাম এই বিরাট ক্রুসিফিকশনের ছবি দেখে। এর ভাবানুষঙ্গ যে দেবরাজ্যের। যাক্‌ এবার বলি ছবিটির কথা।

* * *

একটি প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহে সারি সারি চেয়ার। সাম্‌নে বিরাট রঙ্গপীঠ, যবনিকা ঝুলছে। আমরা গিয়ে নীরবে চেয়ারে বসলাম। এখানে কথা কওয়া বারণ।

ঘরে ঢুকেই মনটা ভ'রে গেল। কী সুন্দর ঘর! কী শুব্ধ। গির্জার মতন গির্জাই বটে। জন, লী, ইন্দিরা ও আমি ব'সে রইলাম। কোনো প্রার্থনামন্দিরেও এভাবে বসিনি উৎসুক হ'য়ে।

খানিক বাদে যবনিকা তোলা হ'ল। দেখলাম ছবি। তার বর্ণনা ভাষায় হয় না। তাই কী-ই বা বলব? শুধু বলি এর পরিপ্রেক্ষিতের কথা।

প্রকাণ্ড মরুভূমি-মতন। এখানে ওখানে কয়েকটি বাড়ি। একটা খাদ। বালি বালি বালি। বহু লোক প্রতীক্ষমান, কেউ ঘোড়ায় চ'ড়ে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ব'সে। কেউ বা মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সাম্‌নে যীশু দাঁড়িয়ে একটি প্রকাণ্ড ক্রসের সাম্‌নে। এদিকে ওদিকে কয়েকটি মেয়ে তাঁর দিকে চেয়ে নতজানু হ'য়ে রয়েছে—কেউ বা মুখ ফিরিয়ে।

ভাবটা—এক্ষুণি যীশুকে ক্রসে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। যীশু সোজা দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে!

দেখতে দেখতে মনে প্রার্থনা জেগে উঠল—চোখে অশ্রুকণা। মনে মনে বললাম: "প্রভু, দেবতা হ'য়ে এসেছিলে মানুষের দুয়ারে। তোমাকে তারা বুঝবে কেমন ক'রে? আজো আমরা কতটুকুই বা বুঝি তোমার মহিমা! শুধু তুমি যে এসেছিলে অপার করুণায়—তমোবিলাসী দুর্ভাগাদের কিছু আলো বিতরণ করতে সেটুকু তো ভুলবার নয়। বুঝতে যদি নাও পারি তোমার করুণার মর্ম—প্রণাম করি যে, তুমি এসেছিলে 'দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে'।"

খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে' ব'সে থেকে বেরিয়ে এলাম। ইন্দিরার চোখে জল। আমি কী বলব ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ পরে জনকে বললাম: "এহেন ছবি মানুষ এঁকেছে, অথচ শুনি নি তো এর কথা!"

জন বলল: "য়ুরোপের অনেক রুচিবাগীশ আমাদের আমেরিকানদের নিয়ে হাসাহাসি করে যে একটিমাত্র ছবির জন্যে আমরা চিত্রগৃহ ফেঁদে বসেছি।"

আমি বললাম হেসে: "মনে রেখো যীশুর কথা—ভগবান্, এদের ক্ষমা কোরো, এরা জানে না কী করছে!"

যুগে যুগে কত মহিমময় পুরুষই এই প্রার্থনা জানিয়েছেন দেবতাকে: "প্রভু, যারা তোমাকে ভুল বোঝে তাদের ক্ষমা কোরো।"—শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন সাবিত্রীতে:

"তাহাদের দিলো শূলে—দিল যারা শিরস্ত্রাণ-দান।" দেবদূতকে চিনতে শিখবে মানুষ কবে?

* * *

## সান্তা বার্বারা

পরদিন—২২শে মার্চ—জন ও লী ওদের মোটরে আমাদের পৌঁছে দিল সান্তা বার্বারায়—লস এঞ্জেল্‌স থেকে শতাধিক মাইল দূরে। সুন্দর সরণী, সাগরসৈকত-বিলম্বিনী। একধারে সমুদ্র, অন্য দিকে শৈলমালা। পরমানন্দে কাটল তিন ঘণ্টা ওদের মোটরে।

সান্তা বার্বারাতে সমুদ্র তীরে "মিং ট্রি" নামে একটি সুন্দর 'মোটেল'-এ আমাদের জন্যে ঘর রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন আমাদের আমেরিকান বান্ধবী—মিস্ মড ওক্‌স্। ইনি কয়েকটি বই লিখেছেন—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ভারতবর্ষে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সানফ্রান্সিস্কোয় "আর্ট ম্যুসিয়ম"-এ আমাদের নৃত্যগীত দেখে উল্লসিত হ'য়ে আমাদের লিখেছিলেন তাঁর শৈলাবাসে অতিথি হ'তে—"বিগ স্যুর" ব'লে একটি গ্রামে। সান্তা বার্বারা থেকে তাঁর ওখানে যাব—তিনি নিজে এসেছেন সেখান থেকে তাঁর মস্ত মোটরে আমাদের নিয়ে যেতে। ইনি যে কত দিক দিয়ে আমাদের আনুকূল্য করেছেন কী বলব? এমন সদয়-হৃদয়া মিষ্টভাষিনী সুশীলা কোনো দেশেই বেশি মেলে না। তাই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম যে, পথচলায় এমন বান্ধবী জুটল ভ্রাম্যমাণ ভ্রাম্যমাণার। ইন্দিরার সঙ্গে এঁর দেখতে দেখতে গাঢ় সখিত্ব হ'য়ে গেল। সৌকুমার্য যে এঁর সহজাত। আমাদের জন্যে কারমেল ব'লে একটি সুরম্য সাগরতীরবর্তী নগরে আমাদের যে নৃত্যগীতের আসর বসবে ২৭শে মার্চ—তার বন্দোবস্ত করেছেন ইনিই। কারমেল না কি আমেরিকার সুন্দরতম নগরীদের মধ্যে একটি। তাই আনন্দ হচ্ছে বৈকি সেখানে থাকব ব'লে।

কিন্তু ঐ যাঃ! পরের কথা ব'লে ফেলেছি আগে। তবে পরিতাপ কেন? একাজ এর আগেও করেছি একাধিকবার, পরেও করব। বলি—যে ঢঙে বলতে কলম চায়।

বলেছি, মড আমাদের ঠাঁই ক'রে দিলেন "মোটেল"-এ, আমাদের দেশে এ শব্দটি এখনো চালু হয় নি—অভিধানেও সম্ভবত পাওয়া যায় না। তাই বলি: মোটেল হ'ল হোটেল ও মোটরের মধ্যপদলোপী সমাসজাত একটি অত্যাধুনিক ইংরাজী শব্দ। এবার ব্যাখ্যার পালা।

বলেছি: এদেশে মোটর রাখা—যাকে বলে পার্ক করা—কী কঠিন। চারদিকেই সাইনবোর্ড শাসাচ্ছে "এখানে পার্ক করা নিষিদ্ধ," "এখানে মাত্র এক ঘণ্টা"—আর অনেক স্থানেই মোটর পার্ক করতে হ'লে অর্থব্যয় হয়।

অনেক হোটেলেই মোটর রাখবার আদৌ স্থান নেই। তাই যেসব হোটেলে মোটর রাখবার ব্যবস্থা আছে তাদের উপাধি লাভ হ'ল মোটেল। বুঝলেন এবার?

যাক—এ-হেন মোটেলে মড ওর মস্ত মোটর পার্ক ক'রে পুলকিত হ'য়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। করুণাময়ী এসেছে পাঁচঘণ্টা মোটরে ক'রে—কী?—না, আমাদের অভ্যর্থনা করতে। পরিশ্রমী মেয়ে—ছবি এঁকে ও বই লিখে জীবিকা-উপার্জন করতে হয় ওকে। তবু এত কষ্ট ক'রে এসেছে আমাদের জন্যে—শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে। সমর্সেট মম একবার লিখেছিলেন: সিনিক হ'তে পারবে মানুষ কেবল সেই পরম দুর্দিনে যেদিন জগতে নিস্বার্থ উপকার ব'লে কিছু থাকবে না—যেদিন দেখব মানুষের মধ্যে কেউই কারুর জন্যে কিছু করছে না যদি এ-কিছু করার পিছনে কোন স্বার্থসিদ্ধি না থাকে। মড আমাদের জন্যে যা করেছে তাকে নিস্বার্থ উপকার ছাড়া আর কোনো নামই দেওয়া চলে না। তাই আমরা ওকে সান্তা বার্বারাতে যাওয়ার কথা লিখতে না-লিখতে ও মোটরে ক'রে ছুটে এসে আমাদের জন্যে একটি অপূর্ব সুন্দর মোটেলে ঘর ঠিক ক'রে রাখল। সান্তা বার্বারাতে এসেই দেখি চমৎকার কাণ্ড! মোটেলই বটে। হোটেল ভালো কিন্তু হোটেল থেকে পদবৃদ্ধি হ'লে তবে না মোটেল। কাজেই ওকে হোটেলের চেয়ে কুলীন যদি নাও বলেন, প্রবীণ তো বলতেই হবে।

* * *

এহেন মোটেলে টমাস-দম্পতি আমাদের সঁপে দিয়ে গেলেন মডের হাতে। তাঁরা বিদায় নিলে আমি মোটেলের "সাঁতার-পুষ্করিণী"-তে সাঁতার দিলাম। সাঁতার-পুষ্করিণী অবশ্য ইতিপূর্বেও দেখেছি, কিন্তু এ-জলাধারের একটু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ, সামনেই সমুদ্র, কাজেই এ-পুষ্করিণীর জল সমুদ্র থেকেই নেবার কথা। কিন্তু এ-জল খাসা কলের জল—পরিষ্কার, নির্মল—একটুও নোনতা নয়। দ্বিতীয়তঃ জলাশয়টি কবোষ্ণ। শীতের দেশে কবোষ্ণ পুষ্করিণীতে স্নান হয়ত আমাদের দেশে বেশি লোক করেননি, কিন্তু স্নান করার আরামটি সকলেই কল্পনা করতে পারবেন আশাকরি।

শুধু স্নানাগারই নয়। সামনে চমৎকার বাগান। ফুলের মধ্যে ব'সে পাইপ-সেবন তথা কলম-পেশন। এ-বিলাসের কি জুড়ি আছে বলতে চান? এখন বিকেল পাঁচটা, মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম-সমাপনান্তে এই যে উঠেই বাগানে ব'সে

মন্দ-মারুত-হিল্লোলে সামনের গাছপালা ও চারদিকে নানারঙা ফুল দেখতে দেখতে ভ্রমণকাহিনী লিখে চলেছি, এ হেন ভাগ্যকেও যিনি হিংসা না করবেন তিনি নিশ্চয় অহিংসা-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

আর শুধু এইখানেই ভাগ্যের পরিসমাপ্তি নয়। কাল রাত্রে মড নিয়ে গেল এক রেস্তরাঁতে ওর মস্ত মোটরে। ভাবুন এ-বিদেশে রেস্তরাঁয় যাচ্ছি ঘড়ি ঘড়ি মোটরে চ'ড়ে অথচ মোটর রাখার শুধু যে ঝক্কি নেই তাই নয়, সে মোটর নিয়ে এসেছেন এক বান্ধবী—শুধু আমাদের দেখাশুনো করতেই—চারশো মাইল দূর থেকে। একেও যদি ভাগ্য না বলেন তবে নাচার। আজ সকালে প্রাতভ্রমণে একটু দূরে যেতেই মিলল কাফে। সেখানে বাগানে ব'সে কফি ও টোস্ট-ডিম্ব সেবন ক'রে ফিরে লেখা স্বরু করলাম: পিতৃদেবের গানটি বদ্‌লে বলি:

সারা সকালটি ব'সে ব'সে শুধু লিখেছি, যা কিছু দেখেছি,
যা কিছু এদেশে শুনেছি হে, বহু ভাগ্যে যা কিছু চেখেছি।

আয়ুর সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। রবীন্দ্রনাথের মতন চিরতরুণ হবার না আছে সহজ প্রতিভা, না দুর্নিবার বাসনা। যৌবনের অনেক উন্মাদনা, রসাস্বাদন, অনুভব-শক্তিই গেছে নিভে। কিন্তু তাব'লে ক্ষতিপূরণ কি কিছুই পাইনি? ভগবান্ এক হাতে কেড়ে নেন, আর এক হাতে ঢেলে দেন। সত্যকথা—প্রাণশক্তির কোঠায় সম্বল অনেক কমে গেছে। কিন্তু ভাবের মণিকোঠায় পাইনি কি—কত কী যার কল্পনাও করতে পারতাম না যৌবনে? তাছাড়া আগে বন্ধু-বান্ধবী লাভ হ'ত সহজে—মানি, কিন্তু স্থায়ী হ'ত না, বা স্থায়ী হ'লেও গভীরের কোঠায় মনের মিল হ'ত না এভাবে।

কথাটা আর একটু গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করি। মনের মিল বল্‌তে কী বুঝি? সংসারে আমরা দিনের পর দিন কত রকম প্রকৃতির মানুষের সঙ্গেই তো কয়েক পা চলি। কিন্তু মাত্র কয়েক পা। মনে পড়ে, সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় এইভাবে কয়েক পা চলেছিলাম, ধরা যাক, আমেরিকান আকাডেমির অধ্যক্ষ গেন্‌স্‌বরোর সঙ্গে। তিনি আমাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, ইন্দিরার হাঁপানির জন্যে ভালো ডাক্তারো বাহাল করেছিলেন—যে ফী নিল না। সব মানি, কিন্তু দুদিন যেতে না-যেতে দেখা গেল আমাদেরো যেমন তাঁকে বিশেষ কিছু দেবার নেই, তাঁরো তেমনি আমাদেরকে কিছু বলবার নেই। হাতে হাত মিলোলে বা কাঁধে কাঁধ মিললেই সৌহার্দ্য হয় না।

কিন্তু মড বা ডেভিড বা এলেন—যাঁর কথা পরে বলব—আমাদের কাছে এসেছিলেন অন্তরের সহজ টানে। এই টানই স্থায়ী হয়। একেই সংস্কৃতে বলে সমানধর্মী, বাংলায়—দরদী। চলতি ভাষায় একেই বলি বন্ধু বা সখী।

ঐ সঙ্গে আর একটা কথা বলব? ভয় হচ্ছে। তবে—নাঃ—ব'লেই ফেলি —যা হবার হবে।

কথাটা ভাবতে একটু হয়ত অবাক লাগে সময়ে সময়ে। তবু সত্য যখন সর্বোত্তম উপাস্য তখন এ-সত্যকে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, আস্তিক মানুষ সব সময়ে আস্তিকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অন্য ভাষায়: বাইরের সত্য ও অন্তরের সত্য এক নয়। তাই আশ্রমবাসী অধিকাংশ গুরুভাই-ই আমার কাছে পর হ'য়ে গেছে, আপন হ'য়েছে অনাশ্রমী নাস্তিক বা অনাচারী স্বাধীন ভাবুক। বিচিত্র সত্যস্বরূপের লীলা-খেলা! যেখানে মিল হবার কথা সেখানে এল গভীর ঔদাসীন্য, আর যেখানে বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনের অমিল সেখানে গ'ড়ে উঠল এমন টান যে মন ভ'রে উঠল!

* * *

মড ওর মোটরে আমাদের নিয়ে রওনা হ'ল দুপুর বেলা। নিমন্ত্রণ ছিল এক ভারতীয় বন্ধুর বাড়ি—আমাদের হোটেল থেকে বারো মাইল দূরে। "বারো মাইল যাব লাঞ্চ খেতে?" বললাম আমি ক্লিষ্টকণ্ঠে। মড হেসে বলল: "এখানে বারো মাইল তো কিছুই নয়।"

জানি—তবু···কিন্তু খেদ ক'রে কী হবে! "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" কথা দিয়েছি—যেতেই হবে।

বন্ধুবরের বাড়ির কাছে এসে কিন্তু পরিতাপ তাপমান যন্ত্রের মতনই প্রায় জ্বরতাপে পৌঁছল। তাঁর বাড়ির কাছে পার্বত্য রাস্তা আঁকা বাঁকা—তার উপর অতি বন্ধুর। এই প্রথম দুর্দান্ত রাস্তা দেখলাম বন্ধুর বাড়ি যেতে। গাড়ির ধাক্কায় ধাক্কায় যখন সমস্ত অন্ত্র কোকিয়ে কেঁদে উঠল, যখন ঠাহর পাওয়া শক্ত হ'ল আমরা মোটরে চ'ড়ে—না একায়—তখন সংশয়-দানব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: কাকে বরণ করেছিলাম বন্ধু ব'লে? এ-নিমন্ত্রণের নাম যদি বন্ধুতা হয় তবে শক্রতার সংজ্ঞা কী দেব? ইন্দিরা কোমলকণ্ঠে সান্ত্বনা দিল, "দুঃখ কী? পৌঁছব এখনি।" কিন্তু 'এখনি' বলতে কী বোঝায়—মন প্রশ্ন ক'রে বসল। ভাগবতে পড়েছিলাম, দ্বারকাবাসীরা কৃষ্ণকে বলছে: তুমি যখন দূরে কোথাও যাও প্রভু, প্রতি মুহূর্ত কোটি শতাব্দীর মতন মনে হয়—'তত্রাব্দকোটি-প্রতিমঃ ক্ষণো ভবেৎ'। মনে পড়ল

গীতার কথা: আমাদের সহস্র বর্ষ ব্রহ্মার কাছে এক পল। তখন বুঝলাম ব্রাহ্মী-চেতনা-লাভের কার্যকারিতা: আহা, যদি সে-চেতনা আজ পেতাম, এ-আধঘণ্টা আধ সেকেণ্ডের মতন কেটে যেত! যাক্।

এমনিই হয়! 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—এ কালাতীত ধরাধামে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই, সুখ একটু পেয়েছ কি চক্রবৎ দুঃখ হানা দিয়ে বসেছে—বসবেই: 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'? কাজেই মিং টি্ হোটেলের পরমানন্দের পরই এল বন্ধুর আতিথ্যের শোকাবহ অভিজ্ঞতা।

প্রথমত বন্ধু পরীক্ষা করলেন এমন খাদ্য পরিবেষণ ক'রে যাকে সুস্বাদু বলতে হ'লে সত্যমিথ্যার সীমারেখাকে মুছে ফেলতেই হয়। কিন্তু গোদের উপর বিষফোড়া—বন্ধুর অনর্গল দুর্বোধ্য ইংরাজি বলা। শুধু দুর্বোধ্য নয়—তাঁর কথার মাথামুণ্ড পাওয়া ভার। কোথায় কর্তা, কোথায় ক্রিয়াপদ—কোথায় বিশেষণ? মনে হ'ল বন্ধুবর পিকউইক পেপার্সের মিস্টার জিঙ্গল্-এর কাছে আলাপের তালিম নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের সে কত কাহিনী যে সুরু করলেন—আর সে কি সহজ আরম্ভ! গীতার বাণী প্রায় ব্যর্থ হয় আর কি—প্রায় অবিশ্বাস এসে গেল "যার সুরু আছে তারই সারা আছে।" বন্ধুবরের কমা-সেমিকোলন-বিহীন অনর্গল বাণী শুনলে গীতার সত্যদর্শনে আর আস্থা রাখা কঠিন হয়। "বিশ্বাসের কী অগ্নিপরীক্ষা মধুসূদন!"—বললাম মনে মনে। সত্যি বলছি, মনে মনে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে" জপ সুরু করলাম—শুধু বচনোদ্‌ভ্রান্ত মনকে উপশান্ত করতে। অলডাস হাক্সলির একটি গল্প মনে পড়ল—জনৈক "ক্র্যাশিং বোর"-এর কাহিনী···

বন্ধুবর ব'লে চললেন কথার পর কথা, আত্মকাহিনীর পর আত্মকাহিনী, হাসির গল্পের পর হাসির গল্প—যে-গল্প শুনে অতিথিদের শুধু ভদ্রতা রক্ষা করতেই স্মিতানন হ'তে হ'ল! কারণ গৃহকর্তা হাসছেন তা আবার খাদ্য পরিবেষণ ক'রে —না হেসে উপায়? তাঁর কথার দু'একটি নমুনা দিই। ইনি নিজেকে বলেন "যোগ"—যোগী নয়—যোগ, মনে রাখবেন। এহেন "যোগ"-কে একজন বলেছিলেন মিথ্যাবাদী। তাকে বন্ধুবর যে পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন তার মর্ম হচ্ছে—"যদি আমি মিথ্যাবাদী না হই তবে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বানাতে পারবে না, আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমাকে মিথ্যাবাদী ব'লে কী আর এমন রাজা ক'রে দেবে?"

আর একবার বললেন: "আমি সে-সময়ে পাঞ্জাবে। সেখানে তখন মুসলমানরা হিন্দুদের নির্বংশ করতে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এক হিন্দু বললেন:

'আমি পালাব না।' আমি তাঁকে বললাম: 'সাবাস জোয়ান! এই তো চাই, থাকুন, মা ভৈঃ।' তারপর আমি কী করলাম? কিছু না, শুধু মুসলমানদের ব'লে দিলাম: 'এঁর গায়ে হাত দিও না'। মুসলমানরা তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে চ'লে গেল, এমন কি আল্লা আল্লাও না ব'লে।" এ-হেন মহাপুরুষকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কী উপাধি দেব? বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার আমেরিকাপ্রয়াণের কথা শুনে গতবৎসর আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন: "বড় আনন্দ হ'ল শুনে! কত নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রে আসবে আবার!" অভিজ্ঞতা বটে—যদিও যা ঘরে আনলাম তাকে সিন্দুকে তুলে রাখবার মতন মণিমুক্তা বলা চলে কি না সে-বিষয়ে মতভেদ হ'তে পারে। যাহোক এহেন সাক্ষাৎ "যোগ"-এর উদ্দেশ্যে একটি ছড়া মনে গুনগুনিয়ে উঠেছিল:

ভাষা দিলেন মা ভারতী করতে প্রকাশ মনের কথা।
শুনতে খাসা—তবু যদি সায় দিতে না বাজত ব্যথা!
বন্ধু! তুমি কোথায় পেলে বাক্য-ঝড়ের এই প্রেরণা?
কিন্তু মুঠোর মধ্যে পেয়ে মরস্তকে আর মেরো না।

শেষরক্ষা করল কিন্তু ইন্দিরার বিদ্যুৎপ্রেরণা: যখন আমরা ভোজন করতে ব'সে প্রায় অন্তিম নিরাশার অতলে ডুবসাঁতার কাটছি অথচ বন্ধুবরের কথা চলেছে তো চলেইছে অশ্রান্ত কল্লোলে—ঠিক তখন ইন্দিরা বলল আমাকে মিস্টার ব্রিনাণ্ডের গল্প করতে। কোনোমতে বন্ধুবরের মুখে থামা দিয়ে বললাম: "তখন আমরা—১৯২১ সালে—সুইজর্লণ্ডে সেণ্ট বার্ণার্ড মঠ দেখে ফিরেছি—সবাই পুলকিত। খাওয়াদাওয়ার পরে আমাদের প্রত্যেককে বলতে হ'ল কোনো-না-কোনো মজার ছড়া। রসিক বন্ধু ব্রিনাণ্ড—তাঁকে আমরা তোৎলামি ক'রে বলতাম মিস্টার ব্রিগাণ্ড—আবৃত্তি করলেন:

"Electrical appliances have superseded steam
And all the old-timed vessels are an antiquated dream.
We have wireless telegraphy, we fly by land and sea;
We play machine pianos but never touch a key.
The good old-fashioned belly-ache is appendicites now
And we are eating daily butter that has never seen a cow.
Progress is our watch-word: modern times have come to stay,
But I'm glad we kiss our sweethearts in the good old-fashioned way."

অবশেষে ঘরের অতিথিরা হাসলেন মন খুলে—যার নাম কাষ্ঠহাসি নয়।

* * *

বাষ্পযানের কমল কদর বিজ্‌লিশিখার অভ্যুদয়ে:
সেকেলে সব হ'ল বাতিল নতুন ঢাকের দিগ্বিজয়ে।
বেতার বাণী ছড়িয়ে গেল—আমরা উধাও জলে স্থলে:
আকাশবাণী ঘরে ঘরে—বাদক বিনা বাজনা চলে!
নাম পেল 'আপেণ্ডিসাইটিস'—শূল বেদনা বলতে যাকে!
গাভী বিনা মিলছে মাখন মার্গারিনের স্বাদসোহাগে!
আগের কিছুই নেই—শুধু আজ একটি পুলক জাগে চিতে:
প্রেয়সীকে চুমন করি আজও প্রাচীন পদ্ধতিতে।

## বিগ সূর

বন্ধুবরের লাঞ্চ সেরে যথাসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে গাত্রোত্থান ক'রে যখন উঠলাম ফের মডের মোটরে তখন বেলা আড়াইটে। হু হু ক'রে চলল মোটর ফের সেই পরিপাটি আমেরিকান রাজপথে: একধারে অব্ধি অন্যধারে অদ্রি!—দেখতে দেখতে দ'মে-যাওয়া মন ফের উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। দুঃখের পর পুনরায় সুখের আবির্ভাব—নিয়তির সেই সনাতন চক্রঘূর্ণনে!

মড অতি লক্ষ্মী মেয়ে—তাই জানত যে, দৃশ্য যতই কেন না সুন্দর হোক মোটরে অবিশ্রান্ত ছ' ছ' ঘণ্টা দৌড়ানোর পর মন আর গ্রহণ করতে পারে না সে সৌন্দর্য: "স্পিরিট" রাজী থাকলেও "ফ্লেশ" হ'য়ে ওঠে নারাজ। শুধু দৃশ্য-সৌন্দর্যই বা বলি কেন—গান বাজনা বক্তৃতা অভিনয় আবৃত্তি কিছুই খুব বেশিক্ষণ ভালো লাগে না, মনেরও আছে পাকস্থলী, ক্রমাগত খোরাক পেলে তারও অন্ত্র প্রথমে অনিচ্ছুক হ'য়ে ওঠে, পরে করে স্রেফ বিদ্রোহ। তাই মডের দূরদর্শিতাকে ধন্যবাদ দিলাম যখন বেলা সাড়ে পাঁচটায় পথিমধ্যে একটি মনোরম হোটেলে রাত্রিযাপন করবার জন্যে আমাদের নামালো। বড় সুন্দর শহর, হোটেলটিও রমণীয়, সমুদ্রের ধারে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ফের রওনা দিলাম।

এবার যে দৃশ্য দেখলাম তেমন দৃশ্য এযাবৎ দেখি নি আমেরিকায়। বিগ সূর একটি ছোট গ্রাম, 'আরণ্যক' উপাধি দেওয়া যায়। কারণ গভীর শৈলারণ্যের মধ্যে গ্রামটি অবস্থিত। পাহাড় অবশ্য খুব উঁচু নয়, তবু এদেশে হাজার দেড় হাজার ফিট উঠলেও শৈত্যাধিক্য বেশ একটু প্রকট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু গিরিপথে

যখন আমরা উধাও হয়েছিলাম তখন এ-শৈত্যাধিক্যের কথা মনেও হয় নি। একধারে শ্যামল শৈলারণ্য, অন্যদিকে সুদূর-প্রসারী চলোর্মি। আঁকা-বাঁকা পথ। কখনো বা এখানে ওখানে ঝরনার কলসম্ভাষণ। শৈলবাহী পথের যে কোনো নববৈচিত্র্য আছে তা নয়—কেবল অতি সুন্দর মসৃণ রাজপথ এইটুকু ছাড়া। কিন্তু এপর্যন্ত এমন কোনো পাহাড়ে উঠি নি যার ধার দিয়ে ধার দিয়ে সমুদ্র চলেছে সমস্তক্ষণই। যতই উঠছি, নানা ফাঁকে নানা ভাবে নানা ছন্দে সমুদ্রের হচ্ছে রংবদল। কখনো বা শুধু অশ্রান্ত বীচিমালা গিরিপাদমূলে গর্জন ক'রে আছড়ে পড়ছে, কখনো বা কোনো তুচ্ছ পাথরে, কখনো বা শুধু প্রসার, সাদার পর সাদা ঢেউ—মাঝে মাঝে লাল পাথর—সে যে কী অপরূপ! কিন্তু না, ভুললে চলবে না যে, দৃশ্য বর্ণনা করা রূপসীর রূপ-বর্ণনার মতনই পণ্ডশ্রম। যারা দেখে নি তারা খতিয়ে শুধু বুঝবে একটি কথা: খুব সুন্দর। তবু একটু উচ্ছ্বসিত হলাম শুধু জানাতে যদি ভবিষ্যতে আমাদের দেশের কোনো ভ্রাম্যমাণ এদেশে আসেন তবে তিনি এই দৃশ্যটি উপভোগ করলে প্রসন্ন হবেনই হবেন।

* * *

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় পৌঁছলাম মডের শৈলাবাসে।

কী অপরূপ নির্জন গণ্ডির পরিবেশে ওর মনোরম কুটীরটি সুখাসীন! যে কোনো ঘর থেকে এধারে দেখা যায় সমুদ্র, ওধারে শৈলমালা। আর একেবারে থমথমে নিস্তব্ধ। আমেরিকার মতন দেশে যে এমন নিস্তব্ধ কুটীর এ-যুগেও মিলতে পারে—না, হয়ত এমন স্থান আরো আছে। তবে আমি এ-যাবৎ দেখি নি, বা এদেশে এমন নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশে যে কোনো মেয়ে এভাবে একেবারে একা বসবাস করতে পারে ভাবি নি। মডকে বললাম: "তোমার একটিও চাকর নেই?"

"না। সব কাজই নিজের হাতে করি। খুব সহজ।"

বাজার করা, রাঁধা, বসন-বাসন ধোওয়া, গৃহমার্জন সব করে একাকিনী এ-স্বাবলম্বিনী! তার ওপরে আঁকে ছবি, লেখে বই। এদেশে লেখিকা ব'লে ইতিমধ্যে ওর একটু নামডাকও হয়েছে বৈকি। কারণ, তিন তিনটি বই লিখেছে —ভ্রমণকাহিনী, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এই সব নিয়ে। মেক্সিকোর দক্ষিণে গোয়াতেমালা হাইল্যাণ্ডে গিয়ে বহু কষ্ট ক'রে ছিল অনেক দিন সেখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে—তাদের রীতিনীতির খবর নিতে। ওর বইটি 'বিয়ণ্ড দি উইণ্ডি প্লেস' ছাপাল এক মস্ত প্রকাশক—দাম সাড়ে আঠার শিলিং; আর একটি

বইয়ের নাম 'দি টু ক্রসেস অব টোডোস স্যান্টস'; আর একটি বইয়ের নাম 'হিয়ার দি টু কেম টু দেয়ার ফাদার', এর দাম আরো বেশি—কারণ অনেক বড় বড় ছবি। দশ পনরো ডলার হবে।

এ-ধরনের নৃতত্ত্ব বা পুরাতাত্ত্বিক বই লিখে থাকেন সচরাচর পণ্ডিতে। কিন্তু মড মেয়ে—এবং খুব বয়স্ক মহিলাও নয়। ওর প্রথম বই যখন বেরিয়েছিল তখন ও তরুণীই ছিল বলব। এখন ওর বয়স হবে চল্লিশ। এ-দেশে চল্লিশ কিছু বেশি বয়স নয়। তবু এই বয়সেই ও এই সব গম্ভীর কাজ নিয়ে আছে একেবারে একা—প্রায় নৈমিষারণ্যে বললেই হয়। অথচ যখন কথাবার্তা কয় তখন ও যেমন সামাজিক, তেমনি হাস্যময়ী, মিষ্টভাষিণী।

ও যে কি খুশি হ'ল আমাদের পেয়ে—ভারতীয় গান শুনে, নৃত্য দেখে! কাল রাতে ওর কয়েকটি প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী এলেন। আমরা গাইলাম দুটি গান এক সঙ্গে। শেষ করলাম নামকীর্তনে: "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।"

গানের শেষে মড বলল: "প্রতিবেশীরা সবাই বললেন যে, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন।" একজন পরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেও জানালেন যে, তিনি শুধু মুগ্ধ নয়—অভিভূত হয়েছেন। একজন দশ ডলার প্রণামীও দিলেন।

২৬শে মার্চ। আজ পুণ্যাহ—ইন্দিরার জন্মদিন। মড ওকে দিল উপহার একটি সুন্দর পাথর—কণ্ঠমালার মধ্যমণি, আর একটি কবিতার বই।

ইন্দিরা সকালে নৃত্য অভ্যাস করল। আমি ধরলাম কলম। মড গেছে এখান থেকে দশ মাইল দূরে বাজার করতে। কাল আমাদের নৃত্যগীত হবে এক বিশিষ্ট আসরে—কারমেল ব'লে একটি রমণীয় শহরে, তার সব সাজ সরঞ্জামও ঠিক ক'রে আসবে ফিরতি মুখে।

২৭শে মার্চ বেলা চারটেয় ফের বেরুলাম মডের মোটরে। কারমেল পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল। পথ যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠল! আঁকা বাঁকা রাস্তা, একধারে সেই সনাতন নীলাম্বু, অন্যদিকে শাশ্বত শ্যামাদ্রি। তবু সারা পথ কেবল মনে হচ্ছিল হয়ত আর কোনোদিনই এ-পরমসুন্দর দেশে আসব না, হয়ত মডের সঙ্গেও আর কোনোদিন দেখা হবে না—যদিও ও কথা দিয়েছে যে, আমাদের কাজে ও ভবিষ্যতে সহায় হবে ও আমাদের সঙ্গে এসে থাকবে। বিশেষতঃ ভারতীয় নাগপূজকদের সমাজরীতি ও জীবনাচার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে ওর কী যে সাধ! বলছিল ও মেক্সিকোর দক্ষিণে আদিম

রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে কী ভাবে ছিল সে পাণ্ডববর্জিত দেশে—এক আধ মাস নয়—তিন তিনটি বৎসর। প্রথমে তারা ওকে সন্দেহের চোখে দেখত। "না দেখবে কেন?"—বলত ও—"স্পানিশ সৈন্যেরা এসে যে কী ভাবে অত্যাচার করছে! গ্রামকে গ্রাম উজাড় ক'রে দিয়েছে—কৃষকদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে, শস্য হস্তগত ক'রে তাদের অনাহারে রেখে দিনে দিনে শুকিয়ে মেরেছে। ওয়র্ডস্ওয়র্থের দীর্ঘশ্বাস মনে পড়ে: "What man has made of man!"

বটে। তবু এই মানুষই আবার সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে গেছে জ্ঞান আহরণ করতে—দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু পার হ'য়ে উধাও হয়েছে ঝড় মেঘ বজ্রকে তুচ্ছ ক'রে। কী? না, আকাশের খবর পেতেই হবে। কত সব দুস্তর পথ বিপথ অতিক্রম ক'রে উড়িয়েছে শান্তি-পতাকা! ধরা যাক মডের মতন "সবলা" (ওকে অবলা বলবে কোন্ সবল?) যে সত্যি সত্যি অর্ধাশনে কাটিয়েছে দিনের পর দিন কোথায় এক নাম-না-জানা জাতির রীতিনীতির খবর নিতে ও দিতে! পাশ্চাত্য দেশকে আমরা কথায় কথায় বস্তুবাদী ব'লে গালমন্দ করি! কিন্তু কী দুর্দম্য এদের জ্ঞানস্পৃহা? মডকে দেখে যেন এ-জাতির মনস্তত্ত্বের একটি গভীর মণিকোঠায় ছাড়পত্র পেলাম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুপারিশে। নৈতিকতা সম্বন্ধে ওর ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণার হয়ত নানান্ অমিল আছে—কিন্তু এই যে জ্ঞানের অভীপ্সা যার অঙ্কুশে ওর কুমারী মন আবাল্য অশান্ত—যার তৃষ্ণা ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে কোথায় কোথায়—যে অতৃপ্ত প্রেরণা ওকে ফের ভারতের দিকে টানছে আমাদের উপলক্ষ্য ক'রেই বলব—এ-সব থেকে কি মনে না হ'য়ে পারে যে, অন্তর্জগৎ নাই হ'ল—বহির্জগৎ সম্বন্ধে ওদের এই-যে শ্রান্তিহীন জ্ঞানস্পৃহা এর মূলে আছেই একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রণোদনা যার নাম—নাল্পে সুখমস্তি? স্বভাব ও স্বধর্মের ভেদ থাকবেই এ জগতে—কিন্তু গভীরে সব বিকশিত মানুষের মধ্যেই একটি অদ্বিতীয় পিপাসা চির-জাগরূক—যার নাম "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী!"

## কারমেল

কারমেলে রাত কাটালাম একটি পরম রমণীয় হোটেলে। সেদিন রাতে ওখানে চেরি ফাউণ্ডেশন সোসাইটির একটি অধিবেশনে আমাদের নৃত্যগীতের

আসর বসল মাদাম চেরির সুরম্য সভায়। শুধু আসর জম্‌ল তাই নয়—দক্ষিণা মিলল আশার অতীত। আমাদের নৃত্যগীতের পর কত নরনারী যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন কত কথা! একটি দম্পতির উচ্ছ্বাস ভুলব না কোনোদিন। স্বামী



কারমেল

আবেগ জানিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন, স্ত্রী ইন্দিরাকে বললেন: "আমি চাই আপনাকে গুরুপদে বরণ করতে। আমি বড় মনঃকষ্টে আছি, আলো চাই অথচ পাই না। এর কাছে যাই, ওর কাছে যাই কিন্তু নানা গোলমাল বাধে।" ইন্দিরা বলল: "আমি তোমার গুরু হ'তে পারব না। তবে আলো যদি সত্যিই চাও তো পাবে—কেবল চাওয়া ছেড়ো না।" মেয়েটির চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু! মনে থাকবে। গানের সূত্রে এরকম কত গভীর আবেগের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এ-ধরনের পরিবেশে এ-জাতীয় আবেগের মধ্যে যেন কোথায় একটা নতুন সুর বেজে উঠল!

পরদিন বেলা সাড়ে দশটায় প্রথম আমেরিকান ট্রেনে উঠে আমার মনের মধ্যে যেন বালক-ভাব উঠল জেগে! মনে পড়ল ছেলেবেলাকার কথা: যা দেখি তাতেই উচ্ছ্বসিত হওয়া। কী সুন্দর এদের কামরা! কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র! কৌচ, টেবিল, টেবিল-বাতি, উত্তাপ-বিতরণের ব্যবস্থা! আমরা নিয়েছিলাম ড্রয়িংরুম-কামরার টিকিট। সে কী মনোরম বিলাস! মোটা কার্পেটে



আসীন কোমল আসনে গদীয়ান্ হওয়া। বসতে না-বসতে আরামে চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। কিন্তু ঘুমব—সাধ্য কী? দুধারে অশ্রান্ত সৌন্দর্যের সবুজ আগুন লেগেছে! আর ট্রেন! সে কি সোজা ট্রেন! প্রায় আধ মাইল লম্বা। জায়গায় জায়গায় যখন ঘোরালো গিরিবর্ত্মে ট্রেন চলে, পিছনকার ড্রয়িংরুম থেকে দেখা যায় সামনে ট্রেন! আমি বললাম: "দেখ দেখ, আর একটি ট্রেন চলেছে!" বন্ধুবর হাণ্টার (ও এসেছিল ফের আমাদের নিমন্ত্রণে সানফ্রান্সিস্কো থেকে) বললেন হেসে: "ও যে আমাদের ট্রেন!" বলতে না-বলতে ওমা!—যে-সর্পিল ট্রেন দেখা যাচ্ছিল বাঁ দিকে, তাকে দেখা গেল ডাইনে! অবিকল সর্পিল গতি—এঁকে বেঁকে চলেছে যেন একটি প্রকাণ্ড অজগর! দার্জিলিংএ শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনের এ-রূপ একটু দেখা যায় বটে, কিন্তু এ-হেন দৈর্ঘ্য! যে কোনো রূপকে যদি ফাঁপিয়ে পঞ্চাশগুণ করা যায় তবে সে পরিচিত ছন্দকে পেরিয়ে বহন ক'রে আনে এক অচিন পরিচয়ের বিস্ময়ানন্দ। আমেরিকার ট্রেনের বিলাসিনী সজ্জা ও অভিনব দৈর্ঘ্য আমাদের এই ভাবেই আশ্চর্য করেছিল। ড্রয়িংরুম থেকে করিডোর বেয়ে ডাইনিং রুমে পৌছনো মানে—সত্যিকার মর্নিং ওয়াক্।

* * *

সান্তা বার্বারায় ফিরে এসেই সন্ধ্যায় লিওনাইন ফেরহেল নামে এক অভিজাতবংশীয়ার সালঁতে আমাদের নৃত্যগীত হ'ল। ইতিমধ্যে খবরের কাগজে

আমাদের ছবি ও প্রেস-প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ ছাপা হয়েছিল। কাজেই ভিড় হ'ল অত্যধিক। বহু লোককে এই শীতের রাতে ঠায় বাইরে ব'সে মোটা ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে শার্শির মধ্যে দিয়ে নাচ দেখতে হ'ল ও লাউড স্পীকারের ফানেলে আমার গান শুনতে হ'ল। তাদের শৈত্যকষ্টের জন্যে সমবেদনা অনুভব করলাম বলাই বাহুল্য, কিন্তু ভারতীয় নৃত্যগীতের জন্যে যে ওরা এত কষ্ট করতে প্রস্তুত চাক্ষুষ ক'রে একটু আত্মপ্রসাদও যে অনুভব করি নি, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

সেই "যোগ" ঠাকুর আমাদেরকে অভ্যাগতদের কাছে পেশ করলে পর আমাকে বলতে হ'ল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে দু'চার কথা। তারপর গান। সর্বশেষে "প্যালা"। দক্ষিণা জুটল বৈকি।

* * *

সান্তা বার্বারাতে স্বামী প্রভবানন্দের তদারকে আছেন চারটি আমেরিকান মহিলা —একটি মেয়েদের মঠে ওরফে কনভেণ্টে বা নানারিতে—যে নামই দিন। স্বামীজি আমাদের নিতে সন্ধ্যাবেলা পাঠিয়ে দিলেন তাঁর মোটর। আমি হাণ্টার ও ইন্দিরাকে সঙ্গে ক'রে গেলাম। কী সুন্দর পরিবেশ! এক ক্রোরপতি এ-মঠটি স্বামীজিকে দান করেন ও খরচা দেন বাৎসরিক নয় হাজার ডলার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। মঠের মধ্যে বাগান ফুল রাস্তা বাড়ি সবই অতি মনোরম। সব চেয়ে মধুর লাগল ঠাকুরের ছোট্ট মন্দিরে তিনটি সন্ন্যাসিনীর সন্ধ্যারতি ও বাংলা কীর্তন গান। তারপর ধ্যান হ'ল। হাণ্টার নতজানু হ'য়ে ব'সে ততক্ষণ। ইন্দিরার সমাধি হ'ল। আমার মনে প্রার্থনা জেগে উঠল: "ঠাকুর, তোমার ভক্তির শতাংশের একাংশও যদি দাও..."

তারপর মঠে সান্ধ্যভোজন সমাপন হ'লে, একটি আমেরিকান মেয়ে গাইলেন বাংলা গান: "জগত জননী শ্যামা" ও "যদি গোকুলচন্দ্র।" স্বামীজি বললেন, মেয়েটি রেকর্ড থেকে গান দুটি তুলেছে। বাহাদুরি আছে মানতেই হবে। অবশেষে স্বামীজি আমাকে গাইতে বললেন "চাকর রাখো জী"—ঠাকুরের সমাধিস্থ ছবির সামনে। এমন আবহে গান গাইতে মনে হ'ল যেন মন উড়ে দেশে ফিরে গেছে। ঠাকুরের ছবিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম—এ-আনন্দ তো তাঁরই করুণায় পেলাম। আরো, দেখতে পেলাম অপরূপ দৃশ্য—আমেরিকান মেয়েরা ঘণ্টা বাজিয়ে, চামর বাতি ঘুরিয়ে আরতি করছে ঠাকুরের ছবির সামনে! মন্দিরের চলতি আরতি প্রায়ই প্রাণহীন হ'য়ে থাকে। কিন্তু ওরা বিদেশিনী, ব্রহ্মচারিণী যাকে বলে। এদের

আরতির দৃশ্যে মন ভ'রে উঠল। মনের মধ্যে গৌরব অনুভব করলাম যে, আমি হিন্দু এবং সেই জাতের একজন—যাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি, রামদাস, তুকারাম, দাদু, কবীর, নামদেব—সর্বোপরি, মহীয়সী মীরাবাই যিনি ইন্দিরাকে ও আমাকে দিনের পর দিন গান শোনাচ্ছেন—এখনো।

* * *

ওখান থেকে ফিরে এলাম লস এঞ্জেল্‌সে—অতিথি হ'লাম ফের বন্ধু জন টমাস-দম্পতির। এই ঘোরাঘুরির অত্যাচারে ইন্দিরা অসুস্থ হ'য়ে পড়ল রাতে। হঠাৎ ওর বুকে দারুণ বেদনা। কিন্তু কী আশ্চর্য—সেই বেদনার মধ্যেও ধ্যান করতেই ওর ফের সমাধি! সমাধি ভাঙলে বলল: "দাদা, মীরা ফের একটি গান গাইলেন।" গানটি আবৃত্তি করল, আমি টুকে নিলাম যথাবিধি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক'রে বললাম টমাস ও লীকে—গানটির মানেও দিলাম বুঝিয়ে। ওরা তো অবাক্‌। গানটি এতই সুন্দর যে এখানে টুকে দিলাম, আমার অনুবাদ সমেত:

মন মেরা বৈরাগী রাজা, করে য়ে কিসসে প্যার?
তন দুখিয়াঁ মহলোঁমে মেরা গহনে হো গয়ে ভার।

ঘর নহি মাঁগে, ধন নহি মাঁগে, মাঁগে আন ন মান,
শান্তী শকতী সুখ নহি মাঁগে, মাঁগে না য়ে জ্ঞান।
য়ে তো মাঁগে চরণ হরীকে দেখে আর ন প্যার:
মন মেরা বৈরাগী রাজা, করে য়ে কিসসে প্যার?

প্রভুকারণ মৈ বনূঁ বৈরাগন্‌, মথুরানগরী জাউঁ,
কুঞ্জ গলী বন্‌ দীন ভিখারন্‌ গোবিন্দ গোবিন্দ গাউঁ।
হৃদয় প্রেমকা দীপ বনাউঁ—অঁসুঅনকে কর হার:
মন মেরা বৈরাগী রাজা, করে য়ে কিসসে প্যার?

প্রভু সঙ্গ মেরে লাখোঁ নাতে, যুগযুগকী হৈ প্রীত।
তাত মাত সুত বন্ধু মেরে বড়ে পুরাণে মীত।
জনম জনমকী দাসী মীরা মাঁগে নন্দকুমার:
মন মেরা বৈরাগী রাজা, করে য়ে কিসসে প্যার?

গানটি ও আবৃত্তি করল হাঁপাতে হাঁপাতে, থেমে থেমে। দেখে কষ্ট হচ্ছিল, ভাবলাম বলি "থাক্‌ এখন।" কিন্তু এহেন অপরূপ গান পরে ভুলে যাবে তো,

কাজেই লোভ সংবরণ করতে পারলাম না এবারো—ওর কষ্ট সত্ত্বেও ওকে বললাম : "কোনোমতে আবৃত্তি ক'রে যাও।" টমাস-দম্পতি দেখে শুনে তো অবাক্। গানটির বাংলা তর্জমা নিচে দিই বাঙালী পাঠকের জন্যে :

মন যে আমার বিরাগী রাজা, সে সাধিবে প্রণয় কার ?
বিষণ্ন তনু প্রাসাদে—বহিতে পারে না ভূষণভার।

চায় না সে গেহ, সম্পদ প্রেয়, কীর্তি কি সম্মান,
শান্তি শকতি সুখ সে চায় না, প্রতিভা জ্ঞানের দান।
হরির চরণই চায় সে যে—হোক আর সব ছারখার :
মন যে আমার বিবাগী রাজা, সে সাধিবে প্রণয় কার ?

তোমারি লাগিয়া উদাসিনী মীরা উধাও মথুরা পানে,
কুঞ্জে কুঞ্জে গায় ভিখারিণী হরিনাম কলতানে—
হৃদয়েরে করি' প্রেমের প্রদীপ, অশ্রু কণ্ঠহার :
মন যে আমার বিবাগী রাজা, সে সাধিবে প্রণয় কার ?

বাঁধিল আমারে বঁধু যুগে যুগে লক্ষ প্রেমের পাশে,
পিতা মাতা সখা সন্তান সে-ই—চিরদিন ভালোবাসে ;
জনমে-জনমে-দাসী মীরা শুধু যাচে নন্দকুমার :
মন যে আমার বিবাগী রাজা—সে সাধিবে প্রণয় কার ?

টমাস তো দেখেশুনে উচ্ছ্বসিত। "এ রকম গান মুখে মুখে আবৃত্তি ক'রে গেল এহেন বুকের বেদনা নিয়ে—হাঁপাতে হাঁপাতে !" বললাম : "ভগবান্ ওকে দিয়েছেন ভক্তি—তার তো আছে ভার! কবি তাই প্রার্থনা করেছেন : 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবার দাও শকতি।' "

* * *

পরদিন ওরা আমাদের তুলে দিল বিমানে—৩১শে মার্চ। নিউয়র্কের পথে শিকাগো, সেখানে নামতে হবে একটি নৃত্যগীতের আসর জমাতে—ইনটারন্যাশনাল হ'লে। দেখা যাক কেমন লাগে শিকাগো।

# শিকাগো

"যুক্তপ্রদেশ"-এর দ্বিতীয় শহর। নিউয়র্কের পরেই শিকাগো—পড়া যায় ভূগোলে। কথাটা সত্য মনে হ'ল। বসন্তরাজ্য কালিফর্ণিয়া থেকে উড়ে শিকাগো নামতেই মনে হ'ল—এবার দার্শনিক হ'তে হবে, সমতা—সমতা—গুরুদেব বলেন নি ?

সমতাকে তলব করার সময় এসেছে বৈ কি। নিউয়র্কে আরামে দিন কাটতে পারে কিন্তু আনন্দে নয়, এরকম একটা পূর্বরাগ মনের মধ্যে পুরবীতে ভাঁজছিলাম—শিকাগোয় এসেই মনে হ'ল—ভাঁজবার সময় এসেছে, খুব সজাগ না হ'লে ফাঁড়া কাটবে না।

আকাশ বিষণ্ণ, শীতের হাওয়া, রাস্তায় কাদা, বাড়িগুলি কালো—মন খারাপ হবে না? তার উপর বিমানঘাঁটিতে নামতেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীল গামি এসে বললেন থাকবো কোথায় ? হোটেলে ?

ভাবলাম বলি—নৈলে কি ধর্মশালায় ? কিন্তু বললাম না। মানুষটি ভালো—তার উপর তাকে তো লিখিনি খোলাখুলি যে শিকাগোতে যারা কন্সার্ট দেয় তারাও চায় মাথা গুঁজবার একটা জায়গা।

কিন্তু কোন্ হোটেলে ? এই হয় প্রশ্ন। এক হাঙ্গেরিয়ান আমেরিকান সহযাত্রী বললেন: "উঃ! শিকাগো! জানেন কি এখানকার জনতা কী ব্যাপার ? এখানে হোটেল পাবেন ভেবেছেন ?"

মনে মনে ডাকলাম: "মধুসূদন! ত্রাহি!"

*　　*　　*

কিন্তু মিলল হোটেল এবং ভালো হোটেল। পেসিমিস্টের পুনঃ পরাজয়। গামি তার মোটরে ক'রে নিয়ে গেল শুধু হোটেলে নয় পরনামধন্য হোটেলে—মার্ক টোয়েন।

বেশ খাসা হোটেল "মার্ক টোয়েন"। চমৎকার দুটি ঘর মিলল। একটি ঘরে দেখলাম নতুন ব্যবস্থা—বইয়ে পড়েছিলাম কিন্তু চোখে দেখি নি। কি না, আলমারির মধ্যে দাঁড় করানো শয্যা, টানলেই বেরিয়ে এসে চিতপাত। তারপর

—শোও পরমানন্দে। শয়নান্তে ফের ঠেললেই শয্যা দাঁড়িয়ে হেঁটে আলমারির মধ্যে ঢুকে যায়—শয়নকক্ষ হয়ে যায় বৈঠকখানা। কে বলে মানুষ শুধু শয়তানের সঙ্গেই মিতালি করে? আমেরিকানদের শুধু যে সময়াভাব তাই নয়—স্থানাভাবও বটে। কাজেই তারা নানাভাবে সমাধান খুঁজেছে রকমারি অভাব-সমস্যার। অভাবের সঙ্গে লড়াই করা যে এদের স্বভাব। না, আমেরিকানদের খালি গালমন্দ করা কোনো কাজের কথা নয়। ভাবুক জেরাল্ড হার্ড লস এঞ্জেল্‌সে আমাকে বলেছিলেন, রুশরা প্রতি মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার যে-আদর্শের কথা বলতে বলতে গলদশ্রু হয়ে ওঠে, আমেরিকানরা সে-আদর্শ প্রায় কাজে পরিণত করেছে হাসিমুখে। তাই এখানে প্রতি তৃতীয় মানুষের একটি মোটর—অন্নাভাবে কেউ মরে না, নিরাশ্রয় বলতে যা বোঝায় তেমন মানুষ মেলা ভার। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হোক, মূলতঃ সত্য মানতেই হবে। এখানে অতি দীন শ্রমিকরা অতি সস্তা হোটেলে যে-ধরনের পুষ্টিকর খাদ্য পায় আমাদের দেশের সচ্ছল মানুষ বহু অর্থব্যয় ক'রেও তেমনটি সংগ্রহ করতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা যে-হোটেলে ছিলাম তাকে অভিজাতদের হোটেল বলা যায় না—কিন্তু সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যের যতরকম বিধিব্যবস্থা ততরকম আয়োজন আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর হোটেলেও মেলে না।

তবু শিকাগো ভাল লাগল না—কেবল এর ২০০ মাইল লম্বা মিচিগান হ্রদ ছাড়া। কী হ্রদ! সমুদ্র ব'লে ভুল হয়। ভাবুন দুশো মাইল লম্বা হ্রদ! সোনার পাথরবাটি! একটি হ্রদ যে দৈর্ঘ্যে এত বড় হ'তে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত কি?

না। শিকাগোর বৈশিষ্ট্য আরো আছে। এ হ'ল দণ্ডীপর্বের সেই উর্বশী—দিনে অশ্বিনী, রাতে মোহিনী! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী (sky-scraper) সৌধ রাতে ঝিকমিক ঝিকমিক করে। দিনে যে কুশ্রী, রাতে সেই হয়ে ওঠে সুন্দরী! বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

* * *

বৈচিত্র্যের নানা স্বাদই মেলে এদেশে—বিশেষ হোটেল জীবনে। তবু সময়ে সময়ে একটু কেমন যেন—কী বলব?—হকচকিয়ে যেতে হয়। ব'লেই ফেলি—শত্রু হাসবে হয়ত,—হাসুক, কিন্তু রসিকজন রস পাবে তো। সেখানেই ক্ষতিপূরণ। ব্যাপারটা এই।

আমাদের পাশের ঘরে থাকতেন একটি বাবা—মানে সাক্ষাৎ পিতা। তস্য পুত্র একদিন পিতার দোরে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

"বাবা!"

ভিতর থেকে : "কে?"

বাইরে থেকে : "আমি, বাবা!"

ভিতর থেকে : "ও। কী চাও বৎস?"

বাইরে থেকে : "দোর খুলুন।"

ভিতর থেকে : "অসম্ভব।"

বাইরে থেকে : "লক্ষ্মীটি, বাবা! একটি মেয়ে আমার সঙ্গে বাইরে।"

ভিতর থেকে : "আরে! আর একটি যে আমার সঙ্গে—ভিতরে!"

ভাবতে পারেন পিতাপুত্রের এ-হেন বিশ্রম্ভালাপ? বিচিত্র নয়? দোহাই ধর্ম, বাড়িয়ে বলি নি। সত্যিই এ-সংলাপ আমাদের শুধু কানের ভিতরে নয়—মরমে পশেছিল।

* * *

আর একদিন গভীর রাতে। পাশের ঘরে তুমুল কাণ্ড।

নর বলছে তারস্বরে নারীকে : "ধরেছি। টাকা নিয়ে পালাবে?"

নারীকণ্ঠ : "আমার পাওনা।"

নরকণ্ঠ : "চুকিয়ে দিয়েছি।"

নারীকণ্ঠ : "না।"

তারপর ধুপ্ ধাপ্ শব্দ। "বুঝ লোক যে জানো সন্ধান!" তবু সব বুঝেও মন একটু উদ্বিগ্ন হ'ল বৈকি। নিষুত রাতে শেষে পুলিশে হানা দেবে না কি? উঠে দেখলাম দোরে ক'ষে খিল দেওয়া আছে তো? সানফ্রান্সিস্কোতে আমাদের হোটেলে মাঝে মাঝে একটি মাতাল গভীর রাতে ঘরে ফিরেও ঘর খুঁজে পেত না—ঢুকতে চাইত এ-ঘরে ও-ঘরে—নিজের ঘর ভেবে। আমাদের দোরের হাতল ধ'রে টানাটানি করত। এখানে কিন্তু ব্যাপারটা অতদূর গড়ায় নি।

গুরুদেব বারবার উপদেশ দিয়েছেন সমতাই যোগিধর্ম। তবু মনটা সময় সময় খারাপ হ'য়ে যায়—ইন্দ্রিয়-লালসায় মানুষ ধাপে ধাপে কোথায় নেমে আসে!

* * *

কিন্তু আরো মুস্কিল এই যে ইন্দ্রিয়লালসাকে এরা আদৌ আমাদের চোখে দেখে না। তাই হয়তো এদের মতিগতি আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। দৃষ্টিভঙ্গির একটু আধটু পার্থক্য থাকলে ভেবেচিন্তে কূল কিনারা পাওয়া যায়, কিন্তু বেশি

তফাত হ'লে অথই জলে। কল্পনা অবশ্য টানলে বাড়ে, কিন্তু অত্যধিক টানাটানি করলে যে আবার মূল শিকড় পর্যন্ত টনটন করে। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

একটি তরুণী মেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছিল কিছুদিন আগে। মেয়েটি থাকে এক আদর্শবাদীদের কলোনিতে—শিকাগোর কাছে। আমরা কন্সার্ট দেব শুনে খোঁজ ক'রে দেখা করতে এসেছিল। এসেই বলল আমাদের সঙ্গে ধ্যান করতে চায়। শ্রীঅরবিন্দের নানা বই পড়েছে। আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু গিয়ে কিছু যোগ রপ্ত ক'রে নিয়েই ফিরে এসে এখানে একটি আশ্রম ফাঁদবে—এই তার ইচ্ছা তথা দুরাশা। উচ্চাশার দিক দিয়ে মন্দ কি ? তবে মনে হয় আমরা ধর্মকে ঠিক এভাবে দেখি না। ধর্মকে সাধনার বস্তু ব'লেই মনে করি আমরা—পণ্য ব'লে নয়। কিন্তু এরা সব কিছুকেই ভাঙিয়ে খেতে চায়। সানফ্রান্সিস্কোয় তথা অন্যত্রও এ-জাতীয় ধর্মব্যবসায়ীর দেখা ইতিপূর্বেই পেয়েছিলাম। তবু একটি অনভিজ্ঞা তরুণী মেয়ে যে এভাবে ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করতে চায় ভাবতে ভালো লাগে না।

কথাবার্তা ক'য়ে বুঝলাম—ভিতরে আরো কথা আছে। একটি ভারতীয় ছাত্র এখানে এসে মেয়েটিকে হাত করে। বলে, সে ধর্মের একটি আলোকস্তম্ভ। তারপর মেয়েটি তাকে ভালবাসে। পরিণাম—কল্পনীয়। সুখের পরে দুঃখ। ভ্রমরটির যথাবিধি মধুপান ক'রে অন্যত্র প্রস্থান। অথচ সরলা (?) বালা তবু বলবে—ফুল্ল ভ্রমরটি ধর্মের জন্যেই তার মধুকামী হয়েছিল—যদিও সহধর্মিণী করতে নয়—ফলেই তো প্রমাণ হ'ল। কিন্তু—বলল মেয়েটি—দেহসুখের মধ্যে দিয়েই সে যে পেয়েছে পরমার্থ-স্বাদ!! যে-পুরুষ তাকে ভোগ ক'রে ছেড়ে চ'লে গেল তাকে কি সত্যি ধর্মপথের দিশারি ভাবে এখনো ? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে বিচিত্র মানুষের মন—কে যে কিসে কোন্ স্বাদ পায় কে বলবে ? যাই হোক, মেয়েটি চায় ভারতে যেতে, তার পরমার্থ-স্বাদদাতার সান্নিধ্য পেতে। স্বাদদাতা যে আর তার স্বাদ চায় না এ-অকাট্য সত্যকেও যেন সে নানা যুক্তির প্রবোধ দিয়ে নাকচ করতে চায়।

খেদের নানা প্রকৃতি, স্তর, জাতি, বর্ণ আছে। কিন্তু একটি সেরা খেদ মনে ঠাঁই পায় যখন দেখি প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাকেও প্রবঞ্চিত তার স্বরূপে চিনতে সত্যি বেগ পায়। মেয়েটি কেমন ক'রে এখনো বলে যে, এই প্রবঞ্চক ধার্মিক ? যে ফের চায় তারই আশ্রয়, যে তাকে ছেড়ে গেছে—তার ট্রাজিডির কী নামকরণ করব ?

আরো দুঃখ এই যে, এ-মেয়েটি অম্লানবদনে প্রায় গর্ব ক'রেই বলল—সে তিন-চারটি পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে ও তার জন্যে পরিতাপের লেশও ওর মনে ঠাঁই

পায় নি। দেহের শুদ্ধি, সতীত্ব এ-জাতীয় ললনার—তথা বহু আধুনিকার কাছে—অবাস্তব। এরা চায় অভিজ্ঞতা—সব রকম পরিবেশে, বিচিত্র সান্নিধ্যে। হয়ত জগতের নানা নৈতিকতার ধারণা হু হু ক'রে বদলে যাচ্ছে, আমরা দেখেও দেখি না তাই টের পাই না অনেকদিন ধ'রে—যতদিন না সে-বদল এমন রূপ নেয় যখন তাকে না-দেখে আর উপায় নেই। হয়ত এমনও হতে পারে যে, বাইরের জগতের এ-বদল আমাদের মনকে ঘা দেয় আরো সচেতন করতে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যে চলমানের পিছনে যে শাশ্বত সত্য আছে সেখানে আশ্রয় না পেলে উদ্‌ভ্রান্ত হ'তেই হবে। সবই বুঝি। তবু এদেশে এসে কয়েকটি বর্ষীয়সী নারীর মধ্যেও যখন দেখলাম এই ধরনের ধারণা যে বহু পুরুষের সঙ্গে সহবাস করার ফলে অধ্যাত্মচেতনা উদ্‌বুদ্ধই হয় তখন সব বুঝেও ঈষৎ চম্‌কে না উঠেই পারি না। তবে যাকে কালো ব'লে জেনেছি ( ভুল ক'রে অনুতপ্ত হয়ে আরো চিনেছি যে, যুক্তি দিয়ে কালোকে সাদা প্রতিপন্ন করতে গেলে মন বুঝলেও প্রাণ মানে না ) তাকে হঠাৎ সাদা ব'লে গ্রহণ করতে যদি না-ই পারি তবে কি সেটা সত্যি দুঃখের বিষয় বলব ? মানুষ নানা পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে নানারকম ঘা খায়। প্রতি আঘাতের ফলে তার কিছু-না-কিছু রূপান্তর হয়। কিন্তু তাই ব'লে কি বলা যায় যে, এ-ধরনের ধারণার মূলেও কিছু সত্য আছে যে, বহু পুরুষের সহবাস বিনা কোনো কুমারী নিজের অধ্যাত্ম সত্তার পরিচয় পেতেই পারে না ? একথা মানি যে, আন্তরিক মানুষ, সত্যসন্ধানী মানুষ পদস্খলন থেকেও কিছু-না-কিছু শেখেই—কিন্তু এ-সত্য থেকে কি এ-ধরনের সিদ্ধান্ত করা চলে যে, পদস্খলন যার হয়েছে সে মানুষ শুদ্ধচিত্ত, অন্তর্জ্যোতি মানুষের চেয়ে কোনো গভীরতর জ্ঞানের দিশা পায় ?

এ-ধরনের প্রশ্ন মনে উদয় হ'ল ঠেকে শিখে যে, এ-জাতীয় মনোভাব নিয়ে যে-কয়েকটি নারী আমাদের কাছে এসেছিল তাদের যুক্তির উত্তরে আমাদের কিছুই বলবার নেই। তাই তাদের শুধু এইটুকু বলা যে, যদি এই পথই সত্যি সত্যি তাদের কাছে পরম পথ ব'লে মনে হয় তবে চলুক তারা সেই পথেই—একদিন না একদিন পরিষ্কার হবেই হবে তাদের কাছে যে, এজাতীয় অভিজ্ঞতায় খতিয়ে তাদের লাভ হয়েছে না লোকসান। সব কথা বলা হ'য়ে গেলেও যা থাকে তার নাম শান্তি। যদি তারা এ-পথে পরমা শান্তি পায় তবে তাদের কেই বা কী বলবে—আর বললেই বা তারা শুনবে কেন ?

কেবল, হায় রে, শান্তি কি কেউ সত্যি পায় বহু সাধনা বিনা ? দেখা যাক

ভারতের শুদ্ধি ও শোধনের নির্দেশে আত্মবিৎ যে-শান্তির স্বাদ পেয়েছে; সে-শান্তির কাছাকাছি পৌছতে পারে কিনা পাশ্চাত্যের এই চঞ্চলতাবাদ—'স্খলনই উত্থানের সিঁড়ি' এই উল্টো নীতিবাদ তাকে মুক্তিস্বাদ বহন ক'রে এনে দেয়, না যমযন্ত্রণা। দূর হোক গে—ফিরে আসি ভাবের অন্তরীক্ষ থেকে প্রত্যক্ষের বাস্তবে।

* * *

গামি আমাদের কন্সার্টের জন্যে যে ব্যবস্থা করেছিল তাকে ভালো বলা শক্ত—কেন না, এদেশে কন্সার্টের ভালো আয়োজন করা বহু শ্রমসাপেক্ষ—তবে মোটের উপর আমাদের আসর জমেছিল। তার প্রমাণ এ-কন্সার্টে আমাদের দক্ষিণা মিলেছিল সবচেয়ে বেশি। জয় হোক ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের!

* * *

চৌঠা এপ্রিল গামি চেক নিয়ে আসতে দেরি করায় আমাদের বিমানঘাটিতে পৌছতে দেরি হ'য়ে গেল। কী হবে? তীরে এসে তরী ডুববে! মালপত্র চ'লে গেল নক্ষত্রবেগে—কিন্তু আমাদের কাছে ওরা চাইল বেশি মাশুল—উপ্‌রি মালের। তার রসিদ দিতে ওরা এত দেরি করল যে দৌড়ে গিয়েও ঠিক সময়ে পৌছতে পারলাম না। বিমানের দোর বন্ধ—সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কী হবে! "যাবার যারা চ'লে গেল"—মানে আমাদের সমস্ত মালপত্র—"আমরাই শুধু রইনু পড়ে?" দ্বারবান্ মাথা নেড়ে বলল: "বড় বেশি বিলম্ব।" কিন্তু তারপর বোধ হয় আমাদের বিচিত্র বিদেশী বেশভূষা দেখে তাদের হঠাৎ দয়া হল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওরা পরামর্শ ক'রে খবর পাঠালো বিমানের কর্তৃপক্ষকে। বিমানের ইঞ্জিন তখন ঘর্ঘর সুরু করেছে—তবু ফের সিঁড়ি লাগাল এক করুণাময় রক্ষী। চড়লাম এক লাফে। দোর খুলল ফের। দৌড়ে ঢুকতে না-ঢুকতে রথ চলা সুরু করল—সাহেবি ইডিয়মে যাকে বলে "ইন দি নিক অব্ টাইম।" এ-ধরনের অসম্ভব যে এ দেশেও সম্ভব হয় কে ভেবেছিল? হাঁপাতে হাঁপাতে ইন্দিরাকে সগর্বে বললাম: "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

# নিউয়র্ক

বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছতেই বিমলানন্দ। ফের সেই চক্রনীতি—দুঃখের পরে সুখের অর। পরম সদাশয় বণিক-বন্ধু শ্রীননীগোপাল বসু ছুটে এসেছেন ফিলাডেলফিয়া থেকে তাঁর বিরাট মোটরে। মালপত্রের বহর অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও সে-বিপুলগর্ভ রথকে মারে কে? সব অবলীলাক্রমে তার কুক্ষিগত হ'ল। মন করল জয়গান: পঁচিশ বৎসর আমেরিকা থেকেও বন্ধু স্বদেশবাসীর জন্য এত ভাবেন!

তাঁর সঙ্গে একটি পুষ্টকায়া আমেরিকান মহিলা ও একটি আমেরিকান তন্বী যার হাতে আমারই একটি ইংরাজি বই—'Among the Great!' কবিযশঃপ্রার্থী যখন তার ঈপ্সিত যশের এ-ধরনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় তখন সে কী করে? না, ভুলে যায় তার শিকাগোর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, খেদের পরে ফের শুনতে পায় উল্লাসের না হোক—আত্মপ্রসাদের চিরপরিচিত সম্ভাষণ।

মোটর ছুটল যথাবিধি। হ্যাঁ, শিকাগোর পরিস্ফীততর সংস্করণই বটে। খালি মোটর, মোটর, আর মোটর—রাস্তা রাস্তা রাস্তা—বিপণি বিপণি বিপণি—সর্বোপরি: দুধারে সমৃদ্ধ সৌধশ্রেণী—গগনস্পর্শী, দুর্দান্ত, উদ্‌ভ্রান্তিকর!

*　　　*　　　*

যে-হোটেলে ঠাঁই পেলাম সেটির উনিশ তলা—থুড়ি, আঠারো তলা, তেরর তলা নেই। তের সংখ্যাটি এখানে বৃহস্পতিবারের বারবেলার মতন অচল। কাজেই বারোর পরেই এখানে চোদ্দ। আমরা পেলাম দুটি মনোরম ঘর উনসর্বোচ্চ—কিনা আঠারো তলায়। এত উঁচুতে আর যিনিই কেন থেকে থাকুন না আমরা থাকিনি—কস্মিন্‌কালেও। তাই মন খুশি। দুধারে আরো উঁচু অট্টালিকা। মোটরে যেতে যেতে অদূরে Empire Building চোখে পড়ল—নিউয়র্কের উচ্চতম সৌধ—একশো দুই তলা! শুনলাম খুব দ্রুতগতি লিফটে উঠতেও পুরো এক মিনিট আট সেকেণ্ড লাগে! ভাবুন! এ-সৌধে পরে আরূঢ় হয়েছিলাম—কিন্তু সেকথা যথাস্থানে।

কাছেই অটোম্যাট (Automat) নামক বিখ্যাত ভোজনালয়। এর বৈশিষ্ট্য —পরিবেষক বিনা আহার্য মেলে এর রকমারি হাতল-ব্যবস্থায়। কফি চাও? একটি ফুটোয় দশ সেণ্ট—কিনা মার্কিন দু-আনি—দাও, হাতল ঘোরাও, অমনি পেয়ালায় কফি ঝ'রে পড়বে। কেক? আর একটি ফুটোয় ঢুকিয়ে দাও মার্কিন সিকি—অম্‌নি আর একটি হাতল ঘোরালেই কেক বেরিয়ে আসবে। এম্‌নি-ভাবে স্যাণ্ডউইচ, পাই, টার্ট—আরো কত কী! চেস্টারটনের একটি গল্পে পড়েছিলাম—দ্বারবান্‌ও কলের পুতুল—বোতাম টিপলেই এসে অভিবাদন ক'রে দোর খুলে দেয়। একদিন হয়ত এমনও হবে যে, কোনো স্টেশনে গিয়ে মূল্য দিলেই নিয়ন্তাহীন রেল চলবে তোমার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে, বিমান উড়বে সারথি বিনা। কে বলতে পারে?

কনসাল আর্থার লাল নিমন্ত্রণ করলেন। সদাশয় সজ্জন। তার উপর সাহিত্যিক—কবি। ইংরাজিতে কবিতা লেখেন। সাহিত্যিক আলোচনা হ'ল তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনেই। তিনি একটি বই দিলেন—তাতে তাঁর একটি ইংরাজি গল্প বেরিয়েছে। আমি তাঁকে পিঠ-পিঠ দিলাম আমার 'Among the Great'.

বিরাট সংবর্ধনা-কক্ষে রিহার্সাল হ'ল নৃত্যগীতের—৫ই সন্ধ্যায়। একটি যুবক তবলা বাজালেন। পরদিন—৬ই এপ্রিল—আমাদের সংবর্ধনা করবেন অনেক-দিনের বন্ধু গগনবিহারী মেতা—রাজদূত। তারপর বসবে সপ্তাহকালব্যাপী সংস্কৃতি-সভা।

* * *

সানফ্রান্সিস্কোয় একটি ভারতীয় বন্ধু আমাদের বলেছিলেন যে, আমেরিকায় যেন দক্ষিণা বিনা কন্সার্ট বা লেকচার ভুলেও না দিই, কেন না নির্মাশুল পণ্যের এখানে দাম নেই। বিনা-দক্ষিণা যে-কন্সার্ট—এরা শোনে নাকি দয়া ক'রে। ভাববার কথা—বিমর্ষ হবার কথা। বিমর্ষ হবার হেতু—যে-ধরনের ধারণায় আমরা আশৈশব মানুষ, হঠাৎ সে-ধারণাকে নামঞ্জুর হ'তে দেখলে মন ঘা খায়। স্বদেশে কত জায়গায়ই গান করেছি। চ্যারিটি কন্সার্টও করেছি বৈ কি—আশ্রমের জন্যে সবজড়িয়ে কয়েক বৎসরে দুলক্ষ টাকারও বেশি উপায় করেছি নানা রঙ্গমঞ্চে গান গেয়ে। কিন্তু তবু এমন কি আশ্রমের জন্যে হ'লেও টিকিট ক'রে যখনই গান গেয়েছি মনের কোথায় অশান্তি বোধ করেছি। এ-দেশেও গান গেয়ে বক্তৃতা দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করেছি বটে কিন্তু তবু মন খুঁত খুঁত

করে, কেননা—ঐ যে বললাম—আশৈশব গান গেয়ে বা শুনে এসেছি টাকা-ট'াকশালের চৌহদ্দির বাইরে—কিনা, রসের সভায়, প্রীতির বাসরে! এখানে এসে প্রথম শুনলাম উল্টো বন্দোবস্তটাই কুলীন—মানে, রসের সভায় প্রীতির বাসরে গান করলে এখানে গান (বা বক্তৃতা) মর্যাদা পায় না! মানুষের বা শিল্পের সম্ভ্রম এখানে টাকার অনুপাতে মাপা হয়। তাই যখন প্রথম একথা শুনি তখন ভেবেছিলাম: দূর হোক গে, এহেন পরিবেশে গান করবই না—মানে মানে এখানে নির্বাক্ থেকে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেই গান ধরব ফের।

কিন্তু তার পরে চাক্ষুষ ক'রে স্বস্তি পেলাম যে, না, বন্ধুবরের কথার মধ্যে সত্য কিছু থাকলেও এদেশের অবস্থা এখনো ঠিক অতটা সঙিন হয় নি। তাই দুচার জায়গায় গান ক'রে বা বক্তৃতা দিয়ে বেশ কিছু উপার্জন করলেও বেশির ভাগ স্থলেই বিনা-দক্ষিণায়ই গান ক'রে তৃপ্তি পেয়েছি ও শ্রোতাদের কিছু অন্তত আনন্দ দিয়েছি। সময়ে সময়ে সন্দিগ্ধ মন বলে: হয়ত এ ধারণা ভুল, আমাদের নাচগানে এরা তেমন কিছু আনন্দ পায় না, মুখে বলে মৌখিক ভদ্রতার খাতিরে মাত্র। কিন্তু যতটা সম্ভব নিস্পৃহভাবে বিচার ক'রে শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কেউ কেউ মৌখিক ভদ্রতার খাতিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও অনেকেই সত্যিকার আনন্দ পেয়েছেন আমাদের নাচ-গান-বক্তৃতায়। কত সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু তাঁদের ভারিক্কি কাজ অবহেলা ক'রেও বার বার আমাদের আসরে যোগ দিয়েছেন, কত গ্রহীতা একাধিক বার সাদরে গ্রহণ করেছেন যা আমরা পরিবেষণ করেছি, কত রসজ্ঞ গানান্তে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পত্রে। দু-তিনটি পত্র শুধু নমুনা হিসাবে পেশ করব—যেগুলি পত্র হিসেবেও চিত্তাকর্ষক।

কনসালের মস্ত সভায় যে-নৃত্যগীত আমরা পরিবেষণ করলাম সেখানে সেই মেয়েটি ছিল যে আমার 'Among the Great' বার বার পড়েছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল সামান্যই—কিন্তু সে ইণ্ডিয়া হাউসে ৬ই এপ্রিলের গান শুনে আমাদের একটি চিঠি লিখল। চিঠিটির ভাষা এত সুন্দর যে খানিকটা উদ্ধৃত করার লোভসংবরণ করা সম্ভব নয়। ইংরাজি থেকে তর্জমা ক'রে দেওয়াই ভালো:

"প্রিয় বন্ধুযুগল,

যদিচ কথায় অল্পই বলা যায়, তবু আমি না ব'লে পারছি না—তোমাদের নৃত্যগীত আমাকে কী গভীর আনন্দ দিয়েছে!

কিন্তু ব'লে রাখি প্রথমেই যে, এ-প্রশস্তি মহাশিল্পের তর্পণ মাত্র নয়। আমি যা অনুভব করেছিলাম সে হ'ল আমি যা জানতাম তারই প্রতিচ্ছবি—যে-জ্ঞান আমাকে বহন ক'রে এনে দিয়েছিল ইন্দিরা দেবীর 'শ্রুতাঞ্জলি'—এক বৎসর আগে। ঐ বইটি প'ড়ে আমার মনে যে-ভাবোদয় হয়েছিল সে-ধরনের ভাব স্বাদ আমি কমই পেয়েছি আমার জীবনে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ('Gospel of Sri Ramkrishna') ইংরাজি তর্জমায় প'ড়ে আমার মনে যে ভাব জেগেছিল শুধু তারই সঙ্গে এ-বইটির সুরের তুলনা হয়।···সেই থেকে আমি পথ চেয়েছিলাম কবে তোমরা আসবে এ-দেশে!···

আজ সন্ধ্যায় আমি যে-আনন্দের আভাষ পেয়েছি তার একটি মাত্র বিশেষণ—'অপূর্ব'—বিশেষ ক'রে তোমার কৃষ্ণকীর্তনে। আমার মনে এ-স্বাদে যেন আরো তৃষ্ণা উঠল জেগে—আরো কৃষ্ণনাম শুনবার। মনে হ'ল এ নামের তৃষ্ণা বুঝি অফুরন্ত।

হয়ত ঝোঁকের মাথায় এত কথা লিখে ভালো করলাম না। আমাকে কেউ কেউ বলেছে যে, এ-ধরনের গভীর ভাব ব্যক্ত করলে তার রস যায় ফিঁকে হ'য়ে। এ-ও হয়ত হ'তে পারে যে, এ-ধরনের ভাব দুবার আসে না। কিন্তু তবু আমি না-লিখে পারলাম না। এমন কি, যদি ঘরে সেদিন সাক্ষাৎ মীরাবাইয়ের আবির্ভাব হ'ত তাহ'লেও হয়ত আমি আশ্চর্য হতাম না। যে-গান শুনলাম সে স্বর্গীয়—শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল বুঝি আমার সমগ্র সত্তা আনন্দে গ'লে যায় বা!

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আমি শ্রীঅরবিন্দকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের তিনি এ-দেশে পাঠিয়েছেন ব'লে। ইতি—মারিতা।"

এই চিঠির সঙ্গে পেলাম আর একটি চিঠি: লেখক আমাদের আমেরিকান বন্ধু জন্, যাঁর অতিথি হ'য়ে আমরা ছিলাম লস এঞ্জেলসে। ইনি ভাবুক তাই এঁর চিঠির ভাব মূলেই পরিবেষণ করি—আরো এই জন্যে যে এ-ধরনের চিঠি তর্জমা করা সহজ নয়।

"·········What can we do to help the world? It is difficult to know, for we are not a nation apiece, like France or England: we are a way of living, an experiment—intangible and scarcely definable. And India, too, is a way of living and somehow the ways must mingle and enrich each other. But who knows this and who can tell how? And when shall it be accomplished?

"Back in our home in California, Lee and I are thinking of you, remembering vividly your presence in this place, recalling your words and your joy. A part of you remains with us and beneath us a firmer base has been built and the way seems clearer......

"Your book, *Sri Aurobindo Came To Me*, arrived the very morning you left. I have just read the introductory chapters and the future is bright with the welcome of its pages. You are very helpful to leave us such a splendid guide."

বন্ধু ডেভিড ওয়েস্টন হাণ্টার কয়েকটি সুন্দর পত্র লিখেছিল, তাথেকে আমেরিকান ধার্মিকের গভীর অভীপ্সার ও সৌকুমার্যের পরিচয় মিলবে:

"ভাই দিলীপ, তোমার এমন সুন্দর পত্রের উত্তর দেব কেমন ক'রে? এমন স্নেহে যে-ভাবে সাড়া দেওয়া উচিত সে-ভাবে সাড়া দেওয়া কি সম্ভব? আমাদের এখানে দেখা হয়েছিল ক'দিনের জন্যেই বা, কিন্তু এ তো আমাদের প্রথম দেখা নয়—সম্ভবতঃ শেষও নয়।

"আমাদের অশ্রুর মধ্যে ঝিকমিক ক'রে ওঠে কত বিস্মৃত অতীত যুগের প্রতিচ্ছবি! কত শত স্মৃতি আমাদের চেতনালোকে ক্ষণিক আভা ঝলকেই অন্তর্হিত হয়! যে-উদ্যানে তাঁর আবির্ভাব আমাদের কাছে এসেছিল নিবিড় হ'য়ে—আমরা পরস্পরের যত কাছে এসেছিলাম তার চেয়েও কাছে এসেছিলেন তিনি—সেখানে তাঁর ছায়াহীন আলোই হ'য়ে উঠেছিল আমাদের জীবন! কিন্তু এ-রহস্যের মর্মপরিগ্রহ করব আমরা ক্রমশ—যখন ঘুম-ভাঙা চোখে আমরা দেখব এ-জগৎকে তাঁর আলোয়, তাঁর চোখ দিয়ে—শুনব তাঁর বাণীকে তাঁর শ্রবণ দিয়ে।......

"তুমি আমার চিন্তায় কতবারই যে দেখা দাও!—তোমার পথযাত্রা নিষ্কণ্টক হোক—যাতে ক'রে সে-আশীর্বাদ আরো সক্রিয় হয় যা তুমি অপরকে বহন ক'রে এনে দাও। মানুষ অপরের মনে যে-সাড়া তোলে তার পরিমাপ সে অনেক সময়েই নিজে করতে পারে না। কিন্তু একটা কথা তুমি নিশ্চিত জেনো: যে, এদেশে যাদের সঙ্গে তুমি সংস্পর্শে আসছ তাদের মনে তুমি ছাপ ফেলে যাচ্ছ—মানে, তাদের মনে যারা গ্রহণ করতে পারে। তোমাকে জেনে, তোমার কথা ও গান শুনে—এমন কি শুধু তোমার সান্নিধ্যের ফলে—আমি যা কিছু পেয়েছি তাকে আত্মসাৎ করতেও আমার সময় লাগবে। সে-প্রহর-গুলি আমার কাছে থাকবে সার্থক। তোমার স্নেহ, ঔদার্য ও হৃদয়ের তাপস্পর্শ

থাকবে আমার স্মৃতিতে জাগরূক। আর হয়ত কোথাও কোনোদিন আমরা আবার কাছাকাছি ব'সে দেখব জীবনস্রোতকে ব'য়ে যেতে—হয়ত নীললহরী গঙ্গার তীরে—হয়ত বা আর কোথাও। মনে আমার আজ এই আনন্দ গাঢ় হ'য়ে উঠেছে যে, জীবনযাত্রায় আমি তোমার মধ্যে পেয়েছি এমন এক বন্ধুকে যে দূরে গেলেও কাছেই থাকবে—আমাদের পথচলায় আমরা দেখা পাব পরস্পরের —যে-ভাবে তিনি চান, আর সে-পথচলায় ফলাও হ'য়ে উঠবে এক একটি অদ্বিতীয় সুখচিত্র।······

"নিউয়র্ক কেমন লাগছে ?···যদি তোমরা আরো কিছুদিন থাকতে পারতে তবে জুনের মাঝামাঝি হয়ত আমি ওখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে পারতাম। কী চমৎকার হ'ত তাহ'লে! তুমি কোনো নিরালা আরণ্যক পরিবেশে তারার দেয়ালির নিচে গাইতে গান ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতে। আমি কোনোদিন ভুলব না সান্তা বার্বারাতে সেই সন্ধ্যার কথা যেদিন শীতের বাতাসের মধ্যে—আকাশে মেঘ ও চাঁদ যখন চলেছিল ভেসে বনানীর মধ্যে দিয়ে—তুমি ও ইন্দিরা বুনে চলেছিলে তোমাদের মায়ালোক আর আমি দেখছিলাম বাইরে থেকে বাতায়নের মধ্যে দিয়ে······

"তোমার 'শ্রীঅরবিন্দ আমার কাছে এসেছিলেন', বইটি পড়া প্রায় আমি শেষ করেছি। অনেক স্থলেই মুগ্ধ হয়েছি পড়তে পড়তে। আমার কোনোদিনই মনে হয় নি যে, তুমি নিজেকে যে-ভাবে যুক্তিবাদী ও সংশয়ী ব'লে প্রচার করো তুমি তাই। না। তুমি তোমার বিশ্বাসের তরফে যুক্তিজাল বুনে চলো শুধু সংশয়ীকে বোঝাতে যে তোমার বিশ্বাস অযৌক্তিক নয়, কিন্তু আসলে তুমি তোমার গুরুশক্তির কাছে হার মানো যুক্তির সাক্ষ্যে নয়—আন্তর অনুভবের এজাহারে। আমি যদি সংশয়ী হ'তাম তবে আগাগোড়া তোমার যুক্তি খণ্ডন ক'রে চলতাম। তাই আমার ধারণা তুমি সংশয়ী নও আদৌ—যদি হ'তে, তাহ'লে আমি অন্তত তোমার দিকে এতটা ঝুঁকতাম না।"

ইন্দিরাকে ও যে কয়টি গভীর পত্র লিখেছিল তাথেকে কিছু তর্জমা ক'রে উদ্ধৃত করি।

"স্নেহময়ী ইন্দিরা!

কেমন আছ? তুমি নিবেদিতার যে-জীবনীটি (Dedicated) আমাকে দিয়েছিলে তার অর্ধেকেরও উপর আমি পড়েছি। কালী সম্বন্ধে যে-সব কথা বইটিতে আছে পড়তে পড়তে আমারো চোখে জল এসেছে।

এ দূর বিদেশে এসে অসুখী হোয়ো না। কারণ, ভগবান্‌কে আমরা খুব কম জানলেও আমাদেরও তিনি খুব দূরে দূরে রাখেন না। একদিন হয়ত তোমার মনে খেদ থাকবে না যে, এদেশে তুমি এসেছিলে। সেদিন তোমার মনে পড়বে যে, এখানেও সুন্দর ও মহৎ অনেক কিছু তুমি দেখেছিলে। ভগবান্ তোমাদের ঘিরে রাখুন তাঁর গভীর শান্তি দিয়ে।

ডেভিড।"

ইন্দিরাকে আর একটি চিঠিতে ডেভিড্ লিখেছিল :

"মনে হয় যেন কত যুগ চ'লে গেছে সেদিনের পর যেদিন তোমরা বিদায় নিয়ে আকাশপথে উড়ে চ'লে গেলে। অথচ আশ্চর্য, সেই সঙ্গে মনে হয় যেন এইমাত্র তুমি মাথা হেলিয়ে তোমার সুন্দর শান্ত ঢঙে করলে অভিবাদন, আর তোমার দাদার মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল তাঁর আশ্চর্য স্মিতহাস্যে। এ-দুটি ভঙ্গিমা আমি ভুলতে পারি না—চাইও না ভুলতে। কারণ, আমি এ থেকে জেনেছি যে, আমি সুযোগ পেয়েছিলাম মহৎ পবিত্রতাকে স্পর্শ করতে। এম্‌নিই তাঁর করুণা—যার বিস্ময় আমাকে শান্তিতে ভ'রে দিয়েছে! তোমাদের উভয়কে, মীরাকে এবং ভগবান্‌কে আমার হৃদয় নিবেদন করছে তার ধন্যবাদ, পরে যেদিন আমি উপলব্ধি করব এসবকে, যেভাবে আজ করতে পারছি না—সেদিন আরো কত নিটোল হ'য়ে উঠবে এ-আশীর্বাদের বিস্ময়!

"তাঁর কাছে ধরা দেওয়া, তাঁর ইচ্ছায় সায় দেওয়া, তাঁকে ভালোবাসা—বাসনা পেরিয়ে, ডাকা ও সাড়া-পাওয়ার রাজ্য অতিক্রম ক'রে—এ-সৌন্দর্যের পরেও—ততঃ কিম্? তুমি জানো আমার চেয়ে বেশি। হয়ত এর নাম দেওয়া যেতে পারে—তাঁর মধ্যে নিজেকে হারানো, তাঁর সত্তার সঙ্গে এক-হ'য়ে-যাওয়া। কিন্তু কী সে-অনুভব জানব কেমন ক'রে? তাই আমি ফিরে আসি আমার প্রার্থনালোকে পরম নির্ভরে—বলি : যেন তাঁর রীতিতেই তিনি আমাকে গ'ড়ে নেন।

"আমি তোমার জন্যে প্রার্থনা করি দিদি—যখন উষায় পৃথিবী জেগে ওঠে, আর যখন সন্ধ্যায় আবার নীরবতা তার বুকে ছেয়ে যায়—প্রার্থনা করি তোমার স্নেহাস্পদ দাদার জন্যে : যেন স্বর্গরাজ্য তোমাদের ঘিরে থাকে, দেবদূতরা তোমাদের কাছে কাছে থাকেন, যেন সেই পরমা শান্তি তোমাদের হৃদয়কে কানায় কানায় ভ'রে তোলে—যে-শান্তির কোনো দিশাই পায় না আমাদের মর্ত্য বুদ্ধি।"

("How many ages have elapsed since we said farewell and you flew away. Yet it is as tho' it were happening now and you bowed again your head in quiet beauty and your Dada smiled upon us the wonder of His smile! These two things I cannot forget nor want to. For I have come to know that I have been permitted to see and hear and touch things that are holy. Such is His Grace and the wonder of it fills me with peace. To you each and to Mira and to our Lord my heart is thankful and someday, when I shall have realised all this as I do not now, how great will be the wonder of His blessing!

To know utter, utter trust, to do and be His will, to love Him, beyond desire, beyond being near Him, beyond calling to Him and hearing Him answer......there is something beyond that, beautiful as it is......what is it? You know better than I. It can be called being lost in Him, being one with Him. Yet how to know what that is, yet? So I return to my prayer to learn to trust Him utterly and let His way find its fashion in me.

And I pray for you, my sister, when the dawn wakens the earth and when evening brings stillness again, for you and your beloved Dada, for the heavens to overshadow you, for His angels to hover near, for the peace that passeth all understanding to fill your lives and hearts......How I long to be there with you both again, while the hours pass, while you talk with me or sing or dance, even to sing with you or to you, or to sail over the seas on the ship with you. But my life and way is in His hands as is yours and at His feet. I must wait for His command and pray only to be able to hear and do as He bids.

Your brother,
David")

তারপরে ও ইন্দিরাকে আর একটি চিঠিতে লিখেছিল :

"তোমার মতন যারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে—লক্ষ্য যাদের চোখে আরো উজ্জ্বল আরো মহৎ হ'য়ে ফুটে উঠেছে—তাদের সাধনাও আর পাঁচজনের সাধনার মতনই—কেবল সে-সাধনাকে তারা অনুভব করে হাজার গুণ নিবিড়ভাবে, বেদনাও তাদের বেশি গভীর, আনন্দও বেশি ঊর্ধ্বসঞ্চারী। কিন্তু এ-কথাও তুমি ছাড়া

আর কে জানবে বলো—যে-তুমি এ-সবই উপলব্ধি করেছ? শুধু-যে তোমারই আছে সেই প্রেম, শক্তি ও ধৈর্য—এ-সম্পদ্ ভগবান্ তোমাকে দিয়েছেন যাতে ক'রে তুমি শেষ পর্যন্ত সব সহ্য ক'রে জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় পারো উত্তীর্ণ হ'তে। এ-বর মহাবর—যে পেয়েছে তার সব বাধাই—বাইরের ও ভিতরের—ছাই হ'য়ে যায় যেমন শুক্‌নো কাঠ হয় আগুনের সাম্‌নে। আমাদের মধ্যে যা কিছু অশিব তাকে পুড়িয়ে গলিয়ে শিব ক'রে তোলা—এইই তো তাঁর প্রেমের জাদুশক্তি। ...তোমার 'পরে তাঁর কত করুণা...কত ভালোবাসেন তিনি তোমাকে!

তাঁর আশীর্বাদ ও শান্তি তোমার পরম সম্পদ্ হোক্।"

( Those who have journeyed as far as you, who see a goal so much brighter and higher, they have the same struggle as everyday mortals, only a thousand times more intense, the pain more deep and also the ecstasy more exalted. But no one knows that, no one but you who experience it. And only you possess the love and strength and patience which your Lord has given you that you may endure to the end and overcome all. This is a great and wonderful gift. Before it all your obstacles within and outside will dissolve as dry wood before fire. This is the wonder of His love—to dissolve and transmute all that is in and around us that is unlike Himself. 'Behold, I will purify thee as a refiner purifies gold.' How greatly He must love you to give you such Grace!

May His blessing and Great Peace be yours.

Your brother,
David
San Francisco,
June 6, 1953 )

অনেক সময়ে এমনও হয় যে কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছে যাকে ভুলে গেছি কিন্তু তার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে জেগে ওঠে সে-ভুলে-যাওয়া মানুষটির ব্যক্তিরূপ। এ-হেন অর্ধবিস্মৃত মানুষ আমাদের মগ্নচৈতন্যে একটা ছাপ ফেলে যায়ই যায়—যে-ছাপ যেন পুনরায় ফুটে ওঠে তার চিঠির আলোয়। এম্‌নি একটি মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সানফ্রান্সিস্কোয় আমাদের নৃত্যগীতের সভা বসবার আগে। শুনেছিলাম তিনি ব্যাঙ্কার। ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে চিন্তাশীলতার দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না, কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম এমন একটি

সহজ গ্রহিষ্ণুতা ও ভাবুকতা যা আমাদের উভয়কেই চমকে দিয়েছিল। এঁকে আমি আমার বই 'Sri Aurobindo Came to Me' উপহার পাঠিয়েছিলাম ডেভিডের হাত দিয়ে। বইটি পাঠানোর পরে তাঁকে আমরা ভুলে গিয়েছিলামই বলব। কিন্তু হঠাৎ যখন তাঁর চিঠি এল যেন চমকে উঠলাম। মনে পড়ল ডেভিডের চিঠিতে তার ভবিষ্যদ্বাণী: "একদিন হয়ত তোমাদের মনে পড়বে যে, এখানেও সুন্দর ও মহৎ অনেক কিছু তোমরা দেখেছিলে।" যাক্ গৌরচন্দ্রিকা রেখে এবার আলাপন সুরু করি। ব্যাঙ্কার বন্ধু লিখেছিলেন:

Dear Mr. Dilip Kumar Roy,

Our peripheral contact the other evening was to me doubly rewarding, first, because it gave a momentary insight into a personality which, I felt, was wise, serene, poetic, balanced, secure and dedicated to a philosophy (all these qualifications are used advisedly) and secondly, because the initial impression has now been buttressed with understanding through the receipt of your book.

It has always been my conviction that the Kingdom of the Mind is universal : in other words, that *all persons who seek an understanding of life and their relationship to the Universe are related in their quest irrespective of differences in speech, custom or origin.* The worlds of thought, art and science know no boundaries. Moreover, seekers of understanding, however modest their attainments, are always eager to learn from the experience of others, disparate or no, and to attempt to reconcile knowledge so gained with their own and, if possible, to arrive at the Truth. So I thank you sincerely for your volume. The thanks come from an American businessman, a believer in the Fellowship of man, and very much like Tennyson's infant crying blindly for the Light.

Very appreciatively,
S. M. Kemper

আমেরিকানদের মধ্যে এই ধরনের খোলা মন অনেক সময়েই চোখে পড়ত, এমন মন যে আন্তরিকভাবে তিন সত্য ক'রে বলতে পারে: "আমি অপরের অভিজ্ঞতা থেকে চাই চাই চাই শিখতে, বিশ্বাস করি করি করি বিশ্বমানবতাকে।" ওদের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি গভীর মনের পরশ পাওয়া সহজ নয়, কেননা

তার জন্যে চাই সময়, আর ওদের সব আছে কেবল নেই এই একটি বস্তু—সময়। কিন্তু তবু কখনো কখনো মিলেছে এই ধরনের স্পর্শ—অবশ্য দৈবাৎ-ই বলব।



শ্রীদিলীপকুমার রায়

যেমন লেখক Tom Powers-এর সঙ্গে। ইনি এসেছিলেন আমাদের কাছে মাত্র দুদিন। কিন্তু দুদিনেই ওঁর গভীর ভক্তি জন্মে গেল ইন্দিরার প্রতি। আমাদের মাঝে মাঝেই লিখতেন তাঁর ধর্মজীবনের তৃষ্ণার খবর দিয়ে। যেমন এবার ওকে লিখেছিলেন :

My dear sister !

Thank you for reminding me what I never should have forgotten : that it is not the world that binds but the ego. And what a tricky beast the ego is. And in a way, how admirable ! With what great skill and courage and subtlety does it defend itself against annihilation in the Light of lights !......Sometimes He seems so close—it is terrifying in the midst of bliss ; it is almost as if He actually were about to reveal Himself without

any veil. No doubt His mercy grants such consolations to our thirst and our weakness when we are yet very far off and still quite unfit for the contact we have the awful temerity to fancy as being near at hand......Oh, at last I do guess something of what *Lila* means !...You, my sister, are closer to Him than I. Where the feeble wings of my poor prayers fail, yours will prevail. Remember me to Him. For I do love Him—and you in Him.

Your brother,
Tom

এরকম কত চিঠিই যে আসে দিনের পর দিন! অবশ্য গভীর বোধের দেখা কোনো দেশেই পথে ঘাটে মেলে না—কিন্তু অনুভবের গভীরতা খুব কম মানুষের অধিগম্য হ'লেও, খতিয়ে সমস্যা তো সবারই এক: কোন্ পথে মিলবে সেই আলো যে আমাদেরকে উত্তীর্ণ করে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, মৃত্যু থেকে অমৃতে। ডেভিড মিথ্যা বলে নি যে, ভগবান্ কারুর কাছ থেকেই দূরে থাকেন না। তাঁকে যে হাতের কাছে পাই না সেজন্যে দায়িক তাঁর অনিচ্ছা নয়—দায়িক আমাদের না-চাওয়া—ভুল পথে চলা। তাই তো এদেশে—শুধু এদেশেই বা বলি কেন, সব দেশেই—বেশির ভাগ মানুষ চলেছে পশ্চিম পানে মুখ ক'রে সূর্যোদয়কে বরণ করতে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেন নি কি—আলোর দিক থেকে মুখ-ফিরিয়ে চলেছে যারা তাদেরও ভ্রান্তি থেকে উত্তীর্ণ করেন তিনিই—ভুলের পথ বেয়েই নিয়ে যান নির্ভুলের জ্যোতির্লোকে ?—

"This too the supreme Diplomat can use.
He makes our fall a means for greater rise
He comes unseen into our darker parts
And, curtained by the Darkness, does His work."

অর্থাৎ,

সে মহাকৌশলী করে নিত্যলীলা ল'য়ে স্খলনেরে,
পতনেরি পথে করে সমুত্তীর্ণ উচ্চতর স্তরে,
অলক্ষিত ছন্দে পশে ছায়াময় অংশে আমাদের,
আঁধারের অন্তরাল হ'তে সাধে ঈশ্বরী সাধনা।

স্বামী নিখিলানন্দ নিমন্ত্রণ করলেন রামকৃষ্ণমিশনে প্রীতিভোজে। বিদেশে রামকৃষ্ণমিশনের সংস্পর্শে আসতে-না-আসতে মন ভ'রে যায়। হাওয়া বদলে যায় যেন। ঠাকুরের ছবির সামনে হল-ঘরে ঢুকতে না-ঢুকতে মনে পড়ে সেই আনন্দময় মায়ের দুলালকে যাঁর নাম আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে—যাঁর পথনির্দেশ পার্থসারথির উপদেশের মতনই এহেন বিভুহীন বিলাসের পরিবেশেও কত শত পথহারাকে দিচ্ছে লক্ষ্যদিশা!

নিখিলানন্দকে ধন্যবাদ না দেবে কে? তিনিই প্রথম অনুবাদ করেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'—'Gospel of Sri Ramkrishna'—যার ভূমিকায় মনস্বী অলডাস হাক্সলি লিখেছেন:

"Never have the small events of a contemplative's daily life been described with such a wealth of intimate detail. Never have the casual and unstudied utterances of a great religious teacher been set down with so minute a fidelity...To read through these conversations...where discussions of the oddest aspects of Hindu mythology give place to the most profound and subtle utterances about the nature of Ultimate Reality, is in itself a liberal education in humility."

* * *

সেদিনের সকালের অভিজ্ঞতা ভুলব না কোনোদিনো।

হঠাৎ এলেন একটি আমেরিকান শ্রীমন্তিনী—হাতে ফুলের সাজি—ইন্দিরাকে ফুলগুলি উপহার দিয়ে বললেন: "সেদিন কনসালের গৃহে যে নৃত্যগীত করেছিলেন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হয়ত সোজা চ'লে এসে ভুল করেছি। কিন্তু আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

ইন্দিরা কোমল কণ্ঠে বলল: "স্বচ্ছন্দে বলুন।"

শ্রীমন্তিনী বললেন: "আপনাদের গুরু আছেন—"

আমি বললাম: "না। তিনি বছর দুই আগে দেহত্যাগ করেছেন।"

শুনতেই শ্রীমন্তিনীর চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল। তিনি বললেন: "আমার গুরুও—বোধানন্দ স্বামী—" কথা তাঁর শেষ হ'ল না। চকিতে রুমালে চোখ মুছে বললেন: "ক্ষমা করবেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করলেও আমি নিজেকে সামলাতে পারি নে। হয়ত সেন্টিমেণ্টালিটি—"

ইন্দিরা আর্দ্র কণ্ঠে বলল: "এর নাম সেন্টিমেণ্টালিটি নয়। এর নাম গুরুর কৃপা।"

আমি বললাম : "আপনি ভাগ্যবতী। এহেন গুরুভক্তি যে লাভ করেছে তার ভাবনা কী?"

শ্রীমস্তিনীর চোখে ফের জল ভ'রে এল, চোখ মুছে বললেন : "ভাবনা অনেক। আমার চরিত্রে কত যে ত্রুটি আছে—গুরু নেই আর, কে শুধরে দেবে বলুন?"

তারপর একথা সে কথা কত কথা! শ্রীমস্তিনীর চোখেমুখে যে কী অপূর্ব সরলতা, কণ্ঠে গাঢ় ভক্তির রেশ! এহেন গুরুভক্তি দেখে ভাব সংবরণ করা আমাদের পক্ষেও কঠিন হ'য়ে উঠল।...

শেষে ইন্দিরা বলল : "আপনার সংস্পর্শ যে পেলাম এ আমরা ভাগ্য ব'লে মনে করি।"

(শ্রীমস্তিনীর নাম মিরিয়াম ওয়াটারম্যান। ইনি বিবাহিতা, গৃহিণী, কিন্তু যখনই আমাদের নৃত্যগীত হ'ত সব কাজ ছেড়ে আসতেন বিশ মাইল দূর থেকে। আর কত ভাবেই যে ইন্দিরার সেবা করতেন!)

সেদিন সারা সকালটা মন ভ'রে ছিল। এদেশের কোনো মানুষের মনে যে এহেন ভক্তি স্থায়ী হ'তে পারে, গুরুর নাম-উচ্চারণেও যে এদেশের কোনো মানুষের চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠতে পারে, সত্যিই ভাবি নি। না—এর নাম সেন্টিমেণ্টালিটি নয়। অশ্রু ঝরে অবশ্য নানা কারণে। আশাভঙ্গের অশ্রু, শোকের অশ্রু, অপমানের অশ্রু—কতরকমই তো অশ্রু আছে। কিন্তু শুধু গুরুর নাম-উচ্চারণে চোখে জল—এর নাম কী দেব—গুরুর কৃপা ছাড়া? মনে মনে শ্রীমস্তিনীকে বার বার নমস্কার করলাম। প্রার্থনা করলাম মনে মনে—যেন হেন ভক্তির উচ্ছ্বাস আমার হৃদয়েও ঢেউ তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ল : "স্ত্রীপুত্রের জন্যে কত লোকেই তো একঘটি কাঁদে, কিন্তু ভগবানের নামে ধারা বয় বহুজন্মের সুকৃতিবলে।" পদাবলীর পদ গুনগুনিয়ে উঠল :

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কৃষ্ণভক্তিরসধারে-সিঞ্চিত মতি
আনো আনো কিনি' যদি কোথাও বিকায়।
মূল্য তাহার শুধু প্রার্থনা নিরবধি
কোটি জনমেরো তপে মিলে না তাহায়।

ভক্তিকামী ঠেকে শিখেছেন এই সত্যটি যে তপস্যায় মিলতে পারে অনেক কিছু —শক্তি, রূপ, স্বাস্থ্য, প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভক্তিভাব নামপ্রীতি বিরহাশ্রু মিলতে পারে শুধু তাঁর কৃপায়। এই শ্রীমস্তিনীকে কতবারই যে মনে মনে নমস্কার করেছি— তিনি পেয়েছিলেন ব'লে এই দুর্লভ কৃপৈকলভ্য ভক্তি।

পক্ষান্তরে আর একটি তৎপর মহিলাকে মনে পড়ল। ইনিও স্বামী বোধানন্দর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু সহসা শ্রীঅরবিন্দের দিকে ঝুঁকলেন। ইন্দিরাকে বললেন: "আমি রামকৃষ্ণমিশনের ধার পাশ দিয়েও যাই না আজকাল।"

ইন্দিরা প্রশ্ন করল: "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপরাধ?"

অ-শ্রীমস্তিনী বললেন: "আমি যে বোধানন্দ স্বামীকে ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দকে ধরেছি মোক্ষম।"

ইন্দিরা বলল: "পূর্বগুরুকে বরখাস্ত করলেন কী দুঃখে?"

অ-শ্রীমস্তিনী বললেন: "কারণ শ্রীঅরবিন্দ বোধানন্দর চেয়ে অনেক বড়।"

মনে পড়ল অনেকদিন আগের একটি ঘটনা। আমি তখন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে সবে ঢুকেছি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে লিখলাম: "এসো শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করবে।" সে উত্তরে লিখল: "শ্রীঅরবিন্দকে আমি গভীর ভক্তি করি তুমি জানো, কিন্তু তাঁকে দর্শন করার কোনো আন্তর তাগিদ এখন পাচ্ছি না মনের মধ্যে। তাছাড়া আমার গুরুর কাছছাড়া হ'তে মন চাইছে না।"

আমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দকে জানালাম একথা। উত্তরে তিনি জানালেন যে, কৃষ্ণপ্রেমের ভাবই খাঁটি—এই রকম গুরুভক্তিই বস্তুলাভের পরম সোপান।

যে নিজের গুরুকে ত্যাগ করে এই যুক্তিতে যে অন্য গুরুর মহত্ত্বের বহর বেশি —তার মতন দুর্ভাগা কমই আছে। এ-জাতীয় মনোভাবের তুলনা শুধু একটি: যে নিজের দরিদ্র পিতাকে ত্যাগ ক'রে আর একজনকে বাবা বলতে রাজী হয় এই যুক্তিবলে যে তিনি দরিদ্র নন—ধনী।

দুজনই আমেরিকান মহিলা। একজন বোধানন্দের শরণাগতা ছিলেন আজও আছেন, তাঁর নামে চোখে তাঁর জল ভ'রে আসে। অন্যজন শ্রীঅরবিন্দকে বরণ করেছেন নিজের গুরুকে ডিশমিশ ক'রে যেহেতু শ্রীঅরবিন্দ মহত্তর ব্যক্তি! প্রথমাকে বলি ধন্যা: দ্বিতীয়ার উপাধি দুর্ভাগিনী ছাড়া আর কী দেব? তাছাড়া ফল দিয়েই গাছের বিচার। প্রথমা পেয়েছেন দুর্লভ ভক্তি—দ্বিতীয়া শুধু ভিত্তিহীন আত্মপ্রসাদের ভড়ং।

কত রকম মহাপ্রভুরই যে এখানে দেখা মেলে! দু'একটি নমুনা পেশ করলামই বা।

একজন টেলিফোন করলেন ইন্দিরাকে: "সেদিন সন্ধ্যায় কনসালগৃহে আপনার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছি।"

ইন্দিরা: ধন্যবাদ।

টেলিফোন-স্বর: আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ইন্দিরা: কেন দেখা করতে চান?

টেলিফোন: এমনি—দেখতে চাই আপনাকে—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

ইন্দিরা: কী বিষয়ে?

টেলিফোন: এ ও তা।

ইন্দিরা: এ ও তা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় আমাদের রুচি নেই।

টেলিফোন: সে কি? কেন?

ইন্দিরা: আমাদের কাজ আছে অনেক।

টেলিফোন: আমারো হাজারো কাজ। জানেন কি, আমি গত পাঁচবৎসরের মধ্যে কারুর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি?

ইন্দিরা: বটে?

টেলিফোন: তবু দেখা করবেন না?

ইন্দিরা: না।

টেলিফোন (রুষ্ট স্বরে): বেশ। আপনি ২৯শে এপ্রিল কাউফম্যান হলে যখন নাচবেন, তখন দেখব আপনাকে—সেখানে তো আর লুকিয়ে থাকতে পারবেন না।

ইন্দিরা (হেসে): না।

* * *

আর একজন দর্শনার্থী টেলিফোন ধরলেন।

দর্শনার্থী: হ্যালো! আপনি ইন্দিরা দেবী?

ইন্দিরা: হ্যাঁ।

দর্শনার্থী: আমি আপনাকে টেলিভিশনে আসতে নিমন্ত্রণ করতে চাই।

ইন্দিরা: দাদা—আমার গুরু—টেলিভিশনের নিমন্ত্রণ নিতে রাজী নন।

দর্শনার্থী: তাঁকে চাই না আমরা টেলিভিশনে। চাই শুধু আপনাকে।

ইন্দিরা : ধন্যবাদ। কিন্তু আমার গুরু যা চান না আমি তাতে যোগ দিই না।

দর্শনার্থী : অবাক্! গুরু চান না টেলিভিশন—আমরাও চাই না তাঁকে। আমাদের লেনদেন শুধু আপনার সঙ্গে। আপনি আসুন আমাদের স্টুডিয়োতে —শাড়ী প'রে দাঁড়ান—দুটো যা পারেন বলুন—

ইন্দিরা : কী বলব? টেলিভিশনে বলবার আমার কিছুই নেই।

দর্শনার্থী : তাহ'লে শুধু ঝলমলে শাড়ী প'রে এসে দাঁড়ান—হেলেদুলে চ'লে যান—হাজার হাজার লোক দেখবে আপনাদের সুন্দর বেশভূষা—

ইন্দিরা : শুধু হেলে দাঁড়াব—বেশভূষা দেখাতে?

দর্শনার্থী : শুধু বেশভূষা কেন? বেশভূষা প'রে এসে দাঁড়ান আপনি নিজে—আপনার সুন্দর ফিগার দেখবে হাজার হাজার লোক।

ইন্দিরা : ধন্যবাদ। ওতে আমার লোভ নেই।

দর্শনার্থী (নাছোড়বন্দ): বেশ তবে আমি আপনার ফটো তুলতে আসব।

ইন্দিরা : না।

দর্শনার্থী : কেন?

ইন্দিরা : অত জবাবদিহি করতে পারব না।

ব'লে টেলিফোন রেখে দিল।

আমেরিকার একটা দিক।

* * *

এক সভায় আমরা গিয়েছি। সেখানে আর এক মহাপ্রভু—থুড়ি, ঠাকরুন —ইন্দিরাকে বললেন: আমি শ্রীঅরবিন্দের মহা ভক্ত—তাঁর কত লেখাই যে প'ড়ে ফেলেছি।

ইন্দিরা : বটে!

ভক্তিমতী : হ্যাঁ। তিনি মস্ত সেণ্ট। কেবল একটা জিজ্ঞাসা আছে আমার আপনাদের আশ্রম সম্বন্ধে।

ইন্দিরা : কী?

ভক্তিমতী : শুনেছি আপনাদের আশ্রমে যে-সব ভক্তিমতী যান তাঁরা সবাই শ্রীঅরবিন্দকে বিবাহ করতে বাধ্য। আপনি কেমন ক'রে দিলীপকুমারকে বিবাহ করলেন?

ইন্দিরা : দিলীপকুমারকে আমি বিবাহ করি নি—তিনি আমার স্বামী নন—গুরু, পিতৃস্থানীয়।

ভক্তিমতী (প্রহৃষ্ট): আমিও ঠিক এই কথাই বলছিলাম আমার এক সখীকে। তিনি বললেন: আপনি দিলীপকুমারের স্ত্রী। আমি বললাম: কক্ষনো না, কেননা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সাধিকারা সবাই শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী—তাঁরা আর কাউকে বিবাহ্ করবেন কেমন ক'রে?

ইন্দিরা (হেসে): আশ্রম সম্বন্ধে আপনার গভীর জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু তাই নয়—শ্রীঅরবিন্দের লেখাও যে আপনি কত মন দিয়ে পড়েছেন—যত ভাবি তত অবাক্ লাগে। এমন বোদ্ধা আর কয়েকটি যদি এদেশে থাকত তবে হয়ত শ্রীঅরবিন্দের বাণী কে প্রচার করবে এ নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতেই হ'ত না। কেবল আপনার একটি মাত্র চুক হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাঁর যোগে ব্রহ্মচর্য-সাধন চাই এবং গুরু এক, স্বামী আর। অর্থাৎ তিনি আশ্রমের সবাইকারই গুরু বটে—কিন্তু কারুরি স্বামী নন।

* * *

সেদিন একজন জগত্তারণ এসে হাজির হাজারো পুস্তিকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে! জগৎকে দিশা দিতেই হবে নানা সংঘ গ'ড়ে, নানা মহাবাণীর আলোতে। আর সে কি একটা পুস্তিকা? কত রকমের এপিগ্রাম, শ্লোক, সূত্র—কত খবরের কাগজের কত রকমের তারিফ: একমাত্র এই পথেই মিলবে জগতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান! আর সে-সমাধান আসন্ন—আণবিক বোমা পড়বার আগেই তার বিস্ফোরণ হ'য়ে জগৎ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠবে তুরীয় চেতনায়! তাঁর অশ্রান্ত ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে মন আমাদের প্রায় অথই জলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইনি শ্রীঅরবিন্দের লেখা সত্যিই পড়েছেন। কেবল পরিপাক করতে পারেন নি ব'লে অগ্নিমান্দ্যে তাঁর এ-দুরবস্থা। নৈলে তিনি আর যাই ভাবুন না কেন, এ ভাবতে পারতেন না যে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ধ্যানে দেখেছিলেন পুস্তিকা ও প্ল্যাকার্ড যোগে বিশ্বের আশু মুক্তিসিদ্ধি। ভাবলাম তাঁকে শুনিয়ে দিই শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে কী বলেছেন আধুনিক শান্তিহীন দিশাহীন মানুষ সম্বন্ধে:

"A riddle of opposites is made his field:
Freedom he asks but needs to live in bonds,
He has need of darkness to perceive some light
And need of grief to feel a little bliss,...
All sides he sees and turns to every call,
He has no certain light by which to walk,...

He would guide the world, himself he cannot guide,
He would save his soul, his life he cannot save."

অর্থাৎ

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রহেলিকা ল'য়ে তার জীবনের খেলা ;
মুক্তিসাথে চায় দিন যাপিতে সে বন্ধনের বুকে,
অন্ধকার চাই তার পেতে দিশা ক্ষণিক জ্যোতির,
বেদনা তাহার চাই আনন্দের লভিতে কণিকা......
প্রতিদিকে দৃষ্টি তার, দেয় প্রতি আহ্বানে সে সাড়া,
ধ্রুবালোক নাই তার যে-প্রভায় চলিবে সে পথ,
বিশ্বের সারথি হবে না জানিয়া পন্থা আপনার,
আত্মার নিস্তার চায়—পায় নি যে প্রাণের পারানি।

* * *

স্বামী নিখিলানন্দ টেলিফোন করলেন—নিয়ে যাবেন আমাদের তাঁর মোটরে নিউয়র্ক দেখাতে। সানন্দেই এ-সদাশয় বন্ধুটির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। জীবনের পথচলায় নানা চরিত্রই সামনে আসে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতন। সব সময়ে যে মনোরম দৃশ্যই বেশি মন টানে এমন কথা বলা যায় না। জীবনের মতনই আমাদের মনেরো অভিজ্ঞতা আহরণ করার প্রকৃতিটি বিচিত্র : গড়পড়তা সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর মুখচোখ তেমন আকৃষ্ট করে না যেমন করে কোনো বিশিষ্ট বিকাশ। অনেক সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর মুখই স্মৃতির জনতায় হারিয়ে যায়, কিন্তু এক একটি বিশিষ্ট দৃশ্য বা বিশেষ মানুষকে কিছুতে ভোলা যায় না। সব জড়িয়ে নিখিলানন্দ স্বামী এম্‌নিই একটি বিশিষ্ট মানুষ। বিশ বৎসরেরো উপর তিনি আছেন এদেশে। একদিন তিনি গল্পচ্ছলে বলছিলেন, আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীট বাজার ভেঙে পড়ল—১৯২৯ সালেই বুঝি। তাঁর এক বন্ধু তাঁকে চারশো ডলার দিয়ে বললেন দেশে ফিরে যেতে—যেহেতু এদেশে আর যেই পেরে উঠুক না কেন, অকিঞ্চন কোনো কিছুতেই পেরে উঠবে না। স্বামীজি হেসে বললেন : না পারি—তাতেই বা ক্ষতি কী? এই চারশো ডলারের মধ্যে তিনশো ডলার অগ্রিম দিয়ে দুমাসের জন্যে একটি বাসা ভাড়া নিলেন, বাকি একশো দিয়ে কিনলেন একশোটি চেয়ার—লেকচার হলের জন্যে। কপর্দকহীন যাকে বলে—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু তার পর? যার ঘর নেই তার পর নেই—বা তার পরও আপন হয়—অবশ্য যদি কোনো

নিস্বার্থ আদর্শ থাকে তার চোখের সামনে। স্বামী নিখিলানন্দের ছিল এই আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য তিনি, পণ নিয়েছেন তাঁর নাম প্রচার করতেই জীবন করবেন উৎসর্গ। হাতে একটি পয়সা নেই, কিন্তু ঠাকুরের নাম মূলধন নিয়ে র'য়ে গেলেন নিউয়র্কে। গ'ড়ে উঠল ভবন—"রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র"—যেখানে পরে আমাদের গান হয়েছিল। চমৎকার ভবন—নিউয়র্কের সেরা রাস্তা "পঞ্চম আভেনিউ" থেকে বেরিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের মনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ইংরাজিতে তর্জমা ক'রে চললেন—কিন্তু এ বিরাট বইটির পাণ্ডুলিপি ছাপবার অর্থসঙ্গতি কোথায়? "যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন"—বলতেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ: যেন আকাশ থেকে হঠাৎ উড়ে এলেন এক ইতালিয়ান কাউণ্ট—রোম থেকে পাঠিয়ে দিলেন স্বামীজিকে সাড়ে তিন হাজার ডলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই। বই ছাপা হ'ল, লোকে বলল: ধন্য।

এইভাবে চলেছেন স্বামীজি চিরদিন। শুনতে শুনতে মন শ্রদ্ধায় ভ'রে উঠল। কর্মী বটে। ধন্য ঠাকুর—যাঁর শুধু নামের ছোঁয়ায় নিঃস্ব হ'য়ে ওঠে চিত্তবান্ তথা বিত্তবান্।

স্বামীজি শুধু সাহসী মানুষ নন—সরল মানুষ। এ-জটিলতার যুগে এমন মনখোলা মানুষের সংস্পর্শে মন আমাদের কেমন যেন উজিয়ে উঠল। স্বামীজি কনসাল-কক্ষে ইণ্ডিয়া-হাউসে আমাদের নৃত্যগীতের আসরে এসে আমাদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হ'য়ে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে গান করতে ও ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলতে। এহেন সাধুর সান্নিধ্যে মনে যে-তৃপ্তির স্বর বেজে উঠল তার পরে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ-না-করার প্রশ্নই ওঠে না। স্থির হ'ল ১৭ই এপ্রিল তাঁদের হল-ঘরে গান হবে, ইন্দিরা ও আমি কিছু বলব ও শেষে অভ্যাগতবৃন্দ কিছু দক্ষিণা দেবেন—গ্রাম্য বাংলায় যার নাম "প্যালা"।

* * *

নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকে দেখি লোক ধরে না। স্বামীজি ভাবিত: কোথায় বসাই অতিথিদের? অনেকেই দাঁড়িয়ে শুনলেন—উপায় কী?

প্রথমেই স্বামীজি উঠে আমাদের বরণ করলেন যথাবিধি—আমাদের নামধাম কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে আমাদের প্রাপ্যের বেশি জয়টিকা দিয়ে। বললেন ইন্দিরার কথা: প্রাসাদ বিলাস গৃহ ছেড়ে সে বরণ করেছে সেই পথ যাকে শাস্ত্রে বলেছে—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—গহন সঙ্কটময় তীর্থযাত্রা, ইত্যাদি—"শুধু তাই

নয়", বললেন স্বামীজি, "ইন্দিরা দেবী কবি ও নৃত্যনিপুণা।" পরে আমার সম্বন্ধেও বললেন অনেক কর্ণরোচক কথা।

তার পরে আমি বললাম খানিকক্ষণ। গৌরচন্দ্রিকা সুরু হ'ল রামকৃষ্ণদেবের তর্পণে। বললাম: "আমাকে স্বামীজি শুধু-যে মহৎ সম্মানে সম্মানিত করছেন তাই নয়—দিয়েছেন একটি সুবর্ণ-সুযোগ। যাঁর নাম আমি আবাল্য পূজা করেছি, যাঁর 'কথামৃত' আমার যৌবনে প্রথম বিপ্লব এনে দেয়, সেই যুগাবতারের স্মৃতিপূত মন্দিরে গান করতে নিমন্ত্রণ ক'রে আমাকে করেছেন তিনি ধন্য।" ব'লে ঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তির উল্লেখ ক'রে সুরু করলাম গান—একের পর এক। প্রথমে গাইলাম পিতৃদেবের ধনধান্য পুষ্পভরা, তার মৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ ও ইন্দিরাকৃত হিন্দি অনুবাদ (এ-গানটিতে ইন্দিরা দোয়ার দিল)। ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত La Marseillaise ও তার মৎকৃত বাংলা অনুবাদ "ভারতরাত্রি প্রভাতিল, যাত্রী" গেয়ে স্বামীজির অনুরোধে ধরলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রিয় গান "মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে"। এ-গানটির উপমা ও ভাব প্রথমে কিছু ব্যাখ্যা ক'রে গানটির মৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি করলাম:

My soul is honey bee of love,
The Mother's lotus feet invite;
Intoxicate, I fly to lose
My world and all in Her delight···ইত্যাদি।

গাইবার আগে বললাম: "এ গানটির সুর দিয়েছি আমি ভৈরবী। ভৈরবী রাগের ঠাট গ্রীকদের সংজ্ঞায় Phrygian mode-এর কোঠায় পড়ে। এ-রাগটির ঋষভ পঞ্চম এই দুটি পর্দা বাদ দিলে পাই মালকোষ রাগ।" ব'লে মালকোষ রাগের একটি গান ধ'রে দিলাম—কালীর রূপবর্ণনা—ঝাঁপতালের ছন্দে:

"রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়
রাঙা মুখে রাঙা হাসি রাঙা মালা শোভে গায়।"

গানটি গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে থেমে থেমে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম কি ভাবে সা, কোমল গা, মা, কোমল ধা ও কোমল নি শুধু এই পাঁচটি পর্দায় এ-গানের রাগটির চলাফেরা। গানটি শেষ হ'লে সুরু করলাম নানারকম তান এই পাঁচটি সুরে।

মাত্র পাঁচটি পর্দায় রকমারি জাঁকালো তানালাপ শুনে শ্রোতৃবৃন্দ কেমন

যেন উজিয়ে উঠলেন: করতালি আর থামে না! যথাবিধি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে বললাম: "আমাদের সঙ্গীতের প্রাণপুরুষ নিহিত তার সুরবিহারে—যাকে আপনারা বলেন improvisation; কিন্তু এবার ব্যাখ্যা রেখে আমি আপনাদের একটি পুরো গান শোনাব যথাযথ তান সমেত—রামকৃষ্ণদেবের ঐ প্রিয় গানটি—যেটির অনুবাদ আবৃত্তি ক'রে শোনালাম এই মাত্র। এ-গানটি যথাযথ গাইতে অন্তত কুড়ি মিনিট সময় লাগে, কিন্তু ভয় পাবেন না, আমি জানি আমেরিকান শ্রোতাদের সময় কত কম—যেহেতু এ-আজব দেশের মন্ত্র 'time is money'—তাই আমি দশমিনিটে গাইতে চেষ্টা করব"

ওরা খুব হেসে উঠলো। তারপর আমি প্রায় পনরো মিনিট ধ'রে গানটি গাইলাম নানা আঁখর ও তান দিয়ে।

তারপর স্বামীজি বললেন: "এঁদের কাজের জন্যে যা পারেন দিন।" দেখতে দেখতে বেশ কিছু নগদবিদায় লাভ হ'ল।

তারপর ইন্দিরা উঠল মীরাবাই সম্বন্ধে কিছু বলতে। বলল বড় সুন্দর ক'রে—আর সে এমন সরল ভাষায় যে সবাই মুগ্ধ হ'ল। (ওর ভাষণের পরদিন থেকে দিন পনরো ধ'রে নানান্ উচ্ছ্বসিত চিঠি আসতে লাগল—কী সুন্দর কথা, শুনে যে কত শিখলাম…ইত্যাদি…কিন্তু সে কথা যথাস্থানে) ও যা বলল তার অনুলিপি লিখে রাখি নি, সব মনেও নেই—তবে ভাবার্থ এই যে, ভগবৎপ্রেম ও মানবিক প্রেম ঠিক এক বস্তু নয়। মানুষ ভালোবাসে না এমন কথা কেউ বলে না, কিন্তু সব কিছুর মতন প্রেমেরও হয় ক্রমবিকাশ। আর যতই বিকাশ হয় ততই আমরা দেখতে পাই যে, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ায় বেশি আনন্দ। মানুষ ভুল করে প্রায়ই আদায় করতে চেয়ে। ভাবে: যত বেশি হাতানো যায় ততই বুঝি লাভের কোঠায় অঙ্ক মোটা হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো: যে যতই হারায় সে ততই জমায়। ভগবান্ আমাদের ভালোবাসেন না এমন তো হ'তেই পারে না—তবে কেন মিথ্যে তাঁর ভালোবাসা চাই চাই চাই বলি এত শত ভনিতায়? উত্তর—কপালদোষে নয়, অভ্যাসবশে, কিসে কী হয় জানি না ব'লে, মানবিক ভালোবাসায় চাওয়া দেওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে ব'লে। মানুষ প্রেমাস্পদকে ভালোবাসে, দেয়ও বটে, কিন্তু প্রধানত ফিরে পেতে। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালোবাসে শুধু নিজেকে দিতে। ফিরে সে পায় অবশ্য সুদে আসলে—আর পায়ও চতুর্গুণ—চতুর্গুণ কেন শতগুণ—কিন্তু যখন সে ভগবান্‌কে তার প্রেম নিবেদন করে তখন তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার কথা তার মনেও



থাকে না। দেবার জন্যই সে দেয়—ভালোবেসেই সে ধন্য। অন্তত এইই হ'ল খাটি ভক্তি ভালোবাসা—এইই ছিল মীরার প্রেম। কৃষ্ণের জন্যে সে সব ছেড়েছিল তাঁকে আরো ভালোবাসতে চেয়েই। এ-কথা হয়ত এযুগে আমাদের কাছে মনে হবে একটু সেকেলে—কাজেই নামঞ্জুর। কিন্তু নিরুপায়। অন্তত মীরার ভালোবাসার যদি মর্ম গ্রহণ করতে হয় তবে তাঁর প্রেমের লক্ষ্য যে ছিল শুধু দেওয়া—অকুণ্ঠে বল্লভ কৃষ্ণের চরণে সর্বদান—এই কথাটি ভুললে চলবে না। তাই না তিনি গেয়েছিলেন:

কভী ঐসা ভি দিন হোগা—তুম্‌হারী মৈ হো জাউঙ্গি?
মৈ হর আশা নিরাশা তজ হরী চরণোঁমে আউঙ্গি?...
তুম্‌হারা নাম স্থনতে কব্ যে ভর ভর নৈন আয়েঙ্গে?
হৃদয়মে প্রাণমে শ্বাসোঁমে তেরা বাস পায়েঙ্গে?
( দিন এমন আসবে না কি প্রিয়, যেদিন হব হে তোমার?
হ'য়ে পার সব নিরাশা আশা পাব চরণ অধিকার?...
ও নামের উচ্চারণেই নয়ন জলে ভরবে যেদিনে?
হৃদয়ে প্রাণের শ্বাসে নেব তোমার সুরভি চিনে? )

সেদিন এসেছিল সাক্ষাৎ আমেরিকান রেডিও কোম্পানী—"Voice of America"—আমাদের গানাদি আমেরিকায় বেতারে ছড়িয়ে দিতে। তাদের মধ্যে একজন আসরের শেষে ইন্দিরাকে বলল: "আপনার ভাষণটি শুনে আমরা এত মুগ্ধ হয়েছি যে, ওর প্রতি কথাটি বেতারে সমস্ত আমেরিকায় শোনাব।"

তারপরে আমি গাইলাম একটি জর্মন ঘুমপাড়ানি গান ও তার বাংলা "ঘুম যাই মা"—যেটি গ্রামোফোনে আমি গেয়েছি। এ গানটির বাংলায় রকমারি তান দিতে ওরা পুলকিত হ'য়ে উঠল।

তারপরে ইন্দিরা ও আমি গাইলাম মীরার বিখ্যাত গান:

"মেরে গিরধর গোপাল দূসরো না কোঈ"।

সময় হ'য়ে গেছে। শ্রোতারা তবু ওঠেন না। কাজেই আর একটি গান গাইতে হ'ল।

সর্বশেষে স্বামী নিখিলানন্দ উঠে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে বললেন: "আমেরিকান শ্রোতাদের আপনারা যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখলেন দু দু ঘণ্টা..." ইত্যাদি।

গানের শেষে স্বামীজি তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের ভোজ্য পেয় দিয়ে যথাবিধি অতিথিসৎকার করার পরে বললেন: "আমেরিকানরা বড় চঞ্চল, এতক্ষণ ঠায় ব'সে বিদেশী গান শুনতে ওদের আমি কক্ষনো দেখি নি। ওরা যেন উঠতেই চায় না মনে হ'ল! সত্যি বলছি—কী আনন্দ যে হচ্ছে—কী গৌরব যে বোধ করছি—"

বাধা দিয়ে বললাম: "আনন্দই তো ভালো, গৌরবের প্রসঙ্গ আর কেন?"

স্বামীজি বললেন: "গৌরব কেন? আপনি বলেন কি? আপনারা কি জানেন কী কাণ্ড করেছেন আপনারা আজ? ওদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জেগে উঠেছে ভারতের ভাব ও শিল্পকারু সম্বন্ধে। একেই আমি বলি প্রকৃত দেশসেবা। আর একাজ যে-ই করুক না কেন—আমার মন ভ'রে ওঠে, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি তার কাছে। কারণ—বড় দুঃখেই এ-কথা বলছি দিলীপবাবু—যে আমি বিশ-বৎসর এখানে আছি কিন্তু বড় বেশি ভারতীয়কে দেখি নি এ-ভাবে মাতৃভূমির সেবা করতে। দীর্ঘায়ু হোন আপনি—এই প্রার্থনাই করি ঠাকুরের কাছে।"

* * *

পরদিন এল সেই আমেরিকান জগত্তারণ যুবকটির চিঠি—মানে যে কিছুদিন আগে আমাদের কাছে এসেছিল নানা নীতিগর্ভ ও রঙচঙে প্ল্যাকার্ড নিয়ে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রে আমাদের গান ও বিশেষ ক'রে ইন্দিরার মীরাবাই সম্বন্ধে ভাষণ শুনে সে প্রকাণ্ড একটা গদ্য কবিতাই লিখে ফেলল নানা রঙের হরফে টাইপ ক'রে। সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি চরণ শুনুন।

ইন্দিরা সম্বন্ধে নানাভাবে নানা উপমা দিয়ে বহু উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ও লিখল:

Greetings to Mira
Who also irresistibly becomes
The Queen of all queens
In the secret life of the soul......ইত্যাদি।

আরো কত চিঠি, টেলিফোনে নিমন্ত্রণ, নামী ও অনামী দাতার কাছ থেকে বাহক মারফৎ উপহার—সে কত কী! কিন্তু এ-সব রেখে এদের মধ্যে একটি মাত্র চিঠির কথা বলব যথাসম্ভব সংক্ষেপে—কারণ, লেখিকা পরে ইন্দিরার অত্যন্ত প্রিয় সখী হ'য়ে উঠেছিলেন তাঁর নিস্বার্থ সেবার গুণে। ইনি জাতিতে চেক—এঁর কথা পরে আরো লিখব যথাস্থানে। উপস্থিত ইনি লিখলেন ইংরাজিতে—বাংলায় তর্জমা ক'রে দিই:

"Beloved Devi ( প্রিয় দেবী—ইন্দিরাকে অনেকেই শুধু দেবী বলত ),

আমার গভীর কৃতজ্ঞতার অর্ঘ গ্রহণ করবেন শুক্রবারে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের সান্ধ্যসভার জন্যে। সেখানে আপনারা দুজনে যা পরিবেষণ করেছিলেন আমি নানাদিক থেকে নানাভাবে রসিয়ে উপভোগ করেছিলাম। আমি খুব বেশি মুগ্ধ হয়েছিলাম আপনার সৎসাহস দেখে—অথচ সে-সাহসের সঙ্গে মিশে ছিল কী সুন্দর বিনয়—বিশেষ ক'রে যখন আপনি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাচ্ছিলেন ভারতের গভীর, নির্মল ও সরল প্রেমের বাণীটি। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দেবেন আপনার গুরুদেব, শ্রীদিলীপকুমার রায়কে তাঁর বিচিত্র সাঙ্গীতিক দানের জন্যে—বিশেষ ক'রে তাঁর ফরাসী ও জর্মন গানের বাংলা প্রতিরূপের জন্যে।"

কিন্তু শুধু তারিফটুকুর জন্যেই পত্রটি তর্জমা করি নি। এর পরে আরো অনেক কিছু লিখে কুমারী লিখলেন : "I am a licensed *masseuse* and it would give me the greatest joy if you would kindly phone me when you would like me to massage you. Somehow I think that it would be very beneficial to you...May I thank you in advance for giving me this great pleasure—of doing something of you ?—

Ruth Ringer"

এমন সরলভাবে সেবার অধিকার চাওয়া ? মনে পড়ে ভাগবতের কথা : ভালোবাসার একটি পরম প্রকাশ সেবায়—প্রতি ইন্দ্রিয় দিয়ে। কারণ, মানুষ নিজেকে দিতে পারে সবচেয়ে সহজে ছোটবড় সেবায়।

প্রশংসা ইন্দিরা অনেক পেয়েছে এদেশে ওদেশে, কিন্তু এ-ধরনের বিচিত্র চিঠি বোধ হয় ও আর কখনো পায় নি—বিশেষ অপরিচিতার কাছ থেকে। এ-ধরনের অভিজ্ঞতাকে মাত্র ব্যক্তিগত বিশেষণ দিয়ে নাকচ করাও চলে না। তাই এ-চিঠিটি উদ্ধৃত করলাম ওর আপত্তি সত্ত্বেও। ওকে নিয়ে কী যে মুস্কিল! ওর সম্বন্ধে কিছু লিখতে যেতে না-যেতে ও করবে আপত্তি। এমন কি, 'শ্রুতাঞ্জলি'তে মীরার-কাছ-থেকে-পাওয়া গানগুলি ছাপতেও ওর ঘোর আপত্তি ছিল—মীরা সম্বন্ধে ওর ডায়ারি বা চিঠির তো কথাই নেই।

অবশ্য ওর কুণ্ঠার কারণ যে দুর্বোধ্য এমন কথা বলব না। মন স্বস্তি পায় না ভাবতে যে, অনেকেই বিশ্বাস করবে না এ-ধরনের উপলব্ধি, শ্রুতি, দর্শন। বিশ্বাস করার চেয়ে আরো শক্ত বিশ্বাস করানো। কিন্তু তবু সুন্দর সত্য ব'লে যাকে জেনেছি তাকে আড়ালে রেখে দেব অবিশ্বাসীর বিদ্রূপের ভয়ে? তাছাড়া, মহদ্বাণী যারা বিশ্বাস করবে না তাদের খাতিরে এ-সব যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে তাদের

বাদ দেব কোন্ যুক্তিতে? এ-জগতে সুন্দর ভাব, মহৎ প্রেরণা, আনন্দদায়ক সংবাদ বিরল। অথচ আমাদের মনের এক দুর্নিবার তৃষ্ণা—মহৎ ও সুন্দরকে প্রচার করবার, শুভ ও সত্যের গুণগান করবার। যাতে নিজে আনন্দ পেয়েছি, যে-আলো আমার নিজের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে, সে-আনন্দ সে-আলোর দু-চারজন অন্তত সরিক হোক—এ-আকাঙ্ক্ষা সুকুমার তথা শিল্পী মনের সহজাত। তাই দেশে দেশে যুগে যুগে শিল্পী পর্যটক আনন্দময় বা বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিকে শুধু হাতে পেয়েই ক্ষান্ত হন নি—লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন তাঁদের যাযাবর জীবনের হাজারো আনন্দময় ঘটনা ও বিস্ময়কর প্রত্যক্ষ দর্শন, অনুভব। ইন্দিরার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা ওর সম্বন্ধে কী ভেবেছে, ওর মধ্যে কী দেখেছে, ওর সংস্পর্শে কী লাভ করেছে সে-সব কাহিনী যদি কেউ বলার মতন ক'রে বলতে পারে তবে এ-দুঃখময় জগতে আনন্দের জমার কোঠার অঙ্ক পুরু হবে—কেন না, কোনো সত্য ও মহৎ আনন্দই খতিয়ে আত্মকেন্দ্র থাকতে পারে না, হ'য়ে ওঠে সংক্রামক। তবে কথা হচ্ছে বলার মতন ক'রে বলতে পারা চাই। এইখানেই সত্যবাদীর সত্যকথনে শিল্পকলার সার্থকতা, রচনাভঙ্গির কৃতিত্ব। যদি কারুর লেখার মধ্যে সে-কৃতিত্ব থাকে তবেই সে এ-ব্যক্তিগত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ভঙ্গির মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দরস পরিবেষণ করতে পারবে। যদি এ-কৃতিত্ব না থাকে তবে তার লেখা হবে ব্যর্থকাম—বটেই তো। গাছকে তার ফল দিয়েই বিচার করতে হবে—বলেছিলেন খৃষ্টদেব। আরো বড় কথা—গীতার বাণী—কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। তাই লিখে যাব যা-কিছু সত্য ব'লে মেনেছি, রসাল ব'লে জেনেছি। এ-সত্যকথনের ফল রসোত্তীর্ণ হবে এ-আশা নিশ্চয়ই রাখি। কিন্তু যদি না-ই হয় তাতেই বা দুঃখ কী? নিষ্কাম কর্মের আদর্শের পিছনে আছেই আছে এই অঙ্গীকার:

সাধনা হোক সত্য—যদি সিদ্ধি নাও আসে,
দুঃখ কেন—সাধনা যবে সার্থক প্রয়াসে?

একথা জানি—পুনরুক্তি মার্জনীয়—যে অনেকে ভুল বুঝবেই, বলবে নানা অকথা কুকথা। কিন্তু যদি অন্তর্যামীর কাছে সরল থাকি, খাঁটি থাকি, তবে কে কী বলল না-বলল তাতে কী আসে যায়? রোলাঁ একবার লিখেছিলেন আমাকে: "মানুষ অবিচার করে? করলই বা—যখন চরম বিচারক সে নয়, চরম বিচারক শুধু একজন—অন্তর্যামী।" ভয়টা কিসের? তাই আমি লিপিবদ্ধ ক'রে যাব যা কিছু সুন্দর দেখেছি জীবনের অশ্রান্ত পথচলায়, যা কিছু জেনেছি সত্য ব'লে

অন্তরের এজাহারে। যদি সাক্ষ্য আমার সত্যাশ্রয়ী হয় তবে আজ না হোক কাল—কাল না হোক তারো পরে—সে আপন সত্যের সহজ প্রতিষ্ঠাশক্তিতেই সর্বজনগ্রাহ্য হবে; আর যদি সত্যলঙ্ঘন ক'রে থাকি তবে দণ্ড পাব দণ্ডধারীর হাতে যার নাম মহাকাল—কর্মফলদাতা। জ্ঞানীদের কাছে শুনেছি—(গভীর জ্ঞানের অন্দরমহলের কথা জানবই বা আর কার কাছে?)—যে প্রতি কর্ম রচে একটি রেশ, কর্মচক্র, যার ফল ফলেই ফলে যদিও সব সময়ে তখনি তখনি নয়—অনেকদিন বাদে, এবং অনেক ক্ষেত্রে সোজাসুজি নয়—বঙ্কিম ভঙ্গে। চরম জবাবদিহি তো শুধু সেই অন্তিম কর্মফলদাতার কাছে যিনি এ-চলিষ্ণু জীবনলোকে পদে পদে প্রশ্নপত্র দাখিল ক'রে চান ঠিক উত্তরটি। এ-পরীক্ষায় পাস হব এ-বিশ্বাস আমার আছে, নৈলে যা ভেবেছি জেনেছি দেখেছি শুনেছি প্রকাশ করবার জন্যে বহুবৎসর ধ'রে লেখার সাধনা করতাম না। তবে যদি ফেলই হই তাহ'লে তা থেকেও আহরণ করব শিক্ষণীয় যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকবে—তার ফলে ভবিষ্যতে পাস হওয়া একটু অন্তত সহজ হবে। শ্রীঅরবিন্দ "সাবিত্রী"-তে বলেন নি কি যে আমাদের অন্তরাত্মার "splendid failures sum up to victory"? তাই কর্মফল নিয়ে মাথা না-ঘামিয়ে কর্মে যে-আজন্ম অধিকার কর্মাধীশ মঞ্জুর করেছেন তাকেই সাধ্যমত নিখুঁত ক'রে নির্বাহিত ক'রে যাই—যা ভালো মনে করি তারই অনুসরণ ক'রে যাই এই মন্ত্র জপ ক'রে যে, "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে"—

যা কিছু সাধি—ফলিবে ফল—আজ না হোক কাল :
বিফল নহে বিফলতাও—রবে না রে আড়াল।

একটু বেশি গুরুগম্ভীর হ'য়ে গেল বুঝি। ফের হাল্কা প্রসঙ্গে ফিরি—গরমের পর নরম।

এক মহিলা সুরু করলেন টেলিফোনের পর টেলিফোন। রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমাদের গান ও বক্তৃতা শুনে অবধি তাঁর মন আকুল হ'য়ে উঠেছে আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। বেশ। আসুন—২১শে এপ্রিল বিকেল বেলা।

এলেন মহিলা। খুব ব্যস্ত। কথা বলেন যাকে বলে অনর্গল। এত দ্রুত যে একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে না-পেতে আরো চারটি প্রশ্ন। প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠি আর কি! ইন্দিরা ও আমি দুজনে মিলে বহু চেষ্টায়ও তাঁকে রুকতে

পারলাম না। জল যখন বাষ্প হয় তখন সে হয় দুর্নিরোধ—বলে পদার্থবিজ্ঞান। তাই তো রেল চলছে।

কিন্তু এ-মহিলার প্রশ্নবাষ্প কোনো প্রণালীতে চলে না—তাই তাকে দিয়ে কোনো কাজই করানো যায় না। একটি মাত্র নমুনা দেই—অলমতিবিস্তরেণ।

"জানেন? আমাদের কাজ বহু। বন্ধ রাখা অসম্ভব। একদিনও ছুটি নেই। কাপড় কাচা কি সহজ ব্যাপার? কত লোকের কাপড়! খেটে খেটে খেটে! স্বামী আমার মহাকর্মী, কিন্তু কাজও যে অন্তহীন। তবু মোটরযানে বহুদূর থেকে এসেছি আপনাদের কাছে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যেতে আমার কী যে সাধ! কিন্তু যাওয়া কি আর হবে? আপনারা সেখান থেকে এসেছেন শুনে ছুটে এলাম। আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা আমার প্রবল, কিন্তু সময় কই? কেবল কাপড় কাচি। ধ্যান ধারণা? হায় হায়, একটু শান্ত হ'য়ে বসলে তবে না ধ্যান? কিন্তু শুনুন, বলতে পারেন আমাকে, হাওয়া থেকে টাকা করা যায় কি না?"

ইন্দিরা তাকালো আমার দিকে। আমি বললাম: "শুনেছি কোনো কোনো সাধু ধুলো থেকে চিনি করেন, কিন্তু হাওয়া থেকে টাকা?"

"আরে হ্যাঁ মশাই, নৈলে বলছি কি? আমারই এক দাদা একবার প্রার্থনা করেছিলেন—ডলার হারিয়ে। বৌদি বকবেন হিসেবে না মিললে। অগত্যা প্রার্থনা ক'রে শূন্য থলিতে হাত দিতেই দেখেন ঘাটতি-পড়া দশ ডলার।"

ইন্দিরা হাসি চেপে বলল: "তা হবে। কিন্তু আমাদের কখনো ও-ধরনের ঘাটতি পড়েনি, কাজেকাজেই এ-ধরনের সমস্যা নিয়ে মাথা বকাতেও হয় নি। আপনি এই জাতের প্রশ্নের যদি উত্তর চান, যান অন্যত্র—যাঁরা উত্তরটা জানেন।"

মহিলা দমবার পাত্রী নন। ব'লে চললেন এ ও তা কত কথা। আমরা হ'য়ে উঠলাম অবান্তর।

শেষটা আর পারলাম না। উঠে পড়লাম—আরো ইন্দিরার অসহায় মূর্তি দেখে। মনে মনে বললাম: "হা ভগবান্! এ কাকে এনেছ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অবিস্মরণীয় কান্না মনে প'ড়ে গেল: "মা গো! এ-সব কাদেরকে পাঠাস আমার আছে? মিথ্যে ব'কে ব'কে প্রাণ গেল। একসের দুধে চার সের জল—জ্বাল দেব আর কত? শুধু কাঠের ধোঁয়ায় চোখ গেল, মা!"

* * *

অথচ ভাবুন—ভদ্রমহিলা সত্যিই বহুদূর থেকে হাজারো কাজ ফেলে

এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দাঁড়াল যা তা এই যে, তিনি এসেছিলেন দেখা দিতে।

সমর্সেট মম তাঁর Writer's Note Book বইটিতে একটি ঘটনা লিখেছিলেন, পড়বার সময় খুব হেসেছিলাম। ঘটনাটি এই—খুঁটি-নাটি মনে নেই শুধু ভাবার্থটি দিচ্ছি।

আমেরিকার কোথায় এক হোটেলে তিনি গিয়েছিলেন একটু জিরুতে। হঠাৎ লাউঞ্জ ঘরে এক মহিলার আবির্ভাব। নিউয়র্কে ট্রাঙ্ক কল করতে হবে টেলিফোনে। কিছুতেই বাঞ্ছিত মানুষটির সঙ্গে যোগ হয় না। মহিলাও নাছোড়বন্দ। সবাই উদ্ব্যস্ত। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা—"চাইই চাই—টেলিফোন আমাকে করতেই হবে—না করলেই নয়। যে ক'রে হোক দিন অমুক নম্বরের সঙ্গে জুড়ে।" শেষটায় রাত বারোটায় বুঝি মিলল সিদ্ধি দুর্দম্য সাধনার। সমর্সেট মম শুনছেন মহিলা বলছেন টেলিফোনে:

"কে? এসেছ? অবশেষে?...হ্যাঁ, আমি চাইছিলাম তোমাকে টেলিফোনে। ...শোনো। আমি শুধু এইটি বলতে চাই যে, তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা কইব না।"

ব'লেই টেলিফোন দুম্ ক'রে রেখে-দেওয়া।

ইন্দিরা হেসে তার এক সখীকে বলছিল এই বসনক্ষালিনীর প্রসঙ্গে: "তিনি টেলিফোনের পর টেলিফোন ক'রে আমাদের দর্শন দিতে এসেছিলেন শুধু জানাতে যে, ধ্যান ধারণার তাঁর সময় নেই।"

* * *

২৩শে এপ্রিল রাত আটটায় এখানে জোসেফ হাইল নামে এক আমেরিকান গুরুভাইয়ের বাড়ি গেলাম। মানুষটি সত্যিই ভালো: সরল, স্নেহশীল, শ্রীঅরবিন্দকে ভক্তি করে অন্তর থেকে। বলল ২৪শে এপ্রিলের ধ্যান হবে। ২৪শে এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দিতেন। ২৩শে এপ্রিল রাত আটটায় যখন আমরা ধ্যানে বসেছি তখন কলকাতায় ২৪শে এপ্রিল, সকাল সাড়ে ছটা।

আমরা ধ্যানে বসতে না-বসতে ইন্দিরার সমাধি হ'য়ে গেল। সেই অপূর্ব মৃদু মৃদু হাসি—যে-দিব্য হাসি জাগ্রত অবস্থায় ওর মুখে ফোটে না। সমাধিভঙ্গ হ'লে বলল—যেমন প্রতিবারই বলে: "দাদা, গান শুনেছি!" মীরা ওর কাছে গেয়েছিলেন যে-গানটি সেটি এত সুন্দর যে এখানে দিলাম বাংলা অনুবাদ সমেত। এ-গানটি ও সে-সন্ধ্যায় আবৃত্তি করেছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম।

( বলতে ভুলেছি : ২২শে এপ্রিল রাতে যখন ধ্যান করতে বসি তখন মীর আমাকে বলেছিলেন : "কাল রাতে ইন্দিরাকে আমি একটি গান শোনাব।" গানটি এই :

কূঁ্য নৈনা তরসে দরশনকো—জো হৃদয়মে প্রাণমে তূ ?
তূ পাস ভি রৈ কূঁ্য দূর হরী—জো জীবমে জানমে তূ ?
তূ মন্দিরকী প্রতিমামে, তূ পূজাকী থালীমে।
তূ চঞ্চল ভঁবরেমে হৈ, তূ ফুলোঁকী লালীমে।
তূ রাজনকা রখবালা হৈ, বলবানকা মান ভি তূ।
তূ ঠাকুরভী, সাধনভী তূ, ধ্যানীকা ধ্যান ভি তূ॥

তূ হী মুসকান অধরপে হৈ, নৈনোঁকা নীর ভি তূ।
তূ চৈন হৈ, শান্তী সুখ হৈ তূ, বেদনকী পীর ভি তূ।
তূ অম্বরকে তারোঁমে, তূ ধরণীকী গহরাঈ।
তূ প্রীতম হৈ, প্রীতী ভী হৈ, তূ প্রেমী সওদাঈ।
তূ ছলিয়া হৈ, চিতচোর হৈ তূ, মোহ ভগবান ভি তূ।
তূ কুল হৈ ইস্ কুলনাশীকা, মীরাকী আন ভি তূ॥

এ-গানটির অনুবাদ দিই :

কেন তৃষিত নয়ন রয়—যদি তুমি রাজো অন্তরে, প্রাণে ?
যদি আছ বঁধু প্রতি জীবে—বলো কে সে দূরের আড়াল আনে ?
আছ মন্দিরে তুমি প্রতিমায়, আছ পূজার ফুলডালায়।
আছ অলির চঞ্চলতায়, কুসুমরক্তরাগ-আভায়।
তুমি রাজারো পালক, বিরাজো প্রতাপাদিত্য বলীর মানে।
তুমি সাধনার শেষে, সাধনার পথে, ধ্যানীর গভীর ধ্যানে।

তুমি অধরে হাসির প্রভা, নয়নের তুমিই অশ্রুধার।
চির শান্তি তুমিই, সুখ আনন্দ, যন্ত্রণা বেদনার।
আছ অম্বরে তারাচন্দ্রতপনে, ধরণীগর্ভে প্রিয় !
তুমি বল্লভ, তুমি প্রেম, হে প্রেমের পাগল অদ্বিতীয় !
তুমি ছলী, চিতচোর, তোমারে বিভোর হৃদি ভগবান্ জানে।
মীরা কুলত্যাগিনী লভিল অকূলে কুলমান তব দানে॥

পরদিন—২৪শে এপ্রিল—গেলাম দেখতে বিখ্যাত "এম্পায়ার স্টেট বিলডিং" —বিশ্বে একমেবাদ্বিতীয়ম্, যেহেতু এত উঁচু সৌধ জগতে দুটি নেই। পারিসের এফেল টাওয়ার যে এফেল টাওয়ার সে-ও মাত্র ৯৮৪ ফিট উঁচু—যেখানে এম্পায়ার সৌধ হ'ল ১৪৭২ ফিট। জগতের উনতুঙ্গতম সৌধ না কি ক্রাইস্লার বিলডিং—১০৪৬ ফিট। এম্পায়ার সৌধের চূড়ায় অতিক্রতগতি লিফ্‌টে উঠতেও এক মিনিটের বেশি সময় লাগে। গোণাগুন্তি ১০২ তলা যে—লাগবে না? ৮৬ তলায় একটি ক'রে ভোজনালয় আছে। এত ভোজনালয় শুনি দিনদুনিয়ার আর কোনো শহরে নেই। Natural History Museum দেখতে গিয়েছিলাম পরদিন—সে কথা যথাস্থানে—সেখানেও একটি খাসা কাফেটারিয়া ভোজনালয়। যেখানেই ভিড় হয় এরা গড়ে ভোজনালয়। এ-সুবিধা যে ছাড়ে তার বিশেষণ অবোধ। কাজেই সুবোধ দিলীপ ঐ উঁচুতে উঠে এক পিয়ালা কফি খেয়ে চাঙ্গা হ'য়ে নিল। এবার কিন্তু একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়াই চাই—নৈলে শুধু কফি পানের খবর দিয়ে থেমে গেলে প্রাণ বাঁচলেও মান থাকবে না।

এ-সৌধটির ৫৫ ফিট না কি মাটির নিচে! অপ্রতিবাদ্য সাক্ষীরা বলেন: অনেক সময়েই ১০২ তলায় সাক্ষাৎ মেঘের খেলা দেখা যায়! নিচে মেঘ উপরে সূর্য! আশ্চর্য হবেন না তবু? এমন অভিজ্ঞতাও অনেকেরই হয়েছে যে নিচে বৃষ্টি কিন্তু উপরে দর্শক রোদ পোহাচ্ছে!

আর কী? কত কী! একটি কীর্তনে আঁখর দিতাম:

> করুণার কথা বলা কি যায়?
> শুধু যে পেয়েছে সে জন জেনেছে
> পায় নি যে—সে কি বুঝিবে হায়!

তাই যারা দেখে নি জানে নি তাদের শুধু এইটুকু বলি যে, দ্রষ্টব্য বটে! চারদিকে ঝাড়া দশমাইল দেখা যায়—দিগন্তব্যাপী প্রসার। নিচে মানুষ ও মোটর চলেছে অশ্রান্ত সমারোহে—যদিও পিপীলিকা-শ্রেণীর মতন। দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়: একের পর এক সমান্তরাল ধূসরাভ রাস্তা—দুধারে শুধু গগনস্পর্শী সৌধ——"স্কাইস্ক্রেপার!" তাকালেই দেখা যায় নিউয়র্কের ভূগোল—নদীমেখলা সুন্দরী রাজধানী—আর কী সুন্দর! নিচে থেকে যাকে মনে হয় গর্জমানা শ্বাসরোধ-কারিণী—উপর থেকে তাকে মনে হয় মৌনময়ী লাবণ্যপ্রভা। নিচে থেকে যাকে দেখা যায় ধূসর ম্লান, উপর থেকে তাকে দেখায় নিশ্চক্রবাল আত্মসংস্থ।

বৈদান্তিক বলেন: চেতনার উপরিস্তরেও নাকি এম্‌নিই হয়: নিচে থেকে

দেখতে যা বেদনা, উপর থেকে দেখতে সে হ'য়ে ওঠে এক নবচেতনালব্ধ বিকাশের আনন্দ-সোপান! মনে সুর গুনগুনিয়ে উঠল, এক বিষাদমধুর সুর:

দেখিলাম সে কী! পারি বলিতে কি! তবু কিছু বলা চাই।
তটিনীমেখলা সৃষ্টি উজলা—আড়াল কোথাও নাই!
জলস্থলের মোহন মিতালি! মহাসভা প্রাসাদের
বলে নীলিমারে যেন: "দেখ চেয়ে এ-মহিমা মানবের!"

ধীরে ধীরে নামে আদিত্য পাটে—ছায়াবুকে জলে আলো!
একটি···দুইটি···ক্রমে অগণ্য দেয়ালিতে নিভে কালো।
অসাঙ্গ-দীপ-রঙ্গময়ী সে-রাজধানী গর্বিতা
জনতা-ধারিণী বণিকতারিণী—সম্পদনন্দিতা!
দিনে নাই যার প্রসাধন—সাঁঝে হয় সে কিরণপরী:
তপনবিদায়ে গৌরবময়ী বিজলিসনাথা, মরি!
প্রকৃতির দান শুধু লভি' মান চায় না এ-রাজবালা।
সূর্যবিনাশে অপরাজেয়া সে সাধে মণিরাগমালা!

শুধু মনে হয়: নয় হেথা নয়—যেথা চায় রাস প্রাণ:
প্রমোদদৃপ্ত বিলাসনৃত্য—কীর্তির অভিমান!
অঝোর রঙ্গ রূপবিভঙ্গ, সুখমোহ, রূপতৃষা
রচে নাগপাশ ব্যর্থ বিলাস—দেয় না মুক্তিদিশা।
স্রোতে যার স্থিতি—নহে সে অদিতি দেবমাতা সনাতনী:
সে-মায়ার খেলা বুদ্বুদমেলা—অলীক কলধ্বনি।
তবু কোন্ টানে কার সন্ধানে অনামা লক্ষ্য পানে
চলে গৌরবী কার নাম জপি—'জ্ঞানীও কি হায় জানে?

আজ মনে পড়ে কোন্ সুলগনে বহু শতাব্দী আগে
সুধাতুরাশিনী কে তপস্বিনী গেয়েছিল প্রেমরাগে:
"মিলে না যেথায় অমৃত—সেথায় কে কোথা পেয়েছে ঠাঁই?
আলেয়ার কায়া মরীচিকা মায়া—সেথায় মুক্তি নাই।"
"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?"

* * *

২৫শে এক বন্ধু এসে নিয়ে গেলেন প্লানেটেরিয়াম দেখাতে। আমেরিকায়



পাঁচটি মাত্র প্লানেটেরিয়াম আছে : সানফ্রান্সিস্কোয়, লস্ এঞ্জেল্‌সে, ফিলাডেল-ফিয়ায়, শিকাগোয় ও নিউয়র্কে। বলাই বাহুল্য, নিউয়র্কের প্লানেটেরিয়ামটি বৃহত্তম। কাজেই গেলাম সাগ্রহে।

কী কাণ্ড! মন যেন থম্‌কে দাঁড়ায়—সম্ভ্রমে—বিশাল প্রেক্ষাগৃহ, কিন্তু বিচিত্র সে-মহাঙ্গন যার লীলাপীঠ সাম্‌নের কোনো রঙ্গমঞ্চ নয়—মাথার উপরে উল্টো পেয়ালা—dome! খোদার উপর খোদকারি বলে না? মানুষ চাইল আকাশের মিনিয়েচার গড়তে যাতে ক'রে আকাশকে বোঝা একটু সহজ হ'য়ে আসে। আর আকাশ ব'লে আকাশ!—দেখতে দেখতে টিক্—ওমা, অজস্র ফুটফুটে তারা ঝিকমিকিয়ে উঠল মাথার ঠিক উপরে। কী ব্যাপার!—এ যেন সত্যি ছায়াপথ দেখছি নির্মল অমাবস্যায়—twinkle twinkle little star—মনে প'ড়ে গেল! আর সে কত তারা যে—কোনোটা বড়, কোনোটা মাঝারি, কোনোটা বা ছোট···কোনোটা বা কাঁপছে, কোনোটা বা স্থির—ঠিক যেমন আকাশে দেখা যায় না? ( টীকা—'টিক্' শব্দ করে বোতাম। )

ফের টিক্—ও কী রে! এক ধূমকেতু দিলেন হাজিরি—আচম্বিতে! পরে আর একটি—সপ্তপুচ্ছ! পরে এ কী কাণ্ড গো—একের পর এক তারা পড়ছে খ'সে তীরের মতন—উল্কাবাজি যাকে বলে! তারপরই টিক্, লাল কস্মিক রশ্মি! এর খেলা শেষ হ'তে না-হ'তে টিক্, চারিদিকে ফুটে উঠল বালুভূমিতে বিরাট গর্ত : আরিজোনার মরুভূমিতে পড়েছিল একটি সুবৃহৎ উল্কা—তার ফলে মরুর কী দশা হয়েছিল দেখা গেল গোলাকার ছবিতে। উঃ! কী সে উল্কা—যার উৎপতনে ঘটোৎকচের মতনই জনপদের সর্বনাশ হ'ত নিশ্চয়—যদি না ভগবৎকৃপায় পড়ত সে ধূ ধূ মরুচরে। কিন্তু বুঝেছিল বেচারি বালুকা সে-আলিঙ্গনের স্বাদ—ষাট ফিট গভীর গহ্বর হ'ল যে-সংঘাতের পরম পরিণাম।

তারপর দেখলাম এখানে ওখানে কত গ্রহ—নিচের তলায়! একটি গোলক নিজের অক্ষেই অশ্রান্তভাবে আবর্তিত হচ্ছে, আর তার চারধারে চাঁদ বেচারি নাহক ঘুরে মরছে, কার আদেশে কে জানে? শনির কয়টি উপগ্রহ, জুপিটারের, মঙ্গলগ্রহের। মীন মকর সিংহাদি রাশিচক্রও। মরুক গে—জ্যোতিষ কিছু পড়েছিলাম বি. এস্‌সি. অনর্স ক্লাসে—ভুলে গেছি প্রায় সবই। গগনতথ্য সম্বন্ধে অবশ্য আরো অনেক কিছু পড়েছি এখানে ওখানে, মনে নেই। যাঁরা এ-সব তথ্যে পুলকিত হ'য়ে ওঠেন তাঁদের কাছে প্লানেটেরিয়ামের দান অমূল্য। তাঁরা যেন দেখেন।

সেখান থেকে গেলাম "প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক জাদুঘরে" (Natural History Museum)। প্রথম ঘরে ঢুকেই দেখি বিশালকায় মাতঙ্গ তিনচারটি—অবশ্য অজীবস্তু, নৈলে কি আর রক্ষে ছিল? নিউয়র্কে ভারতবর্ষের আমদানি! তবে শুধু ভারতবর্ষই বা বলি কেন, নিউজীলাণ্ডের প্রাণী, অস্ট্রেলিয়ার, পেরুর, ব্রেজিলের চীনের, আফ্রিকার—আরো কত দেশ বিদেশের! সবচেয়ে মুগ্ধ হ'লাম দেখে যে প্রতি জন্তু পাখী উভচরকে রাখা হয়েছে মস্ত মস্ত কাঁচের খাঁচায় কিন্তু তাদের অভ্যস্ত পরিবেশে। কোথাও বা সমুদ্রের ছবি—আঁকা চরে বাঁকা বক দাঁড়িয়ে, কোথাও পাহাড়ে পাথর—বাঘ জল খেতে ঝুঁকছে, কোথাও শ্যামল বনানীতে হরিণ উৎকর্ণ হ'য়ে তাকিয়ে। কোথাও বা ছাদ থেকে ঝুলছে উড়ন্ত পাখী। জীব জন্তু পশু পক্ষী যে কত—কী বলব? তাছাড়া, এ-সব প্রদর্শনী দর্শনীয়, বর্ণনীয় তো নয়। তাই ইতি করি।

গর্ব ক'রে বলতাম—আমি সাইটসীয়র নই। একদা দর্পহারী দর্প চূর্ণ করলেন: লোভে প'ড়ে বেপরোয়া হ'য়ে বেরিয়ে পড়লাম স্বামী নিখিলানন্দের মোটরে বিখ্যাত বিশাল হডসন নদীতীরে। ঠিক যেন কলকাতার গঙ্গা! দেখতে না-দেখতে মন উদাস হ'য়ে গেল—কবে দেখব ফের মা গঙ্গাকে—গাইব পিতৃদেবরচিত স্তব:

> পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
> বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
> বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
> মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

যাহোক দীর্ঘশ্বাস দমন ক'রে উধাও হলাম বিখ্যাত ওয়াশিংটন সেতুর উপর দিয়ে ওপারে। সেখান থেকে ফিরলাম "লিঙ্কন্" সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এপারে—নদীর নিচে সুড়ঙ্গ—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে "উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর"!

আর একদিন বন্ধুবৎসল স্বামীজি নিয়ে গেলেন এখানকার বিখ্যাত ব্রঙ্ক (Bronz) চিড়িয়াখানায়। শুনলাম—জগতের সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা। এরা যাই করে—চুটিয়ে করে। চিড়িয়াখানা—তাই সই—সবার চেয়ে বড় চিড়িয়াখানা ক'রে তবে ছাড়ব—এই ভাব। উঁচু সৌধ—তাও হোক সবার চেয়ে উঁচু। রঙ্গমঞ্চ বা পার্ক তাই সই—কিন্তু সবার চেয়ে বড়। সার্কাস সে-ও



একমেবাদ্বিতীয়ম্। এখানকার সেণ্ট্রাল পার্ক দু-তিন মাইল লম্বা—মাইল খানেক চওড়া। সেখানেও একটা চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে দেখেছিলাম এক অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী—TIGLON—মানে TIGER ও LIONESS এর সঙ্গমজাত জীব। নানা ফুল বা শস্যের বর্ণসঙ্কর এরা করেছে নানা ভাবে। হয়ত একদিন ORANGE-এর সঙ্গে LEMON মিলিয়ে করবে LORANGE, MELON-এর সঙ্গে APPLE-এর ঘটকালি ক'রে জাতকের নাম দেবে MAPPLE*—কিন্তু ওরা তো নিরীহ বেচারি, ওদের নিয়ে নয়-ছয় করলে আপত্তি করবেই বা কে—আর করলেই বা শুনছে কে? কিন্তু এখানে এ কী কাণ্ড? সাক্ষাৎ সিংহীর গর্ভে ব্যাঘ্রের ঔরসে যার সৃষ্টি হ'ল তার একী নামকরণ—"স্যাংঘ্র" !! তবে হয়ত এ-বর্ণসঙ্কর মানুষের ঘটকালিতে হয়নি—কোন্ এক নির্দিশা লগ্নে অনামী বনে হয়ত এ-বিবাহে বনমর্মরই বাজিয়েছিল শানাই-করতালি—আর তখন আরণ্য উলুধ্বনিতে বলেছিল

ব্যাঘ্র—সানুনয়ে :

প্রেয়সী সিংহী! এ-উদার যুগধর্মের কথা শোন্ না :
আমেরিকা ডাকে—"আয় আফ্রিকা! করি দোঁহে ঘরকন্না।"
মানুষ যা পারে আমরা পারি না একথা করবি গ্রাহ্য?
এ-একাকারের যুগে কে না বলে : "জাতিভেদ ধিক্, বাহ্য!"

সিংহী—সকুণ্ঠে :

কিন্তু···যখন সন্তান হবে—নাম দেব তার বল্ কী?

ব্যাঘ্র—সগর্জে :

ছাড়্ পরিণাম-চিন্তা এ-যুগে, বেশি ভেবে সখী ফল কী?

সিংহী—চিন্তিতা :

তা বটে বন্ধু,···বেশি ভেবে ভবে কে পেয়েছে কবে পার হায়!
তবু শিশু এলে মার প্রাণ দিতে নাম তো একটা তার চায়!
নামধামের যে চিন্তা না করে লোকে বলে তারে লুব্ধ—

ব্যাঘ্র—সহসা

পেয়েছি লো পার—নাম হোক তার "স্যাংঘ্র" হোস্ নে ক্ষুব্ধ।

---

* হোটেল+মোটর=মোটেল, স্মরণীয়। আর একটি—breakfast ও lunch যখন একবারে সারে তখন তার নাম brunch—একদিন খেয়ে এলাম—সে ভারি চমৎকার ভোজ!

* * *

এখানে গান্ধিজির ছায়াছবি দেখানো হচ্ছে। উদ্বোধনের দিন, ২৮শে তারিখে, রাজদূত গগনবিহারী মেতা নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠালেন। গেলাম সানন্দেই।

ছবিটির ত্রুটি অনেক আছে। গান্ধিজির জীবনের নানা অধ্যায়ের ছবি অপরিস্ফুট—সময়ে সময়ে আলোর বিন্যাস এতই মন্দ যে, চোখকে পীড়া দেয়। তাঁর অনেক কীর্তিরই ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবু সব জড়িয়ে ঘণ্টা দুই ধ'রে ছবিটি দেখতে দেখতে মন আনন্দে, গৌরবে ভ'রে উঠল। ভারতবর্ষের একটি মহাগৌরবী কীর্তিমানের নির্ভীক চালচলন, সদানন্দ হাসি, সরল বক্তৃতা —সর্বোপরি ধর্মভীরু চরিত্রের যে-বিচিত্র চিত্রটি সব জড়িয়ে চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠল তার শুধু ঐতিহাসিক মূল্যই নয়, নৈতিক মূল্যও কম নয়। গান্ধিজি অনেক ভুলভ্রান্তি করেছেন, তাঁর অনেক মন্তব্য, ব্যাখ্যা, জীবনদর্শনই এযুগে অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু মনে পড়ে কবির কথা—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

মন দুলে ওঠে থেকে থেকে। দণ্ডী মার্চ-এ চলেছেন নিঃশঙ্ক গান্ধিজি ৭৯টি মাত্র সহযাত্রী নিয়ে—ক্ষীণতনু একটি মানুষ দাঁড়িয়েছেন হাসিমুখে বৃটিশসিংহের দুর্দান্ত গর্জনের সাম্‌নে! মন গর্বিত হয় দেখতে, নিরস্ত্র নাগরিকরা পুলিশের লাঠির সাম্‌নে পড়ছে কিন্তু আবার তক্ষনি উঠছে ফের মার খেতে—তবু ভয় পাচ্ছে না। মহাত্মাজির অকুতোভয় বাণীর জয় হোক্। প্রাণেই প্রাণ জাগে, সাহসেই সাহস। নমস্য তিনি—বরেণ্য!

কেবল একটা কথা না বললেই নয়। ছবির নানা স্থানেই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মহীয়ান্ কান্তি দেখে মনে শুধু পুলক না—বিপুল গৌরববোধ জেগে ওঠে ভাবতে সে-মহাতেজস্বী ক্ষণজন্মার কথা—যার চরিত্রবল, ত্যাগ, বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রতিভা, দেশভক্তি, মহাত্মাজির চেয়েও কোনো অংশেই কম ছিল না। অথচ ছবিটির বক্তা বললেন, যেন তাচ্ছিল্যভরেই: "সুভাষ যা পারেনি মহাত্মা গান্ধি তা পেরেছেন—কি না পরাধীন দেশের অন্ধকারে স্বাধীনতার আলো ডেকে আনতে।"

একথা অসত্য। সুভাষের কল্যাণেই ভারতে সৈন্যদলের মধ্যে ইংরাজভক্তির মূলোচ্ছেদ হয়। বিখ্যাত আই-এন-এ বিচারে ইংরাজ সর্বপ্রথম বোঝে যে, তার দমননীতি আর চলবে না, কেন না যাদের দিয়ে তারা এতদিন আমাদের দাবিয়ে রেখেছিল সেই সৈন্যরাই হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী। মনে

পড়ে চার্চিল সাহেবের বহু-উদ্ধৃত গর্বোক্তি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে—"I have not come here to preside over the liquidation of the British Empire." তা সত্ত্বেও ওরা ভারতকে স্বরাজ দিতে বাধ্য হ'ল কেন?—একটি প্রধান কারণ নিশ্চয়ই সুভাষের দুর্দমনীয় মহাগৌরবময় বিদ্রোহ যার ফলে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যেও বিক্ষোভ ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল। কোনো দেশেই একটা গোটা জাতির স্বাধীনতা মাত্র একটি মানুষের শ্রম বা সাধনায় অর্জিত হ'তে পারে না। স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ-তিলক-বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে-দুর্জয় আন্দোলনের উপক্রমণিকা, গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে তার পরিণতি, সুভাষের দেশপ্রাণতায় ও অভী-মন্ত্রে তার সমাপ্তিপর্ব। কাজেই সুভাষ যা পারেনি মহাত্মাজি তা পারলেন একথা বলায় সত্যের অপলাপ হয়েছে। বলা উচিত ছিল: মহাত্মাজি তাঁর সাহস ও সাধনায় অগণ্য দেশসেবকের ত্যাগ ও আরাধনাকে সফল ক'রে তুললেন, যাদের মধ্যে সুভাষের স্থান কারুর চেয়েই কম নয়। গাছ বিকশিত হয় শুধু বীজবপনে নয়, আলো-হাওয়া লালন-পালনাদি অনেক আনুকূল্যের সে অপেক্ষা রাখে। গান্ধিজিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হোক কিন্তু তাঁকে বড় করতে গিয়ে অন্য মহাপ্রাণ দেশসেবকদের ছোট করার শুধু যে সার্থকতা নেই তাই নয়—এতে ক'রে মহাত্মাজিকেও খানিকটা খাটো করা হয়েছে।

একটু স্মৃতিচারণ করলামই বা। কয়েক বৎসর আগে—আই-এন-এ বিচারের পরেই—আমি গিয়েছিলাম বম্বেতে আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে কিছু টাকা তুলতে! সেখানে বিখ্যাত ক্রিকেট ক্লাবে আমাকে সংবর্ধনা করতে একটি সাহেবি সান্ধ্যভোজ দেওয়া হয়। সে-ভোজে বক্তা পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং ৺বুলাভাই দেশাই। আমার পাশেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলার পরে ভোজন সুরু হ'ল। কথায় কথায় সুভাষের প্রসঙ্গ এসে গেল। সবাই জানেন বুলাভাই ছিলেন আই-এন-এ সেনানীদের উকিল। আমাকে তিনি এ-সূত্রে যা বললেন তার সারমর্ম এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বুলাভাই বললেন: "আপনি সুভাষের পরম বন্ধু ছিলেন শুনেছি, তাই আপনাকে বলি তাঁর সম্বন্ধে কিছু, যা শুনলে আপনি খুশি হবেন। আপনি জানেন কংগ্রেসপক্ষের অনেকেই সুভাষের প্রতি গভীর অবিচার করেছিলেন। আমিও করেছিলাম—বহুর টানে ভেসে চলা সহজ, কিন্তু সে-টানের বিরুদ্ধে যে

উড়িয়ে চলতে চায় তার পক্ষে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। কাজেই আমিও সবার সুরে সুর মিলিয়ে বলতাম—সুভাষ দুর্বুদ্ধি যদি নাও হন, ভ্রান্ত নিশ্চয়ই। কারণ, বিদ্রোহের যে-পথে তিনি চলেছিলেন সে-পথে লক্ষ্যসিদ্ধি হওয়া অসম্ভব, হ'তে পারে শুধু দেশের অকল্যাণ।"

"কিন্তু," বললেন বুলাভাই, "আই-এন-এ বিচারে উকিল বাহাল হয়ে সুভাষের কীর্তিকলাপের তন্ন তন্ন ক'রে সন্ধান নিতে গিয়ে দেখতে দেখতে আমার চোখ খুলে গেল—এল গভীর অনুতাপ। এ কার নিন্দা করেছি—না জেনে? এ তো শুধু দেশভক্ত ফ্যানাটিক নয়—সাক্ষাৎদ্রষ্টা, রাজনীতিবিশারদ—স্টেট্‌স্‌ম্যান! কী ভাবে যে সুভাষ আই-এন-এ সেনাদল গঠন করেছিলেন, কী বিপুল প্রতিকূল পরিবেশে ভাঙা হাটে বসিয়েছিলেন সুগঠিত কর্মিদল—কী ভাবে অজস্র টাকা তুলেছিলেন, প্রাণ তুচ্ছ ক'রে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ইম্‌ফালে হানা দিয়েছিলেন—সর্বোপরি, কী আশ্চর্য দূরদৃষ্টি-উদ্বুদ্ধ প্রতিভায় এক নবরাজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন—ভাবতে ভাবতে অগাধ শ্রদ্ধায় তাঁকে প্রণাম করেছিলাম আমি। আপনাকে বলছি—ভারত গৌরব করতে পারে যে, এহেন প্রতিভাবান্ সর্বত্যাগী সন্তানের সে জন্ম দিয়েছিল। সুভাষের চরিত্র ও কীর্তির স্বীকৃতি একদিন আসবেই—আর সে-দিন তাঁর নিন্দকদের মুখে পড়বে কালি—তিনি থাকবেন তাঁর কীর্তির অক্ষয় গৌরবে চিরোজ্জ্বল—দেশের 'নেতাজি'।"

শুনতে শুনতে গর্বে গৌরবে বুক আমার দশ হাত হ'য়ে উঠেছিল। তাই তো আরো বাজে যে, এখনো অনেক অন্ধ বিদ্বেষী এ-মহিমময় মানুষটিকে তার প্রাপ্য প্রণাম পর্যন্ত দিতে নারাজ। তবে মানুষ প্রায়ই চলে দলের মতামতের স্রোতে গা ভাসিয়ে। চক্ষুষ্মান্ বিচারক জগতে সর্বত্রই বিরল। সাড়ে পনের আনা মানুষ চলে বহু-র মতামতের প্রতিধ্বনি ক'রে অন্ধভাবে, দেখতে পেয়েও দেখতে না চেয়ে। অন্ধতার আবেগ শুধু মিথ্যা নয়—সস্তা, আর সস্তা ব'লেই বেশি ছোঁয়াচে। গড়পড়তার গড্ডলিকা চলে হুড়মুড় ক'রে, টাল সামলাবে কেমন ক'রে—সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা দেবেই বা কিসের তাগিদে? উদার নিস্পৃহ দৃষ্টি বিনা ঐতিহাসিক হওয়া তো দূরের কথা, দিনের পর দিন যা ঘটে তার বিচারকও হওয়া যায় না। আজকের যুগে গান্ধিজি যে-ভাবে বহু অভাবুকদের অপ্রবুদ্ধ জয়ধ্বনি পাচ্ছেন ভাবী কালে তাঁর ব্যক্তিরূপ তথা কীর্তিকলাপের ঠিক ততখানি মর্যাদা বিচক্ষণ ঐতিহাসিক দেবেন কি না সে নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু একটা কথা জোর ক'রেই বলা যায় ভবিষ্যদ্বাণীর সুরে যে, যত দিন যাবে ততই কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষের

মহিমা স্ফুটতর হ'য়ে প্রতিভাত হবে তাঁদের নেত্রে যাঁরা দৃষ্টিবান্, সুবিচারক, বিচক্ষণ। তাঁরা বুঝবেনই বুঝবেন নেতাজির ঐকান্তিক দেশভক্তি, পুণ্যসুন্দর চরিত্র ও পরম আত্মদানের বিরল গরিমা। সে-দিনে সুভাষের নিন্দকদের কথা কারুর মনেও থাকবে না, যেমন স্বামী বিবেকানন্দের নিন্দকদের কথা আজ কারুর মনে নেই। তাই আরো বলব প্রতিবাদের স্বরে যে, মহাত্মাজির পটকে উজ্জ্বল ক'রে দেখাতে গিয়ে সুভাষের জ্যোতির্ময় চরিত্রকে দূর বিদেশে এভাবে নিষ্প্রভ করবার এ-কংগ্রেসী প্রয়াসকে কোনো যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পরে লিখেছিলেন একটি অবিস্মরণীয় শ্লোক :

"এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।"

এ-তর্পণ সুভাষের অমর স্মৃতির সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য।

* * *

এর পরের দিন নিউয়র্কের একটি মস্ত প্রেক্ষাগৃহে আমাদের নৃত্যগীত হ'ল টিকিট ক'রে—কাউফম্যান হলে। আটশো দর্শকের সুন্দর আসন। রমণীয় আয়োজন, চমৎকার রঙ্গমঞ্চ ও নিখুঁত পাদপ্রদীপের ব্যবস্থা খাস মার্কিন প্রযোজনায়। আমেরিকায় এ-পর্যন্ত এত বড় প্রেক্ষাগৃহে আমাদের নৃত্যগীত হয়নি। সানফ্রান্সিস্কোর "মুসিয়ম অব্ আর্টস্" কি শিকাগোর "ইণ্টারন্যাশনাল হাউস" মস্ত হ'লেও ব্যাপ্তিতে এত বড় নয়। তাই ভাবনা হয়েছিল বৈকি—আরো এই জন্যে যে, টিকিটের মূল্য বাড়ানো হয়েছিল।

কিন্তু হল-ঘর ভরতি দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। সঙ্গে ছিলেন একটি আমেরিকান বন্ধু—যাকে বলে impresario অথবা promoter—অর্থাৎ আসরের উদ্যোক্তা। তাঁর উদ্বেগ দেখে কিন্তু হাসি এল আমাদের। কী হবে—যদি সব ঠিকমত না চলে—এ ভাবনা আমাদের নয়। আমরা যদি সত্যই নিস্বার্থ আদর্শ নিয়ে এদেশে এসে থাকি ভক্তিগীত-নৃত্য-কথা পরিবেষণ করতে, তবে তার মান রাখবেন তিনিই যাঁর উদ্দেশে আমরা আমাদের অর্ঘ নিবেদন করতে বদ্ধকাম। ইন্দিরা এই কথাই বলেছিল তাঁকে মৃদু হেসে যে, আমাদের আসরের সাফল্য নিয়ে মাথাব্যথা যদি কারুর থাকে তবে সে সর্বনিয়ন্তার। প্রার্থনা এ নয় যে, আমরা যা পরিবেষণ করব তা নিউয়র্কের দর্শকবৃন্দের কাছে গ্রহণীয় হোক, প্রার্থনা এই যে, আমাদের নিবেদন সত্য হোক—যেন বন্দনার ছদ্মবেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা না ছাড়পত্র পায়। তাই আমাদের মন একটুও চঞ্চল হয়নি—এ তাঁরই কৃপা, তা ছাড়া আর কী বলব ?

বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপেই বলি। সবজড়িয়ে আমি গাইলাম তিনটি গান ; এ-ছাড়া, ইন্দিরা নাচল তিনটি নৃত্য আমার গানের সঙ্গতে। গানের শেষে শ্রোতৃবৃন্দের করতালি আর থামে না। বার বার যবনিকা তোলা হয় আর আমাদের এসে পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে দর্শকবৃন্দের সামনে অভিবাদন করতে হয়।

তারপর ইন্দিরাকে কত লোকে পাঠালেন যে কত কী উপহার : ফুল, মিষ্টান্ন, রুমাল—এমন কি কিমোনো পর্যন্ত। অনেকে র'য়ে গেলেন আসরের শেষে অভিনন্দন জানাতে। একের পর এক নরনারী এগিয়ে আসেন করনিপীড়ন ক'রে সোল্লাসে ধন্যবাদ দিতে। একটি মহিলা বলেছিলেন বড় চমৎকার কথা আমাদের এক আমেরিকান বান্ধবীকে : "ভাবতে অবাক্ লাগে—দুটি মাত্র মানুষ নিউয়র্কের মস্ত রঙ্গমঞ্চে এসে এমন বেপরোয়া হ'য়ে নাচগান ক'রে গেল—মাত্র একটি হার্মোনিয়ম সম্বল, না আছে অর্কেস্ট্রা, না দৃশ্যপটের সমাবেশ, না আয়োজনের বৈচিত্র্য—অথচ এরা অবলীলাক্রমে দুঘণ্টা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখল—আর সে এমন ছন্দে যেন ব্যাপারটা ঘরোয়া!—এই নিউয়র্ক শহরে—যেখানে আমরা বহু সরঞ্জাম ঘটাপটা বিনা কোনো কন্সার্ট দেওয়ার কথা ভাবতেই পারি না সেখানে এই দুটি নিঃসহায় বিদেশী কেমন ক'রে এমন দুঃসাহসী হ'তে পারল!"

বলতে ভুলেছি বন্ধুবর ননীগোপাল বসুর পুরশ্চারণের কথা। তিনি আমাদের পেশ করেছিলেন একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণে :

"দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী আপনাদেরকে পরিবেষণ করতে এসেছেন যাকে আপনারা বলেন কন্সার্ট তা নয়। তাঁরা এসেছেন আপনাদের কাছে বহন ক'রে দিতে ভারতীয় আবহ—যার বাদী সুর ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা। আপনাদের কাছে আমাদের শুধু প্রার্থনা : আপনারা অনধীর হ'য়ে এ-দান গ্রহণ করুন, কারণ ব্যস্ত হ'লে যা তাঁরা দিতে এসেছেন আপনারা তার রসগ্রহণ করতে পারবেন না। প্রত্যেকেই নিজেকে মেলে দিন—শান্ত হ'য়ে—সানন্দে—খোলা মনে। তবেই আপনাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছবে তাঁদের নৃত্যগীতের নির্যাস যার ফলে আপনারা লাভ করবেন আনন্দসমৃদ্ধি।"

ননীগোপালের চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা অনেক দিন আগেই। আমেরিকায় তিনিই আমাদের সর্বপ্রথম নিমন্ত্রণ করেন, ইন্দিরার নৃত্যের ছায়াছবিও তিনিই নেন অগ্রণী হ'য়ে। কিন্তু তিনি নিজে যে আমেরিকায় আমাদের কাজের সহায় হবেন এমন সর্বান্তঃকরণে, এখানকার একজন বনিয়াদি রপ্তানী ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও যে বার বার তাঁর বহু কাজ ছেড়ে ফিলাডেল্‌ফিয়া থেকে ছুটে আসবেন



আমাদের কন্সার্টের ব্যবস্থা করতে—এ সত্যিই ভাবি নি। মানুষ মানুষের জন্যে কিছু করে না এত বড় অসত্য কথা সানন্দে বলতে পারে কেবল সে-ই যে স্বভাব-সন্দিগ্ধ —সিনিক। কিন্তু সিনিক না হ'য়েও বোধ হয় এ-কথা বলা যায় যে, মানুষ অনেক কাজকেই নিস্বার্থ ব'লে জাহির করে যা সম্পূর্ণ নিস্বার্থ নয়। নানা ফাটল দিয়েই "আমি" মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—বাহাদুরি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, পৃষ্ঠপোষকতার আত্মধন্য ভাব, উপকার করবার উচ্চাঙ্গের হাসি। আমেরিকায় কয়েকটি সজ্জন মানুষ দেখে তৃপ্তি পেয়েছি যাঁদের মধ্যে ডেভিড হাণ্টার, মিস মড ওক্‌স্‌, স্বামী নিখিলানন্দ ও ননীগোপালের স্থান অতি উচ্চে। এমন নিস্বার্থভাবে আমাদের কাজের আনুকূল্য করতে স্বদেশেও বড় বেশি লোককে দেখি নি। এই কয়টি সদাশয় ও মহৎ বন্ধুবান্ধবীর যে কী আগ্রহ যাতে আমাদের নৃত্যগীত এখানে সমাদৃত হয়—যত এ-আগ্রহের পরিচয় পাই ততই হই মুগ্ধ। ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ফলেই প্রীতি গ'ড়ে ওঠে কিন্তু সে-প্রীতি ততদিন পর্যন্ত থাকে খানিকটা সঙ্কীর্ণই বলব যতদিন না সে কোনো আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে খানিকটা অন্তত নৈর্ব্যক্তিক স্তরে উঠতে পারে—অন্য ভাষায়, যতদিন না সে চলতি স্বভাবের 'পিছুটান ছেড়ে আরূঢ় হ'তে শেখে কোনো মহৎ ভাবের উচ্চভূমিকায়। আমেরিকায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ননীগোপাল, স্বামী নিখিলানন্দ, মড ও ডেভিড আমাদের আনুকূল্য করেছিলেন যে-নিস্বার্থ ভঙ্গিতে তার মূলে ছিল এই আদর্শবাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে এই সহজ বিশ্বাস যে আমরা সাত সাগর পেরিয়ে এখানে এসেছি কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির লোভে নয়। আমেরিকায় আমাদের পথ সর্বত্র কুসুমাস্তৃত ছিল না—কোনো আদর্শবাদীর পথই আদ্যন্ত নিষ্কণ্টক হ'তে পারে না। বরং এ-পথে বাধা আসে আরো বেশি। এ-বাধার প্রতিকার কঠিনতর হয় আরো এইজন্যে যে, তীরন্দাজি যিনি করেন তিনি অনেক সময়েই থাকেন হয় অলক্ষ্যে কিম্বা তাঁর প্রচারিত অপবাদের প্রতিবাদ করলেও কুফল ফলে। তাছাড়া, এমনো হয়েছে দু-এক স্থলে যে, যাঁদের সঙ্গে কোনো বিরোধই নেই তাঁরা আমাদের অজান্তে এসে আমাদের সম্বন্ধে নানা নিন্দাবাদ ক'রে চেষ্টা করেছেন যাতে আমরা বিদেশে অপদস্থ হই। শুধু ভগবানের করুণায়ই তাঁরা সফলকাম হন নি—দু-একটি ক্ষেত্রে লাঞ্ছিতই হয়েছিলেন।

এ-কথার উল্লেখ করলাম মানবমনের একটি সনাতন ও অসুন্দর প্রবৃত্তির পাশাপাশি একটি ততোধিক সনাতন ও সুন্দর মনোভাবের ছবি ফুটিয়ে তুলতে —যার নাম অহেতুকী প্রীতি। বলতে কি, যদি এদেশে নানা মানুষের মধ্যে হিংসাদ্বেষের পরিচয় না পেতাম তাহ'লে হয়ত এ-হেন প্রীতি ও মৈত্রীর পুরোপুরি

মর্যাদা দিতে শিখতাম না। ননীগোপাল, স্বামীজি, ডেভিড ও মডের দৃষ্টান্তে এ-কথা যেন আরো বেশি ক'রে মনে হ'ত আমাদের। আমাদের এই উপলব্ধিটিরই একদিন বর্ণনা করছিলাম ননীগোপালকে একটু ঘুরিয়ে। বলেছিলাম: "এক সময়ে মনে হ'ত কেন এ-দেশে এ ও সে এ-ভাবে অকারণ শত্রুতা করল আমাদের —এতে কী লাভ হ'ল তাদের? তোমাদের মতন কয়েকটি শুভার্থী বন্ধুর দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে বুঝি মিলেছে এ-প্রশ্নের উত্তর—খানিকটা অন্তত। সে-উত্তরটি এই যে, প'ড়ে-পাওয়া জিনিসের আমরা ঠিক দাম দিতে পারি না। আমাদের স্বভাব নয় সর্বদা সজাগ থাকা—তাই প্রায়ই আমরা অনেক দানকেই গ্রহণ করি স্বীকার না ক'রে—যাকে ইংরাজিতে বলে—taking things for granted; কিন্তু দুর্দান্ত দুর্জন যখন শুধু বিদ্বেষবশে সৎসঙ্কল্পের পথে হানা দেয় তখনই আমাদের চোখ খুলে যায়, আমরা চিনতে পারি সহজ সুজনের নিস্বার্থ আনুকূল্যকে তার মহৎ স্বরূপে। তাই তো তোমাদের মত কয়েকটি বন্ধুর অহেতুকী প্রীতি আমাদের মনে এত গভীর ছাপ ফেলেছে।"

* * *

শুনি—কবি বাইরন নাকি "ডন জুয়ান" লেখার পর রাতারাতি সর্বস্তুত হ'য়ে বলেছিলেন: "I got up one morning to find myself famous." কাউফমান হলে গান ক'রে আমরা এ-ভাবে হঠাৎ-নবাব হ'য়ে পড়েছিলাম এতটা বললে নিশ্চয়ই সেটা অত্যুক্তি হবে। কিন্তু যদি একথা বলি যে, অনেকের মনেই ভারতীয় নৃত্য তথা গীত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধা জেগেছিল এবং অনেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁরা (যথা, কার্ণেগি ফাউণ্ডেশনের হর্তাকর্তারা) অন্যথা আমাদের লক্ষ্যই করতেন না—তাহ'লে হয়ত সত্যের অপলাপ হবে না। দিনের পর দিন অজস্র টেলিফোন, অন্তহীন দর্শনার্থী আসতে লাগল—তাদের সবারি মুখে এক জিজ্ঞাসা: ফের কবে গান হবে? এঁদের মধ্যে শ্রীতারকনাথ দাশ ছিলেন একজন। একদিন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন ও বার বার বললেন যেন আমরা জর্মনি ও ইসরেলদের কৃতি ও শক্তি দেখে যাই। কত গুণী সুরু করলেন কত প্রশ্ন—কত গীততৃপ্ত মানুষ পাঠালেন কৃতজ্ঞতার ডালি! এখানে ওখানে দেখা হ'ত কত অপরিচিত অপরিচিতার সঙ্গে—তাঁরা প্রথম কথা বলতেন: কাউফমান হলে আমাদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সে যাক। গানের সব চেয়ে বড় তৃপ্তি আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দেওয়া। প্রকাশ্য স্বীকৃতির দাম নেই এমন কথা বলি না, কিন্তু সে মুখ্য নয়।

তবে শুধু এইটুকু জুড়ে দেব—যে-কথা স্বামী নিখিলানন্দ আমাদের বার বার বলতেন যে—এ-দেশে এসে যদি আমাদের দেশের শিল্পীরা ভারতের শিল্পকলার মান বাড়িয়ে যেতে পারেন তবেই বলব সে-কৃতি অভিনন্দনীয়। কাউফমান হলে আমাদের নৃত্যগীত-আসরের সাফল্যের ফলে ভারতীয় কলাকারুর সুনাম হয়েছিল এইটুকুই আমার বলবার কথা। ধরুন যদি সুনাম না হয়ে দুর্নাম হ'ত তাহ'লে ওয়াশিংটন থেকে গগনবিহারী মেতা টেলিফোন করতেন না যে, সেখানে প্রত্যাসন্ন বিরাট আন্তর্জাতিক নৃত্যগীতের বিশ্বসভায় আমাদের ওরা সাদরে নিমন্ত্রণ করছে যেহেতু ওদের কানে পৌছেচে নিউয়র্কে আমাদের সাফল্যের কথা। একটি চিঠি নিচে দিই যার মূল্য আমার কাছে খুব বেশি, যেহেতু লেখিকা জর্মন আমেরিকান। ইনি লিখছেন :

Dear Mr. Roy,

I want to express to you and Indira Devi my sincerest admiration and thanks for the extraordinary, beautiful and inspiring performance of songs and dances on April 29th at the Kaufmann Hall. I do believe that your poetical and spiritual creations should be brought to the widest attention of the people of the world as it would help them to distinguish between the true values and superficial beauties and empty techniques.

I do think that you are the greatest bard of our time and I do hope you will come to New York again and again and win the hearts of this country and of all the world.

Yours thankfully,
Miriam Sommerburg

( অর্থাৎ : "তোমাকে ও ইন্দিরা দেবীকে আমার সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাউফমান হলে তোমাদের অসামান্য, সুন্দর ও উদ্দীপক নৃত্যগীতের জন্যে। তোমার কবিত্বপূর্ণ তথা আধ্যাত্মিক সৃষ্টি বিশ্বমানবের সভায় উপস্থাপিত হওয়া দরকার যাতে ক'রে মানুষ বুঝতে পারে খাঁটি ও মেকির প্রভেদ। আমি মনে করি এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতদূত তুমি। আশা করি নিউয়র্কে বার বার এসে তুমি এদেশের ও সর্বদেশের চিত্তহরণ করবে। ইতি—মিরিয়াম সমাবুর্গ" )

কেবল আর একটি চিঠি উদ্ধৃত ক'রে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব : কাউফমান হলে ও অন্যত্র আমাদের সাফল্যের খবর আমেরিকার বাইরেও গিয়েছিল। সেখান থেকে চিঠি এল :

My dear Mr. Dilip Kumar Roy and Indira Devi,

I cabled to you on April 30th last that the Hebrew University in Jerusalem invited you to Israel...We hear so many remarkable reports of the great cultural contribution made by your performances. Large circles in Israel are deeply interested in Indian culture and we do hope that you will be able to include Israel in your trip...In the letter sent to you to London I wrote that Professor S. D. Goitein, Head of the Oriental Institute of the Hebrew University, had asked me to extend to you the Hebrew University's cordial invitation to appear in Jerusalem... It is my profound hope that you will be able to come here and that many of us will have the great spiritual pleasure of hearing and seeing you.

S. Schwartz (Secretary of the Hebrew University)

কিন্তু যাব যাব ক'রেও প্যালেস্টাইনে আমাদের যাওয়া হ'ল না, কারণ সবাই ভয় দেখালে যে, ইহুদিদের দেশে গেলে আর মিশরে ঢুকতে দেবে না—যেমন রুষদেশে আগে গেলে আর আমেরিকায় পদার্পণ অসম্ভব। হা চতুরানন! কী সৃষ্টিই করেছ প্রভু!—যেখানে ক-র ওখানে গেলেও খ মারতে আসে, গ-কে নমস্কার করলেও ঘ দেয় অর্ধচন্দ্র!

* * *

জনরব—এখানেই নাকি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্কাস—বিশ্ববিখ্যাত "রিংলিং ব্রাদার্স"। দুদিন আগে হয়ত সার্কাস দেখবার কথা ভাবতেও পারতাম না কিন্তু এখানকার দু-তিনটি থিয়েটার দেখে গভীরভাবে নিরাশ হবার ফলে ভাবলাম—ক্ষতি কি? তাছাড়া, স্কেটিং সার্কাস দেখতে যখন বিবেকে বাধল না তখন রীতিমত সার্কাসই বা বাদ যায় কেন—বিশেষ যখন ইনি জগতের সেরা সার্কাস! দেশে ফিরে অন্তত পাঁচজনকে বলতে তো পারব তারস্বরে:

সৌধ-নৃত্য-চিত্রে ভরা যে-দেশ দেখে ধরায় সরা,
সেই দেশে এক আখড়া আছে সব আখড়ার সেরা।
( ঘোর ) সিংহ বাঘের রোল সেথা, গোল গ্যালারিতে ঘেরা।
সার্কাস এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সং নটী নট রঙের তুফান ঢঙের জন্মভূমি!

কথাবৎ কার্য। গেলাম আমি ও ইন্দিরা এক রুষ-আমেরিকান বান্ধবীর

নিমন্ত্রণে। ইনি আমাদের নানাদিক দিয়েই আনুকূল্য করেছিলেন, তাই এঁর কথা একটু ব'লে নিই।

এঁর নাম নাতাশা রাম্‌বোভা। নাম রুষ। কাজেই সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে না যে রুষ বংশে এঁর জন্ম।

ইনি ছিলেন অনেকদিন মিশরে—মিশরীয় পুরাতত্ত্বাদির সম্বন্ধে গবেষণা করতে। এঁর ঘরে গিয়ে দেখি—কী কাণ্ড! কত দুরবগাহ বই যে! আর্ট সম্বন্ধে, প্রতীক (symbol) সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে, পুরাতত্ত্ব, রকমারি চিত্রকলা···কত বলব? এঁর ডেস্কে দেখলাম অগুন্তি ফাইল-করা কাগজপত্র পরিষ্কার নম্বর দেওয়া। পরে কথাবার্তা ক'য়ে আরো হকচকিয়ে গেলাম। যাকে বলে নেপথ্যতত্ত্ব—occultism—তাতে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। এ-সম্বন্ধে কত যে জেনে ফেলেছেন—কত খবর যে এঁর নখদর্পণে! ইন্দিরা ও আমি উভয়েই চম্‌কে গেলাম। নানা ছাত্র-ছাত্রীকে ইনি লেকচার দেন এ-সম্বন্ধে। বেশ সুন্দর ফ্ল্যাটে থাকেন কিন্তু স্বার্জিত ধনে। এক সময়ে ইনি বিখ্যাত রুডল্‌ফ ভ্যালেন্টিনোকে বিবাহ করেছিলেন। ইন্দিরা একদিন এক সচিত্র মার্কিন পত্রিকায় দেখালো রুডল্‌ফ ভ্যালেন্টিনো (যাঁর এ-দেশে ডাক নাম the greatest lover ever born of earth) ও ইনি একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। সে সময়ে ইনি ছিলেন চিত্রতারকা। এখন দার্শনিক—অধ্যাপিকা। এ-হেন বান্ধবী আমাদের টিকিট ক'রে নিয়ে গেলেন সার্কাসে—না গিয়ে উপায় কি!

এবার বলি সার্কাসের কথা। উঃ—সে কী কাণ্ড! সেরা ব'লে সেরা! সে ক—ত বাঘ! ক—ত সিংহ! ক—ত ভালুক! ক—ত হাতী! ক—ত ঘোড়া! ক—ত আলো! ক—ত মল্ল! ক—ত নটনটী, বেশভূষা, যানবাহন, সাজ সরঞ্জাম! উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হয়। সর্বোপরি, সে কী বিরাট আখড়া! চারিদিকের গ্যালারিতে অন্তত বিশ হাজার লোক বসবার স্থান—ভাবুন!

এহেন প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণকে খোরাক দিতে হ'লে তার পরিমাণকেও তো হ'তে হবে সমান দশাসই। কাজেই এরা এক সঙ্গে—যুগপৎ—তিন তিনটি ক'রে খেলা দেখায় তিনটি বৃত্তে। এতে যন্ত্রণা কল্পনীয়। বাঁদিকে ভালুকের খেলা, মাঝে সিংহের, ডানদিকে বাঘের। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি ছাই? এ খেলা শেষ হ'তে না-হ'তে ও কি!—বাঁদিকে সাইকেল, মধ্যে দড়ির উপর নটীর নৃত্য, ডানদিকে নটের নাকে বাঁশের মাথায় চাকা বন্‌ বন্‌ ক'রে ঘুরছে—

অথচ না পড়ছে চাকা, না ভাঙছে নাক! এইভাবে খাড়া তিন ঘণ্টা ধ'রে উদ্যোক্তারা দেখিয়ে চললেন পর পর তিন তিনটি ক'রে খেলা। কিন্তু ওঁরা ভুলে গেছেন একটি কথা যে, এ-স্বরসঙ্গত (হার্মনি) নয় যে তিনটি স্বর মিশে দাঁড়াল একটি ধ্বনি। এ হ'ল অত্যায়োজনের অত্যাচার শুধু স-দাপটে জাহির করতে—"দেখ, কী অজস্র আমাদের খেলার বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনীর সংখ্যাধিক্য!" এ-ব্যবস্থাকে ভালো বলবে কে? যা দেখব মন দিয়ে দেখলে তবে তো পাব রস? কিন্তু হায় রে, এখানে মন দিই কোন্‌টাতে? বাঁদিকে তাকালে ডানদিকের ও মাঝখানের খেলা বাদ পড়ে, মাঝখানে ত্রাটক করলে ডানদিকের ও বাঁদিকের খেলা অগোচর থেকে যায়, ডানদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলে বাঁদিক ও মাঝখানের কাণ্ডকারখানা হয় অন্তর্হিত। কিন্তু এ-কথা এরা বুঝবে না কিছুতেই। কেন? না, দর্প করে অন্ধ। বৈভবদৃপ্তি এদের মগজে ভর করেছে, তাই এরা মত্তস্বরে বলছে: "পশ্য ভো ঐশ্বর্যং মম। যখন দেখে ফুরোতে পারবে না, অত্যধিক ভোজনে যখন উঠবে উদ্‌গার তখন করবে সেলাম, বলবে—'গেলাম'!"

কিন্তু এ অতি খেলো মনোভাব। অবশ্য সার্কাস মানেই নৈপুণ্যের জাহিরিপনা। কিন্তু সে-জাহিরিপনার লক্ষ্য কী?—না, নৈপুণ্য-দর্শনের ফলে বিস্ময়ের শিহরণ-আনন্দ। বটে তো? কিন্তু এখানে লক্ষ্য বা আদর্শ কী? না, নিছক 'প্লীহা চমকিত' ক'রে মানুষকে দিশাহারা করা। কোন্‌ ইংরাজি কবির কবিতায় বাল্যকালে পড়েছিলাম:

A child whom many fathers share
Has never known a father's care.

এখানে এসে মনে হ'ল:

Eyes which are met by a dazzling light
Can never know the joy of sight.

অজস্র ভোজ্য সাজিয়ে যারা অতিথিসৎকার করতে উৎসাহী, তাদের ভোজে ঔদরিকের পরমানন্দ হ'তে পারে কিন্তু রসিকের স্বপ্নভঙ্গ। 'সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্‌' প্রবচনটি কদাচ অবজ্ঞেয় নয়। আমেরিকার আমেরিকানিস্‌মের একটি প্রধান ত্রুটি এইখানে—এরা উপকরণ বাড়ানোকে মনে করে পরমার্থ। যাই করবে চুটিয়ে না ক'রে ছাড়বে না। অত্যধিক শক্তি পেলে তার অপচয় করার লোভ-সংবরণ করা কঠিন একথা সত্য। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু একথাও তো কিছু কম সত্য নয়। দূর হোক গে—সার্কাসের কথাই বলি।

কিন্তু না। কী বলব? কত বলব? শুধু বলা যে, এমন সাজ সরঞ্জাম ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য তথা সমারোহ আর কখনো দেখি নি। ঐশ্বর্য ব'লে ঐশ্বর্য! একটি দৃশ্যে এরা দেখালো শুধু শোভাযাত্রা—procession: শুধু প্রদক্ষিণ ক'রে গেল ওরা সবাই যে যেখানে আছে। সে যে কত রকম যানবাহনের অন্তহীন আস্ফালন, কত রকম জমকালো বেশের বিন্যাস—মুখোশ পাগড়ি আংরাখা, কত রকম প্রাণী—হাতির পরে হাতি, ঘোড়ার পরে ঘোড়া, ভালুকের পরে ভালুক—না এহো বাহ্য! বলি শুধু একটি খেলার কথা যা বলবার মত—যা দেখে শুধু মুগ্ধ না, স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

ভাবুন খু—ব উঁচুতে—দু-তিনশ' ফিট উপরে—একটি দোল্‌না। নিচে একটি সরু দণ্ডকে ধারণ ক'রে আছে দুটি খাড়া দণ্ড। প্রথম, মেয়েটি ব'সে দুলছে—ভাবুন। তারপর কল্পনা করুন: সে উঠল দাঁড়িয়ে—দুধারের খাড়া দণ্ড দুহাতে ধ'রে দুর্দান্ত দুলছে—"দুলছে রে নর্তকী দুলছে"! তারপর একপায়ে দোলা—আর সে কী উদ্দাম দোলা—এ-গ্যালারির প্রান্ত থেকে প্রায় ও-গ্যালারির প্রান্ত পর্যন্ত! কিন্তু এ-ও প্রায় বাহ্য হ'য়ে ওঠে বা! একহাত ছেড়ে দিয়ে শুধু ঐ দণ্ডটির উপর দাঁড়িয়ে দুলছে প্রচণ্ড! তারপর ওমা! দুহাতই দিলো ছেড়ে—দুলছে সমান মহাবেগে! তারপর টপ্ ক'রে অধোমুণ্ড হ'য়ে দুপা দিয়ে দণ্ড আঁকড়ে দোলা। তারপর এক পা দিয়ে। তারপর পায়ের পাতা দিয়ে দণ্ড আঁকড়ে দোলা—ঐ তিনশো ফিট উঁচুতে—ভাবুন! কী হবে! যদি ফ'স্কে যায়! মাগো!—কিন্তু এ-ও বাহ্য—সবে কলির সন্ধ্যে। অতঃপর সেই দণ্ডে জানু পেতে দোলা, দুহাত ছেড়ে। বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ ক'রে ওঠে! তারপরে চরম খেলা—মাথা দণ্ডটির উপরে ন্যস্ত, পা উঁচু। দুলছে সমানই বেপরোয়া। একটি সরু দণ্ডে মাথা রেখে—ভাবুন! প্রথমে দুধারের দণ্ড ধ'রে, পরে এক হাতে একটি দণ্ড ধ'রে, পরে—ক্লাইম্যাক্স: দুহাতই ছেড়ে দিয়ে। কল্পনা করুন একবার ঐ বিপর্যয় উঁচুতে একটি তরুণী মেয়ে একটি সরু দণ্ডে মাথা রেখে শীর্ষাসনে দুলছে আর যে সে দোলা নয়—সাংঘাতিক দোলা—রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে—"দে দোল্ দোল্!" কী? এখনো শিউরে উঠবেন না! তবে নাচার।

আর একটি খেলা—কিন্তু একে সার্কাসের খেলা বলতে বাধে, কেন না এ হ'ল আসলে শিল্পপ্রতিভা, মাত্র অভ্যাস বা নৈপুণ্যের কীর্তি নয়। একটি পাঁচ বছরের ফুলের মতন শিশু দুটি কাঠি দিয়ে দুহাতে টুংটাং ক'রে চমৎকার

বাজালো জলতরঙ্গ। কিন্তু চমৎকার বাজালো বললে কতটুকুই বা বলা হয়? যার গুণগান করতে চাই পঞ্চমুখে একটি মুখে তার কী গুণগান করব? অপরূপ সে-জলতরঙ্গ, আর বাজছে—ভাবুন—পঞ্চাশ ষাটটি যন্ত্রের অর্কেস্ট্রা সঙ্গতে—সমানে, অবলীলাক্রমে, একটিবারও বেসুর না বাজিয়ে। শুধু এ-ই নয়। খানিক বাদে—ও মা—ঐ বিরাট প্রেক্ষাগৃহের হাজার হাজার দর্শক গান ধ'রে দিল ঐ-শিশুর বাজানো-সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে! সে-সমবেত ঐক্যতানে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমাদের। কিন্তু এ হ'ল সাঙ্গীতিক কৃতিত্ব, শিশুপ্রতিভার মধ্যে ভাগবত প্রেরণার আলো—একে সার্কাস-নৈপুণ্যের বিস্ময়রস-পরিবেষণের পর্যায়ে ফেলা চলে না। মনে পড়ে শিশু মোজার্টের পিয়ানো বাজানো চার বৎসর বয়সে, মনে পড়ে নয় বৎসর বয়সে বীটোভ্‌নের অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করা। আমাদের দেশে বিখ্যাত ধ্রুপদী ৺উপেন্দ্রনাথ বাকচির দৌহিত্রী চার বৎসর বয়সে মালকোষ হিন্দোল জাতীয় ঔড়ব রাগ নিখুঁত গাইত ধামারে, চৌতালে। আমেরিকা ভারতবর্ষের রাজা হ'লে সে-শিশুটিকে হয়ত জাহির করা হ'ত দশ হাজার শ্রোতার সাম্‌নে! তাতে ফল ভালো হ'ত, না মন্দ—রায় দেওয়া সহজ নয়। শুধু এইটুকু হয়ত মৃদু আপত্তির সুরে বলা যেতে পারে যে, শিশুপ্রতিভাকে নিয়েও ব্যবসা ক'রে বণিকের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তোলার এহেন দৃশ্য শোভন নয়—অন্তত দেখতে ভালো লাগলেও ভাবতে ভালো লাগে না। তবে এ হ'ল বৈশ্য যুগ—সব কিছুরই দর ধরা হবেই হবে তার অর্থ-মূল্যে—আর এতে কই কেউই তো আপত্তি করে না, দোষ ধরবে কে? এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর সুন্দর উরুও ইনশিওর করা হয়েছে দশলক্ষ ডলারে, যে-রম্ভোরু দেখতে হাজার হাজার লোক আসে দিনের পর দিন! আমাদের কাছে যদি উরুকে দেখানো ও তার দর কষা অসুন্দর মনে হয় তবে ওরা হাসতে পারে বৈ কি! সেকেলে হ'তে কেই বা চায়? অথচ পুরোপুরি একেলে হ'তেও যে বাধে! উভয় সঙ্কট।

সঙ্কটটা কিসের? বোধ হয় আদর্শের—আর কী নামই বা দেব? আবার, এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হয়ত সঙ্কট ব'লে কিছুই নেই। কারণ, আদর্শই যাদের আলাদা তাদের মধ্যে সেতু বাঁধবে কে? এদের কাছে আমরা কী ক'রে কোন্ যুক্তি দিয়ে আমাদের শোভন-অশোভনের আদর্শ পেশ করব? কী ক'রে বলব—শিশুর অভিনয়প্রতিভা বা সঙ্গীতপ্রতিভাকে নিয়েও ব্যবসা কোরো না, সব কিছুরি সময় আছে, ফল যখন স্বাভাবিক গতিতে পাকে তখনই সে সবচেয়ে সুস্বাদু হ'য়ে ওঠে।

বলতে বাধে, কেন না একটা দ্বিধা থেকেই যায়। এ-শিশুর সঙ্গীতপ্রতিভায় আনন্দ তো পেয়েছি। তবে? এরা ওকে নিয়ে ব্যবসা না করলে আমরা ওর বাজনা শুনতাম কোত্থেকে? এ-যুক্তিকে নাকচ করা কঠিন, কিন্তু তবু অবোধ মন মানে না মানা, বলে গুম্‌রে: "কিন্তু সবরকম আনন্দই কি সমর্থনীয়?"

আসুন, দ্বিধাটিকে নিয়ে আরো একটু পর্যালোচনা করি। ১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয় বার য়ুরোপ যাই তখন লণ্ডনে একটি বিচিত্র "বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন" মেলা দেখেছিলাম। নানা বণিক নানা পণ্যের বিজ্ঞাপন-পদ্ধতির বিজ্ঞাপন জাহির করেছে। একটি পদ্ধতি চোখে পড়েছিল: একটি পরমাসুন্দরী তরুণীকে ওরা বসিয়েছিল এক শো-উইণ্ডোর খাঁচায়—তার হাতে পাম অলিভ সাবান। অপরূপ তার মুখাবয়ব ও গোলাপী রঙের জৌলুষ। পাম অলিভের গুণেই ওর এহেন লালিমা—এই হ'ল বিজ্ঞাপনের ঘোষণা। লোকে ভিড় ক'রে যায় সেখানে মেয়েটির সৌন্দর্য দেখতে। আমি ও শ্রদ্ধ ক্ষিতীশ সেন দুবার গিয়েছিলাম সলজ্জে। সেখানে কী ভিড়! মেয়েটি ঠায় মৃদু হাসে পাম অলিভ হাতে ক'রে। প্রতিদিন এইভাবে সে আট দশ ঘণ্টা ঐ খাঁচায় ব'সে রূপ দেখাত। শুনলাম প্রত্যহ সে পেত পঞ্চাশ না ষাট পাউণ্ড। টাকা পেয়ে তার নিশ্চয় লাভ হ'ত, বণিকদেরও নিশ্চয়ই লোকসান হ'ত না এ-হারে বিজ্ঞাপন দিয়ে। কোনোদিক দিয়েই কারুর অনিষ্ট হয়েছে বলা যায় না। তার সৌন্দর্য দেখে আমাদের মনও যে আনন্দ পেয়েছে এও তো অনস্বীকার্য। তবে? কোন্ যুক্তির জোরে বলব এ-আনন্দ নামঞ্জুর? অথচ তবু মন মানে না মানা।

খতিয়ে সমস্যাটি একটু গুরুতর—শুধু যুক্তির দরবারে যার সমাধান হয়ত অসম্ভব। তাই আপাতত সমস্যাটির উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব।

সবাই জানেন যে, সব দেশেই একটা মস্ত সম্প্রদায়কে মানুষ বাহাল করেছে সমাজকে আনন্দ পরিবেষণ করতে। হাল আমলে এই দল সবচেয়ে বেশি স্ফীতি তথা প্রতিপত্তি লাভ করেছে সিনেমা রাজ্যে—এবং সিনেমার রূপলোকের শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বলোক হলিউডে। এই সম্প্রদায়ের চালচলন ধরনধারণ রীতিনীতি নিয়ে আমেরিকায় আলাপ আলোচনার অন্ত নেই! সংবাদপত্রাদি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে শুধু এদের সম্বন্ধে গুজব নিয়ে চর্চা ক'রে, এদের ছবি ও মতামত ছাপিয়ে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা জগতে এ-ভাবে বিশ্বব্যাপী হয়নি আজ পর্যন্ত। এখন, এই যে দল—এরা আনন্দ অনেককেই দিচ্ছে—না মেনে

উপায় নেই—তা সে-আনন্দের গুণমূল্য ও গভীরতা যেমনই হোক না কেন। কিন্তু সে-আনন্দের যোগফলে জাতীয় জীবনে যে সুখ বা স্বস্তি বেড়েছে একথা বলা চলে কি জোর ক'রে? শুধু তাই নয়। এদের নৈতিকতার ও দায়িত্বের ধারণা নানা ফাটল দিয়েই প্রবেশ করছে এদের পূজারীদের মন্দিরে। ফলে বহু লোক এদের জীবনযাত্রার আদর্শকেই শিল্পজীবনের চরম আদর্শ ব'লে ভাবতে সুরু করেছে যার ফলে আমেরিকার দাম্পত্য জীবনে বিবাহভঙ্গ খুব বেশি চালু হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যেই এবং ভবিষ্যতে সে-হার আরো বাড়বে মনে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে—ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের আনন্দ পাবার ফলে যা ঘটছে তাকে মানুষের শুভবুদ্ধি অকুণ্ঠে বরণ ক'রে নিতে বাধা পাচ্ছে। অথচ এরা ধনাগমের দরুন সমাজে এত বেপরোয়া ও খ্যাতনামা হ'য়ে উঠেছে যে, এদের মতামত জাতীয় জীবনে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

এখানে আমি কল্পনানেত্রে দেখছি—প্রগতিপন্থী ভ্রূকুটি ক'রে বলছেন: "সাবধান! এ হ'ল সেই সেকেলিয়ানা—পশ্চাৎপন্থীর অগ্রগতি-বিরোধী যুক্তিবাদ—এ যুগে মেকি টাকা। আমাদের অত্যাধুনিক প্রগতি-দর্শনে ঘর হ'তে চলেছে বরখাস্ত। মানুষ নেমে আসছে ধাপে ধাপে মন্দির ছেড়ে হাটে মাঠে ক্লাবে। একাকার ছত্রাকার—এই হ'ল আধুনিকতার সামাজিক সাকার বিগ্রহ—জাতিভেদ, গোপনীয়তা, লজ্জা, শীলতা, সংযম এ-সবের দিন গত। এ-যুগের গণমন চাইছে শুধু বৈচিত্র্যের নব নব রসাবেশ, নিত্যনূতন অভিজ্ঞতার সর্বসুবোধ্য চমক, অচিন-পথে চলার টানে চেনা পথকে বিদায় দেওয়ার দুঃসাহস। যা যায় তা আর ফিরে আসে না। কাজেই তৈরি হও এ-যুগের মনোভাবের মল্লাঙ্গনে সরাসর নেমে এসে হট্টরাগের জগৎজোড়া ডামাডোলে অট্টহাস্য করতে। চলো চলো সমুখপানে পিছন দিকে না তাকিয়ে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে নবজীবনায়।"

জানি না—এ-নবজাগৃতিদুন্দুভির জয়নাদে ক্ষণিক মোহের উত্তেজনার চেয়ে গভীরতর কোনো সার্থকতার সুর বেজে উঠবে কি না। তবে ভরসা এই যে, মহাকালই এ-বিশ্বলীলার ধারয়িতা। মানুষ কর্ম করে কিন্তু তার কর্মফলের পুরোপুরি দিশা পায় না ব'লেই কর্মস্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে পারে—ঠিক সানন্দে না হোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে যে, আখেরে ভরাডুবি হবে না—বা হ'লেও সে-ভরাডুবি এত সুদূর যে তা নিয়ে মাথা ঘামান বিড়ম্বনা। আমরা কে? কতটুকু আমাদের চিন্তার শক্তি, জ্ঞানের বৃত্ত, দূরদৃষ্টির পরিধি? কোথাকার জল কোন্ বাত্যার মুখে উধাও হ'য়ে কোন্ নবসার্থকতার কলোর্মি-মোহানায় মিশবে কে বলতে

পারে? আমাদের প্রত্যেকের শুধু এক মন্ত্র হোক—কেন না তার চেয়ে বড় কোনো মন্ত্র আমরা জানি না—যে:

সত্য বলিয়া যা জেনেছি আজ তারে যেন শুধু করি বরণ।
তার পরে কোথা উত্তরিব—সে জানো শুধু তুমি, হে ত্রিনয়ন!

## ফিলাডেলফিয়া

বন্ধুবর শ্রীননীগোপাল বসু নিমন্ত্রণ করলেন ফিলাডেলফিয়াতে তাঁর ডেরায় দুদিনে আতিথ্য স্বীকার করতে। নিউয়র্কের ইট কাঠ পাথরের পরিবেশে প্রাণ শুকিয়ে উঠেছিল, ভাবলাম শুষ্কপ্রায় জীবাত্মার তরুমূলে একটু নৈসর্গিক রসসিঞ্চন করলে মন্দ কী? নিউয়র্কের চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী হ'য়ে নানা দিনে নানা কথা মনে হ'ত ভাবতে ভাবতে। কখনো মনে হ'ত (দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের "হো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর কার্তিক গণপতি, আর দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মী সরস্বতী" গানের ছন্দে সুরে):

হো লণ্ডন প্যারিস বার্লিন মস্কো—যেথাই যাও না ভাই,
আহা নিউ ইয়র্কের কোথায় দোসর? এর তুলনা নাই।
হেথা তাকাও কেন যেদিকেই—বিলুপ্ত উদার গগন:
কারণ তলার পরে চাপিয়ে তলা দাঁড়িয়ে শাস্ত্রী ভবন!
তাই তাদের ভয়ে পেছিয়ে নববধূর ম'তই হায়
কাঁদে মেঘের ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে সে তটস্থ শঙ্কায়।
চাক বাঁধল তাই তো এই শহরে জগতের মৌমাছি
ঐ ডলার-মৌ-এর গন্ধে—বণিক্-বাজিকরের বাজি!

কখনো বা:

যদি প্রশ্ন ওঠে: জন্ম কেন চায় বসুধায় জীব,
যদি প্রশ্ন ওঠে: সত্য সে কী—কারই বা নাম শিব,
যদি প্রশ্ন ওঠে: ধায় বাসনা কোন্ মোহানার পানে,
যদি প্রশ্ন ওঠে: বাঁচে আশা কার সে-বরদানে,
যদি প্রশ্ন ওঠে: কোন্ সে-সুধার জপে ক্ষুধা প্রাণ,
এসো নিউ ইয়র্কে—সকল দ্বিধার হবেই অবসান।
হেথা সব ভাবনাই পড়বে ঝ'রে উঠবে রে ভাই ফুটে
শুধু এক ভাবনা: কেমন ক'রে ডলার নেব লুটে!

কেবল মুস্কিল এই যে ডলার যার "এত ভাবনা" নয় তার মন কিছুতেই মানে না

মানা। তাই এলাম ছুটে ননীগোপালের সুন্দর শান্তিকুটীরে। চারদিকে ছোট ছোট বাড়ি—ফুল গাছপালা—এককথায় বনানীর স্নিগ্ধ শোভা ঝলমল করছে। ইন্দিরা তো আনন্দে অধীর—সোচ্ছ্বাসে বলা সুরু ক'রে দিল পারস্য দেশে ও কী আনন্দে ছিল—যেখানে ফুলফলের আছে প্রাচুর্য, মানুষের আছে অবকাশ, চারদিকে ছড়িয়ে সুগন্ধ—আরো কত কী! সুন্দরের ছোঁয়াচে সুন্দরেরই তো স্মৃতি জাগবে।

ননীগোপাল ৩২ বৎসর আগে স্বদেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিলেন—১৯২০ সালে। তাঁর বর্তমান আমেরিকান স্ত্রী ও তিনি আছেন ফিলাডেলফিয়ায় এই সুন্দর ছোট্ট কুটীরে। রাস্তার দুধারে কেবল ফুলগাছ, এ-অঞ্চলের প্রতিবেশীরা সবাই ফুল গাছপালা ভালোবাসে। তাই তো বলছিলাম এখানে এসে প্রথম পেলাম বনানীর পরিবেশ। ননীগোপালের পুত্র অমরগোপাল বাংলা না জানলেও পিতাকে "ড্যাডি" বলেন না, "বাবা" ব'লেই সম্বোধন করেন। বিদেশিনীকে ঘরনী ক'রে ও বিদেশে এতদিন থাকা সত্ত্বেও ননীগোপালের স্বাদেশিকতা, কিনা বাঙালিয়ানা, যে এখনো অটুট আছে তার একটি সেরা প্রমাণ এই এজাহারে। নয় কি! বাস্তবিক ননীগোপালের নাম সার্থক। এ নাম বাঙালী ছাড়া আর কারুর হ'তে পারে না, তাছাড়া নামের মতনই কোমল মানুষটির স্বভাব। অনেক বাঙালী আছেন যাঁরা শুধু নামেই বাঙালী, স্বভাবে সাহেব। ননীগোপাল তাদের দলে নাম লেখায় নি। ওর সাধুতা, সহৃদয়তা, সহজাত শালীনতা তথা সৌকুমার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখেও ছাপ পড়েছে স্বভাবের কমনীয়তার। তাই না ও এত জনপ্রিয়। শুধু জনপ্রিয় নয়—সচ্চরিত্র ব'লে সবারই শ্রদ্ধেয়। সর্বোপরি, ও রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত মনে প্রাণে। এমন ভক্ত যে ওর আমেরিকান স্ত্রীর মনেও এ-ভক্তির ছোঁয়াচ লেগেছে—উভয়ে দীক্ষা নিয়েছে স্বামী যতীশ্বরানন্দের কাছে। আমি ওদের বাড়িতে আসতে না-আসতে ননীজায়া যে কত প্রশ্নই করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রামকৃষ্ণদেবের ক'জন শিষ্যকে চোখে দেখেছি, কী কী বলেছিলেন তাঁরা, কবে দেখা হয়েছিল, ইত্যাদি। বললেন: নিখিলানন্দের অনূদিত রামকৃষ্ণকথামৃত—The Gospel of Sri Ramkrishna—তিনি বার বার তিন বার পড়েছেন আদ্যন্ত। শুনে একটু চমকে উঠেছিলাম বৈকি। সঙ্গে সঙ্গে স্বামী নিখিলানন্দের সৎকর্মের ফল প্রত্যক্ষ ক'রে পুনরায় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম মনে মনে। শুভকর্ম এই ভাবেই বহুলোককে প্রভাবিত করে অলক্ষ্যে—যদিও হট্টগোলের মধ্যে এ-বীজবপনের ফল আমরা সব সময়ে চাক্ষুষ করতে পারি না। কিন্তু যা বলছিলাম।

ওদের ঘর-কন্নায় কিন্তু আমেরিকান রীতিরও আমেজ আছে। যথা ননীগোপাল বাণিজ্য করেন, ননীগোপাল-জায়া স্কুলে পড়ান: কিনা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রোজগেরে। ভারতেও এ-ব্যবস্থার আমদানি হ'তে সুরু হয়েছে কোনো কোনো গৃহস্থালিতে—কিন্তু আমেরিকায় বসবাসের খরচা এত বেশি যে স্ত্রী অনেক সময়েই শুধু ঘরের কন্নারি অংশীদার নন—রোজগারেরো জোগানদার। অন্য ভাষায়, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বলেন: "তুম ভি মিলিটারি, হম্ ভি মিলিটারি" আর কি। ইন্দিরা বলছিল একদিন যে, এ-ব্যবস্থায় কিন্তু মানুষ ঠিক গৃহজীবনের—হোম-লাইফের—স্বাদ পায় না। কথাটা পুরোপুরি সত্য না হ'লেও খানিকটা যে সত্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই ননীগোপালকেও রাঁধতে হয় নিজে হাতে—দরকার হ'লে। অবশ্য আমেরিকার রন্ধনালয় ঠিক আমাদের "হেঁশেল" নয়—এখানে সবই চলে গড় গড় ক'রে সৌদামিনী দেবীর পৌরোহিত্যে। তাছাড়া বাসনধোওয়া, বাজার করা প্রভৃতি হাজারো হাঙ্গামের এখানে সুরাহা হয়েছে যন্ত্রের মেহেরবানিতে। টেলিফোন করলেই মুদি খাবার পাঠান, কাপড় কাচতে হ'লে কোনো হাঙ্গামাই নেই—শুধু বোতাম টিপলেই হ'ল, ঘর ঝাড়তে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার—এ-ও-তা লাখো সুবিধে। তবু ঘরকে নিয়ে কন্না করতে হ'লে পুরুষ মানুষের কান্না আসেই সময়ে সময়ে। নিরুপায়। You cannot have it both ways, বলে না সাহেব-পুরাণে?

থাক এসব ফাল্‌তো কথা: খানিকটা আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যাক্—এখানে বর্তমান জীবনসংগ্রামে গৃহস্থালি কী ভাবে চলে। মানুষ এখানে আমাদের চেয়ে মনে স্বাধীন হয়ত নয়, কিন্তু বাইরে মূলতঃ স্বাবলম্বী—তা কী নর কী নারী। হয়ত আমাদের দেশেও ক্রমশ এই ব্যবস্থাই চালু হ'য়ে যাবে—যেহেতু খানিকটা যে ইতিমধ্যেই হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। ব্যাপারটা আরো একটু বেশি দূর গড়ালে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান—

হোলো কী এ হোলো কী? এ তো ভারি আশ্চয্যি!
বিলেতফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চায্যি!...
পুরুষেরা সব শুনছে ব'সে, মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে!
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে শুনে তা পিলে চমকাচ্ছে!

এর অনুকরণে লিখতে হবে হয়ত:

হোলো কী এ হোলো কী!—এ তো ভারি আশ্চয্যি!
মেয়েরা সব খাচ্ছে ককটেল—পুরুষ খাচ্ছে শাকসবজি!•

বাড়ির মধ্যে নেই তো গিন্নি, কর্তা করছেন ইস্তিরি!
লজ্জাশীলার সজ্জার নেই শেষ, বাবু হলেন মিস্তিরি!

চাও কি ধুতে বাসন কোশন? আলমারিতে দাও পুরে:
বিজলি বোতাম টিপ্‌লেই আসবে গরম সাবানজল ঘুরে:
ধোওয়া বাসন মুছবে গামছা—সাফ হবে সব ভাই তোফা!
যন্ত্রই গুরু, মানুষ গোলাম—যতই ভাবি, হই বোবা!

* * * *

যাহোক একদিন সন্ধ্যায় ননীগোপাল ডাকলেন অনেককে—খাওয়ালেন আইসক্রীম, শোনালেন আমার গান। এলেন অনেকেই: আমেরিকান, মাদ্রাজি, গুজরাতি, বাঙালী। কেউ বা প্রফেসার, কেউ এঞ্জিনিয়ার—একটি অদ্বৈতবাদী আমেরিকান ভাবুকও এসেছিলেন। গুজরাতি ভদ্রলোকটি এনেছিলেন একটি টেপ-রেকর্ডিং ফনোগ্রাফ। একটি ফিতের উপর রেকর্ড করা হয় গান বা কথাবার্তা —পরে তখনি তখনি শুনিয়ে দেওয়া হয়। জাপানে য়োকোহামাতে এক সিন্ধুদেশীয় বণিক প্রথম এই রকম একটি যন্ত্র এনে আমার একটি ভজন রেকর্ড ক'রে শুনিয়ে দিয়েছিলেন জানুয়ারী মাসে। তারপরে নিউয়র্কে একটি গুজরাতি ছাত্রও নিয়েছিল আমার গান তার নিজের যন্ত্রে। কিন্তু আমার আবৃত্তি বা কথাবার্তা এযাবৎ রেকর্ড করা হয় নি—এই গুজরাতি এঞ্জিনিয়ারটির কৃপায় শুনলাম আমার নিজের "সাবিত্রী"-আবৃত্তি স্বকর্ণে। লাগল ভালো। আমার সঙ্গে সেই আমেরিকান ভাবুকটির আলাপ আলোচনাও শুনতে ভারি মজা লাগল। স্থানে স্থানে ইন্দিরার মন্তব্যও পরিষ্কার উঠেছে। ইন্দিরা বলল এ-যন্ত্রটি কিনে দেশে নিয়ে যেতেই হবে।

শেষে একটি হাসির গান গাইলাম স্বরচিত ইংরাজিতে—হাসির গান না ব'লে laughing song বলাই ভালো। গানটি এখানে উদ্ধৃত করলে ক্ষতি কী?

The bird sings of the flower
And flower sings of the bee:
The bee of honey's sweetness
And honey of ecstasy.

But man sings of the ego
And vaunts: "Behold, I rule!"

And destiny laughs loudly :
"O blind, imperial fool!
O ha ha ha ha ha ha..."

এ গানটির মৎকৃত বাংলা অনুবাদ তথা ইন্দিরাকৃত হিন্দি অনুবাদও গাইলাম। বাংলা অনুবাদটি এই :

গায় পাখি গান ফুলকলির,
গায় অলি : "আয়, অলি বঁধু!"
গায় অলি : "মধু—সে কী মিঠি!"
গায় আনন্দ-গান মধু!
গায় মানুষ অহঙ্কারে :
"আমি বিশ্বরাজ স্বাধীন!"
ধাতা হাসেন : "রাজাই বটে,
তুই পণ্ডিত, অর্বাচীন! ...হা হা হা হা হা হা..."

ইন্দিরা এর যে হিন্দি তর্জমা করেছিল সেটি এই :

পঞ্ছী গায় কলিকে গানে
কলি ভোঁরেকী গীত গায়।
ভোঁরা গায় মধুকে তরানে
মধু আনন্দ-রাগ স্থনায়।
মন আপেকে গুণ গাতা,
"জগ মেরা"—আপা বোলে।
হঁস হঁস কর কহে বিধাতা :
"অন্ধে মূরখ্ ও ভোলে!
হা হা হা হা হা হা..."

আশ্রমে গত বৎসর কয়েকটি আশ্রমবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়ে মিলিত-অট্টহাস্য সমেত এ-গানটি গাইয়েছিলাম আশ্রমের দুটি পর পর উৎসবে। সবাই মিলে হাঃ হাঃ হাঃ হাসির ধ্বনি বড় চমৎকার শোনায়। একলা অট্টহাস্যও মন্দ শোনায় না—ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়। অন্তত অভ্যাগতবৃন্দ তো হেসে কুটি কুটি। টেপ-রেকর্ডেও ভারি চমৎকার শোনালো।

অনেক দিন বাদে হঠাৎ ভজন গান, আবৃত্তি ও হাসির গান এক আসরেই সম্পন্ন করা গেল!

পরদিন সকালবেলা ননীগোপাল তার মোটরে ক'রে নিয়ে এল নিউয়র্কে। দুঘণ্টা ধ'রে বেশ সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে আসা গেল। ফিরে এলাম নিউয়র্কে দুপুরবেলা—সেই ঘর্ঘর ও গগনস্পর্শী সৌধরাজির পরিবেশে, যেখানে আকাশের দেখা মেলা ভার। পুনর্মূষিক—বলে না? আরো কতদিন এ-দুঃসহ পরিবেশে দিন কাটবে কে জানে? যাহোক তবু ননীগোপালের কল্যাণে ফিলাডেলফিয়ার নৈসর্গিক পরিবেশে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নেওয়া গেল।

## নিউয়র্কে প্রত্যাবর্তন

এখানে একটি স্বরূপা ও চিন্তাশীলা আমেরিকান ধনবতীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। নাম আনা হারিসন। ইনি আমাদের নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হ'য়ে এসেছিলেন দেখা করতে। নানা কথাই হ'ল তাঁর এঙ্গে। এঁর একটি গুণ চোখে পড়ল—কিম্বা বলা যাক দুটি গুণের বিরল সমাবেশ: কথা বলতে পারা ও কথা শুনতে চাওয়া। অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন—যাঁরা ভালো বক্তা তাঁরা অনেক সময়েই ভালো শ্রোতা হ'তে পারেন না। কিন্তু ইনি বলতেও পারেন যেমন গুছিয়ে, শুনতেও পারেন ঠিক তেমনি মন দিয়ে। এই ধরনের মানুষের সঙ্গেই আলাপ জমে সবচেয়ে সহজে। নানা কথাবার্তার পরে ঠিক হ'ল এঁর বৈঠকখানা ঘরে—কি না সাল-কক্ষে—হবে ইন্দিরার ও আমার বক্তৃতা।

যথাকালে রাতে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি—বহু লোক এসেছেন: চিত্রী, গুণী, লেখক, এডিটর, সিনেমা-ডিরেক্টর, নানান্ আমেরিকান গৃহলক্ষ্মী, এমন কি সাধকও ছিলেন একজন যিনি আগে ছিলেন স্বামী বোধানন্দের শিষ্য। বলা বাহুল্য এহেন পরিবেশে কথা বলতে বেগ পেতে হ'ল না।

প্রথম বলল ইন্দিরা, আর সে এমন সরল ভঙ্গিতে, অথচ ওজস্বিতায় উদ্দীপ্ত যে চমৎকৃত হ'ল সবাই—জনে জনে ওর বক্তৃতার শেষে প্রায় সোচ্ছ্বাসেই ওকে ধন্যবাদ দিল। ওর বক্তৃতাটির সারমর্ম এখানেই দিই।

ইন্দিরা বলল: "এদেশে নানা আমেরিকান সুজনের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে একটা জিনিস চোখে পড়ে প্রায়ই—যে, আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে এখানকার নানান্ বিচারকই খুব সরাসর রায় দেন যে, আমরা পুরুষ-পদানতা, অবলা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়া। কিন্তু এ-রায় ভ্রান্ত! এমন কথা বলি না যে অবলা আমাদের দেশে নেই। সব দেশেই আছে। কিন্তু তা ব'লে এমন কথা বলা চলে না যে ভারতরমণীর অভিজ্ঞান হ'ল দুর্বলতা। যে-কোনো জাতিকে বিচার করতে হ'লে তার শ্রেষ্ঠ নমুনাই নিতে হবে। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী যাঁরা, তাঁরা একান্ত-ভাবেই রক্ষণশীলা গৃহলক্ষ্মী, একনিষ্ঠা পতিব্রতা ও সর্বোপরি, ধর্মে শ্রদ্ধাবতী। ধর্মে আন্তরিক আস্থার মূলে থাকে মনের প্রাণের শক্তি। আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে

যে ধার্মিক হ'তে পারেন তাঁরাই যাঁরা বলীয়ান্। ভারতকে যাঁরা ভাসা-ভাসা ভাবে দেখেন, তাঁরা দেখেন ভারতীয় নারী লজ্জাবতী লতা—যেহেতু তাঁরা বেশি গায়ে-পড়া নন, নিজেকে জাহির করেন না, নানা বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে মতামত প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন না। এথেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে দুর্বলতা আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু ভারতকে যাঁরা একটু গভীরভাবে দেখেছেন জেনেছেন চিনেছেন তাঁরা জানেন ভারতীয়া নারীই ধারণ ক'রে আছেন ভারতের ধর্মবিশ্বাসকে, সতীত্বকে, গৃহকে, সন্তানকে, সমাজকে, অতিথি-সৎকারকে। একথা সত্য যে আমেরিকার তুলনায় আমরা দরিদ্র, বেশভূষায় চোখ-চম্‌কানো ফ্যাশনে অগ্রণী নই! কিন্তু সত্যকার চরিত্রবল সিদ্ধ হয় না এসব বাহ্য প্রসাধনে—সত্যকার শক্তির খুঁটি—ধর্মবিশ্বাসে, আস্তিকতায়, সতীত্বে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে। আমেরিকায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখি ধর্মের নামে উচ্ছ্বসিত হন অনেকেই, কিন্তু তাঁরা দেখেও দেখেন না যে, সত্যিকার ধর্মই ধারণ ক'রে থাকে সার্বভৌম সত্যকে, চিরন্তন সুনীতিকে। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নমুনা যেসব মেয়ে তাঁরা প্রাণপণে লালন ক'রে থাকেন শ্রদ্ধাকে, ভক্তিকে, পবিত্রতার আদর্শকে। তাঁরা আবহমানকাল এ-দুঃসাধ্য কর্তব্যটি দিনের পর দিন নির্বাহিত ক'রে এসেছেন ব'লেই ভারত বহুবর্ষ ধ'রে পরাধীনতার গ্লানি সত্ত্বেও আজ বেঁচে আছে। ভারতীয়া নারী হয়ত নানা ক্লাবে সভায় যার-তার বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে নৃত্য করতে এখনো খুব বেশি প্রেরণা পান না, কিন্তু তাব'লে বলা যায় না যে, তাঁদের মধ্যে আন্তর তেজস্বিতা নেই। তাঁরা সবলা ব'লেই আমাদের ঘর সংসার তথা সংস্কৃতি শোকাবহ দারিদ্র্যের মাঝেও ধ্বসে পড়ে নি।

"কিন্তু শুধু নৈতিকতার রক্ষণেই শক্তির চরম পরিচয় নয়। ভারতে নারীকে বলে শক্তি, সহধর্মিণী। এ কথার কথা নয়। গভীরদর্শী যাঁরা তাঁদের চোখে পড়বেই পড়বে যে ধর্মের শুধু আনুষ্ঠানিকতাই নয় নিষ্ঠার দিকেও ভারতীয়া নারীর দান নগণ্য নয়। ব্রত উপবাস পূজা শুচিতা তীর্থস্নান কৃচ্ছ্রসাধন এ সবে এখনো বহু ভারতীয়া নারী সমান আস্থাবতী। ভারতের বহু স্বনামধন্য কীর্তিমান্ পুরুষসিংহ তেজ-প্রতিভায়, ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রেরণা পেয়েছেন তাঁদের জননীর দৃষ্টান্তে, সহধর্মিণীর সহযোগিতায়। ভারতীয়া নারী হয়ত রাজনৈতিক হাটে যোগ দিতে দলে দলে বেরিয়ে পড়েন না—কিন্তু মন্দিরে, তীর্থে, ধর্মচর্চায় তথা গৃহকর্মের লক্ষ দায়িত্বে তাঁরা আজও পুরুষের সঙ্গিনী তথা পুরোগামিনী। সর্বোপরি, তাঁরা জানেন সেবায় আত্মদান কাকে বলে। প্রেমের সবচেয়ে বড় কীর্তি এই আত্মদানে—যার চরম

বিকাশ ভক্তির আত্মসমর্পণে। এ-আত্মসমর্পণ কাকে বলে তার পরিচয় পাওয়া যায় ভারতীয়া ভক্তিমতীদের চরিত্রে, যথা—রাধা, অনুসূয়া, সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, মীরা—আরো কত নাম-না-জানা ধর্মসেবিকার উজ্জ্বল চরিত্রে। দাদা আপনাদের কাছে আজ বলবেন শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী সম্বন্ধে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্যে সাবিত্রীর যে চরিত্র এঁকেছেন তার একটি প্রধান ধারয়িত্রী সাবিত্রীর শক্তিমত্তা, চরিত্রপ্রভা। আমেরিকান মহিলার মধ্যেও আছে শক্তি, কিন্তু ভারতীয়া নারীর মধ্যে দিয়ে সে-শক্তি যে-ভাবে স্বচ্ছন্দে ধর্মপ্রাণতার দিকে স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছে সেই সহজ সচল ধর্মভাবটি থেকে তাঁদের অনেক কিছু শিখবার আছে। তাই তাঁরা যখন আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন 'Poor dear Indian Women' ব'লে, তখন অজ্ঞানের দুর্দশা বেশি আমাদের না তাঁদের, এ-প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হয়! তাছাড়া সাহসের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'ল অকুতোভয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে পারা। আমেরিকায় এই জাতীয় স্বীকৃতি বিরল—বিশেষ ক'রে আমেরিকান মহিলাদের মধ্যে যাঁরা প্রায়ই আমাদের সাহায্য করতে আসেন পৃষ্ঠপোষক ভঙ্গিতে—"হাত ধ'রে তোলো তোলো, নৈলে ওরা নেতিয়ে পড়ল ব'লে" —এই মনোভাব নিয়ে। আমরা চাই তাঁদের সখিত্ব, সহযোগিতা—কিন্তু চাই না তাঁদের পৃষ্ঠপোষক পরোপকারিতার ঋণ গ্রহণ ক'রে তাকে খাটিয়ে ধনী হ'তে। চাই না, কেন না ভারতীয়া নারীর চরিত্রে নানান্ অভাব অপূর্ণতা থাকলেও আমরা শুধু যে শক্তির কোঠায় দেউলে নই তাই নয়, শক্তির যে পরম পরিচয় ভক্তি সেই ধনে দীপ্তিময়ী, ধনশালিনী!"

ওর কথাবার্তায় অনেকেই চম্‌কে গিয়েছিলেন! বক্তৃতার পরে পর পর বহু অতিথিই ওকে ছেঁকে ধ'রে নানা প্রশ্ন সুরু করলেন। অনেকেই বললেন যে, এ-ধরনের বাণী তাঁরা কখনো শোনেননি কোনো ভারতীয়ার মুখে—বিশেষ ক'রে ভক্তিমতীর মধ্যে শক্তিময়ীর আত্মগোপন ক'রে থাকার কথা তাঁদের চম্‌কে দিয়েছে।

তারপর আমি প্রায় ঘণ্টা খানেক ধ'রে বললাম, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে। সে-সব কথার পুনরুক্তি করা সম্ভব না। শুধু একটি কথা বলি—যা বলেছিলাম সে-স্মরণীয় সান্ধ্যসভায়।

আমি বলেছিলাম: শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে শুধু কাব্যসৌন্দর্য রচনা ক'রে কবিনামযশঃপ্রার্থী হ'তে চাননি। কবির কীর্তি তাঁর উপাস্য ছিল না কোনো দিনই—যদিও তিনি ছিলেন স্বভাবকবি—মহাকবি। সাবিত্রীতে তিনি প্রধানতঃ

রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর একটি ধ্যানদৃষ্টির : যে, মানুষ তার তপস্যার বলে পেতে পারে এমন ভাগবত শক্তিকে যার প্রসাদে সে নিয়তিকেও পারে বশে আনতে। মানুষের কাছে ভগবান্ কীই বা চাইতে পারেন? তাঁর কিসের অভাব! তবু আশ্চর্য এই যে ভাগবত প্রেমলীলায় ভগবান্ দীনহীন মানুষের দ্বারেই আসেন প্রার্থী হ'য়ে, তার চাওয়ার প্রার্থনা তাঁরো প্রার্থিত। নানা সুরে, নানা ভঙ্গিতেই তিনি বলেন, 'তুমি চাও—শুধু চাও যা সবার চেয়ে বড়, সবার চেয়ে সুন্দর, সবার চেয়ে বরণীয়, তাহ'লেই আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।' তাই তিনি লিখেছিলেন একটি কবিতায়

Thou who pervadest all the worlds below
Yet sits above,
Master of all who work and rule and know,
Servant of Love!

কারণ একথা সত্য যে, ভগবান্ জ্ঞানীর কর্মীর অধীশ্বর হ'লেও প্রেমের দাস। তাই ভাগবতে বলেছে যে প্রেম হ'ল সেই ডোর যাকে ধ'রে টানতে না-টানতে তিনি হাজিরি দিতে বাধ্য—যেহেতু তিনি হলেন "প্রণয়রশনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ"।

সাবিত্রীর মধ্যে দেখতে পাই ফুটে উঠেছে এই মহাসত্যের ছবি—কাব্যের মহিমময় মন্ত্রমান্ ছন্দে। নইলে সাবিত্রীর এত জোর কিসের? কোন্ সাহসে সে বলেছিল : আমি চাই না শুধু নিজের মুক্তি, ব্রহ্মনির্বাণ, দাও আমাকে তোমার সেই শক্তি যার প্রসাদে মানুষ উঠতে পারে তার অসহায় অজ্ঞানের কোঠা থেকে ভাগবত জ্ঞান ও জীবসেবার শিখরে—দেখতে পেয়ে যে প্রতিজীবের মধ্যে আছ শুধু তুমি, তোমা বিনা কিছুই নেই এ-বিশ্বপ্রপঞ্চে। সাবিত্রীকে যখন বিশ্বরাজ এসেছিলেন বর দিতে তখন নিঃস্ব বিধবা হ'য়েও সে চেয়েছিল শুধু :

'Thy magic flowing waters of deep love,
Thy sweetness give to me for earth and men.
জীব ও জীবন তরে দাও তব মাধুর্য আমারে :
দাও ইন্দ্রজালময় তব গাঢ় প্রেমের প্রবাহ।'

"ইন্দিরা মিথ্যা বলে নি। সাবিত্রীর মধ্যে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করলেন ভারতীয় সতীর ভক্তির শক্তি—সর্বত্যাগ প্রেমের জন্যে—এমন প্রেম যে অকুতোভয়ে সাক্ষাৎ কৃতান্তের সামনেও বলতে পারে 'ফিরে দাও আমার সত্যবানকে যেহেতু—

I am a deputy of the aspiring world :
My spirit's liberty I ask for all
আমি প্রতিনিধি এই অভীপ্সা-উন্মুখ জগতের :
আমার আত্মার মুক্তি চাই আজ সর্বভূততরে।'

* * *

সিনেরামা না? দেখে এলাম সেই সাক্ষাৎ সিনেরামা! দেখেছেন কি? নিশ্চয়ই দেখেন নি—যদি না আমেরিকা এসে থাকেন। কারণ এ-বস্তু এখনো আমাদের দেশে রপ্তানি হয় নি। তবে হয়ত এ কীর্তির কথা কোথাও প'ড়ে থাকবেন বা লোকমুখে শুনে ফেলেছেন। কিন্তু শোনা এক, দেখা আর। আর না দেখলে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না কী ধরনের নব উদ্ভাবন এ-ছবি—কী অসাধ্যসাধন করেছে এ! ভাষায় এ-হেন উদ্ভাবনের কীর্তিবর্ণন অসম্ভব, তবে এটুকু আভাষ দেওয়া যেতে পারে। সেই সাধু উদ্দেশ্যেই কলম ধরা আজ।

ভাবুন—কল্পনা করুন—একটি প্রকা—ণ্ড রঙ্গমঞ্চ। তার উপরে সাদা পট দেয়ালের মতন—সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জুড়ে—বাঁকানো দেয়াল 'কংকেভ' ভঙ্গিতে—একটা প্রকাণ্ড গোল ঘরের ভিতরের দিকে দেয়াল যেমন দেখায় আর কি। বুঝলেন তো? এটুকু ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায়।

কিন্তু তার পরেই অথই জল। এ-হেন বিশাল প্রাচীর-পটে তিন তিনটে উৎক্ষেপক ( projector ) থেকে আলো এসে প'ড়ে যোগফলে গ'ড়ে উঠল একটি বিরাট ছবি! আর সে ছবি—দেয়াল কংকেভ হওয়ার জন্যে কি না জানি না—দেখায়, যেমন দেখায় সব কিছু সাদা চোখে—মানে তিন ডাইমেনশনে। এ ছবির আবিষ্কর্তা নিজে ব্যাখ্যাতা হ'য়েই বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উদ্ভাবনকৃতির বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রথমে নানা ভাবে দেখালেন সিনেমা ধীরে ধীরে কী ক'রে উদ্ভাবিত হ'ল, কী ক'রে বেড়ে উঠল—ম্যাজিক লণ্ঠন থেকে এসে পৌছল চলমান ছবির থিয়েটারে। সে-ব্যাখ্যান নানা বিলিতি পত্রিকায় বেরিয়েছে ও যথাকালে আমাদের দেশেও পৌছবে। তবে সিনেরামা হয়ত আমাদের দেশে রপ্তানি হ'তে দেরি হবে। হাজারো তোড়জোড় যে! তাছাড়া এখনো এ-ছবিকলির তো সবে সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে এর উন্নতি হবেই হবে মহাবেগে। ব্যাখ্যাকার বললেন যে ছায়াছবির জগতে এই যে তিন ডাইমেনশনের আবির্ভাব একে বলা যেতে পারে বিপ্লব—"The whole technique of talkie has been revolutionised"—কালে অদূর ভবিষ্যতে দুই ডাইমেনশনের ছবি—যা আপনারা আজ

দেখছেন—হ'য়ে যাবে সেকেলে, বরখাস্ত—যেমন কথাছবির আবির্ভাবে হয়েছে মৌনছবি।

একথাও কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেটা চোখে না দেখলে কল্পনা করা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে :

প্রথম, সিনেরামার বিশালতা। মনে হয় যেন গোটা আকাশকে এরা ক্যামেরার ফাঁদ পেতে ধ'রে ফেলেছে। বিশেষ ক'রে পাহাড় ও নদীর বা সমুদ্রের ছবি। এ-দৈর্ঘ্যপ্রস্থ চলতি টকির টেকনিকে দেখানো অসম্ভব।

দ্বিতীয়, অনেক দৃশ্যপট এরা নিয়েছে আকাশ থেকে—চলমান বিমান থেকে তুলতে তুলতে গ্রেপ্তার করেছে। ধরুন নিউয়র্কের ছবি। তাকে বিমান থেকে যেভাবে দেখা যায় দিগন্ত-বিতত—ঠিক তেম্‌নি। না, আরো বেশি—বড় ক'রে দেখানো। মানে ম্যাগ্‌নিফাই ক'রে চোখের সামনে ধরা। কাজেই শুধু যে প্রতি খুঁটিনাটি দেখা যায় তাই নয়—দেখা যায় যেন সব-জড়িয়ে, চল্‌তি পটে, ফ্রেমকরা ছবিতে যেমন খানিকটা ছবি দেখানো হয় তেমন নয়—চোখে যেমন দেখি প্রায় তেম্‌নি।

তৃতীয়, এমন ভাবে নদী বা সমুদ্রের ঢেউ গড়িয়ে আসতে থাকে যে দৃষ্টিবিভ্রমে ঠিক মনে হয় যেন আমাদের প্রেক্ষাগৃহটি একটি জাহাজ, আমরা ডেক থেকে দেখছি সমুদ্র বা নদীর ঢেউ—যেন চলেছি তর তর ক'রে ঢেউ কেটে। এখনো আশ্চর্য হবেন না ?

না, পরিহাস নয়। এ একটি সত্যিই চমকপ্রদ সৃষ্টি। সবাই জানে কীর্তির মানেই হ'ল কমবেশী অসাধ্যসাধন। দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ যে-পরিমাণে অসাধ্যসাধন করে সেই পরিমাণেই সে কীর্তি অর্জন করে, যার উপনাম—যশ মান। বৈজ্ঞানিক এই দৈনন্দিন জীবনের কীর্তিকে নানাভাবে প্রসারিত ক'রে এনে ফেলেছেন প্রায় নবসৃষ্টির বিস্ময়লোকে : যা ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের রূপকথারি পর্যায়ে তাকে টেনে উত্তীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষের জাজ্জ্বল্যমান রঙ্গমঞ্চে। অপিচ বিমান, মোটর, রেল, জাহাজ, সেতু, সুরঙ্গ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্রামোফোন, রেডিও, প্রেস, টেলিভিশন—প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষ চেয়েছে উত্তরোত্তর ঘোষণা করতে : "নাল্পে সুখমস্তি—যত পাই বলো ভাই : আরো চাই, আরো চাই, যাহা নাই, আজো নাই—চাই তাই, চাই তাই।" যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী : ফলে, মানুষ অশ্রান্তবেগে ছুটেছে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপায়নে। এ-বিচিত্র রূপোদ্ভাবনার একটি প্রধান রঙ্গপীঠ যে ছায়াছবি একথা না

## ওয়াশিংটন

রাজদূত মেতা টেলিফোন করলেন "জাগতিক বাণিজ্য সপ্তাহের" (World Trade Week) এক অধিবেশন হবে ১৯শে থেকে ২১ মে—বিশাল "বাণিজ্য-প্রেক্ষাগৃহে" (Commerce Auditorium)—যেখানে নাকি দু-তিন হাজার দর্শক শ্রোতার সমাগম অবধারিত। ব্যাপারটা কী ঠিক বোঝা না গেলেও এটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পেতে হ'ল না যে এ হ'ল তাই যা বাল্যকালে এক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে পড়েছিলাম: "হৈ হৈ ব্যাপার! রৈ রৈ কাণ্ড! গোবিন্দলাল অন হর্স ব্যাক"। (টীকা:—বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রঙ্গমঞ্চে গোবিন্দলালের অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ)। ভাবুন, একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সপ্তাহ; তদুপরি দু-তিন হাজার লোক; তদুপরি ভারত, পাকিস্তান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, চীন, মিশর, অস্ট্রিয়া, আয়র্লণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইংলণ্ড, গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, জর্মনি, ওলন্দাজ, তুর্কী ইত্যাদি—সর্বশেষে আমেরিকা। আর, এঁরা কী করবেন? না, প্রত্যেকে পাঠাবেন সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি যাঁরা হয় নাচবেন, নয় গাইবেন, নয় ভেঁপু বাজাবেন, নয় লোক হাসাবেন। ছাপার অক্ষরে বিজ্ঞাপন বেরুল: প্রথম দিন রাত সাড়ে আটটায় আসর বসবে। ভারতকে দিয়ে সুরু, মিশরকে দিয়ে সারা। দ্বিতীয় দিন অস্ট্রিয়াকে দিয়ে সুরু, তুর্কীকে দিয়ে সারা। তৃতীয় দিন কস্টারিকা (তা সে যেখানেই হোক—ভূগোল মনে নেই, এ-বয়সে আর রপ্ত হবেও না, আপনারা যদি দুর্দান্ত সার্বভৌম ঔৎসুক্যকে দাবিয়ে রাখতে না পারেন তবে কোনো ভূগোলে দেখে নেবেন), তারপর কিউবা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, বলিভিয়া, ইকোয়েডর ও আমেরিকা। (পুরো তালিকা দিলাম কিছুই বাদ না দিয়ে—সাংবাদিক না হওয়া সত্ত্বেও, তবু দেবেন না ধন্যবাদ?)

এহেন হট্টমন্দিরে আমরা যাব না?—অনুনয় করলেন স্বয়ং রাজদূত মেতা; বললেন—বহু লোক ৬ই এপ্রিলে নিউয়র্কে আমাদের নৃত্যগীত দেখে বায়না ধরেছে তাঁর দরবারে: "ডাক দিন ওঁদের, লক্ষ্মীটি!" নেতা সজ্জন—রাখলেন অনুরোধ, দিলেন ডাক—আরো লোভ দেখাতে চেয়ে যে, আমাদের প্রত্যেকের

নৃত্যগীতাদি শুধু যে হাজার তিনেক লোক দেখবে তাই নয়—আমরা যাই কেন না করি—পতন ও মূর্ছা হলেও সাক্ষাৎ সর্বঘটের পরিবেষক টেলিভিশন আমাদের কীর্তিকলাপ সারা আমেরিকায় চালু করবে—সবাই বলবে "ধরো ধরো!" ভাবুন, এহেন প্রলোভন সংবরণ করা কি সহজ ব্যাপার? এক ত্রৈলঙ্গ স্বামী পারতেন হয়ত। অন্তত আমরা যে পারি নি তার প্রমাণ তো প'ড়েই রয়েছে—এই বিবরণী লিখছি সেই হট্টমেলার।

না, এবার গম্ভীর হ'য়ে বলি শুনুন। ওরা মানুষ ভালো—গিয়ে দেখলাম স্বচক্ষে। কী কাণ্ডই করেছে! সাক্ষাৎ পবন-নন্দনদের (খুড়ি, Air-force = পবনশক্তিমন্তদের) দিয়ে কী ভেঁপুই না বাজালে: শুধুই নির্ভেজাল ভেঁপু—সাধুভাষায় যাকে বলে শৃঙ্গ, হেমচন্দ্রীয় ভাষায় "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে!"

উদ্ধৃতিটি দেখুন কেমন ঝাঁ ক'রে এসে গেছে। আমরা "যাব না" বলব—সাধ্য কি? হেমচন্দ্রের জলদমন্দ্র শৃঙ্গধ্বনি কি দিল ঘুমুতে? বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠল:

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রবে?"

অবশ্য ঘুম যে মন্দ জিনিস এমন ইঙ্গিত করা আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু এ-ঘুম কায়েম হ'য়ে থাকবে কি না সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসে?—যেখানে সারারাত সিনেমা চলে, ট্রাম চলে, বাস চলে, লিফ্‌ট চলে, অনেক ভোজনালয়ে খাওয়াদাওয়াও চলে অবিরাম—চব্বিশ ঘণ্টা। যেখানে বিজ্ঞাপনে আঁকা প্রকাণ্ড একানন থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বেরোয় অনর্গল! (এ আমাদের স্বচক্ষে দেখা মশায়! বলছি কি?) তা ছাড়া সবার মুখেই শুনি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই আমাদের এই অবস্থা—তাই এখানে একটু বেশি ক'রেই গাইতে হবে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য দর্শকান্‌ নিবোধত!"

পরিণাম: অকুতোভয়ে মেতাকে টেলিফোনে অভয় দেওয়া—যা থাকে দগ্ধ ললাটে, যাব ওয়াশিংটন, গাইব আমি, নাচবে ইন্দিরা। "আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই" জাগৃতিমন্ত্র জপতে জপতে ওয়াশিংটন রওনা হলাম ১৮ই মে সকালবেলা জগতের বেগবত্তম ট্রেনে। এ-অভিজ্ঞতাই বা কম কি?

* * *

ট্রেন ওয়াশিংটনে পৌঁছুতেই চিরবদান্য সুধীর বন্ধু ননীগোপাল মোটর নিয়ে হাজির। সঙ্গে এক বাঙালী ভদ্রলোক—লাহিড়ি। ওয়াশিংটনে যেতে নিমন্ত্রণ ক'রেই দিয়েছেন চম্পট—কোথায় কোথায় কত কী কাজ তাঁর! সাক্ষাৎ রাজদূত, তাঁর কি ব'সে থাকলে চলে? তার উপর শুনলাম ভারত থেকে অকর্মকে কর্ম প্রতিপন্ন করতে কে আসছেন গণ্যমান্য, তাঁকে দেখাশুনো করতে হবে না?

এহেন ক্ষেত্রে—যেখানে নিমন্ত্রণসভা বজায় রইল কেবল নিমন্ত্রণকর্তা অন্তর্হিত —মন যে ননীগোপালকে দেখে ব'লে উঠেছিল "স্মরামি চ পুনঃ পুনঃ" একথা না বললেও কল্পনা করতে পারবেন নিশ্চয়ই? এই বন্ধুটি যে কত ভাবে কত দিক দিয়ে আমাদের আনুকূল্য ক'রে এসেছেন অক্লান্তভাবে—কিন্তু সে যাক। এহেন প্রীতির ঋণ অপরিশোধ্য ব'লেই না তার মূল্য বেশি!

ইন্দিরা ও আমি ওয়াশিংটনের একটি মস্ত হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। সেদিনই আমার ওখানকার এক বাঙালী দম্পতির ওখানে গান। গৃহকর্তার বিচিত্র নাম: বিদ্যুৎ পালিত। বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ হ'লে মানেটা কী রোমহর্ষক দাঁড়াত ভাবুন! কাছে যেতে ভয় করত না কি—"শক্" খাবার ভয়ে সাপের চেয়ে ব্যাঙের চক্র যদি বড় হয় তবে বিদ্যুৎ-এর চেয়েও বিদ্যুৎ-পোষ্যপুত্রের ক্ষমতা শকিং না হ'য়ে পারে?

কিন্তু না। মানুষটি নামী হলেও বিদ্যুতের মতন অসহিষ্ণু নন—বরং লাজুক, মুখচোরাই বলব। সত্যি ভালো লোক। আমাদের খাওয়ালেন সবাইকে কত কী—ভালো লোক না হ'লে কেউ খাওয়ায়—এ দূর আক্রাগণ্ডার দেশে—যেখানে একটিমাত্র রামপক্ষীর চরণ দুডলার—কি না দশটাকা!

এলেন বহু দেশের জনগণমননায়ক না হোন "পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ" তো বটেই, তদুপরি শ্বেতাঙ্গও ছিলেন কয়েকটি। এক আমেরিকান বৃদ্ধাও ছিলেন সশরীরে, যদিও ক্রোধে তিনি প্রায় মূর্ছা যান আর কি! কেন—শুনুন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালোরে—মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়ার বাড়িতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে নাকি এক টেবিলে খেতে বসতাম, এই আমার অপরাধ। মহিলা সুভদ্রা একথা বাঙ্গালোরে হয়ত না জেনেও মেনেই নিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর চালচলন বা কথাবার্তায় এমন কোনোই অভিজ্ঞান চোখে পড়ে নি যা স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ ক'রে রাখবার ম'ত। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার বিস্মরণকে ঠিক এ-হেন চোখে দেখেন নি! "You don't

remember me? Me? But I remember you!" হা হতোঽস্মি! মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা—দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না। ছিলেন দরদী পিতৃদেব, তিনি বুঝতেন ব্যথা দিয়ে ব্যথা। মনে পড়ে, বলেছিলেন আমাকে একদিন সদীর্ঘশ্বাসে: "ওরে! কত শত্রুই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে! যাকেই মনে রাখতে হারি, সেই দেখি মণ্টে ক্রুস্ট হ'য়ে দাঁড়ায়—ভোলে না যে, এ-দণ্ডনীয়কে দিতেই হবে জাজ্বল্যমান সাজা!" এঁরা হ'লেন সেই চিরপরিচিত "স্বনামধন্য" জাতের মানুষ যাঁরা ঐ বিশেষণটির অর্থ ধরেন—"আমি অগ্রগণ্য!" এ-জাতের মানুষ কেবল পেরে ওঠেন না বার্নার্ড শ-র কাছে। এঁদের একজন তাঁকে বলেছিলেন: "আমাকে চিনতে পারছেন না? কিন্তু আমি তো চিনি আপনাকে!" তাতে শ তূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন:

> বহু বোকা আছে—বোকা টমে যারা রাখে স্মরণে,
> বোকা টম শুধু পারে না রাখতে তাদের মনে!*

এ-ভদ্রমহিলাকে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল শ-র কথা, কিন্তু ভাবলাম পরিণামে হয়ত কোনো মার্কিন পিনাল কোডের ধারায় ফেঁসে যাব। তাই শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ ক'রেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম: "দিলীপ, অনেকগুলি কথা আছে যারা নিজেকেই নিজে প্রতিবাদ করে, যেমন ধরো common sense: বলবে কি এ-বস্তু এ-জগতে সত্যিই কমন্?" অলমতিবিস্তরেণ।

যাহোক পরদিন যথাকালে রাজদূতাগার থেকে একটি মহিলা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন বাণিজ্য-প্রেক্ষাগৃহে। লোক হয়েছিল অগুন্তি—মানতেই হবে। আয়োজনও করেছিল ওরা অনবদ্য। কর্মের এ-কৌশলটি ওদের কাছ থেকে আমাদের শিখে নিতেই হবে। প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহ। ঢুকতেই সামনে নানা স্টল মতন—প্রতি স্টলে হরেক রকমের ম্যাপ, প্রতি দেশের কীর্তিকলাপের নমুনা ইত্যাদি। লণ্ডনে বহুদিন আগে দেখেছিলাম রকমারি পণ্যের প্রদর্শনী—রকমারি তাঁবুতে। খানিকটা সেই ব্যবস্থা। সব কিছুর মধ্যে দিয়েই এরা চায় আত্ম-দর্শন না হোক আত্ম-বিজ্ঞপ্তি। এ দেশ যে বিজ্ঞাপনের দেশ—যুগও

---

* "More fools know Tom Fool than Tom Fool knows"—বলেছিলেন শ।

হ'ল বৈশ্য—আর দেশকালের প্রধান পাত্র তথা উদ্গাতা তো আমেরিকা বটেই —না মান্‌বে কে ?

কিন্তু এবার আসল মেলার পালাগানের সময় এল।

ব্যাপারটা হ'ল—বণিক্‌দের বাণিজ্য সপ্তাহের মেলা—Trade week—উদ্বাহিত হবে Chamber of Commerce-এর পৌরোহিত্যে। এ-ধরনের যাগযজ্ঞ কি কোনোদিন দেখেছি ছাই যে অকুতোভয়ে বর্ণনা করব? তবু প্রবচন-শাস্ত্রে বলে নৃত্যে অবতরণ ক'রে অবগুণ্ঠন পরিহার্য। কাজেই বলি যা পারি—যতটুকু লেখনীর সাধ্যে কুলোয়।

হাজার তিনেক দর্শক-শ্রোতা। কী বিরাট্ প্রেক্ষাগৃহ একবার ভাবুন! যেন গড়ের মাঠ। তদুপরি রকমারি তীব্র আলোকরশ্মিপাত প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে! সর্বোপরি, সাম্‌নেই একদল উড্ডীয়মান শক্তিসঙ্ঘের ব্যাণ্ড—শুধুই শিঙে। এতগুলি লোক শিঙে ফুঁকবে সমতানে! দেখেই হলাম শিহরিত, শোনবার পরে যে-রোমহর্ষণ সে শুধু কল্পনীয়। কিন্তু ঠাট্টা নয়, চমৎকার বাজালে ওরা—গায়ে কাঁটা দেয় সত্যিই। অজস্র ওদের টাকা তথা আয়োজনের নিপুণ ব্যবস্থা। প্রতি জাতির প্রতিনিধির হাতে সেই দেশের জাতীয় পতাকা। নৃত্যগীত সুরু হবার আগে প্রেক্ষাগৃহের ডান দিকে একটি উচ্চ বাসরে প্রতি জাতির প্রতিনিধি—একটি মহিলা—পতাকা মেলে দাঁড়াতেই তীব্র রশ্মিপাত তাঁর উপরে। পরিণাম—হাততালি। অতঃপর রস-পরিবেষণ—যে যেমন পারে অবশ্য।

সুরু হবার আগে এক যুবক উদ্যোক্তা আমাদের প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন কী ভাবে অন্ধকার গৃহে রঙ্গমঞ্চে টাল সাম্‌লে ধীরপদবিক্ষেপে এসে দাঁড়াতে হবে। তার পরেই তীব্ররশ্মি প্রত্যেককে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে করবে কি না—উত্তীর্ণ।

সুরুতে উদ্যোক্তা অনেকক্ষণ ধ'রে বক্তৃতা দিলেন—কেন কী উদ্দেশ্যে এ-আনন্দমেলার আয়োজন। তার সারমর্ম—"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিল জয়ভেরী"—কার? না, প্রতি দেশের শিল্পকলার, নৃত্যগীতের। শিল্পের মাধ্যমেই সবচেয়ে সহজে এক জাতি আর এক জাতির কাছে আসতে পারে। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসবাস—বটে, কিন্তু সরস্বতীকে অর্ধচন্দ্র দেওয়াও তো চলে না। এ হ'ল সেই সাক্ষাৎ সরস্বতীর আবাহন! এই জগতের মহামানবের "সাগরতীরে" না হোক "প্রেক্ষাগৃহে" বিশ্বমানব এসে হাজিরি দিচ্ছে—জনে জনে তার শিল্পকলার ডালি নিয়ে।

উদ্দেশ্য মহৎ, মান্‌তেই হবে। তাছাড়া সাধ্য না থাকলেও সাধ থাকতে বাধা কী? সবাই তাই এসেছে বড় সাধ ক'রে যে তাদের জাতীয় কলাকারু এই সার্বজনীন প্রদর্শনীতে অভিনন্দিত হবে।

ভাগ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন: ভারতকে নিয়েই এ-বিশ্বশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল। প্রথমে চারণ বক্তা আমাদের পেশ করলেন ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে। বললেন—ইন্দিরা—নৃত্য-অপ্সরী, দিলীপকুমার—গীতকিন্নর, ইত্যাদি গালভরা বিশেষণ।

আমি প্রথমে গাইলাম পিতৃদেব-রচিত শিবনামকীর্তন :—

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণ ভীষণ মহান্ শঙ্কর শ্মশানচারী।
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী।
মহাদেব মৃড় শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।
স্থাণু কপর্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর।
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাসবিহারী।

শুধু নাম সাজিয়ে সংস্কৃত ছন্দে এই গানটি পিতৃদেব বেঁধেছিলেন সে কবে! পাশ্চাত্য দেশে শক্তিস্পন্দিত গানের সমাদর সহজেই হয়। হলিউডে রামকৃষ্ণ মিশনে অলডাস হাক্সলি এ-গানটি শুনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন শব্দ ও স্বরের প্রাণশক্তিতে। গানটি আমি স্বরচিত আড়ানা রাগে দূন ক'রে গাইলাম ধ্রুপদী ঢঙে। ফল হ'ল—আশাতীত। দর্শকবৃন্দের সে কী উৎসাহ! করতালি আর থামে না—তিনহাজারী করতালি—ভাবুন! পিতৃগর্বে বুক দশহাত হ'য়ে উঠল। কী গানই বেঁধে গিয়েছিলেন তিনি!

তারপর আমি বন্দেমাতরম গান গাইলাম, ইন্দিরা নাচল ভারতনাট্যনৃত্যের বেশ প'রে। ওর নাচে দর্শকবৃন্দ যেন আরো উজিয়ে উঠল। বার বার যবনিকা ওঠে, আর আমাদের এসে অভিবাদন করতে হয় বাকায়দা ঢঙে। সে কী উচ্ছ্বাস! করতালির একটা পালা সারা হ'তে না-হ'তে, নতুন পালা—যেমন একটা ঝাপ্‌টার পরে আর একটা।

তারপরই পাকিস্তান। না, পরনিন্দা ভালো নয়। তবে লোকে বলাবলি করতে লাগল—প্রথম সন্ধ্যা কেন অকারণ এভাবে রসভঙ্গ করা হ'ল—কেন

অন্তত উদ্বোধনের দিনে শুধু ভারতবর্ষের নৃত্যগীতেই সুরু ও সারা হ'ল না? কিন্তু এ যে আমেরিকা—এখানে

সময় যে নাই!
সকলে এসেছে ছুটে দেশ দেশান্তর হ'তে তাই!
তাদেরো বক্ষে কত আশা!
কণ্ঠে কত সুর, কত ভাষা!
কারো হাতে ছুরি, কারো হাতে থালা, কারো হাতে মালা,
কারো হাতে ঘৃতদীপ জ্বালা।
কোরিয়া ও ইন্দোচীন, তথা ইন্দোনেশিয়া, মিশর
জাপান ও চীন অতঃপর
সুতরাং সময়-সংক্ষেপ ভারতের—
কোথা চারা এর?

* * *

পাকিস্তানের পর কোরিয়ার গান গাইলেন এক মার্কিন মহিলা। কিন্তু সে গান যদি সত্যিই কোরিয়ার গান হয় তবে কোরিয়া সম্বন্ধে হতাশ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তবে জানি তো—অ-ভারতীয় শিল্পকে কত ভারতীয় শিল্পী-যশঃপ্রার্থী বিদেশে যেতে না-যেতে পেশ করেন ভারতীয় ব'লে—কাজেই দার্শনিকের মতন জপলাম: "এ-নমুনা দেখে কোরিয়ান নৃত্যগীত সম্বন্ধে সরাসর কোনো সিদ্ধান্তে না পৌছনোই ভালো।"

* * *

বন্ধুবর ননীগোপালের মোটরে আরূঢ় হ'য়ে সারা ওয়াশিংটন শহরটা ঘুরে দেখে শুধু মুগ্ধ না, চমকে গেলাম—আরো বোধহয় এইজন্যে যে সাক্ষাৎ আমেরিকায় এ-ধরনের অ-বৈশ্য শহর দেখব সত্যিই ভাবি নি। ঐতিহাসিকতায় জগতের অনেক প্রাচীন শহরই একে দুয়ো দিতে পারে, কিন্তু রাজধানীদের মধ্যে মনোজ্ঞ আধুনিকতা, ঐশ্বর্য ও শালীনতার এহেন ত্রিবেণীসঙ্গম আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। অদৃষ্টপূর্ব এর সমন্বয়ের ছন্দ: সবুজ গাছ, উদার প্রান্তর, ঝলমলে বাগান, অপরূপ বিশাল নদী—একটি নয়, দুটি নদী একে মালা দিয়েছে একযোগে! মনে পড়ল আমেরিকায় প্রথম তেজস্বী য়ুরোপীয় নাবিকদের অবতরণ: তাদের বুকে ছিল দৃপ্ত বীর্য, চোখে নবরাজ্যের স্বপ্ন, মাথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেহে আশ্চর্য স্বাস্থ্য। এদেরি প্রতিভায় গ'ড়ে উঠেছে আমেরিকার অদ্বিতীয়া নগরী ওয়াশিংটন, জেফার্সন ও

আব্রাহাম লিংকন—মনীষিত্রয়ীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী। এদের মধ্যে এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে আমাকে। জেফার্সনের মনুমেণ্টে খোদাই করা তাঁর বাণী পড়লাম—ডিমক্রাসির পুরশ্চরণ : "Government of the people, by the people, for the people!" আব্রাহাম লিংকনের মনুমেণ্টে উৎকীর্ণ করা তাঁর কত বাণী চোখে পড়ল। ওয়াশিংটনের মনুমেণ্টের ভিতর যাই নি—বাইরে থেকে তাঁর নামপূত উত্তুঙ্গস্তম্ভ দেখেই মন ভ'রে উঠল। কেবল সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে, এ-ধরনের উদ্দীপক জোরালো বাণী আজকের দিনে কেউ বলে না—কিম্বা যদি বা কখনো কারুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সে নিজেই কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে কেমন-কেমন শোনালো ব'লে! যেমন ধরা যাক আমেরিকান Declaration of Independence-এর বাণী : "right to life, liberty and pursuit of happiness, যেহেতু all men are born equal, tyranny hateful"—ইত্যাদি। এ-ধরনের কথা আজকাল কেউ খবরের কাগজেও লিখতে ভরসা পায় না—পাছে লোকে হাসে এই ভয়ে। কালেভদ্রে এক পেশাদারী বক্তার মুখে শোনা যায় বটে—তবে তিনি এ-ধরনের বুলি কপ্‌চে চলেন বোধকরি পূর্বজন্মের কর্মফলে : অর্থাৎ একদা তিনি এ-ধরনের কথার কারবারী ছিলেন তো—সে সংস্কার জমা হ'য়ে রয়েছে তাঁর অবচেতন মনে—তাই কি বেরিয়ে পড়ে থেকে থেকে? জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, আজকের দিনে ও পরিবেশে এ-ধরনের বাণীকে মনে হয় সেকেলিয়ানা : এমন কি ভারত যে ভারত সেখানেও ধর্ম যে ধারণ করে এমন কথা বলতেও সাহস পায় না বেশি মানুষ। তাই আমরা শুধু মহাভারতেই পড়ি :

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

প্রজারে করে ধারণ বলি' ধরে
ধর্ম নাম তাহার চরাচরে।

খুব দোষ দেওয়া যায় না মানুষকে, যখন সে নিত্যই চাক্ষুষ করছে উল্টো এজাহার—যে-আমেরিকা আটম বোমার স্তূপ গড়ছে সে-ই বলছে ধর্ম সম্বন্ধে বড় বড় কথা! (এ-আমেরিকাকে ঠিক ওয়াশিংটন, জেফার্সন, লিংকনের বংশধর বলা চলে কি!) তাই একেলিয়ানা ধরল অন্য বুলি : সিনেমা-তারকা, প্রলেটারিয়েট বা ফাইভ য়ার প্ল্যান—এতে অন্তত একেলিরা বিশ্বাস করেন এইটুকুই বাঁচোয়া।

এ-ব্যবস্থায় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক প্রায় সবাই সায় দিয়েছে বললে হয়ত খুব অত্যুক্তি হবে না। কেবল যে-দুচারজন দেয় নি তাদেরি হ'ল মুস্কিল। কেন না তাদের মনের অতলে কোথায় এখনো তৃষ্ণা মরিয়া-না-মরে-রাম হ'য়েই

আছে বেঁচে, সে-দুর্ভাগা উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে এর চেয়ে কোনো ভালো মন্ত্র শুনতে। আধ্যাত্মিক মন্ত্র শুনতে পাবে এ-আশা সে প্রায় দুরাশাই মনে করে, যেহেতু আধ্যাত্মিক মন্ত্রপাঠ করবে এমন বুকের পাটা এ-যুগে খুব কম লোকেরি আছে—বিশেষ ক'রে ইংরাজি ভাষায়। বিবেকানন্দ বা শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাপুরুষ মেলে কালেভদ্রে—কিন্তু এঁদের-মতন-মহাজনের-প্রিয় আধ্যাত্মিক বাণী বাদ দিলেও আন্তরিক নৈতিক বাণী শোনা যেত একশো বছর আগেও। দুঃখ এই যে, এ-বাণীর উদ্‌গাতাও ক্রমশ কমতে আরম্ভ করল সিনিকদের উপহাসে। একথা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম ওয়াশিংটনে পৌঁছে—কেন না সেখানে যেতেই মনে প'ড়ে গেল যে আজকের আমেরিকানদের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন এই তিনটি ব্যক্তিরূপ—পার্সনালিটি—মহামানব না হ'লেও মহৎ মানুষ। আমেরিকা আজ পুরোপুরি ব্যবসাদার হ'তে বসেছে—প্রিন্সিপ্‌ল্ তার হয়ত এখনো কিছু আছে মনের অতলে—কিন্তু বাইরে ডলারের প্রতিপত্তি এত বেশি যে, প্রিন্সিপ্‌ল্-এর কথা এদের মুখে শুনতে যেন কেমন কেমন লাগে। আমাদের দেশে এখনো সাধু মানুষ, ঋষি, জ্ঞানী, সর্বত্যাগী সবার নমস্য। এ দেশে সবাইয়ের লক্ষ্য—ক্রোরপতি হওয়া। "বলং বলং বাহুবলম্" বলে অসুর। "ধনং ধনং বহুধনম্"—বলে বৈশ্য। আমেরিকার সাধনা যন্ত্র নিয়ে, সিদ্ধি—বৈভবে। আশ্চর্য বলিষ্ঠ জাত! দুর্দম্য প্রাণশক্তি! কিন্তু শুধু প্রাণশক্তির বহুচর্চায় ধনলাভ হ'তে পারে, মদমত্ততার প্রবল ক্ষণানন্দ লাভ হ'তে পারে, এমন কি হয়ত সার্বজনীন দারিদ্র্যকেও কোণঠাসা করা যেতে পারে। কেবল পারে না শান্তিতে পৌঁছনো, "পীযূষামৃতের" অধিকারী হওয়া। নৈতিক প্রিন্সিপ্‌লেও হয়ত ঠিক শান্তি বা অমৃত মেলে না, কিন্তু মেলে আভিজাত্য, চরিত্রগৌরব। ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল এই দুটি পরম ঋদ্ধি—কৌলীন্যসম্পদ। ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রশক্তির রাখীবন্ধনে জেগে উঠেছিল এদের মনে জাতীয় গৌরবের স্বপ্ন যার ভিত্তি সাম্যবাদে। সে-সাম্য আজ আগের তুলনায় খানিকটা বনেদ পেয়েছে বটে—বিশেষ ক'রে আমেরিকায়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-যুগের বৈশ্য মানব তার ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আভিজাত্য খানিকটা হারিয়েছে বৈ কি। ফলে ওয়াশিংটন, জেফার্সন, লিংকন প্রমুখ মনীষীর জপ্য মন্ত্রগুলি এখন এদেশের লোকের মনে শুধু ঐতিহাসিক স্মৃতিতেই পর্যবসিত হয়েছে। বুদ্ধিমান উকীল হয়ত বলতে পারেন—"যেকথা একসময়ে বড় গলা ক'রে বলার দরকার ছিল সেকথা আজ সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়েছে ব'লেই আর শোনা

যায় না। অসুখে মানুষ সাবধান হয়—স্বাস্থ্য ফিরে এলে কে ওষুধ খায়? সাম্যবাদ যেসময়ে মার্কিন মনীষীদের কণ্ঠে নির্ঘোষিত হয়েছিল সে-সময়ে প্রবলের অত্যাচারই ছিল সব চেয়ে বড় জাগতিক আধি তথা ব্যাধি। তাই সে-সময়ে সাম্যবাদের গুণগান ছিল আবশ্যিক। কিন্তু আজ ডিমক্রাসি, গণতন্ত্র, সুখে-সর্বাধিকার বর্গীয় বাণী সার্বভৌম মনে চারিয়ে গেছে, কাজেই ও-ধরনের প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর পুনর্ঘোষণ হ'য়ে দাঁড়াল বাহুল্য।"

এ-ওকালতির মধ্যে কিছু সত্য আছে—মানি। কিন্তু অসত্যও আছে। সাম্যবাদ এখানে হয়ত অন্য অনেক দেশের চেয়ে বেশি দৃঢ়মূল। কিন্তু ধনের বৈষম্য বশে যে অসাম্য তাকে সরায় কার সাধ্য? ক্রোরপতির মেয়ে কি এদেশে নির্ধনকে চায় ভর্তারূপে? এক আধটা সারা রুজভেল্টের নাপিতপুত্রকে বিবাহ করা, কি প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রেমের জন্যে সিংহাসন-ত্যাগ ব্যতিক্রমের মধ্যেই ধরতে হবে। বিদ্যা বা বংশভেদে বৈষম্যের রূপ এক, বৈভবভেদে তার রূপ আর। দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে যে-তফাত এদেশে উগ্র হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাকে কি ডিমক্রাসি নাম দিয়ে নস্যাৎ করা চলে? অর্থের অনুপাতে কৌলীন্যের পরিমাপ এদেশে কায়েম হ'য়ে গেছে মানতেই হবে। কাজেই এখানে মানুষ আইনের বা থিওরির চোখে সমান হ'লেও কার্যক্ষেত্রে বৈষম্যের যে মূলোচ্ছেদ হয় নি এ-সত্যকে অস্বীকার করতে পারে এক—অন্ধ, দুই—আমেরিকার নীতিধ্বজ।

তাই হয়ত ওয়াশিংটন এত ভালো লাগল। যাঁদের কণ্ঠে এখানে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল যে মানুষ সবাই সমান ও প্রবলের অত্যাচার দণ্ডনীয়—তাঁরা ছিলেন সত্যিই মহৎ মানুষ, গুণকুলীন, বীর্যসুন্দর। তাঁদের মর্মরমূর্তি দেখতে তাই লক্ষ লক্ষ লোক আজো ওয়াশিংটনে যায়। তা ছাড়া প্রাণ জুড়োয় ওয়াশিংটনের আশ্চর্য আভিজাত্যে, গুণগ্রাহিতায়, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে। কী অপরূপ বিশাল নদী! কী খোলা সবুজ মাঠ! সর্বোপরি, এ-আশ্চর্য পুরীতে কী মনোজ্ঞ মণিকাঞ্চন-সংযোগ হয়েছে ঐতিহাসিকতা ও আধুনিকতার! ঐতিহাসিক নীতিবাদ ও আধুনিক ধনবাদ। এত ধনী শহর যে এমন কুলীন হ'তে পারে, ওয়াশিংটনে না এলে হয়ত অজানাই থেকে যেত আমার কাছে।

## নিউয়র্কে পুনঃ প্রত্যাবর্তন

ওয়াশিংটন থেকে নিউয়র্কে ফিরে এসে মন যেন আরো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ছাড়া পেয়ে খাঁচায় ফেরে যে-পাখি তার মনঃকষ্ট ছাড়া-যে-পায়নি সে-পাখির চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। কাজেই ফিরেই কয়েকটি থিয়েটারে গেলাম পর পর। বিশদ বর্ণনা দেবার স্থানাভাবও বটে, ইচ্ছাভাবও বটে। কিন্তু এসম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করলে হয়ত মন্দ লাগবে না পাঠকের।

প্রথমেই বলি এক হিপ্‌নটিস্টের কথা। ইন্দিরা ধরল: "হিপ্‌নটিসম্‌ কখনো দেখিনি—চলোই না—এখানকার এক থিয়েটারে জগতের সেরা হিপ্‌নটিস্টের আবির্ভাব হয়েছে।"

প্রায় চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় থার্স্টন্‌ নামে এক হিপ্‌নটিস্ট তথা বাজিকর এসেছিলেন। ইনি শুধু তাঁর সেক্রেটারিকে অচেতন ক'রে নানা খেলা দেখাতেন। শূন্যেও তুলতেন। শূন্যে তোলা বিশ্বাস হয় নি তবে হিপ্‌নটিস্‌মের-মাধ্যমে-মোহিত সেক্রেটারি ব'লে দিতেন, কে কোথায় ব'সে কী লিখছে, কার হাতে কোন্‌ তাস—ইত্যাদি। এ ধরনের খেলার মধ্যে কতটা কারসাজি ও কতটা সিদ্ধাই বলা শক্ত। তবে দেখতে ভালো লাগে, অবাক্‌ লাগে মানতেই হবে। কারণ ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল যদি নাও জানেন তবু তাঁর ভেল্কিকে যদি ভেল্কি মনে হয় তবে তিনি ঐন্দ্রজালিক উপাধি দাবি করলে নামঞ্জুর করা কঠিন। কিন্তু না, হিপ্‌নটিস্‌ম্‌কে ভেল্কি বললে ভুল হবে। বইয়ে পড়েছি মেস্‌মার ব'লে জনৈক অস্ট্রিয়ান ডাক্তার আঠারো শতকের শেষাশেষি ভিয়েনাতে মেস্‌মেরিস্‌মের জাদুতে বহু রুগ্নকে নীরোগ করতেন। তখন এ-সম্মোহন-জাদুবিদ্যাকে বলা হ'ত মেস্‌মেরিস্‌ম্‌।

তারপরে জেম্‌স্‌ ব্রেড নামে এক সাহেব ম্যানচেস্টারে এই বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ ক'রে বহু লোককে সম্মোহিত ক'রে নাম কেনেন। তিনি গ্রীকভাষার "হিপ্‌নো" (মানে নিদ্রা) থেকে "হিপ্‌নটিস্‌ম্‌" রচনা ক'রে এই শব্দটিকেই নানা য়ুরোপীয় ভাষায় চালু করেন। তার পরে নানা ডাক্তার নানা সময়ে হিপ্‌নটিস্‌ম্‌ বিদ্যার সাহায্যে নানা রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে তাদের শরীরে কাটাকুটি করেছেন।

এখনো অনেক সার্জন শুনি এইভাবে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে তাদের দেহে অস্ত্রচালনা করেন। তবে ক্লোরোফর্ম-বর্গীয় চেতনাহারী ঔষধের আবিষ্কার হওয়ার ফলে সার্জারিতে হিপ্‌নটিস্‌ম্‌-এর প্রতিপত্তি অনেক কমে গেছে। এখনো কোনো কোনো ডাক্তার ক্ষেত্রবিশেষে একে প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু লোকে একটু ডরায় এ-বিদ্যাকে। ভয়ের হেতুও আছে বৈ কি। এই সেদিনই নিউয়র্কের একটি কাগজে পড়ছিলাম এক ডাক্তার অভিযুক্ত হয়েছেন রোগিণীকে এইভাবে অবশ ক'রে তার উপর বলাৎকার করার দরুন।

হিপ্‌নটিস্‌মের মূল নিশানা আমাদের অবচেতন ( subconscious ) মন। বাইরের চেতন মন নিস্তেজ হ'লে অবচেতন এগিয়ে আসতে না-আসতে তাকে যা বলা যায় সে সেই অনুসারে না· চ'লে পারে না। কিন্তু থিওরি নিয়ে মাথা বকিয়ে কাজ কি ? গুছিয়ে বলি, শুনুন, যা দেখলাম—যেটুকু রসাল।

এখানকার "বিজু" থিয়েটারে ডাক্তার স্লেটারের অভ্যুদয় হ'ল। কাগজে লিখল: "World's fastest hypnotist"—আর একথার স্বপক্ষে নানা এজাহারও ছাপা হ'ল ডাক্তার স্লেটারের প্রণীত "How to Hypnotise" পুস্তিকায়। রটনার সত্যাসত্য-নির্ণয়ের না আছে সময়, না সাধ। তবে এ-সূত্রে চাক্ষুষ করলাম বৈকি যে, তিনি ধাঁ ক'রে সম্মোহিত করতে পারেন একের পর এক অনেকগুলি মানুষকে। অবহিত হোন্: মজা আছে।

যবনিকা তোলা হ'লে ডাক্তার স্লেটার এসে খানিকক্ষণ নিজের গুণপনা সম্বন্ধে বিনম্র ঢাক বাজিয়ে ডাক দিলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে কতিপয় দর্শককে। বললেন: "আমি অচেনা দর্শককে ডাকি—সাজানো সাক্ষী নিয়ে মিথ্যাচার করি না। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে যাঁরা 'মোহিত' হ'তে আসেন তাঁদের কেউ আমার চেনা তবে আমি আমার সাতদিনের রোজগার কোনো চ্যারিটিতে বিতরণ ক'রে দেব।"

যাহোক, ছয়জন ভদ্রলোক তো রঙ্গপীঠে উঠে গিয়ে বসলেন ছয়টি চেয়ারে। তারপর ডাক্তার করলেন কি, এদের মধ্যে একটি কর্নেল, একটি সৈনিক ও একটি নাবিককে ছুঁতে-না-ছুঁতে মোহিত ক'রে ফেললেন। যাকে যে-ভাবে ছুঁলেন সে ঠিক সেই ভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল অচেতন অবস্থায়। এ-যে হিপ্‌নটিস্‌ম্—সন্দেহ রইল না। তারপর দেখানো সুরু হ'ল নানা খেলা—যেমন হয়। অর্থাৎ তিনি যা বলেন ঘুমন্ত ত্রয়ী তাই করেন। মজা হ'ল যখন এক ডলকে আনা হ'ল সামনে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন প্রথম মোহিত সৈনিককে:

"তুমি কোন্ সিনেমা-তারকাকে ভালোবাসো?" সে বললে: "শার্লি বুত।" ডাক্তার বললেন: "তবে দেখ কী সৌভাগ্য তোমার—তিনি তোমার কাছে এগিয়ে আসছেন তোমার বাহুপাশে ধরা দিতে।" অম্‌নি সৈনিক হৃষ্টমনে সেই ডলকে উচ্ছ্বসিত চুম্বন সুরু করলেন। সবাই হেসে কুটি কুটি।

কিন্তু এর চেয়েও উপভোগ্য হ'ল ডাক্তারের post-hypnotic suggestion কয়েকটি। তিনটি মাত্র বলি। নাবিককে বললেন: "এখন তোমার ঘুমন্ত অবস্থা, আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ—বললেই তুমি উঠবে জেগে। তখন তোমার কিছুই মনে থাকবে না আমার কথা। ভুলে যাবে যে তোমাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল! কিন্তু আমি যেই একটি সিগারেট ধরাব তোমার জুতো এত গরম হ'য়ে উঠবে যে তুমি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

কর্নেলকে ঐ ভাবে বললেন: "যেই আমি বলব 'হ্যালো'—তুমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠবে 'শাট্ আপ্'।"

সৈনিককে বললেন: "যেই আমি বলব 'স্ট্রাভিন্‌স্কি' তুমি নাচ সুরু ক'রে দেবে।"

এক থেকে দশ বলতেই ওরা তিনজন কথাবৎ জেগে উঠে ঘুমভাঙা ভঙ্গিতে চোখ মুছতে লাগল। তারপর ডাক্তার একথা সেকথা বলতে বলতে সিগারেট ধরালেন। অমনি নাবিক যুবকটি হন্তদন্ত হ'য়ে পা থেকে দুপাটি জুতোই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল—এক পাটি এসে দমাস ক'রে উৎপতিত হ'ল প্রেক্ষাগৃহে। ফলে দর্শকের হাসি অফুমেয়। সে-বেচারীর মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। ডাক্তার বললেন: "কী ব্যাপার?" সে বলল: "জুতোয় যে আগুন লেগেছে মনে হ'ল।"

তারপর যেন কথাচ্ছলে ডাক্তার সামনে উপবিষ্ট এক দর্শককে বললেন: "হ্যালো!" অম্‌নি কর্নেল বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকল: "শাট্ আপ্।" ফল—হাসির রোল। সে বেচারী লজ্জায় প্রায় আধমরা হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। ইন্দিরা বলতে লাগল—আমাদের পার্শ্ববর্তিনী কয়েকটি মহিলার সুরে সুর মিলিয়ে: "Poor man!"

তারপর কথায় কথায় ডাক্তার বললেন: "একজন মস্ত রুষ সুরকার স্ট্রাভিন্‌স্কি—"

বলতেই সৈনিক উঠে নাচ সুরু ক'রে দিল। কিন্তু দুপা নেচেই তার চৈতন্য

হ'ল—করছি কি?—অমনি সেও লজ্জায় অধোবদন। ঘরে হাসির সাড়া প'ড়ে গেল।

এরকম আরো কয়েকটি খেলা দেখালেন ডাক্তার। মনে হ'ল না কোনো জুয়াচুরি আছে—বা সাজানো সাক্ষীর কারসাজি—যাকে বলে—stooges; তবে তদন্ত না ক'রে জোর ক'রে বলা যায় না—ওরা তিনজন সত্যিই ডাক্তারের অজানা ছিল কিনা। ইংরাজিতে যাকে বলে "benefit of the doubt"—দিলাম—ডাক্তারকে।

* * *

ভাবলাম জগতের সেরা অভিনয় তো দেখেছি পারিসে ফরাসীদের অভিনয় শিল্পের, তথা বার্লিনে রুষ অভিনয়ের দৌলতে। আমেরিকান অভিনয়ও তো দেখা চাই—নৈলে তুলনামূলক সমালোচনা করব কী ক'রে?

যে-কথা সেই কাজ। দেখলাম তিনচারটি থিয়েটার। একটি নাটক, তুটি নাটিকা, একটি ডিটেক্‌টিভ গল্প।

মুস্কিল হ'ল এদের উচ্চারণে। আমেরিকান উচ্চারণ আমার স্বল্পশ্রুতি কানের পক্ষে বোঝা তুর্ঘট। অথচ ইন্দিরা দেখি বেশ বুঝতে পারে। তবে ভালো লাগল এদের রঙ্গমঞ্চের আলো দৃশ্য প্রভৃতি। পাশ্চাত্য নৈপুণ্য। বহু শ্রম স্বীকার করে এরা—মানতেই হবে। কিন্তু এদের নাটকে নাটকত্ব কোথায়? Drama of human emotions—এই-ই তো নাটকের উপজীব্য। এদের অধিকাংশ নাটকই—নাটিকা কমেডির তো কথাই নেই—যাকে বলে playing to the gallery, প্রগল্‌ভতায় ভরা। সিনেমা সম্বন্ধেও ঐ কথা। একটি মাত্র সিনেমা দেখে মুগ্ধ হলাম—চার্লি চ্যাপলিনের "লাইমলাইট"। মনে পড়ল শ-র কথা যে, চার্লি চিত্ররাজ্যে একমাত্র প্রতিভা, উত্তেজনার দক্ষযজ্ঞে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেব। করুণ মধুর হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনার অপূর্ব সমাবেশ! এ ছবিটি আর একদিন দেখতে যাবই যাব। এ হ'ল সত্যি একটি সৃষ্টির ওয়েসিস সিনেমার শুষ্ক মরুচরে।

দেখলাম এদের বহু নটনটীর নৃত্য "রেডিও সিটি"-তে। এটি হ'ল আমেরিকার সবচেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ। লণ্ডন পারিস বার্লিন কোথাওই বহরে এত বড় রঙ্গমঞ্চ কি প্রেক্ষাগৃহ নেই। কিন্তু হ'লে হবে কী, এখানে নটনটীর নাচ গান অভিনয় অতি হাল্কা—ছেপ্‌লা বললেও বেশি বলা হবে না। মনে পড়ে বেচারী আবু হোসেনের রাজবেশ—বাইরে থেকে দেখতে রাজা হ'লেও আসল

মানুষটা যে বেচারী, কাজেই কথায় কথায় লোক হাসায়—অ-রাজকীয় আচরণ ক'রে। কিন্তু কী অজস্র লোক যায় দিনের পর "রেডিও সিটি"-তে! দুদিন টিকিটই পেলাম না। শেষে সেই শোয়েবেল এলো হঠাৎ তারক হ'য়ে—যোগাড় ক'রে দিলো দুটি টিকিট। এখানে খানিকটা দেখানো হয় সিনেমা, খানিকটা অভিনয় বা নাচগান। মানে, পাঁচমিশেলি চিত্তরঞ্জন। সব রকম মানুষেরই তো চিত্তবিনোদন করতে হবে—তাই রেডিও সিটি বা রক্সির প্রবর্তন—খানিকটা ছবি, খানিকটা জীবন্ত মানুষের নৃত্যগীত, অভিনয়। রক্সিতে দেখলাম টাইটানিক জাহাজডুবি। ছবি তোলার বাহাদুরি আছে মানতেই হবে। সমুদ্রে সে কী বিশাল বরফের পাহাড় যার অভিঘাতে জগদ্বিখ্যাত টাইটানিকও ডুবল। দুহাজারের উপর যাত্রী ছিল, বাঁচল মাত্র সাত শ। শেষ মুহূর্তে সেই জাহাজ ডোবার ছবি—গায়ে কাঁটা দেয়। একটি শিশু তার পিতাকে ছেড়ে নৌকোয় গেল না, একটি বৃদ্ধা তার স্বামীর সঙ্গ ছাড়ল না। হৃদয় আর্দ্র হয় বৈকি। অবশ্য এসব এরা কল্পনা ক'রেই তুলেছে, তবে মনে রাখতে হবে—এই ধরনের সত্যিকার নাটকই অভিনীত হয়েছিল চল্লিশ বৎসর আগে—অকূল পাথারে। ড্রামা বটে। জাগতিক তুচ্ছতার ব্যাপক পটভূমিকায় থেকে থেকে হঠাৎ ফুটে ওঠে মানুষের মহত্ত্ব—যেমন অগাধ জলভেদ ক'রে ফুটে ওঠে তুঙ্গ নগাধিরাজ—অগুন্তি ঊর্মির কলোচ্ছলতাকে ব্যঙ্গ ক'রে! বলে: "তোমরা আসো যাও, আমিই একা আছি অনড় অকম্প:

লহরী তরল বাতাসে উছল আমি একা ধ্যানরত
অটল মহান্ রজনীবিহান—স্থিতি যে আমার ব্রত।"

জগতে চলমান তো সব কিছুই। আজকের দিনে মহত্ত্ব প্রায়ই উপহসিত না হোক অবাস্তব ব'লে গণ্য। তবু শিল্পকলার হাজারো তরল চপল ঠাটঠমক ছাপিয়ে থেকে থেকে দেখা দেয় মানুষের মহত্ত্ব। বিরল, কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই না অমল ধবল মহিমময়! চার্লি চ্যাপলিনের লাইমলাইটেও দেখা পেলাম এই মহত্ত্বের—প্রেমের স্থায়িত্বের, ত্যাগের মহিমার। তাই না হৃদয় সাড়া দিল। শুধু অভিনয়-নৈপুণ্যে কী হবে? অথচ এ-যুগের-মানুষ প্রায়ই বলে শুনি—অমুক ছবি চমৎকার—কী অপূর্ব অভিনয়ই করল অমুক তারকা! এ যেন বলা: "অমুক ওস্তাদ কী কণ্ঠসাধনাই করেছে—সুরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল গো!" টেকনিক বা আঙ্গিক কলার পূর্ণায়তির পক্ষে অপরিহার্য বটে, কিন্তু আঙ্গিকের উদ্দেশ্য তো রূপসৃষ্টি! কিসের রূপ? আমার মতন যাদের মন তারা বলবে

মহত্বের, মর্মস্পর্শী সৌন্দর্যের। কিন্তু এ-যুগের দুলাল যাঁরা তাঁরা বলেন অন্য কথা: আর্ট ফর আর্টস্ সেক। অর্থাৎ যদি ছেপ্‌লামিই হয় বিষয়বস্তু তবে চুটিয়ে ছেপ্‌লামি করো, যদি তাকে ফোটাতে পারো তবে সেই হবে চমৎকার। আমাদের ছাঁচের মন একথা নেয় না। বড় চিত্র, বড় কাব্য, বড় শিল্প মানুষের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেই ফুটিয়ে তুলবে—এই-ই আমাদের মনের সাধ ও তৃষ্ণা। সাধে কি গলসওয়র্দি সদীর্ঘশ্বাসে বলেছেন: "This is a vulgar age"—এ-যুগে চমকই হ'ল উপাস্য—মুখ্য, সুন্দর প্রবৃত্তি মহৎ প্রেরণা এরা নগণ্য যদি নাও হয়, গৌণ তো বটেই। তবু মহত্বকে ফোটাতে পারলে বহুলোকের মন আজো আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। নৈলে চার্লি চ্যাপলিনের লাইমলাইট কখনই এ-অকুলীন যুগেও জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পারত না। যাহোক মহত্বের এ-দুর্ভিক্ষের দিনে এ-দৃশ্য দেখে আরো ভালো লাগল—বিমর্ষ মনেও আশার ক্ষীণরেখা চিকিয়ে উঠল যে, তুচ্ছতা, নির্লজ্জ দেহ-উদ্‌ঘাটন ও ছেপ্‌লামির প্রতিপত্তি আজকের সিনেমা-থিয়েটারে ব্যাপক হ'লেও মানুষ হয়ত শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না—কারণ তার প্রাণের সুরে দেবত্বের যে-আগমনী গান সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ঝংকৃত হ'য়ে উঠে এসেছে, মহত্বের যে-চিরকাঙ্ক্ষিত আহ্বান আবহমান কাল তার পথের পাথেয় হ'য়ে এসেছে, সে-ডাকের উদাত্ত সামগান এসব নগণ্য প্রগল্‌ভ সুরের ঘর্ঘরকে ছাপিয়ে চিরদিনই অনুরণন তুলবে প্রতি হৃদয়বীণায়।

* * *

আমেরিকায় জীবন চলে দ্রুততর ছন্দে। বিরতি এরা শুধু যে জানে না তাই নয়—মানেও না। অর্থাৎ, চঞ্চলতা এদের কাছে পরিহার্য তো নয়ই, বরং উপাস্য। দৃশ্য বা অদৃশ্যভাবে এখানকার আকাশে বাতাসে চঞ্চলতার অগণ্য বীজাণু ছড়িয়ে। ইংরাজিতে একটি বিশেষণ আছে hectic—এখানকার জীবন সম্বন্ধে এর চেয়ে সত্যতর বিশেষণ ভেবে বা'র করা কঠিন। চুপ ক'রে ব'সে থাকাকে এরা জীবন্মৃত্যুরই সামিল মনে করে, এক আবর্ত থেকে মুক্তি পেলে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিতে ছোটে অন্য আবর্তে। রুথ রিঙ্গারের কথা বলেছি ইতিপূর্বে। সে রোজ যেচে, সাগ্রহেই আসত ইন্দিরাকে "মাসাজ" (massage) করতে। বাংলায় এর নাম মর্দন—অসুন্দর, কাজেই মাসাজ শব্দটিই প্রয়োগ করি। ও নানা নরনারীকেই মাসাজ দিয়ে চাঙ্গা ক'রে জীবিকা-উপার্জন করে। ইন্দিরারও এমনই ভক্ত হ'য়ে উঠল যে এক পয়সাও নেবে না—নিলে হয়ত

প্রত্যহ ইন্দিরার পক্ষে ওর সেবা গ্রহণ করা সম্ভবও হ'ত না—কারণ ওর প্রতি মাসাজ-এর ফী পাঁচ ডলার ক'রে—কিনা পঁচিশ টাকা। কিন্তু সে অন্য কথা। যা বলছিলাম। রুথের কাছে প্রায়ই শুনতাম আমেরিকানদের আমেরিকানিস্‌ম্ সম্বন্ধে নানা মন্তব্য। বলেছি—ও জাতিতে চেক্—প্রাগ থেকে এখানে এসেছিল হিটলার প্রাগ অধিকার করার ঠিক আগেই। তাই ও বিদেশিনী ব'লে আমেরিকা সম্বন্ধে ওর নানা মতামত আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হ'ত —আরো এই জন্যে যে মাসাজ করা ওর জীবিকা ব'লে বহু আমেরিকান মধ্য-বিত্ত, অভিজাত তথা চিত্রতারকার অন্তঃপুরের খবর ও পেত। ও বারটি অভিজাত-বিলাসিনীকে মাসাজ করে—যাদের জীবন শুধু জনারণ্যে ক্ষণসুখবিলাস শিকার ক'রে ফেরা। ও একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করল এক তুর্কী ভোজনালয়ে। সেখানে কথায় কথায় একটি ভারি চমৎকার মন্তব্য করল। ইন্দিরা বলছিল: "আমেরিকানরা ভারি চঞ্চল, শান্তি যেন আদৌ চায় না।" তাতে রুথ বলল: "আমার একটু অন্যরকম মনে হয়, যদিও মূলত আপনার কথা সত্য—কারণ স্বভাবে এরা চঞ্চল তো বটেই। কিন্তু শান্তি এরা যে ঠিক চায় না তা নয়—চায় খুবই। তাই ফী শনি রবি বারে এরা অনেকেই যায় জোড়ে জোড়ে মোটরে নিউয়র্কের কাছাকাছি নানা সুন্দর পার্কে বা বাগানবাড়িতে। কিন্তু যদিও যায় সেখানে একটু জুড়োতে, ফিরে আসে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে আরো তপ্ত হ'য়ে। হয়েছে কি জানেন? এরা শান্তি চায়, কিন্তু কোথাও শান্তির ছিটেফোঁটাও না পেয়ে অনভ্যাসের বশে তার স্বাদ ও শর্ত প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। তাই এরা ভাবে শান্তি বুঝি মিলবে অন্তহীন বৈচিত্র্য বা নূতনত্বের মধ্যে; এ-নূতনত্বের মধ্যে কিছু সুখ আছে বৈকি—কিন্তু সুখ স্থায়ী না হ'লে শান্তি নেই—তাই এখানে ওখানে একটু-আধটু সুখ পেলেও এরা স্থায়ী শান্তি পায় না কোনো কিছুতেই। বিদেশীরা হয়ত একটু পরিষ্কার দেখতে পায় এদের ভাবগতিক, এরা ভাবে যে, এরা ধাওয়া করছে সুখ থেকে সুখান্তরে। কিন্তু আমাদের মতন বিদেশীর চোখ দেখে কি, এরা খুঁজে বেড়ায় বৈচিত্র্যের পরিবর্তনশীল রঙ্গমঞ্চে নিত্যনতুন চমকের ক্ষণিক দোলা। এক কথায়, এরা এ-সুখ থেকে আর এক সুখে পৌছয় না, পৌছয় এ-চমক থেকে আর এক চমকে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়: এরা চায় সুখ, কিন্তু ভাবে স্নায়বিক উত্তেজনার রকমফেরে মিলবে সুখ বা সার্থকতা যাই বলুন।" ব'লে সবশেষে আবার বলল: "They travel not from joy but from distraction to distraction."

মন্তব্যটি মনোগ্রাহী, তাই এত ঘটা ক'রে বললাম। আরো এইজন্যে যে, এ-মেয়েটির সঙ্গে ইন্দিরার অন্তরঙ্গতা হওয়ার দরুন আমরা একটি সনাতন সত্যকে যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম। সেটি এই যে জীবনে দুঃখ যারা অনেক পেয়েছে তাদের চোখ খুলে যায় অল্পবয়সেই—দেখতে পায় অনেক কিছু, যা দুঃখ যারা বেশি পায় নি তারা দেখতে পায় না বা দেখেও দেখে না।

এখানে তর্ক উঠতে পারে—দুঃখ পায় নি কেই বা? জীবনের পথচলায় সুখের ফুলচয়ন করতে চায় সবাই, কিন্তু সুখের ফুলের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুঃখের কাঁটা অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে। মানি। তবু বলব য়ুরোপে, বিশেষ ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে, এ-কাঁটা এমন অনেক অচিন্ত্য যমযন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে অন্তত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। একথা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো হয়ত একটু কঠিন, কিন্তু রুথের জীবনকাহিনীর মধ্যে দিয়ে মনে হয় সহজেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে। তাই একটু বলি ও ইন্দিরাকে যা বলেছিল। খুব সংক্ষেপেই বলব।

ওরা থাকত প্রাগে। চেকোস্লোভাকিয়া ছিল সে-সময়ে মিত্রশক্তির তরফে। তাই হিটলার প্রাগ আক্রমণ করতেই রুথ চ'লে এসেছিল ইংলণ্ডে, পরে আমেরিকায়। কিন্তু সবাই তো দেশ ত্যাগ করতে পারে নি, তাই ওর পরিবারের আর সবাই ছিল ওখানেই। ওরা ইহুদী এ-খবর নাজিদের গোচর হ'তে না-হ'তে ওর বাপ মা ও ভাইকে বন্দী করা হয় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। ওর বাপকে প্রথমেই ওরা গ্যাস দিয়ে শ্বাসরোধ ক'রে মারে। ওর মা ও ভাই বহু কষ্টে কয়েদীর মতন কিছুদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু অত্যাচার, হাড়ভাঙা খাটুনি অথচ আহার নেই, কাজেই ক্ষুধার যন্ত্রণায় ওর মা ও ভাই দিনের পর দিন মৃত্যু-কামনা করত। ওর ভাই নিজের খাবার থেকে কিছু কিছু মাকে দিত—নাজিরা তাও বন্ধ ক'রে দেয়। ফলে একদিন ওর মা ক্ষুধায় অধীর হয়ে পড়ায় ওর ভাই এক টিন সুপ চুরি ক'রে এনে মাকে দেয়। নাজিরা জানতে পেরে ওদের দু'জনকেই শাস্তি দেয়—প্রাণদণ্ড, গ্যাসে-ভরা ঘরে ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ ক'রে মারে।

ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। খানিকটা যেন বুঝবার কিনারায় আসি কেন ভলটেয়ার বলেছিলেন: "The more we see dogs, the less we like men." জগতে দুঃখের অবধি নেই। সভ্য মানুষ নানান্ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে প্রকৃতিকে তাঁবেদার ক'রে এ-দুঃখকে খানিকটা জয় করেছে বটে, কিন্তু তবু

আমাদের নিহিত অসভ্য প্রবৃত্তিগুলি বুঝি আজো তেম্‌নিই আছে—যুদ্ধবিগ্রহের বিস্ফোরণে তারা বেরিয়ে পড়ে নগ্ন হ'য়ে—এই মাত্র। আর কোন্ টীকা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে মানুষের এ-দুর্বোধ্য রাক্ষসী প্রবৃত্তিকে ?

রুথের কাহিনী শুনতে শুনতে একটা কথা মনে হ'ত প্রায়ই: খবরের কাগজে এ-সব অত্যাচারের কাহিনী যখন পড়ি তখন আমাদের মন ঘা খেলেও ঠিক বিকল হয় না। কিন্তু যাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি জেনেছি, দিনের পর দিন সেবা ও প্রীতির ডালি উপহার দিয়ে যে খানিকটা আত্মীয়ার পর্যায়েই প'ড়ে গেছে, তার মুখে এসব কাহিনী শোনা যেন খানিকটা নিজের অভিজ্ঞতার কোঠায়ই পড়ে। রুথ এখানে একলাই থাকে—এখানে ওখানে মাসাজ ক'রে জীবিকা উপার্জন করে। ইন্দিরার স্নেহ পেয়ে ও যেন ধন্য হ'য়ে গেছে। দিনের পর দিন কত ভাবে যে আমাদের ও সেবা করত সে কী বলব! ফলে স্বতঃই ওর দুঃখে আমরা বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলাম। একদিনও ও ইন্দিরার সেবা থেকে রেহাই চায় নি—রোজ এসে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ইন্দিরাকে মাসাজ করত, যার ফলে ইন্দিরার স্বাস্থ্যের অনেকখানি উন্নতি হয়েছিল। অথচ প্রতিদানে ওর জন্যে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারি নি। ও কত কথাই বলত নিজের জীবনের! সে সব লিখতে বাধে। শুধু এইটুকু বলি যে এত দুঃখের পরেও কোনোদিনই ওর মুখে প্রফুল্ল হাসিটির অভাব দেখি নি। আমাদের ও কত রকম উপহার দিত—দিনের পর দিন ফলের রস এনে ইন্দিরাকে ও আমাকে নিজে হাতে খাওয়াত, আমাদের চিঠিপত্রের তদারক করত, বাজার করে দিত—কত কী! ভাবি—মানুষ যখন স্নেহ পায় তখন তার কী সুন্দর রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে বিনা প্রয়াসে! আমাকে ও ইন্দিরার ঢঙে "দাদা" ব'লেই ডাকত। সত্যিই ওকে মনে হ'ত দুঃখিনী, পরোপকারিণী, স্নেহশীলা ছোট বোন। দেশ কাল ভাষার ব্যবধানকে কাটিয়ে অহেতুক স্নেহ প্রীতি আমাদের টেনে এনেছিল কত কাছে এবং কত সহজে! অবশ্য এর একটি কারণ—ওর স্বভাবনিহিত ধর্মপিপাসা। ও সত্যিই চাইত আধ্যাত্মিক জীবন। হয়ত তাই ও ইন্দিরাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলেছিল—স্বাদ পেয়েছিল তার আধ্যাত্মিক সত্তার ও পুণ্য চরিত্রের।

আমেরিকায় ঠিক এভাবে না হোক নানা ভাবেই নানা নরনারী করেছে আমাদের আনুকূল্য। সবাইকার কথা বলার সময়াভাব—স্থানাভাবও বটে। তবু আর একজনের কথা বলব—না বললেই নয়। এর নাম মিসেস এলেন প্লানটিক। ও শুধু যে ধনশীলা তাই নয়—একজন সত্যিকার অভিজাতবংশীয়া

মহিলা। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কন্যাদের সখী। বিধবা হয় বহু বৎসর আগে। রূপা কিন্তু আর বিবাহ করে নি। ওর মধ্যে ছিল আবাল্য গভীর ধর্মতৃষ্ণা। আমাদের দেখে ও আকৃষ্ট হ'য়ে এসেছিল কাছে। বলত নিজের জীবনের কত কথাই যে! দুঃখ পেয়েছে অনেক। কিন্তু সে সব বেদনার মধ্যে দিয়ে ওর ভাগবতী ভক্তি আরো বিকশিতই হ'য়ে উঠেছিল। আমার Sri Aurobindo Came To Me বইটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্বে ও এতই মুগ্ধ হয় যে দিনের পর দিন আসত তাঁর কথা শুনতে। এই সূত্রে ওর সঙ্গে আমাদের একটি গভীর স্নেহ-সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল। ও আমাদের আদর্শে সাড়া দিয়েছিল মনে প্রাণে। তাই যেদিনই আসত কিছু কিছু প্রণামী দিত। অর্থ এমন কিছু বড় কথা নয়, কিন্তু একটা কথা মনে হয় প্রায়ই—যে, অর্থ যারা দেয় তারা সব সময়ে না হোক অনেক সময়েই একটি আদর্শের টান অনুভব করে ব'লেই হাত উপুড় করতে পারে। অন্য ভাষায়, দান প্রমাণ করে মানুষের আন্তরিকতাকে। অনেক স্থানেই দেখেছি যারা কোনো মহৎ আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হয় ও তার জন্যে দিতে পারে দশগুণ, তারা সিকির সিকিও দান করে না। সে সব ক্ষেত্রে সন্দেহ আসে তারা সত্যিই কি চায় কোনো বড় আদর্শের সহায় হ'তে ?

কিন্তু এ-প্রসঙ্গ থাকুক। এলেন যে আমাদের বার বার অর্থানুকূল্য করেছিল এজন্যে ওর সহৃদয়তাকে স্বীকার ক'রেও বলব যে ওর সব চেয়ে বড় দান হ'ল ওর অহেতুক শ্রদ্ধা ও প্রীতি। ইন্দিরার কাছে ও প্রায়ই আসত উপদেশ নিতে—আর সে কী সহজ বিনয়ে! (দু'দিন যেতে না-যেতে বলল: "আমি তোমাদের বোন দিলীপ, আমাকে নাম ধ'রেই ডাকবে।") অথচ শিক্ষায় বা আভিজাত্যে ও কারুর চেয়েই কম নয়—ধনের তো কথাই নেই। তবে আমেরিকায় এহেন অভিজাত মহিলার সঙ্গে এত নিকট-সংস্পর্শে আমরা বড় বেশি আসি নি।

* * *

নিউয়র্কে যে-হোটেলে আমরা ছিলাম সেটি সত্যই চমৎকার। অথচ চার্জ অত্যধিক নয়। এ-হোটেলে লিফ্‌টম্যান, দ্বারপাল, চেম্বারমেড প্রভৃতি সবাই আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করত। ইন্দিরা সহজেই ভাব ক'রে নিতে পারত পরিচারক পরিচারিকাদের সঙ্গে। এখানকার পরিচারক পরিচারিকারা—বিশেষ ক'রে হোটেল রেস্তরাঁ বিপণি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের—যখন কাজ শেষ ক'রে বাইরে বেরোয় তখন তাদের বেশভূষা দেখে বলবার উপায়

নেই যে তারা সেবক জাতের লোক। এর একটি কারণ—এদের বেতন। আমাদের হোটেলের দ্বারপাল একদিন ইন্দিরাকে বলল: "আগামী সপ্তাহে আমার ছুটি নিতে হবে, নতুন মোটর কিনেছি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেরুনো হয় নি ক'দিন।" আমাদের ঘরের পরিচারিকা মেরি—চেম্বারমেড—ভারি চমৎকার মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আইরিশ আমেরিকান। হাসতে খুব ভালোবাসে। আমরা তাকে দূরে দূরে রাখতাম না। ধর্মে ও ক্যাথলিক। তাই ইন্দিরাকে ধর্মসম্বন্ধে রকমারি প্রশ্ন করত। ওর সমাধি হয় শুনে মুগ্ধ হ'য়ে একদিন বলল: "তুমি যে-রকম ধার্মিক, যদি ভার্জিন মেরিকে ডাকো তবে নিশ্চয় তাঁর দেখা পাও।" ও অবাক হ'ত শুনে যে আমরা কৃষ্ণকে ভক্তি করা সত্ত্বেও ভার্জিন মেরির প্রতি বিরূপ নই। খুব মন দিয়ে শুনত ইন্দিরার বসুধৈবকুটুম্বিকা বাণী। ক্যাথলিক ব'লেই বোধহয় ইন্দিরার ঔদার্যে ও এতটা অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল—বিস্ফারিতনেত্রে বলত একে ওকে তাকে: "She is a holy person." আমাকে ডাকত "দাদা" ব'লে। একদিন ওর পাশ দিয়ে চ'লে গিয়েছিলাম অন্যমনস্কভাবে। তাতে ওর সে কী অভিমান! "দাদা আমাকে 'গুড মর্নিং' বললেন না!"

ও আমাদের আয়র্লণ্ডে নিমন্ত্রণ করেছে। বলল: "নিশ্চয় এসো আমাদের ওখানে।" ওর স্বামী মারা যায় ডাবলিনে। ও উড়ে যাচ্ছিল সেখানে খবর পেয়ে যে তাঁর অসুখ—কিন্তু ঠিক তার আগেই তার এল যে সব শেষ হ'য়ে গেছে। এজন্যে মনে ওর বড় ব্যথা আছে। ইন্দিরার কাছে সমবেদনা পেয়ে তাই তো ও আমাদের আরও কাছে এল।

আমরা ওর সঙ্গে আত্মীয়ের মতনই ব্যবহার করতাম। ও-ও সহজেই আমাদের সৌহার্দ্যকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এর একটি প্রধান কারণ আর্থিক সাচ্ছল্য। কথাটা বলি একটু গুছিয়ে। বলবার ম'ত।

অর্থ অনর্থের মূল বলে আমাদের শাস্ত্রে। বেশি অর্থ আনে অশান্তি, মনঃকষ্ট—কত কী! অনেকে যতই অর্থ পায় ততই চায় আরো অর্থাগম—হ'য়ে ওঠে কৃপণ। অবশ্য কেউ কেউ মুক্তহস্তও হয়, কিন্তু অত্যধিক অর্থাগমে মনের যে প্রায়ই স্বাস্থ্যহানি হ'য়ে থাকে একথাটা এত জানা যে, বোধহয় খানিকটা অকুতোভয়েই বলা চলে।

অন্য দিকে, অর্থের অনটনও মানুষকে দমিয়ে দেয় বৈ কি! যে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে তার মনে সহজেই জেগে ওঠে আত্মসম্মান-বোধ।

এদেশের শ্রমিক সেবক পরিবেষক বর্গীয় সবাইয়ের মধ্যে তাই প্রায়ই দেখা যায় বেশ সহজ ঋজু চলন বলন। কাউকেই অত্যধিক সমীহ করা এদের ধাতে নেই। ভালোই, কারণ অত্যধিক সমীহের ভাব প্রায়ই আনে এক ধরনের শঙ্কাত্রস্ত অবসাদ। মেরি এ-হোটেলে দিন পিছু আট ডলার রোজগার করে—মানে, মাসে বারশো টাকা। আমরা যে-অটোমাটে খাই ও-ও সেখানে খেতে যায়। যদি একদিন আমাদের টেবিলে এসে বসে তো আমরা ওকে বেশ সহজেই বরণ ক'রে নেব। হোটেলের কর্তা ও পরিচারিকাকে এক টেবিলে ব'সে খেতে দেখেছি প্রায়ই। হোটেলের ক্রোরপতি কর্তাকেও দরকার হ'লে ভ্যাকুয়াম-ক্লীনার-হাতে ঘর ঝাঁট দিতে দেখেছি। দৈহিক শ্রম এখানে হেয় নয়—কেউ তার জন্যে লজ্জিত হবার কথা ভাবতেও পারে না। তাই মেরির বা অন্য পরিচারকদের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা হ'তে বাধে না। শুধু আমরা নই—অভিজাতবংশীয়া এলেনের ওখানে একদিন নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। ওর বাটলারের সঙ্গে দেখলাম রসিকতা করতেও ওর বাধল না। বলতে কি, ঠিক অভিজাত বলতে ইংলণ্ডে যা বোঝায় এখানে সে-শ্রেণীর কৌলীন্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। ইংলণ্ডে করোনেশন নিয়ে যে-তুমুল কাণ্ড হ'ল এখানে সে-ধরনের ধুমধাম শুধু যে অসম্ভব তাই নয়—অকল্পনীয়। কারণ এখানকার আবহাওয়ায় শুধু মধ্যবিত্ত নয়, পরিচারক জাতীয় লোকের মনে—যাদের আমরা বলি শূদ্র—একটা এমন ঋজু ভাব কায়েম হ'য়ে গেছে যে তারা কিছুতেই কোনো রাজকীয় তখমা বা বেশভূষাকে দেখে ত্রস্ত হ'য়ে সেলাম করতে পারবে না। ইন্দিরা সর্বত্র এদের ডিমক্রাসির এই ঋজুভাবটির মুক্তকণ্ঠেই প্রশংসা করত। ডিমক্রাসি আরো অনেক দেশেই আছে। আদর্শে ও যে-বস্তু, কার্যক্ষেত্রে যে ঠিক তা নয় একথার ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তবু বলব—ডিমক্রাসির মূল সূত্রগুলি জগতের প্রায় সর্বত্রই, থিওরিতে অন্তত, সবাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ডিমক্রাসি আমেরিকায় যতখানি সহজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ও জাতীয় মনে যেভাবে চারিয়ে গেছে সে-ভাবে আর কোথাও যায় নি, গেলে ইংলণ্ডের মতন রাজ্যেও করোনেশনের উপলক্ষে এতবড় ব্যাপক জাতীয় প্রহসন সংঘটিত হ'তে পারত না, বা আমার এক ইংরাজ বন্ধু সগর্বে লিখতেন না যে তিনি দশ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন সাম্রাজ্ঞীর রথ একটিবার দেখবার লোভে। এদেশে যে এহেন প্রহসন অভিনীত হ'তে পারে না একথা ভাবলে আমেরিকার জাতীয় মনের ঋজুতার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব না এসেই পারে না। এ-সম্পর্কে আমার তরুণ

আমেরিকান বন্ধু জনের একটি চিঠি উদ্ধৃত ক'রেই এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানব। লস এঞ্জেল্‌স থেকে ও লিখল :

"The Coronation in Britain was fascinating to watch over the television. But also it was very revealing. We, in this country, long ago did away with such pomp and pageantry in the drive to revolutionize society and promote equality among our citizens. Here you will not see, perhaps, such perfect *decor* or action or ceremony performed by so many 'correct' political leaders as in Britain. For our leaders rise up from the ranks of the common man and their political expressions are franker, closer to humanity's more vital, basic instincts. But those expressions are motivated by a deep realization that 'the life of kings' belongs to all men—not a select few and, feeling this, we are often impatient with the rest of the world in its slow struggle to achieve equality and a better life for its inhabitants."

বাইরে থেকে যাঁরা আমেরিকাকে দেখেন—দেখেন তার হাজারো ত্রুটি, প্রগল্‌ভতা, বৈশ্যবৃত্তি—তাঁরা হয়ত এ-ধরনের কথাকে দেশভক্তির উচ্ছ্বাস ব'লেই ভিশমিশ ক'রে দেবেন। কিন্তু গড়পড়তা আমেরিকানের মনে এ-ধরনের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়মূল যে, তারা সমাজে ইতিমধ্যেই সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলেছে। ইংলণ্ড ফ্রান্স জাতীয় অভিজাতবংশোদ্ভব ক্রিটিক্‌রা যেমন আমেরিকার হাঙ্কামি ও অর্থাসক্তিকে ডলারপূজার আনুষঙ্গিক ইতরতা ব'লে অবজ্ঞা করেন, আমেরিকার উত্তমীরা সে-কটূক্তিকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দেয়—তাদের সাগরপারের পূর্বপুরুষদেরকে মেকি-মান-সম্বল দেউলে স্থবির নাম দিয়ে। ত্রিশ বৎসর আগে যখন আমি প্রথম ইংলণ্ডে ও কন্টিনেন্টে ভ্রমণ করি তখন ওদের প্রাণশক্তি দেখে অবাক মেনেছিলাম। কিন্তু আমেরিকার প্রাণশক্তির উদ্দাম রূপ দেখে আর সব দেশের প্রাণশক্তিকে মনে হয় স্তিমিত না হোক ফিকে, অনুজ্জ্বল। গণতন্ত্র সম্বন্ধেও বুঝি ঐ কথা। ডিমক্র্যাসি থিওরিতে প্রায় সব পাশ্চাত্য দেশেই গ্রাহ্য হ'লেও কার্যত কোথাওই আজ পর্যন্ত মানুষ পুরোপুরি মাথায় সমান হ'তে পারে নি। জাতিভেদ এখনো পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র দৃঢ়মূল। খানিক আগে বলেছি, সর্বদেশেই আয় যার খুব বেশি তার জাত, কিনা কৌলীন্য, আয় যার কম তার চেয়ে উঁচুতে। কিন্তু সব মেনেও তবু বলব যে, আমেরিকায় একটি মনোভাব ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে যার মূলে সাড়ে পনর আনা না হোক

বার আনা সত্য আছে। সে-মনোভাবটি এই যে, একজন মানুষ আর একজন মানুষের সামনে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়াবে না বা নিজের জীবিকা-অর্জনের কোনো নীতিসম্মত রীতির জন্যেই সর্বসমক্ষে লজ্জিত বোধ করবে না। সেদিন এক ইংরাজ এঞ্জিনিয়রের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তিনি একটি কথা বললেন বেশ, মনে লাগল। তার মর্ম এই যে, ইংলণ্ডে এখনো সমাজে নানা থাকের মধ্যে সীমারেখা সুপ্রতিষ্ঠিত : যে মুদী সে কিছুতেই ডাক্তারের সঙ্গে সমান সমান কথা বলতে পারবে না, ডাক্তার কিছুতেই কোনো ডিউককে সমীহ না ক'রে পারবে না—ইত্যাদি। কিন্তু আমেরিকায় অর্থের প্রতিপত্তি আর সব পূজার দাবিকে বাতিল করে দিয়েছে। এখানে শুধু দু'টি থাক আছে : ধনী ও নির্ধন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতি নির্ধনের সামনেই ধনার্জনের রাস্তা সমান খোলা, আর যেদিন সে এ-খোলাপথে নিপুণ ভাবে চলতে শিখে টাকার টাঁকশালে পৌঁছলো সেই দিনই সে তৎক্ষণাৎ সর্বত্র স্বাগত ও সমাদৃত। শুধু তাই নয়, টাকা যার কম সে যদি বেশি উপায় করতে নিজের পদবীর নিচে নামে তবে তাকে কেউই হীন মনে করে না। যে-ইংরাজ কুলীন এসেছিলেন এদেশে তাঁকে তাঁর এক আমেরিকান বন্ধু কয়েকটি চিঠি দিয়েছিলেন নিউয়র্কে নানা চিন্তাশীল লেখক-জাতীয় আমেরিকানের সঙ্গে দেখা করতে। এঁদের মধ্যে একজন বেশ নামকরা লেখক। তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা করতে গিয়ে ইংরাজ তো থ : শুনলেন লেখক সন্ধ্যায় থাকেন এক ড্রাগ-স্টোর্স-এ, দিনে —লেখেন, এইভাবে দাওয়াইখানার কাজকর্ম দেখাশুনো ক'রে বেশ দু'পয়সা ঘরে আনেন। আরো আশ্চর্য এই যে এতে তাঁর লেখক বন্ধুরা কেউই ঘা খায় নি —যেমন খেত যদি ইংলণ্ডে কোন লেখক এ-বৃত্তি অবলম্বন করত। হয়েছে কি, এখানে, মানে আমেরিকায়, আদর্শ সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লেও, মানুষের মর্যাদা যে তার জীবিকার্জনের রীতির উপর নির্ভর করে না একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। তাই শূদ্রজাতীয় নাগরিক এদেশে ক্ষাত্র বা বৈশ্যবংশীয় কাউকে দেখলে আর মাথা হেঁট করে না।

কেবল এক দুঃখ জাগে : যে, ব্রাহ্মণ এখানে নেই আর। ইংলণ্ডের মতন অকেজো রাজা বা রাণী নেই এজন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলতে হিন্দু যা বোঝে—জ্ঞানের ধর্মের ধ্যানের পূজারী—সে-জাতির উচ্ছেদে পরিণামে মানুষের কখনই মঙ্গল হ'তে পারে না। এখানকার বুদ্ধিবাদী যাঁরা তাঁরা হাজার মস্তিষ্কচর্চা করুন না কেন, অর্থকে অবজ্ঞা করার কথা ভাবতেও পারেন

না। দরিদ্র হবার কথা মনে হ'তে না-হ'তে তাঁরা শিউরে ওঠেন। স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং ও বিলাস ক্রমাগত বাড়িয়ে-চলা যে পরম শুভ এ-বিষয়ে কারুর মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাই এদেশে বিলাসের উপকরণ যতই বাড়ছে গণমন ততই হৃষ্ট হ'য়ে উঠছে, বলছে: "দেখো দেখো, কী প্রগতিই না হ'তে চলেছে দিনে দিনে! জীবনের যে-সুখসুবিধা ও বিলাসব্যবস্থা আগে রাজারো কাছে দুর্লভ ছিল আজ সে-সুখাগম হয়েছে গড়পড়তা মানুষের জীবনে! পশ্য ভো বৈভবং হি নঃ।"

কথাটা হয়ত এরা একটু বেশি জাঁকালো—এমন কি ঝাঁঝালো সুরেই—বলা সুরু করেছে, বিশেষ ক'রে হাল আমলে। কিন্তু তাই ব'লে বলা যায় না যে এ-দর্পঘোষণার ষোলো কড়াই কানা। মানে, একথা মানতে বাধা নেই যে বিজ্ঞান, যান্ত্রিকতা ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ তার বাহ্যজীবনে এমন অনেক সুখসমৃদ্ধির আমদানি করেছে যাকে বাঞ্ছনীয় ব'লে অঙ্গীকার করতেই হবে। কেবল মানুষের নিয়তি প্রায়ই হাসেন পরিহাসের হাসি—তাকে সুখের অজস্র উপকরণ দিয়েও শান্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে খেলেন লুকোচুরি—যার ফলে সে কায়াকে ধরতে গিয়ে ধরে ছায়াকে, সুখ থেকে যা পাবে মনে করে, সুখ পেতে না-পেতে সেই আসল বস্তুটিরই দিশা খুইয়ে হ'য়ে ওঠে হুতুশে। আমাদের অনেক দার্শনিক এই পেতে-পেতে-না-পাওয়ারই নামকরণ করেছেন মায়া। অথচ মুস্কিল এই যে, মায়াকে মায়া ব'লে চিনেও ছায়া যে কায়া নয়, একথা মানতে মানুষ বেগ পায়। তাই সে যখন অন্তরে বেশ বোঝে যে অমৃতসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না ছায়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করলে, তখনো সে ছায়ার মায়া-নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করার মতন মনের জোর মনের মধ্যে খুঁজে পায় না। তখন কী হয়? না, যাতে সুখ পাচ্ছে না তাকেই সে আরো আঁকড়ে ধরে। এরই নাম অন্ধ আসক্তি—মায়ার প্রধান বাহন। এর চরম সমাধান জ্ঞানে, যার দিশা দিতে পারে কেবল সাত্ত্বিক বৈরাগ্য, কি না অনাসক্তি। কিন্তু অনাসক্তির অন্য নাম বাসনাবর্জন, অথচ বাসনাই মানুষের ঐহিক জীবনের মূল উপজীব্য। কাজেই সে ভাবে বাসনার ভিত ছাড়লে দাঁড়াবে কোথায়? এই ভয়ই হ'ল ঐহিক আসক্তির জনয়িতা, নৈলে বাসনা-বিসর্জনকে মানুষ এত ডরাত না। কিন্তু বিলাসের মোহ একবারে পেয়ে বসলে তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া সহজ নয়, কাজেই সুখশান্তি না পেয়েও সে বিলাসকেই ফাঁপিয়ে তোলে, ভাবে মুক্তি তথা আনন্দের এ-ছাড়া আর পথ নেই। আমেরিকার বিলাসবাহুল্য দেখে

একথা আমাদের বারবারই মনে হ'ত, কিন্তু একথা ওদের কাছে বলবার মতন ক'রে বলাও কম কঠিন নয় যেহেতু—ঐ যে বললাম—মোহ যখন মনকে চেপে ধরে তখন নির্মোহকে সে শূন্যচারণ মনে না ক'রে পারে না।

কিন্তু এ-ধরনের তত্ত্বকথায় মানুষ আজকের দিনে কান না দিলেও একদিন তাকে কান দিতেই হবে। কেন না তর্কাতর্কির শেষ না থাকলেও দুঃখকষ্ট বাড়তে বাড়তে মানুষকে এমন একটি অবস্থায় এনে ফেলে যখন তাকে আবার গোড়া থেকে ভাবতে সুরু করতেই হয়—এ-মূল প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতেই হয় যে, চলেছি কোথায়? কিন্তু এখনো বোধকরি মানুষের দুঃখকষ্ট সে-প্রত্যন্ত সীমায় পৌঁছয় নি যে-সীমায় পৌঁছলে মানুষের গোড়াকার প্রশ্নগুলি নিয়ে গোড়া থেকে ভাবতে সুরু করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সে-দিন—Zero-hour—প্রত্যাসন্ন যেদিনে মানুষকে বলতেই হবে যে বাহ্য জীবনের সুখসমৃদ্ধিবর্ধন বাঞ্ছনীয় হ'লেও কেবল সুখের শিকারে ফিরলে মেলে না মণির মণি, কেন না স্থায়ী শান্তি বাইরে নেই, অন্তরেই তার অধিষ্ঠান।

কিন্তু তা ব'লে একথা বলব না যে, মানুষ তার বাহ্যজীবনকে সমৃদ্ধ করতে চেয়ে নিছক ভুল পথেই চলেছে। আসল কথা হ'ল এই যে, আত্মদর্শনের পরে সবই সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে। বলতে কি, বাহ্য ভোগ সত্য হ'য়ে ওঠে কেবল তখনই—যখন অন্তরে উপস্থিত হয় পরমার্থের প্রসাদ। তখনই মানুষ বলে—যা কিছু দেখছি সবই উদ্ভাসিত করছে বিশ্বের নিহিত মাধুর্যকে: "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু—অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু"—এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু—যা কিছু দেখি সবই 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্'।"

কিন্তু অন্তর যতদিন পরমার্থের এ-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত থাকে ততদিন সে সুখ হ'তে সুখান্তরে মিথ্যেই ঘুরে মরে সার্থকতার অন্বেষণে—যে-খেদ খৃষ্ট মন্ত্রায়িত ঝঙ্কারে গেয়েছিলেন সে কবে—"বাইরের জগৎকে হাতে পেয়ে কী ফল যদি না অন্তরে মেলে আত্মার প্রসাদ?"

কিন্তু এ-কথা জানবার মতন ক'রে জানবার জন্যেও বোধহয় মানুষের দরকার ছিল ভোগের শিকারী হওয়া—অন্তত ততদিন পর্যন্ত যতদিন না ভোগে তার আসে বিতৃষ্ণা। তাই পাশ্চাত্য জগৎ—যার শীর্ষে আজ আমেরিকা—এই পরীক্ষা করছে তার সমগ্র অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের মন্ত্রণায়। করুক এ-পরীক্ষা। কে বলবে—প্রকৃতি ও লীলাময় তাকে দিয়ে এ-পরীক্ষা করাচ্ছেন না

ভ্রান্তি থেকে অভ্রান্তির আলোয় উত্তীর্ণ করতেই? ব্যাস বলেন নি কি: "কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা—পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ"—বা, পরমহংসদেবের ভাষায়, "ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা হয় না।" তাই এ-তত্ত্বকথার সমাপ্তি টানি শুধু এইটুকু ব'লে যে আমেরিকা নিচের মানুষকে টেনে উপরে তুলবার প্রয়াসে এবং জনসাধারণকে মানবতার ভিত্তিতে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় অন্য সব দেশের চেয়ে কীর্তিমান হ'লেও * আধুনিক জীবনে মনে হয় খতিয়ে শান্তির চেয়ে বেশি এনেছে অশান্তি, যদিও সেই সঙ্গে একথাও মানতেই হবে যে আরামের বহু সাজসরঞ্জাম রচনা ক'রে সে মানুষের দৈহিক জীবনকে অনেকখানি মুক্তি দিয়েছে হাজারো অসুবিধার চাপ থেকে। এক এক সময়ে মনে হয় যে হয়ত শান্তি বেচেই এরা কিনেছে এসব বিলাসপণ্য। তবে এ-সম্বন্ধে জোর ক'রে কোনো কথা বলতে বাধে। কেন না যে-দুর্দম্য শক্তিকে সংঘবদ্ধ ক'রে এরা মানুষের দৈনিক জীবনে বহুল সুখসুবিধা বহন ক'রে এনে দিয়েছে সে-শক্তির শুভ পরিণাম সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া অসম্ভব হ'লেও—সে-শক্তির অনলস প্রয়োগ-কৌশল তথা সৃষ্টিমূলক প্রেরণাকে নিন্দা করলে ভুল হবে। তামসিকতার চেয়ে রাজসিকতা ভালো। মানি—রাজসিকতার মধ্যে এমন অনেক দুষ্প্রবৃত্তি ছাড়া পায় যা তামসিকতার মধ্যে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে সুপ্তবৎ বিরাজ করে, কিন্তু একথা মেনে নিয়েও সত্যের খাতিরে অঙ্গীকার করতেই হবে যে, তামসিকতার চেয়ে রাজসিকতা বিকাশে মহত্তর ব'লে তামসিক আরামের চেয়ে রাজসিক অস্বস্তিও শ্রেয়ঃ।

কিন্তু ততঃ কিম্:—জিজ্ঞাসা আসে যখন সাত্ত্বিকতার প্রশ্ন হানা দেয়। রাজসিক মনোবৃত্তি অশ্রান্ত উদ্যমী, অনন্ত কৌশলী—কিন্তু মন্ত্রী ছাড়া রাজ্য চলে না, সাত্ত্বিক মন্ত্রীর মন্ত্রণায় যদি সে না চলে তবে সে ঝুঁকবেই আসুরিকতার দিকে, আর তখন আসুর মনোভাব উড়ে এসে জুড়ে ব'সে হবেই তার দিশারি, মন্ত্রদাতা। আমেরিকার রাজসিকতার রাজ্যে দু'টি প্রধান অসুর আজ মন্ত্রী হ'তে চলেছে: অর্থ ও লালসা। কেবল ভোগের অগ্নিতে নব নব উদ্ভাবনের ইন্ধন যোগানো, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিরন্তর উপকরণবৃদ্ধি, সর্বোপরি, নারীকে সর্বত্র

* রুষদেশে আমি যাই নি, তাই রুষদেশ সম্বন্ধে কোনো কথা লিখব না—ওদেশের মতিগতি ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে শুধু বই প'ড়ে মতামত প্রকাশ অবাঞ্ছনীয়।

লাগানো মানুষকে মোহিত করতে। নারী স্বাধীন হ'তে চলেছে সব দেশেই। শিক্ষার সব অলিগলি রাজপথেই সে আজ পুরুষের সহচারিণী। এতে আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু যখন দেখি তার রূপকেও ক্রমাগত ব্যবসায়ীর ব্যবসার কাজে লাগানো হচ্ছে ব্যাপকভাবে ইন্দ্রিয়লালসার সমিধ্‌রূপে, তখন মন কিছুতেই সায় দিতে পারে না যে এই পথেই মুক্তি মিলবে।

তবে হয়ত এ-ও ছদ্মবেশে মানুষের জীবনযাত্রার আর একটি পরীক্ষা। ক'রে দেখুক এপথে চলতে চলতে শেষে সে কোথায় পৌছয়। আদর্শলোকে নারী আমাদের দেশে ছিল সহধর্মিণী। এদেশে হ'তে চলেছে সহযাত্রিণী, ক্রমশ সর্বসঙ্গিনী, শেষে দাঁড়ালো বিলাস-ব্যবসায়ের প্রধান নটরঙ্গিণী। দেখা যাক এ-বণিক্‌তন্ত্রের সর্পিল সরণীতে ওরা পৌছয় কোন্ পরম সার্থকতার গোলোকধামে।

* * *

গান মানুষকে নানাভাবে অভিভূত করে একথা সবাই জানে। কিন্তু বিদেশী গান শুনে একটি সঙ্গীতজ্ঞ যুবক এখানে যেভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন ঠিক সেভাবে কাউকে অভিভূত হ'তে দেখিনি এ-পর্যন্ত। ওর নাম রিচার্ড মিলার। স্বভাব অত্যন্ত লাজুক। কিন্তু সত্যিই ওর মুখ দেখলে মায়া হয়। বয়স বছর তেইশ চব্বিশ হবে। দুর্দম্য অভীপ্সা—স্বরকার (composer) হবেই হবে—না হ'লেই নয়। বরাবরই ওর এ-অভীপ্সা ছিল। এখানে ভারতীয় গান শুনে শুধু এ-অভীপ্সা আরো জেগে উঠেছে, বলে: "আমাকে শিষ্য করুন।" আমি চ'লে যাব ভাবতে ওর চোখে জল আসে। কত যে চিঠি লেখে দিনের পর দিন! তার বাদী সুর—স্বরকার ওকে হ'তেই হবে—অথচ এখনো প্রেরণা যে এসেও আসছে না! লেখে: "চাকরি ছেড়ে দেব ভাবছি।" অথচ ছেড়ে দিলে জীবিকার উপায় হবে কি?—বলি ওকে একথা। ও ম্লানমুখে বলে: "তা বটে কিন্তু তবু—" ব'লে থেমে যায়। পরে ফের চিঠি আসে। সে যে কত চিঠি—যৌবনের রঙিন আশা আবেগে ভরা। ভালো লাগে এ সরল উচ্ছ্বাস। কিন্তু গুরু হব ওর কী ক'রে? বলি ওকে। ও মানে না। বলে: "তবু আপনিই আমার গুরু।" আমার কাছে এ বিষয়ে উৎসাহ না পেয়ে লেখে ইন্দিরাকে। ইন্দিরা বলে: "আহা, ওকে সাহায্য করো একটু।" কিন্তু কী ভাবে সাহায্য করব? পিতৃদেবের "সাজাহান" নাটকের একটি কথা মনে পড়ে: "ভগবান্! মানুষের ইচ্ছাকে এত প্রবল অথচ শক্তিকে এত দুর্বল

করেছিলে!" ওকে এগিয়ে দেব আমি কী-উপায়ে? ওর দীক্ষাগুরু হবার সামর্থ্যই বা আমার কোথায়? সঙ্গীতে? কিন্তু ওদের সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের মিল কতটুকু? তবু ওর আগ্রহ দেখে মনে হয়: "আহা, যদি ওকে কিছু সাহায্যও করতে পারতাম!" ভেবেচিন্তে ওকে নিমন্ত্রণ করি, ও তাতে কী যে খুশি হয়! শুধু নিমন্ত্রণ করার জন্যেই খুশি নয়, গান শুনেও খুশি। আসবে সব সভাতেই গোপন-সঞ্চারে, বসবে সবার পিছনে, শুনবে একান্ত আগ্রহে, পরে লিখবে উচ্ছ্বসিত পত্র: কী অপরূপ সঙ্গীত, কী দিব্য প্রেরণা···ইত্যাদি। ওর একটি পত্রের খানিকটা মাত্র উদ্ধৃত করি নমুনা হিসেবে, কারণ শুধু যে ও লেখে সুন্দর তা-ই নয়—লেখার মধ্যে দিয়ে নিত্যই ফুটে ওঠে ওর প্রাণের জ্বলন্ত অভীপ্সা, যৌবনের দুর্নিবার আদর্শবাদ:

"Dada! I keep feeling a sense of failure because I haven't arrived yet at the sacred grove of music. After days of wandering among thorns and thistles I come to a place whose pale flowers here and there and scattered grass, all dusty and impoverished, are at least an improvement. The heart of the matter is high discipline. But I don't know exactly how to apply it...

Would you allow me to send you tune specimens and some poems which I may achieve?...From where I stand now all my music (and poems) will be written only for you...I will just go on with my discipline to hear and surrender to Krishna..."

ইন্দিরাকে দেখেই ও মুগ্ধ হ'ল, ওকে চিনতে পেরে লিখল ওর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা:

"White dawn-flower of mysteried morning air
Of virgin sweetness and quiet joy...
Shower upon the aching world
The blessing of your radiant peace and sun-blest calm
Shining like a ringing star of Truth and Holy Love...
Purity entempled in a House of Faith
Stirring with the whispers of compassion's sigh...
Now make my home the vessel of thy Grace,
My heart the ground of thy untroubled feet.

P. S. Here is what I put down looking at Indira's wonderful and beautiful picture last night.

With all my love and gratitude,

Richard Miller"

কিন্তু ক্রমশই ফুটে উঠতে লাগল ওর মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও অভীপ্সা: আস্থা সেই সত্যে যাকে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে ধরাছোঁয়া যায় না, আর অভীপ্সা সেই আলোর "যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"—যাঁর আলোতে ভুবন আলো জীবন কিরণময়।

মাঝে মাঝে যখন এ-দেশের বহু ক্লান্তির ভার বুকে চেপে বসে, তখন ভাবি ইন্দিরার একটি গানের কথা (পুরো গানটি শ্রুতাঞ্জলিতে দ্রষ্টব্য, ৫০ পৃঃ):

যহ জগ তো হৈ রৈনবসেরা, অপনা দূর ঠিকানা,
হল্কা রখ্না ভার করমকা ফির না পড়ে উঠানা।

অর্থাৎ

এ-জগৎ ক্ষণিকের পান্থনিবাস, তোর আপন আলয় দূর তীরে
কর্ম করিস কেন গুরুভার দিনে দিনে—তুলিতে হবে না তায় ফিরে?

"কেন মিথ্যে কর্মের বোঝা বাড়ানো?"—শুধান মায়াবাদী—"যত পারো বোঝা হাল্কা করো—travel light!"

কিন্তু হায় রে, আমরা যা করব ভাবি তাই কি পারি? না, যা কর্তব্য ভাবি তা-ই সব সময়ে সত্যি করণীয়? দিনে দিনে কত রকমের কর্মাবর্তে প'ড়ে নাজেহাল হই—এক থেকে আর এক ঢেউয়ের মাথায় চ'ড়ে চলি উধাও কোন্ "দূর তীরে"—কে বলবে? এই যে যুবকটি চায় তার ভার আমাদের দিতে—(শিষ্য হওয়া মানে এছাড়া আর কি?)—এর উত্তরে কী সাড়া দেব? যাঁরা দেখতে পান দীক্ষার্থীর অন্তর অবধি তাঁরা হয়ত বলতে পারেন কার ভার নেওয়া চলে, কার চলে না। কিন্তু আমি কতটুকুই বা দেখতে পাই? তাই ওকে বলতে হ'ল যে আমি গুরু হ'তে পারব না—নিজেকেই ঠিকম'ত চালাতে পারি না, অপরকে চালাবার ভার নিই কেমন ক'রে? ও বিমর্ষ মুখে বসে থাকে। মন ব্যথিয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি? আমাদের সঙ্গে ওর দেখা কি তাহ'লে ব্যর্থই বলব?

হয়ত নয়। হয়ত কিছু ও পেয়েছে আমাদের সঙ্গীত ও স্নেহস্পর্শ থেকে। নৈলে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করব এমন কথা কেমন ক'রে বলে এহেন

বুদ্ধিমান্ যুবক? (ওর শিক্ষক বলেন এরকম মেধাবী ছেলে তিনি খুব কমই দেখেছেন সংসারে।) সংসারে ঘা খেয়েছে অনেক। বোঝে অনেক কিছু। আর যতই বোঝে ততই যেন অসহায় বোধ করে। অথচ ওর কতটুকু সহায়তা করতে পারি আমরা? নিজেরই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নি—কোন্ জ্ঞানশলাকা দিয়ে ওর অজ্ঞানতিমিরান্ধ নয়নে আলোর বাণী বহন ক'রে এনে দেব?

না। বাইরের দিক থেকে যতটুকু দেখা যায় তাতে এর বেশি বলা যায় না যে, ওকে আমি বড় জোর একটু প্রেরণা দিতে পারি। কিন্তু এ তো হ'ল আমার তরফের কথা। ও আমার কাছ থেকে কী পেয়েছে ও-ই জানে। দ্রোণ একলব্যের দিকে চেয়েও দেখেন নি। কিন্তু একলব্য দ্রোণকে গুরুবরণ ক'রে কী পেয়েছিল ব্যাসদেব তার যে বর্ণনা দিয়েছেন সে কি শুধুই কবিকল্পনা? দর্শনার্থী দেখতে চায়—শুধু চোখের দেখা মাত্র। যাকে চোখে দেখল সে যায় ভুলে। কিন্তু যে দেখে সে তো ভোলে না। মনোজগতে দান যে দেয় সে কি সব সময়ে জানে? যে পায় সে কিন্তু খবর রাখে প্রায়ই—কী পেল। খতিয়ে গ্রহীতার নেওয়ার শক্তির উপরেই বেশি নির্ভর করে পাওয়া। তাই হয়ত রিচার্ড মিলার পেয়েছে আমাদের কাছ থেকে এমন কিছু যার খবর ও রাখে, কিন্তু আমরা ভেবে পাই না।

* * *

নিউয়র্কের বন্ধুরা ধরলেন বিদায় নেওয়ার আগে অন্তত আর একটিবার নৃত্যগীতের আসর জমকাতে হবেই। কনসাল আর্থার লাল উদারধর্মী, বললেন: বেশ, ইণ্ডিয়া হাউসের বিশাল কক্ষেই ব্যবস্থা করবেন আমাদের সঙ্গীতের তথা অতিথিদের আসনের। আটই জুন আমরা গেলাম সেখানে। এবারকার আসরে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল: ইন্দিরা ও আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম বেছে বেছে কেবল তাঁদের যাঁরা বিশেষ আগ্রহান্বিত। সেদিন নৃত্যগীতবাসরকক্ষে ঢুকে হঠাৎ চম্‌কে গেলাম: এত অতিথি আমাদের বন্ধু! যাঁদের কোনোদিনও জানতাম না, এমন কি নাম পর্যন্ত শুনি নি তাঁরা এত আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত! আর সে কত জাতির বর্ণের উপাধির অতিথি! মার্কিন, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, জর্মন, পাঞ্জাবী, বাঙালী, দক্ষিণী—আরও কত দেশের লোক! এছাড়া ফোর্ডের প্রতিনিধি, কার্ণেগির প্রতিনিধি—হ্যাঁ, এক সিংহলীও ছিলেন যাঁর দয়িতা মুসলমান। আজব দেশের আজব দম্পতী! মুসলমান মহিলাটি বড় ভদ্র! সিংহলী ভদ্রলোক—কিন্তু, না, কী হবে তাঁর হাঁড়ির খবর দিয়ে?

সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলি—এদেশে আসতে না-আসতে দেখি অনেকেই ভাবেন তাঁরা সবজান্তা। ইনি সেই "অনেক"-এর ক্লাসে নাম লিখিয়েছেন।

ইন্দিরা সেদিন বড় সুন্দর নাচল—তিন তিনটি নাচ। গানের আবহও বেশ জমাট হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে! এক আমেরিকান মহিলা ছিলেন, নাম মিলড্রেড ডিলিং। আমাদের লেসলি পাফরথ নামে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটি গানের আসরে। ইনি কার্ণেগি ফাউণ্ডেশনের একজন প্রধান "গুস্ত"। ইনিই নিয়ে এসেছিলেন মাদাম ডিলিংকে। মাদামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—ইনি জগতের বিখ্যাত হার্প-বাদিকাদের অন্যতমা। ইনি আমাদের গান শুনে এতই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন যে ভাব হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে। পাফরথ বললেন এঁর বীণা শুনতে একদিন নিয়ে যাবেন আমাদের। আমরা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলাম। সে কবে শুনেছিলাম গ্রীক বীণা (harp) পারিসে Lapin Agile কাবারে-তে! এ-যন্ত্রটি যেমন সুন্দর শুনতে তেমনি দেখতে। গ্রীকরা একসময়ে খুবই হার্প বাজাতেন—তারপর এর চল ক'মে গেছে, বিশেষ পিয়ানোর অভ্যুদয়ের পর। তাই আমরা খুব ঔৎসুক্য নিয়েই গেলাম মাদামের বাড়িতে।

চা কেক পরিবেষণান্তে মাদাম বাজালেন স্বর্ণবর্ণ বীণা। কী সুন্দর যে লাগল! বললেন তিনি আসবেন আমাদের দেশে। যদি আসেন তো আমাদের দেশের সঙ্গীতজ্ঞরা শুনবেন অতীব মধুর সঙ্গীত।

লেসলি পাফরথ আমাদের নৃত্যগীতে আরো উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন, ধরলেন—লণ্ডন রওনা হবার আগে আর একটি নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু কোথায়? তিনিই বললেন কার্ণেগি এনডাউমেণ্ট ইনটার-ন্যাশন্যাল হল-এ আমাদের নৃত্যগীতের বিশেষ অধিবেশন হ'তে পারে, যদিও এ নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে কেবল বক্তৃতাই হ'য়ে থাকে। "কিন্তু"—বললেন তিনি—"নৃত্যগীতের চেয়ে জুৎসৈ শান্তি-ঘটক কে আছে দিনদুনিয়ায়?" তবু বক্তৃতাসভায় গান—কেমন হবে কে জানে? মনের দ্বিধাভাব কেটেও কাটতে চায় না।

কিন্তু আসর বসল অবশেষে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ওঁরা চিঠি ছাপিয়ে বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ তথা গুণিমানীকে ক'রে ফেললেন নিমন্ত্রণ। ত্বরিৎকর্মা তো! ঘর একেবারে ভরতি!

সুন্দর ঘর। নিউয়র্কে তখন খুব গরম—কিন্তু ঘর এয়ার-কণ্ডিশণ্ড্। ঢুকে

শীত করতে লাগল, কারণ এসেছিলাম মাত্র ধুতি পাঞ্জাবি প'রে খাস-বাঙালী বাবুটি! ইন্দিরার শাল মুড়ি দিয়ে গান করতে হ'ল।

ফাউণ্ডেশনের দু'জন অধ্যক্ষ পর পর আমাদের সংবর্ধনা করলেন আমাদের গুণপনা সম্বন্ধে অনেক কিছু ব'লে। মন খুশি হ'য়ে উঠল, দেখতে দেখতে গান জ'মে উঠল। প্রথমে গাইলাম শঙ্করাচার্যের "শিবোহং"—খাস সংস্কৃতে—ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে, ঝাঁপতালে। মূল গানটি গাইবার আগে এ-গানটির মৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ তারস্বরে আবৃত্তি ক'রে বললাম শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা। এ-বিখ্যাত স্বরটির উদাত্ত ধ্বনি ও বিষমপদী প্রস্বনে ওরা খুবই চমৎকৃত হ'ল। দেবভাষা তো—তার ধ্বনিকল্লোল লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে কোত্থেকে! মন ভ'রে উঠল—কবে এ অপরূপ স্তবটি লিখেছিলেন সে-মহাপুরুষ—তবু আজও তার আবেদন আছে সমান অভিনব—"সনাতন অথচ পুনর্নব"!

তারপর মীরার রাসনৃত্যভজন্। ইন্দিরা নাচল মণিপুরী ভঙ্গিতে। ঘর ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল ওর নাচে।

তারপর আমি গাইলাম মীরার একটি ভজন "ধীরে ধীরে প্রেমকে তীরে"—
—যেটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে।

সর্বশেষে গাইলাম মৎপ্রণীত গান "শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ" ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতে—যেটি আমার "অনামী"-তে ছাপা হয়েছিল।

অন্তে কার্ণেগি-ফাউণ্ডেশনের অধ্যক্ষ মিঃ শটওয়েল—অশীতিপর বৃদ্ধ—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন অনেক কথা। তার সার মর্মটি মাত্র দিই :—

"এ-হলে এই প্রথম হ'ল সঙ্গীত—যেখানে এযাবৎ হ'য়ে এসেছে শুধু কথার বেসাতি। আমরা গাঁথি কথার পর কথা জগতের শান্তি-বরণার্থে। কিন্তু সঙ্গীতে যে-শান্তি মেলে তার জুড়ি কোথায়? তাই আইন লংঘন করেছি আমরা বাইরের দিক থেকে মাত্র। যেহেতু ভিতরের দিক থেকে দেখতে গেলে বলব যে শান্তির যে-পাঠ আজ এঁরা দু'জনে মিলে করলেন সে-পাঠ আমাদের লক্ষ্যসিদ্ধির পরম অনুকূল ব'লেই সকলে মানবেন তাঁদের আন্তর অনুভূতির এজাহারে। তাছাড়া এঁরা এসেছেন আমাদের কাছে আধ্যাত্মিক ভারতের বাণীবাহ হ'য়ে। এঁদের সেই নিবেদনের ঢেউ আমাদের হৃদয়ের তটে এসে লেগেছে আজ সন্ধ্যায়। তাই বলব: এঁরাও ধন্য, আমরাও ধন্য। এঁরা দিলেন দান সানন্দে, আমরা গ্রহণ করলাম সকৃতজ্ঞে। আমাদের চোখের সামনে এক নতুন দৃশ্য যেন খুলে গেল আজ। এ-স্মৃতি সবার মনেই জাগরূক থাকবে"......ইত্যাদি।

গানের শেষে আমাদের বহু নবলব্ধ বন্ধুবান্ধবী এসে সানন্দে করলেন ভারতীয় সঙ্গীত তথা নৃত্যের গুণগান। পর দিনই আমরা রওনা হব লণ্ডন—তাই মনের কোণে একটু বেদনাও ছিল: এঁদের সঙ্গে আর হয়ত কোনোদিনই দেখা হবে না ভাবতে আমাদের হৃদয় করুণ রসে আপ্লুত হ'য়ে উঠল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে উদয় হ'ল এক বিচিত্র অনুভূতি প্রাক্-বিদায় লগ্নে। জীবনের পথচলায় কত দিন কত অভিজ্ঞতাই চয়ন করি আমরা! কিন্তু এক একদিন অকস্মাৎ অন্তরলোকে ঘনিয়ে ওঠে এক বিচিত্র অনুভব—যে, সঙ্গীত যখন ভক্তিরসে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে তখন সে মানে না কোনো মানসিক বেড়ার বাধা। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন আমাকে এই কথাটি বড় সুন্দর ক'রে। বলেছিলেন: সঙ্গীত এমন অনেক মানুষকে আমাদের কাছে টেনে আনতে পারে যাদের সান্নিধ্য শুধু সঙ্গীতের জাদুতেই সহজলভ্য—আর কিছুতে এত সহজে এ-সামীপ্য প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে পারত না।

আমাদের মার্কিন-জীবনে একথা আমরা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। কারণ আমেরিকায় এত নানারূপী বন্ধু-বান্ধবী আমাদের চারদিকে জড়ো হ'য়ে উঠেছিল প্রধানত আমাদের নৃত্যগীতেরই টানে। ওরা আমাদের সঙ্গীত থেকে কী ধরনের আনন্দ পেয়েছিল বা আমাদের ভক্তিরসের কতখানি ওদের মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল বলা কঠিন—যেহেতু আমরা অন্তর্যামী নই—কিন্তু একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, ওরা আমাদের গানের মধ্যে এমন কোন চুম্বক-শক্তির পরিচয় পেয়েছিল যা ওদের মন টেনেছিল। নৈলে—শুধু একটা দৃষ্টান্ত—এ-হেন বক্তৃতাসভায় ওরা এত আগ্রহে আমাদের নৃত্যগীত-সভার ব্যবস্থা করত না নিয়ম ভেঙে। এ-দেশে নিয়ম-ভাঙা যে কী কঠিন আমাদের দেশের আবহাওয়ায় আমরা কিছুতেই ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারব না। কারণ আমরা স্বভাবে খানিকটা উড়নচণ্ডী, মাটিছাড়া—ইংরাজিতে বললে বলা যায়—informal: যীশু সে কবে বলেছিলেন ইহুদিদেরকে যে, কাজ করতে হবে শ্লোকের চোখরাঙানি মেনে না, প্রাণের কথাটিতে কান দিয়ে—spirit of the letter: বলেছিলেন যারা শুধু বাইরের দিক দিয়ে নিয়ম মেনে চলে তাদের উপাধি—"ফারিসী"। এদেশে মানুষ প্রায়ই ফারিসী-র মতই ব্যবহার করে। ঠিক সেই জন্যেই মন আমাদের উৎফুল্ল হয়েছিল দেখে যে আমাদের নৃত্যগীতে এরা এত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত প্রতি সভাতেই। সঙ্গীত কঠোর মানুষের হৃদয়কেও দ্রব করে একথা শুনে আসছি সে কবে থেকে! এখানে এসে সে-শোনা-কথাকে পুনরায় চাক্ষুষ ক'রে আরো তৃপ্তি পেলাম।

নিউয়র্কে এসে আর একটি লাভ হ'ল এই যে শ্রীঅরবিন্দর মহিমাকেও নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম তাঁর মহাকাব্য 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে একাধিক বক্তৃতা দিয়ে। বক্তৃতা হয়েছিল আমাদের নবলব্ধা বান্ধবী মিসেস হারিসনের সার্লে-তে। সেখানে লেখক, শিল্পী, ধার্মিক তথা সাধারণ নরনারী এল যে কী আগ্রহ নিয়ে! আমাদের অত্যধিক ব্যস্ততার দরুন আমরা পারি নি আরো কথাচক্রে যোগ দিতে। কিন্তু শুনবার আগ্রহের অভাব ওদের মধ্যে দেখি নি। স্বভাবচঞ্চল হ'লেও ওরা শুনতে সত্যিই চায়। চিন্তাশীলা বিদুষী নাতাশা রামবোভা আমাদের বলেছিলেন সেদিন যে, আমেরিকার যুবক সম্প্রদায় এখন সত্যিই চায় ধর্মের বাণী শুনতে—যদি কেউ সত্যি আধ্যাত্মিকতার প্রাণের কথাটি সরল ভাষায় পেশ করতে পারে। একথার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম বৈ কি!

নিউয়র্কে শেষ কয়দিন আমাদের কেটেছিল আরো আনন্দে এই জন্যে যে আমাদের বন্ধু ডেভিড হাণ্টার এসেছিল সুদূর সানফ্রান্সিস্কো থেকে শুধু আমাদেরই জন্যে। ওর কথা ইতিপূর্বে অনেক বলেছি। এমন ধার্মিক ও পবিত্র-চরিত্র ভাবুক মানুষ যে-কোনো দেশেই কম মেলে। ওর মধ্যে দেখেছিলাম আর একটি সুন্দর মনোবৃত্তি: সৎকথা শুনবার আগ্রহ। সংসারে খুব কম লোকই খাঁটি জিজ্ঞাসু। মনের উন্নত অবস্থার একটি প্রধান অভিজ্ঞান—জিজ্ঞাসা। ডেভিডের মধ্যে ছিল এই জিজ্ঞাসা সদা জাগরূক। যে-কারণেই হোক নিউয়র্কে ওর এই জিজ্ঞাসার তৃষ্ণা যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠেছিল, ও ক্রমাগত প্রশ্ন করত পুরুষোত্তম বলতে কী বোঝায়, প্রকৃতি-পুরুষের তাৎপর্য কী, ভাগবতে কৃষ্ণের মহিমা কী ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের বাণীর সঙ্গে রামদাস বা রমণমহর্ষির বাণীর কোন্‌খানে তফাৎ ইত্যাদি। অনেক সময়েই মুস্কিলে পড়তে হ'ত কারণ শুধু যে জানতাম না তাই নয়, অনেক কিছু জেনেও ভালো ক'রে বোঝাতে বেগ পেতে হ'ত। আমরা সবাই অনেক কিছু জানি কিন্তু বলতে গেলে দেখি—যা জানি তাকে জানানো দুর্ঘট। তবু ওর জিজ্ঞাসুবৃত্তি দেখে মন বড় তৃপ্তি পেত।

এই জিজ্ঞাসুতা দেখেছিলাম এলেন-এর মধ্যেও। কিন্তু সে আমাদের কাছে আসত শুধু "জিজ্ঞাসু"ভাবে নয়, গীতায় যাকে বলেছে "আর্ত" সেই ভাবে। বিশেষ করে ইন্দিরার কাছে। কারণ ইন্দিরাকে ও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিল ব'লেই খানিকটা আঁচ পেয়েছিল ওর অন্তরের অগ্নিশিখার। ধনীদের মধ্যে সচরাচর জিজ্ঞাসুভাব কমই প্রকট হ'য়ে থাকে এ অতি জানা কথা। কিন্তু জীবন বিচিত্র, তাই প্রায় সব লক্ষিত নিয়মেরই ব্যতিক্রম দেখা যায়। (এইজন্যেই সূত্র

দিয়ে জীবনকে বুঝতে গেলে প্রায়ই পড়তে হয় অথই জলে।) এলেন ছিল—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলব না, তবে—বৈশ্যকুলে ব্রাহ্মণী। সত্যি ব্রাহ্মণী। মানে যে—মৈত্রেয়ীর মতনই—চায় তত্ত্বজ্ঞান—তথ্যসঞ্চয়ও নয়, ধনাত্মপ্রসাদও নয়।

এই রকম আরো কত চিত্তাকর্ষক চরিত্র লক্ষ্য করেছিলাম আমরা। তাদের মধ্যে কেউ বা এসেছিল আমাদের খুব কাছে, কেউ বা করত দূর থেকে দণ্ডবৎ, কেউ বা কাছে এসে আশাভঙ্গের দরুন মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেত, কেউ বা চাইত শুধু আমাদের ক্ষণিক সান্নিধ্য—তার বেশি নয়। জীবন পাঁচমিশেলি—এইভাবে নানা রস মণি ও উপল সঞ্চয় ক'রেই কাটে পাঁচজনার বহির্জীবন। আমাদেরও কাটত। কেবল একটি জিনিস ধীরে ধীরে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল: যে, মানুষের মূল সমস্যা, আন্তর তৃষ্ণা, প্রায় সবদেশেই খতিয়ে এক। মানুষে মানুষে তফাৎ নেই এমন কথা বলব না। শুধু এইটুকু বলা যে, আমরা দেখতাম যে, নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে সারবান্ মানুষ এদেশেও আমাদের দেশের মতনই চলেছে এক অচিনের টানে, খানিকটা বুঝে, খানিকটা না বুঝে, খানিকটা বা ভুলবোঝার ফেরে প'ড়ে। তবু সবচেয়ে আনন্দ হ'ত যখন দেখতাম এ-অচিনের টান ধীরে ধীরে নিবিড় হ'য়ে উঠছে কারুর কারুর মধ্যে জিজ্ঞাসুতার সহজ আগ্রহে। এদের মধ্যে রিচার্ড, মড, এলেন ও ডেভিডের স্থান বোধ করি সবচেয়ে উঁচুতে।

নিউয়র্ক থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে কেবলই মনে হচ্ছিল এদের কথা। কী সহজ স্নেহে এরা আমাদের কাছে এগিয়ে এসেছিল—আমাদের সম্বন্ধে, বলতে গেলে, কিছুই না জেনে! মড করল তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ, নিয়ে গেল তার মোটরে কত সুন্দর সুন্দর জায়গায়। বিদায় নেবার সময়ে লিখল কী সরল স্বীকারে:

My dear sister Indira,

Sunday night at 11-30 when I went to bed, I saw you so clearly in meditation and felt great strength from you. David Hunter had arrived that afternoon. As you and Dilip can imagine, we talked so much about you both and what a deep and lasting impression your friendship has made on both of us! It reminded me of an excerpt I had read many years ago (from the Mahabharata, I think), a description of driftwood floating on the great deep moving sea of life. How a current might bring certain pieces together! They would touch, cling, float together—part

of the same current—till they were separated, each to go its way. Yet if the Gods were kind, this pattern might repeat again. I hope and pray so... Sincerity, truth and wisdom you both have, and yet a fourth—beauty and yet a fifth—humor, for beauty and humor are important and you both have it.

Dear friends, may all open and become as you wish it, for you both have so much to give to the world, and what you have to give is so badly needed...I miss you both very much and my thoughts often go out into space and hover near you. They are good thoughts and have wings like a dove.

Love to you and Dilip.

Your sister Maud

বিদায়ের দিনে রিচার্ডের সে কী চোখভরা জল! বলল: "আমাকে লিখবেন কী চাই—অধিকার দেবেন সেবা করতে।" ব'লে অশ্রু গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

আর ডেভিড হাণ্টার। ও কথা রেখেছিল—সত্যিই এসেছিল সুদূর সানফ্রান্সিস্কো থেকে—তা আবার ট্রেনে, প্রায় দু'দিন লেগেছিল ওর আসতে। এসে কেবলই শুনতে চাইত ভাগবতী কথা, ভাগবতী গীতি! বলত বেশ চমৎকার ক'রে: "এ গান যতই শুনি, এ-নৃত্য যতই দেখি ততই যেন মনের দৃষ্টি খুলে যায়—পাই এক নবলোকের আভাস যার মধ্যে বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে আনন্দ, তাই না এত মধুর! ভগবানকে আমরা চাই কিন্তু পাই কই? শুধু সঙ্গীতের বরে পাই এক অভিনব অঙ্গীকার—যে তিনি অধরা হ'লেও আমাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান।"

আমেরিকায় আমাদের সাঙ্গীতিক অভিযানের উনশেষ সন্ধ্যাটি ভুলব না কোনোদিনো। এসেছিলাম যে-দেশে সবারই অপরিচিত হ'য়ে সে-দেশ থেকে বিদায় নেবার সময়ে দেখি কতগুলি বন্ধুবান্ধবী কাছে এসে গেছে কী রকম অজান্তে—যারা বাইরে-থেকে-দেখতে পরদেশী—কিনা আমেরিকার মতন বস্তুতান্ত্রিক দেশের বাসিন্দা—তারাও অন্তরে হ'য়ে উঠেছিল ভারতেরই প্রতিবেশী!

* * *

পরদিন ডেভিড আমাদের বিমানে তুলে দেবার সময়ে একটি চিঠি দিল আমার হাতে। বলল: "পরে পোড়ো।"

বিমানে উঠে পড়লাম এ অপরূপ স্নেহলিপিটি। সে লিখেছিল অনেক কথা।

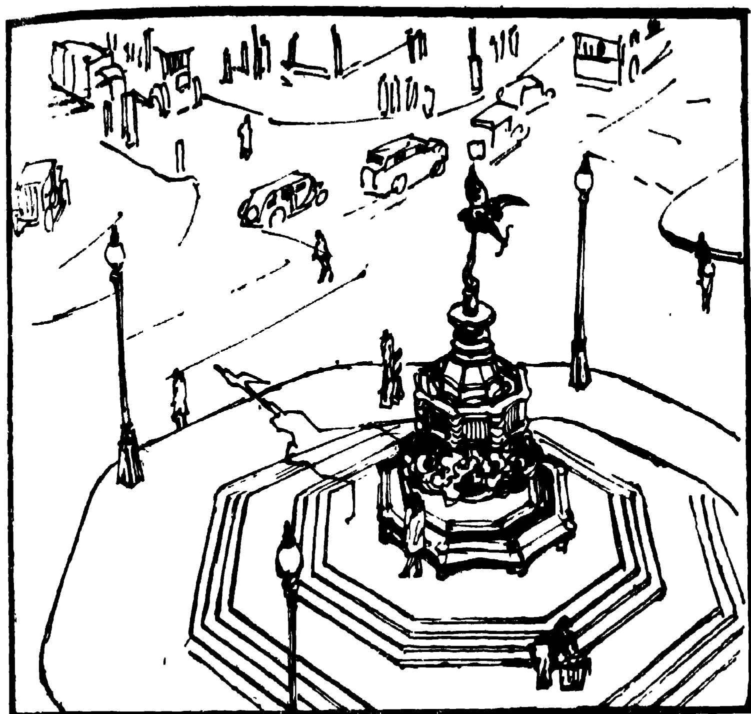
তার মাত্র খানিকটা তর্জমা ক'রে আমাদের আমেরিকান জীবনের শেষ অধ্যায়ের শান্তিপাঠ করি :

"প্রিয় ভাই ও দিদি! কী উপহার তোমাদের দিতে পারি আমি? ভেবে পাইনে। তোমাদের আছে কতই না সম্পদ! কী আমি তোমাদের কাছে ধ'রে দেব যা তোমাদের যোগ্য?…না, আমি আজ তোমাদের জানাতে চাই কেবল একটি কথা মাত্র: যে, আমি যে তোমাদেরি একজন একথা কোনোদিন ভুলো না।

"কিন্তু আমি নিজেকে তোমাদের কাছে নিবেদন করব কী ক'রে? আমার যা আছে সবই যে তাঁর—ভগবানের। তবু আমি জানি যে তোমাদের সঙ্গে আমার প্রীতির যে-রাখীবন্ধন হ'ল তার ফলে যা কিছু আমি দিই তোমরা তার সরিক হবেই—কেননা তোমরাও যে তাঁর। তাই আমি আজ তোমাদের অর্পণ করতে চাই আমার কৃতজ্ঞতা, কারণ ভগবানের যে-করুণা ও প্রেম তোমরা পেয়েছ তোমাদের ভালোবাসার মাধ্যমে আমাকেও যে করেছ তার অংশীদার। আমার ভালোবাসা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু এম্‌নিই প্রেমের রহস্য যে তাকে যতই বিলানো যায় সে ততই আয়তনে বাড়ে।

"আর সেই সঙ্গে জানাই আমার অন্তরের এ-প্রার্থনা: যেন শিবসত্যের আশিস হয় তোমাদের শিরোভূষণ—আর আমাদের সকলেরি নাথ যিনি তাঁর মহান্ প্রেম ও শান্তি যেন তোমাদের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজ করে।

তোমাদের কৃতজ্ঞ ভাই ডেভিড।"



# ইংলণ্ড

## লণ্ডন

উনিশ শো সাতাশে দ্বিতীয় য়ুরোপ-অভিযানে এসেছিলাম ইংলণ্ডে। ঠিক হয়েছিল মহামতি বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে এক জাহাজে আমেরিকা যাব। ঠিক কি সেই সময়েই তৃষ্ণা জাগতে হয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবার? বিধাতা অলক্ষ্যে কী ধরনের হাসি হাসেন কল্পনা ক'রে সাধ মেটে না, আহা, যদি চাক্ষুষ করতে পারতাম!

তারপর ফের উনিশ শো তিপ্পান্নো সালে পঁচিশে জুন বিমান থেকে নাববেন দিলীপকুমার তৎশিষ্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে—এতেও তো বিধাতার নিরাকার ওষ্ঠাধরে পুনরায় সাকার হাসি ফুটে উঠবার কথা। কারণ ইংলণ্ডে আমাদের আসার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে দেখা করা—যাঁর সঙ্গে এক জাহাজে আমেরিকা যেতে যেতেও যাওয়া হয়নি! বৈরাগ্যবশে সেদিন যাঁর সঙ্গ হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলেছিলাম, আজ ফের তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেই আসা! নিয়তির পরিহাস বলে আর কাকে? যাক্‌, তৃতীয় বার ইংলণ্ড-অভিযানের কথাই বলি।

বিমানঘাটিতে নামতেই দেখি অরিন্দম (ওরফে অরবিন্দ বসু) হাজির। বেচারি এসেছে সুদূর ডরহাম থেকে তার অধ্যাপনা ছেড়ে। (যদিও তার অধ্যাপনা এখনো সুরু হয়নি, তবু এসেছে তো অতদূর থেকে শুধু আমাদের তত্ত্বাবধান করতে!)

অতঃপর বিনোদ মোদি ব'লে একটি যুবক গুজরাতি ডাক্তার এগিয়ে এলেন তাঁর মোটর নিয়ে। বিদেশে বিভুঁয়ে পরিচিত দু-দুটি মুখ, তদুপরি মনোরম মোটর! ক্লান্তি অপনীত হবে না?

ইংলণ্ডের সেই মধুর বাসন্ত সমীর! আমেরিকার গ্রীষ্মাধিক্যের পরে যেন শিরায় শিরায় পুলক জেগে উঠল। থুড়ি: শুধু শিরায় শিরায় নয়—কবির ভাষায়, গাছে গাছে! কী সুন্দর দেশ ইংলণ্ড! আমেরিকায়ও সৌন্দর্যের অভাব নেই মানি, তবু পরিচিত সৌন্দর্যের আছেই আছে ভাবানুষঙ্গ। সেই ছোট পথঘাট, ছোট মোটর, কম যানবাহন—যদিও এ-পঁচিশ বৎসরে যানবাহনের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে, তবু সদ্য যে-দুর্ধর্ষ শোরগোল দেখে এলাম তার তুলনায় কি একে ট্র্যাফিক বলা যায়?

আমেরিকার তুলনায় ইংলণ্ড ছোট দ্বীপ, সম্পদেও ঢের পিছিয়ে। কোথায় অত রেস্তর্যাঁর গ্রাহক, কোথায় বা অত বড় বড় মোটর, ভ্যান, বাস, ঘর্ঘর! তবু বড়র পরে ছোটর দরবারে আসতে-না-আসতে প্রাণ জুড়োলো। গ্যলিভার বালখিল্যদের দেশ থেকে অতিকায়দের দেশে উত্তীর্ণ হ'য়ে নিশ্চয় বৈষম্যের দরুন আরো বেশি চমকে গিয়েছিলেন। আমরা ঠিক উল্টো দিকের অভিজ্ঞতায় কম-চমকের সাদর সম্ভাষণে উঠলাম হৃষ্ট হ'য়ে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন ছোট বাড়ি ছোট ঘরই তাঁর বেশি প্রিয়। বড় বাড়ি বড় ঘরে তিনি নিজেকে খুঁজে পান না যেন। এ-বাণীটির মর্ম আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে এসে যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম—আরো বেকার স্ট্রীটের কাছে এক ছোট হোটেলে উঠে।

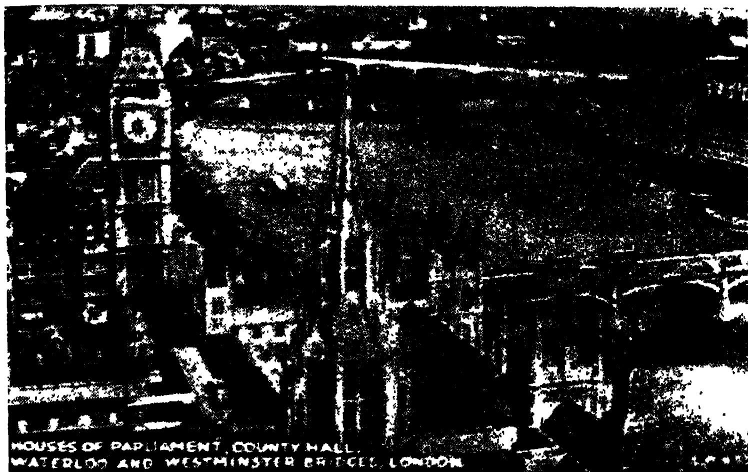
ছোট হোটেল—বটেই তো। কোথায় আমেরিকায় ১৯ তলার হোটেলে ১৮ তলার ঘরে বসবাস, আর কোথার ইংলণ্ডের তিনতলা হোটেলে দ্বিতীয় তলে অধিষ্ঠান! জনারণ্য নেই, কাজেই জনকল্লোল কম। লিফ্‌ট ছোট্ট একটি মাত্র। নিউয়র্কে তিন তিনটি ছিল—প্রকাণ্ড।

মনের দিকে তাকিয়ে দেখি মন প্রতি পদে ইংলণ্ডকে দেখছে আমেরিকার সঙ্গে তুলনা ক'রে। এখানে কী নেই যা আমেরিকার আছে, কী আছে যা আমেরিকার নেই? এদের কী গুণ নতুন ক'রে চোখে পড়ছে যা আগে পড়েনি—আমেরিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না-থাকার দরুন?

প্রথমেই দেখা গেল—ইন্দিরা আরো নির্দেশ দিল এ-দর্শনের—যে এখানকার লোক আমেরিকার মতন ঠিক অতটা ব্যস্ত নয়। এরাও চঞ্চল বলিষ্ঠ জাত বৈ কি—কিন্তু এখানে এদের যেন অবসর ঈষৎ বেশি। পর পর কিউ গার্ডেন, রিজেণ্ট পার্ক ও সেণ্ট্ জেম্‌স্ পার্কে গিয়ে বার বার প্রত্যক্ষ করলাম যে এরা জানে যাকে বলে আমেরিকার মতন আমোদ করা না হোক্, ঘরোয়া ভাবে প্রমোদ করা—কিনা আলসেমির চর্চা। আমেরিকায় সুখের শিকারী অজস্র, কিন্তু আলস্য-সন্ধানী লাখে না মিলয়ে এক। ওরা সাগরতীরে যায়, বাগানে যায়, থিয়েটারে যায়—সবই করে ইংরাজের মতন—কিন্তু এদের চেয়ে অনেক বেশি অশান্ত ছন্দে, চঞ্চল কদমে। এমন কি পিকাডিলি যে পিকাডিলি সেখানেও জনস্রোত চলেছে আমেরিকার তুলনায় ঢিমা চালেই বলব।

এলেন একদিন কমল বসু—এখানকার বাংলা "বিচিত্রা"-র দলপতি। রেডিওতে ফী সপ্তাহে কিছুক্ষণ ক'রে নানান্ বক্তা বাংলায় বক্তৃতা দেন—সেসব শোনে ভারতের নানা বাঙালী। বললেন আমাকে বক্তৃতা দিতেই হবে—

তবে পাঁচমিনিটে। রাজি হওয়া কঠিন; ভেবে দেখব—বললাম তাঁকে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার: খাস লণ্ডনে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া হবে—শুনবে কলকাতায়! লঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হোলো—শুনে আর হাসবার উপায় রইল না! তবে কমল বসু বললেন পাঁচমিনিটে একটি বাংলা গান গাইলে আরো ভালো—বৃটিশ সিংহের ফানেল বাইরে ছড়িয়ে দেবেন। দেখা যাক




কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। গানকে এভাবে কোনোমতে পাঁচমিনিটের পণ্য করতে বাধে।

* * *

পরে দিলাম একদিন বেতারে বক্তৃতা ইংলণ্ডে কেমন লাগছে। গাইলাম একটি বাংলা গান, একটি হিন্দি গান। কমল বসু বললেন এরা দক্ষিণা দেয় যথেষ্ট। ভালোই।

* * *

এখানে ফের দেখা হ'ল পীটার চকের সঙ্গে। আশ্রমে ইনি গিয়েছিলেন গত বৎসরের শেষে। সেখানে বলেছিলেন আমাদের যে, আমেরিকায় খুব সাবধান হওয়া দরকার, নৈলে সেখানকার সংবাদপত্রাদিতে কত কী যে লিখে ফেলবে! বললাম তাঁকে যে, আমেরিকান নানা পত্রিকায় আমাদের অদৃষ্টে দুর্লিখনজনিত মনঃকষ্ট লাভ হয়নি—বরং ওরা মন খুলে ভালোই বলেছিল নানা সমালোচনায়। শুনে পীটার খুব খুশি।

মানুষটি বড় সদাশয়। ইংরাজ জাতির সহৃদয়তা, রসিকতা ও সদাশয়তা এঁর চরিত্রকে বড় সুন্দর ক'রে তুলেছে। আমাদের কত জায়গায়ই যে দেখালেন যা আমি দেখি নি! টেম্‌সে স্টীমারে চড়ালেন যা আগে চড়িনি। লণ্ডন টাওয়ার, এ ও তা অনেক কিছুই দেখলাম এঁর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু ভালো লাগল শুধু নদীবিহার। শেক্ষপীয়রের Love's Labour Lost অভিনয় হ'ল রিজেণ্ট পার্কে খোলা আকাশের তলে—মাঠের উপরে। টিকিট ক'রে গেলাম এঁর সঙ্গে। নতুন অভিজ্ঞতা বৈকি!

সবচেয়ে চমক লাগল লণ্ডনে নানা জায়গায় বোমা প'ড়ে ভাঙচুরের দৃশ্যে। কত বাড়িই যে এখনো ধ্বংসস্তূপ হ'য়ে আছে! কত ভিটেয় চলতিভাষায় যাকে বলে ঘুঘু চরা—তাই দেখলাম অক্ষরে অক্ষরে। এরা দুঃখ পেয়েছে বৈ কি। বাড়ি প'ড়ে গেছে—আর তোলা হয়নি—সেখানে জলাশয় মতন করেছে—জল ধ'রে রাখবে সেখানে, যদি ভবিষ্যতে ফের যুদ্ধ হয় তখন সে-জল কাজে লাগবে। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল: "মানুষ যখন মানুষের প্রধান শত্রু তখন দুঃখের শেষ সীমা"—যেকথা "তীর্থংকরে" লিখেছি। "শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা?"—বলেছিলেন আর এক কবি—কৃত্তিবাস।

এক বন্ধু কোহেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই নিয়েই। যুদ্ধ কেউ চায় না—অথচ কী উপায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করা যায় তার হদিশ দিতেও পারেন না কোনো দিশারিই। এখনো এদেশের মানুষের সারথি তথা নিয়ন্তা—বুদ্ধিই বলব, অথচ তীক্ষ্ণতম ধী-ও আজ অকূল পাথারে—কী উপায়ে মানুষকে বোঝানো যাবে এই সাদা কথাটি যে, আত্মহত্যার চেয়ে বেঁচে-বর্তে থাকা শ্রেয়ঃ? রাসেল তাঁর সদ্যোজাত "Impact of Science on Society" বইটিতে অনেক গবেষণা ক'রে শেষটায় এই আশঙ্কায় পৌঁছেছেন: "I fear that mankind may choose Death. I hope I am mistaken."

কিন্তু এত বুদ্ধি হ'ল, এত সাজসরঞ্জাম হ'ল, এত প্রগতির ঢাক পেটানো হ'ল অথচ শেষপর্যন্ত মানুষকে বোঝানো যাবে না যে গরলের চেয়ে অমৃত ভালো? এই-ই কি মেনে নিতে হবে? মানুষ এতশত দেখেশুনে ভেবেচিন্তে বেয়েছেয়ে শেষটায় কিনা না-কেই চাইবে হাঁ-কে বরখাস্ত ক'রে? রাসেল এ-আশঙ্কা করলেও আমরা—আস্তিকতার প্রেরণায়—জপব: এ-বিশ্বের আছেন একজন নিয়ন্তা, তিনি অণু থেকে অবতার সৃষ্টি ক'রে শেষটায় ইস্তফা দেবেন তাঁর বিবর্তনের কাজে—এ হ'তেই পারে না—না না না, এ জগৎকে তিনি কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে

দেবেন না। আমরা বলব: কিন্তু কথা হচ্ছে—নাস্তিকরা এ-সান্ত্বনায় বুক বাঁধবেন কোন্ বিশ্বাসের খুঁটির জোরে?

* * *

ইন্দিরার এক মামা ১৯৩৫ সালে ভূমিকম্পে মারা যান বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েতায়। সে-ভূমিকম্পের রাতে বড় আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। নিশুত রাতে ইন্দিরা স্বপ্ন দেখে ভূমিকম্পের। তাড়াতাড়ি ওকে কে যেন ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ও বাইরের মাঠে বেরিয়ে যাবার মুখে ওর এক আত্মীয়া পায়ের শব্দ শুনে বলেন: "কে?"

ইন্দিরা বলে: "আমি। বেরিয়ে এসো এক্ষনি!"

"পাগলামি করিস নে। এই শীতে কোথা যাব বাইরে?"

অগত্যা ইন্দিরা একাই বেরিয়ে আসে। যেই বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে অম্নি দারুণ ভূমিকম্প স্বরু হয় যাতে কোয়েতার অর্ধেকেরো বেশি বাড়ি প'ড়ে যায়। ইন্দিরাদের মস্ত বাড়ি প'ড়ে যায় ও ওর সমস্ত আত্মীয়—৩০ জন হবে—মারা যায়। একা ইন্দিরা বেঁচে যায়। মৃতদের মধ্যে ছিল ওর এক আপন মামা। ইন্দিরা তখন পঞ্চদশী।

ওর আর এক মামা, শ্রীপ্রাণনাথ নন্দা, দিল্লিতে মস্ত রাজপুরুষ: কৃষি-বিভাগের একজন কর্মকর্তা। ওর তৃতীয় মামা শ্রীরামনাথ নন্দা বহুবৎসর আগে ইংলণ্ডে এসে ডাক্তারি পাস ক'রে এক ডাক্তার এফ-আর-সি-এস ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ ক'রে ইংলণ্ডেই থেকে যান। ডাক্তার হ'য়ে তাঁর প্রচুর পশার হয়। তিনি মনোরম গ্লস্টারশায়ারে (Gloucestershire) দু-দুটি চমৎকার বাড়ি খরিদ করেন—বহু জমিসমেত। চাকর চাকরানি, রাঁধুনি, মোটরচালক ইত্যাদি নিয়ে চার-পাঁচটি চাকর ছিল তাঁর। গতবৎসর তিনি স্থির করেন ছুটি নিয়ে দেশে ফিরবেন কিছুদিনের জন্যে। কিন্তু রওনা হবার ঠিক আগেই হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যে হঠাৎ দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়; ইন্দিরা ধরল ওর বিধবা শোকার্তা মামীমাকে দেখতে যাবেই যাবে। তিনি ওকে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভালোই হ'ল—ভাবলাম আমি—ইন্দিরার দেখা হবে ইংলণ্ডের একটি অতি-সুন্দর জনপদ।

আটই জুলাই আমরা সকালের ট্রেনে রওনা হলাম গ্লস্টারের টিকেট কিনে। ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেন গন্তব্য স্থানে পৌঁছল। ইন্দিরার মামীমা শ্রীমতী মুরিয়েল নন্দা চমৎকার একটি মোটর হাঁকিয়ে নিজে এলেন স্টেশনে।

পঁচিশ মাইল রথ চালিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন তাঁর অপরূপ বৃহৎ উদ্যান-বাটিকায়।

পথের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। চারদিকে বসন্তের ছড়াছড়ি। গাছপালা, ফলফুল, ঘাসপাতা, নদী, উপত্যকা—কিসের অভাব? আর সবার কলধ্বনিতে মন্ত্রপাঠ করছেন পুরোহিত দীপ্ত নীলাকাশ! ইন্দিরা তো উচ্ছ্বসিত!

কী সুন্দর আরামনিলয়! আর কী মস্ত! সবসুদ্ধ উনিশ কুড়িটি ঘর! এখনো শ্রীমতী নন্দার তাঁবে চার-চারটি পরিচারক পরিচারিকা: মালি, মোটরচালক, দাসী ও রাঁধুনি। এক মেয়ে, তার বিবাহ হ'য়ে গেছে। বিধবা একলাই থাকেন এত-বড় বাড়িতে। তাঁর মুখে শুনলাম: শ্রীযুক্ত নন্দা উইলে তাঁর রাঁধুনিকে ও মোটর চালককে তিন হাজার পাউণ্ড ক'রে দিয়ে গেছেন।

কিন্তু শুধু অজস্র উপার্জনই না—শ্রীযুক্ত নন্দা সুনাম কিনেছেন তার চেয়েও বেশি—শ্রীমতী নন্দা দেখালেন খবরের কাগজের রিপোর্ট। ডাক্তার নন্দার মৃত্যুর পরে স্থানীয় খৃস্টান পুরোহিত গির্জায় তাঁর তর্পণে বলেন (পড়লাম আমরা): "এমন উদার মহৎ ডাক্তার আমরা কমই দেখতে পাই এযুগে যাঁর কাছে ধনী দরিদ্র সমান। আমরা এমন মহদাশয় বন্ধুকে হারিয়ে…" ইত্যাদি। আরো দেখলাম একটি সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো অভিনন্দন-পত্র। কয়েক বৎসর আগে গ্লস্টারের নাগরিকরা সবাই মিলে তাঁকে চাঁদা তুলে উপহার দিয়েছিল তিনশো পাউণ্ড। অভিনন্দন পত্রে লেখা: "আমাদের জন্যে তুমি কত করেছ! প্রতিদানে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমাকে এই সামান্য উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ ক'রে আমাদের কৃতার্থ কোরো, বন্ধু!"

পড়তে পড়তে মন ভ'রে উঠল। মনে পড়ল কবি মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা:

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজনে;—"

* * *

লণ্ডনে ফিরে এলাম পরদিন। কারণ তার পরদিনই ছিল আমাদের কন্সার্ট বিখ্যাত "কনওয়ে হল"-এ। কী উপলক্ষে বলি।

কাজি নজরুল ইসলামকে তাঁর কৃতজ্ঞ অনুরাগীরা সবাই মিলে তাঁর উন্মাদ-রোগের চিকিৎসার্থে চাঁদা তুলে পাঠিয়েছেন লণ্ডনে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। দুর্ভাগ্য একা আসে না—নজরুল-জায়া বহু বৎসর যাবৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু—উত্থানশক্তি-



রহিতা। লণ্ডনে খরচ অনেক। সপ্তাহকাল আগে লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা একটি চ্যারিটি কন্সার্ট ক'রে কিছু টাকা তুলে দেন এঁদের সাহায্যার্থে। আমাদের কাছে তাঁরা আসতে আমরা সানন্দেই রাজি হলাম আর-একটি চ্যারিটি কন্সার্ট দিতে। ঠিক হ'ল এ-কন্সার্টে শুধু আমি গাইব ও ইন্দিরা নাচবে।

এগারই জুলাই দু'টি ছাত্র আমাদের নিয়ে গেল কনওয়ে হলের রঙ্গমঞ্চে। ঘর প্রায় ভরতি। কাজি নজরুলের প্রতিভাকে যে আমরা সমাদর করতে শিখেছি ভাবতে মন আর্দ্র হ'য়ে উঠল।

ইংরাজ-সনাথা শ্রীমতী এলা সেন আমাদের পেশ করলেন দর্শকদের কাছে।

তারপর স্থরু হ'ল নৃত্যগীতের আসর। দেখতে দেখতে জল্‌শা জ'মে উঠল। বিপুল উৎসাহ! "আরো গান—আরো নাচ" ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ ধ্বনিত! আমাদের আসর প্রায় দু'ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়েছিল। মনে হয় দেড়শো দুশো পাউণ্ড উঠেছিল এ-কন্সার্টের টিকিটে।

শুনে মন ঈষৎ আশ্বস্ত হ'ল যে, ডাক্তারেরা নাকি বলেছেন কাজি হয়ত সেরে উঠতেও পারেন। আহা, ভগবান্ করুন—তাই যেন হয়!

* * *

রাসেলকে চিঠি লিখলাম—আমরা তাঁর দর্শন চাই। উত্তরে তিনি লিখলেন (১লা জুলাই, ১৯৫৩) রিচমণ্ড থেকে :

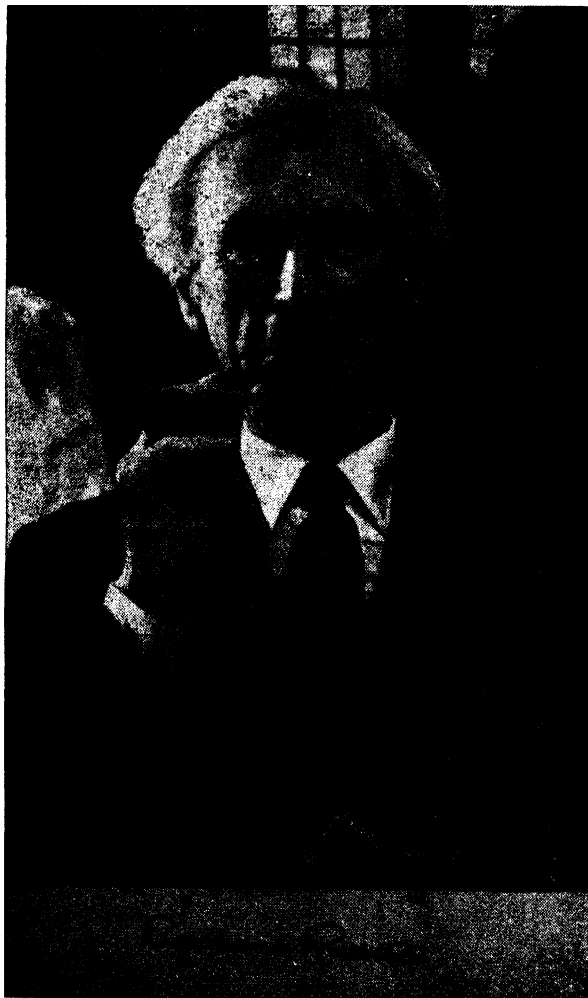
Dear Mr. Roy.

It would be a great pleasure to see you and your adopted daughter here to tea at about four on Saturday, the fourth, or, if that does not suit you, on Wednesday, the eighth or any subsequent day. Would you mind ringing me up to let me know what day you would prefer ? It would be very delightful if you were to sing and your daughter to dance.

Yours sincerely,
Bertrand Russell

আমরা যথাকালে হাজির হলাম। প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে কত কী ঘ'টে গেছে জগতে—কিন্তু রাসেল আজ অশীতিপর বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আছেন প্রাণশক্তিতে কি ঠিক্ তেমনি বলিষ্ঠ, বুদ্ধিতে তেম্‌নি সজাগ, হাসিতে তেম্‌নি মনস্ক! বলাই বাহুল্য তাঁর সঙ্গে আমাদের মতামতের নানা অমিল আছে। কিন্তু মতান্তরে মনান্তর হয়নি ভাবতে মন প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল—বিশেষ যখন দেখলাম

তিনি তেম্‌নি সাদরে নিজে হাতে চা ঢেলে দিলেন। লেডি রাসেল ( রাসেল এখন লর্ড পদবীতে আসীন ) কেক পরিবেষণ করলেন ইন্দিরাকে ও আমাকে।



আমাদের আলাপ জমেছিল ঘণ্টাখানেকের বেশি। কিন্তু আমি এ-কথোপ-কথনের হুবহু রিপোর্ট দেবার তেমন তাগিদ খুঁজে পাচ্ছি না মনের মধ্যে। "মহৎ-পূজারী" হয়ত এখনো আছি, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে আলো পেয়ে

অন্য প্রণম্যদের প্রণাম করতে মন আজো তেম্‌নিই উৎসুক থাকলেও অন্য চিন্তানায়কদের আলোর বাণী আর তেমন কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশে না যে! কিন্তু তবু একটা উপলব্ধি যেন নতুন ক'রে পেলাম: যে, হৃদয়ের অনুরাগ যখন মানস চিন্তাকে সহায়রূপে পায় তখন সে কালাতিপাতেও নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে না। তাই আজো রাসেল আমাকে দেখে তেম্‌নি প্রসন্ন, আমি তাঁকে দেখে তেম্‌নি উৎসাহিত। মনে পড়ল চেস্টারটনের একটি বিখ্যাত কবিতার চারটি লাইন:

"In a time of sceptic moths and cynic rusts
And fatted lives that of their sweetness tire,
In an age of passing loves and fading lusts,
It is something to be sure of a desire."

—যে-অভীপ্সা—desire—লর্ড রাসেলকে আমাদের সঙ্গে এক যোগসূত্রে বেঁধেছে তার নাম—এক নবজগতের আশা—হয়ত দুরাশা। রাসেলের ভাষায়ই বলি:

"The world that I would wish to see is one where emotions are strong but not destructive and where, because they are acknowledged, they lead to no deception either of oneself or of others. Such a world would include love and friendship and the pursuit of art and knowledge. I cannot hope to satisfy those who want something more tigerish." *

রাসেলকে ভালোবাসি তাঁর মধ্যে প্রেম সহজ ব'লে। নৈলে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এমন কথা লিখতে পারতেন না: "The root of the matter is a very simple and old-fashioned thing, a thing so simple that I am almost ashamed to mention it, for fear of the derisive smile with which wise cynics will greet my words. The thing I mean—please forgive me for mentioning it—is love, Christian love, or compassion. If you feel this, you have a motive for existence, a guide in action, a reason for courage, an imperative necessity for intellectual honesty." †

আমার সময়ে সময়ে আশ্চর্য লেগেছে ভাবতে যে এ-হেন হৃদয়বান্ রাসেলকে

* লেডি রাসেল আমাকে দিয়েছিলেন রাসেলের একটি সদ্যোজাত প্রবন্ধ। এ অংশটি তার শেষাংশ থেকে উদ্ধৃত।

† The Impact of Science on Society...Science and Values অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

অনেকে কেমন ক'রে ভুল বুঝতে পারেন, ভাবতে পারেন শুষ্ক বুদ্ধিবাদী ব বন্ধ্যা ব্যঙ্গবাদী? অবশ্য দু'জন মানুষ কখনোই জগতকে অবিকল এক দৃষ্টি দিয়ে দেখে না, দেখতে পারে না, কিন্তু তবু রাসেলের উজ্জ্বল স্বপ্ন, ঝংকৃ আশা, শিল্পে, চিন্তনে, মহত্ত্বে শ্রদ্ধা কি তাঁর নানা লেখায়ই দীপ্ত হ'য়ে ওঠে নি? নাস্তিক? মানি তিনি ভগবানের স্তবগান করেন না। কিন্তু জগতে যারা ভগবানের স্তব করে তারা সবাই কি সত্যি আস্তিক? ভাগবতে একটি শ্লোক আছে যে, যেখানে যাকেই পূজা করো না কেন, তার নৈবেদ্য গিয়ে পৌছবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে। কথাটি আমার কাছে কোনোদিনই কথার কথা মনে হয় নি। রাসেল সত্যান্বেষী—জগতের সম্বন্ধে "বিশ্বাসযোগ্য" জ্ঞানের উপলব্ধির পূজারী। তাঁর এ-পূজাও কি শ্রীকৃষ্ণের চরণে পৌছবে না? ভগবান্ নানা অধিকারীকে নানা পথ দিয়ে টেনে আনেন তাঁর পায়ে। কে বলতে পারে রাসেলকে তিনি সত্যব্রত ও শুভবুদ্ধির পথ দিয়ে উত্তীর্ণ করবেন না পরম আশ্রয়ে? কিন্তু থাক এসব বাজে কথা—যা যা কথা হয়েছিল তার যতটুকু মনে আছে বলি।

এর পরে যা যা লিখছি আমার ইংরাজি অনুলিপি থেকে তর্জমা করা। এ-অনুলিপিটি লিখবার সময়ে ইন্দিরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে, মনে করিয়ে দেয় অনেক কথা যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ইংরাজি রিপোর্টটি আমি টাইপ করিয়ে রাসেলকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার অনুমোদন ক'রে দ্বিতীয় দিন বলেছিলেন আমার রিপোর্ট ঠিকই লেখা হয়েছে, কেবল লর্ড বার্টরাণ্ড রাসেল বলে না এদেশে। "হয় বলো বার্টরাণ্ড রাসেল, নয় লর্ড রাসেল," বলেছিলেন তিনি।

ইন্দিরা কথায় কথায় রাসেলকে বলল যে আমেরিকায় অলডাস হাক্সলির সঙ্গে আমাদের দেখাশুনো ও কথাবার্তা হয়েছিল অনেক।

রাসেল বললেন: "বটে? কেমন দেখলে তাঁকে? দরদী?"

ইন্দিরা বলল: "সত্যিই দরদী।"

আমি বললাম: "অলডাস হাক্সলিকে আমার খুব উজ্জ্বল ভাবুক ব'লে মনে হয়। আপনার মত কি?"

রাসেল সায় দিয়ে বললেন: "বটে, তবে তাঁর পথ তো ঠিক আমার পথ নয়।" ব'লে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গহাসি হেসে বললেন: "আমার মনে বরাবরই সংশয় ছিল অলডাস শেষটায় রোমান ক্যাথলিকের দলে নাম লেখাবেন।"

তবু মতভেদ সত্ত্বেও অলডাস হাক্সলির মনস্বিতাকে যে রাসেল অস্বীকার করলেন না এতে আমি খুশি হ'য়ে উঠলাম। কারণ এ-যুগে পাশ্চাত্য জগতে

এই দু'টি মনস্বীকেই আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি বরাবর, যদিও বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় অলডাস রাসেলের সমকক্ষ নন।

চা-পানান্তে রাসেল ধরালেন তাঁর পাইপ।

আমি বললাম: "আপনি পাইপ-বিলাসী দেখে আমার খুব ভালো লাগল। কারণ আমিও পাইপ-ভক্ত।"

ইন্দিরা হেসে বলল: "দাদা প্রায়ই বলেন: পাইপ কি কম? স্বয়ং আইন-স্টাইন ও রাসেল পাইপ-ভক্ত!"

লেডি রাসেল হেসে বললেন: "আপনি পাইপ-ভক্ত—তবে পাইপ ধরাচ্ছেন না কেন?"

আমি বললাম: "আমাদের দেশে ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি যে গুরুজনের সামনে ধূমপান করা গর্হিত।" (One should not smoke before one's superiors.)

বলতেই রাসেল মেঘগম্ভীর মুখ ক'রে মুখ থেকে পাইপটি নামিয়ে বললেন: "কী সর্বনাশ, তাহ'লে তো আমার আর ধূমপান করা চলে না।"

আমরা সকলে একযোগে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে আমি কথায় কথায় বললাম: "আমার এক ইংরাজ বন্ধুর সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। তিনি আপনার প্রতিভা স্বীকার ক'রেও অনুযোগ করেন যে আপনি অবুঝ যুক্তিবাদী ব'লেই বলতে পারেন এমন কথা যে শুধু যুক্তির খেয়াই করতে পারে অধম-তারণ।"

রাসেল বললেন: "শুধু যুক্তির খেয়ায় অধম কি উত্তম কারুর তারণ হবে একথা যে বলে তাকে আর যাই বলা যাক না কেন, যুক্তিবাদী বলা যায় না। কেন না যুক্তিই সব আগে দেখতে পায় মানুষ স্বভাবে কী অসম্ভব অযৌক্তিক।"

আমি বললাম: "জানি। কারণ আপনি আপনার লেখায় বারবার বলেছেন যে গড়পড়তা মানুষ স্বভাবে এত ঝোঁকালো যে যুক্তির কথায় সে নিরস্ত না হ'য়ে আরো রুখে ওঠে পাছে তার ঝোঁক বাধা পায়।"

রাসেল সায় দিয়ে বললেন: "হয়েছে কি জানো? আমি লক্ষ্য করেছি যে, অনেকেই আমার সম্বন্ধে আগে থেকে একটা মনগড়া ধারণা মনে ছ'কে নিয়ে তবে আমার লেখা পড়তে বসেন। নৈলে আমি নিছক বুদ্ধিবাদী বা যুক্তিপূজারী এমন কথা কারুর মনে ঠাঁই পেতেই পারত না। কারণ আমি কখনোই এমন বোকার মতন কথা বলিনি যে বুদ্ধি মানুষের কর্মের বিধায়ক কি নিয়ামক। বুদ্ধি আমার

আছে ব'লেই আমি বরাবরই ব'লে এসেছি যে বুদ্ধির কাজ হ'ল শুধু মানুষের নানা ঝোঁকের রাস টেনে ধরা, বলেছি—বুদ্ধি বা যুক্তির নিজস্ব ক্ষেত্র বেশ স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সে পারে শুধু একটি কাজ : দেখাতে যে, কোন্ পথ বেয়ে চললে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। যদি তুমি যেতে চাও আমেরিকায় তবে যুক্তি আমাকে বলে ইস্তাম্বুলের বিমান না নিয়ে নিউয়র্কের প্লেন ধরাই বুদ্ধির কাজ। আরো পরিষ্কার ক'রে বলি কথাটা! তোমার লক্ষ্য ধরো এই এই। বুদ্ধি বা যুক্তি তোমাকে সে-লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় ব'লে দিতে পারে, কিন্তু তোমার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে-নির্দেশ দেওয়া আদৌ তার এলাকার মধ্যেই পড়ে না। তবে আমি যুক্তি বা বুদ্ধির পক্ষপাতী এই জন্যে যে, জগতে গড়পড়তাদের চিন্তা এত ঘোলাটে যে বুদ্ধিকে মাঝি করলে অনেক সময়েই পার হওয়া একটু সহজ হয় —অন্তত মাঝদরিয়ায় ভরাডুবি ঘটে না।"

(রাসেলের প্রবন্ধটি থেকে আর একটু উদ্ধৃত করি : One critic takes me to task because I say that only evil passions prevent the realisation of a better world, and goes on triumphantly to ask : 'Are all human emotions necessarily evil ?' In the very book that leads my critic to this objection, I say that what the world needs is Christian love, or compassion. This surely is an emotion and in saying that this is what the world needs, I am not suggesting reason as a driving force. I can only suppose that this emotion, because it is neither cruel nor destructive, is not attractive to apostles of unreason."

"আপনি যা বলছেন আমি জানি ও মানি, লর্ড রাসেল," বললাম আমি। "কিন্তু একটা কথা। এই যে চিন্তার স্বচ্ছতা বা গবেষণা—এতে কী দাঁড়ায় খতিয়ে! এর ফলে কি আপনি পেয়েছেন পরম সার্থকতার আস্বাদ, বা শান্তি —যাই বলুন ?"

রাসেল হেসে বললেন : "যদি আমি বলি যুক্তি পৌঁছে দেয় পরম প্রাপ্তিতে তাহ'লে আমাকে হ'তে হবে পরম অযৌক্তিক। আর পরম শান্তি ? তা কী ক'রে হবে এ-জগতে যেখানে বহু নরনারী নিত্য কাল কাটাচ্ছে দুঃখদৈন্যের মধ্যে ?"

ব'লে একটু থেমে বললেন : "আমি শুধু পই পই ক'রে ব'লে এসেছি একটি কথা : যে, জীবনে এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যাদেরকে এড়িয়ে চলা সম্ভব, এবং

বুদ্ধি আমাদের মঙ্গল করতে পারে সেই সব দুঃখের হাত থেকে আমাদের খানিকটা অব্যাহতি দিয়ে যে-সব দুঃখ ঘনিয়ে আসে ঘোলাটে চিন্তার পথে চলতে গিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার বিপাকে পড়লে। কথাটা আরো পরিষ্কার ক'রে বলি। মানুষ অনেক কিছু চায় যাকে পাওয়া যায় না ভুল পথে চললে। এই সব ক্ষেত্রে যুক্তি বা বুদ্ধি নির্দেশ দিতে পারে—কোন্ পথে চললে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব। আমার আপত্তি এইখানে যে, যাঁরা বলেন আমি বুদ্ধির সুফল নিয়ে বাড়াবাড়ি করি তাঁরা আমার মুখে বসিয়ে দেন এমন অনেক অযৌক্তিক কথা যা আমি বলিনি কোনোদিনো। আমি বলিনি বুদ্ধি বা যুক্তি জীবনের কর্মের প্রেরণা হ'তে পারে—ব'লে এসেছি বরাবরই যে কামনাবাসনা, আবেগ উচ্ছ্বাসই আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

( রাসেলের ঐ প্রবন্ধটি থেকে আর একটু উদ্ধৃত করি। রাসেল লিখছেন: "There is another, more sinister, motive for liking irrationality. If men are sufficiently irrational, you may be able to induce them to serve your interests under the impression that they are serving their own. This case is very common in politics. Most political leaders acquire their position by causing large numbers of people to believe that these leaders are actuated by altruistic desires. It is well-known that such a belief is more readily accepted under the influence of excitement. I suppose the advocates of unreason think that there is a better chance of profitably deceiving the populace if they keep it in a state of effervescence. Perhaps it is my dislike of this sort of process which leads people to say that I am unduly rational." )

তারপর একথা সেকথা। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "আপনার Impact of Science on Society বইটি নিউয়র্কে পড়লাম। এর পরে আরো কোনো বই লিখেছেন কি ?"

রাসেল বললেন: "একটা গল্পের বই লিখে ফেলেছি—হঠাৎ।"

আমি বললাম: "গল্পের বই ? কী আশ্চর্য! জানেন, কালই আমি মনে মনে ভাবছিলাম আপনি একটি গল্পের বই লিখলে কেমন হয়!"

রাসেল হাসলেন: "তাই নাকি ?"

ব'লে তাঁর এ-বইটি আমাকে উপহার দিলেন নাম লিখে। বইটির নাম "Satan in the Suburbs"।

বিদায় নেবার সময়ে বললাম : "তাহ'লে কবে গান হবে আপনার এখানে ?"

রাসেল বললেন : "দেখি। ব'লে তাঁর পকেট বই খুলে বললেন : "রোজই তো দেখি একটা না একটা কিছু লেগেই আছে—এই যে—১১ই—১১ই হ'তে পারে। সেদিন কি সুবিধা হবে ?"

"বেশ।"

বিদায় নেবার সময়ে রাসেল আমাদের সঙ্গে সিঁড়ি অবধি এলেন, নিচে নামেন আর কি, এমন সময়ে ইন্দিরা বাধা দিয়ে বলল : "সে হবে না, আপনি কষ্ট ক'রে নিচে যাবেন না।"

রাসেল করপীড়ন ক'রে হেসে বললেন : "আচ্ছা।"

লেডি রাসেল আমাদের নিয়ে দোরগোড়া অবধি পৌঁছে দিয়ে বললেন : "তবে ১১ই, কথা রইল।"

আমি বললাম : "বেশ। পকেট বইয়ে লর্ড রাসেল যেন লিখে রাখেন।"

লেডি রাসেল বললেন : "পকেট বইয়ে লিখে রাখতে হবে না। ওঁর স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত।"

গেট থেকে বেরুচ্ছি এমন সময়ে রাসেলের পুত্রবধূ সুসান রাসেল ও পুত্র জন এসে হাজির। সুসানের সঙ্গে আমাদের পত্র-ব্যবহার ছিল : ইন্দিরার শ্রুতাঞ্জলি ও আমার Among the Great প'ড়ে ও আমাদের উচ্ছ্বসিত পত্র লিখেছিল। জনকে আমাদের সাম্‌নে পেশ ক'রে ও আলাপ করিয়ে দিল—"আমার স্বামী, জন।"

আমি বললাম : "জন ? তোমাকে আমি পাঁচ বছরের ছেলে দেখেছিলাম ১৯২৭ সালে।"

জন হাসল।

আমি সুসানকে বললাম হেসে : "জানো, ১৯২৭ সালে ওর সঙ্গে যখন লর্ড রাসেল আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান ব'লে, তখন ও ভেবেছিল আমি বুঝি রেড ইণ্ডিয়ান, বলেছিল : 'I will kill him.' "

জন ও সুসান হেসে উঠল—আমরা যোগ দিলাম।

আমি বললাম : "সুসান ! আমরা ১১ই ফের আসব। আমি গাইব, ইন্দিরা নাচবে।"

সুসান আনন্দে প্রায় হাততালি দেয় আর কি : "চমৎকার !"

(এর পরে নৃত্যগীতের আসরের রিপোর্টটিও আমি লিখেছিলাম ইংরাজিতে ইন্দিরার সহযোগিতায়। এ রিপোর্ট তারই সারানুবাদ—যতটা সম্ভব বাংলা ইডিয়মে।)

এগারই জুলাই আমরা আমাদের বিমানঘাটির বন্ধু বিনোদ মোদিকে বললাম তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের রিচমণ্ড নিয়ে যেতে। তিনি এলেন ঠিক বেলা তিনটের সময়। ঐ সঙ্গে আর একজন এল—জ্যোতি মল্লিক—আমাদের এলাহাবাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের ছোট ছেলে। এই তীক্ষ্ণধী যুবক লণ্ডন থেকে কিছু দূরে আছে, কেমিকাল এঞ্জিনিয়ারিঙে বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা হ'য়ে এদেশে এসেছে। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য আশ্চর্য।

চারজনে মিলে যখন লর্ড রাসেলের ওখানে পৌছলাম তখন বেলা চারটে। এবার আমাদের উপরে নিয়ে গেল সুসান।

রাসেলের ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে করপীড়ন ক'রে বসতে-না-বসতে চা-র ট্রে হাতে লেডি রাসেলের প্রবেশ। রাসেল উঠে কাছাকাছি একটি চেয়ার আছে কিনা দেখতে লাগলেন।

আমরাও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালাম। রাসেল "বোসো বোসো" ব'লেই বেরিয়ে গেলেন একটি চেয়ার আনতে। আমি জ্যোতিকে ইঙ্গিত করলাম। ঘরে রাসেল একটি চেয়ার নিয়ে ঢুকতেই জ্যোতি এগিয়ে লর্ড রাসেলের সঙ্গে ধরাধরি ক'রে চেয়ারটি এনে লেডি রাসেলের কাছে রাখল, তিনি বসলেন।

আমি বিনোদ মোদির ডাক্তারি গুণপনার কীর্তিকাহিনী রাসেলের কাছে যথাবিধি পেশ করলাম। তারপর জ্যোতিকে দেখিয়ে বললাম:

"জানেন লর্ড রাসেল, এই ছেলেটি আমাদের এক অতি প্রিয় বন্ধু শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের মেধাবী সন্তান: বিধুভূষণ এলাহাবাদের চীফ জাসটিস, কিন্তু তাঁর পুত্রের মনের গড়ন একেবারে ভিন্ন: ইনি চিত্রী, কবি তথা কেমিকাল এঞ্জিনিয়ার: যুগপৎ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক—বিরল যোগাযোগ!"

রাসেল হেসে বললেন: "বিরল ব'লে বিরল! লিওনার্দো দা ভিঞ্চির পরে এমন মানুষ বোধহয় এই প্রথম জন্মালো।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

*

এই সময়ে কী একটা কারণে রাসেল হঠাৎ আবার উঠে দাঁড়াতে আমরাও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালাম।

রাসেল জোরালো কণ্ঠে বললেন : "বোসো, বোসো। আমি উঠে দাঁড়ালেই যে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরো উঠে দাঁড়াতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এ-ধরনের লৌকিকতায় মানুষ শুধু বিব্রতই বোধ করে।"

আমি হেসে বললাম : "মনে পড়ল—আপনার চীনের সমস্যা বইটিতে আপনি লিখেছিলেন ওরা পূর্বপুরুষদের পূজা করে বড় বেশি।"

রাসেল বললেন : "হ্যাঁ। পূর্বপুরুষদের বেশি পূজা করা কিছু নয়। কারণ যদি একথা সত্য হয় যে জগৎ একজায়গায় নিশ্চল হ'য়ে ব'সে নেই, চলেছে বিকাশের দিকে, তাহ'লে সিদ্ধান্ত করতেই হবে যে আমাদের পূর্বপুরুষদেব চেয়ে আমরা কিছুটা অন্তত এগিয়েছি।"

আমি বললাম : "কিন্তু পূর্বপুরুষদের পূজা করতে আমরাও ভালোবাসি যে।"

রাসেল বললেন : "অমন কাজটি কোরো না। কারণ তাহ'লে কবে যে অজান্তে বাঁদরদের পূজা সুরু ক'রে দেবে কে জানে?"

আমরা ফের একজোটে হেসে উঠলাম।

চা-র ট্রে হাতে নিয়ে লেডি রাসেল বেরিয়ে গেলেন। রাসেলও তাঁকে সাহায্য করলেন এ-বিষয়ে। (লেডি রাসেল ইন্দিরাকে বললেন যে, রাসেল অনেক সময়েই নিজে হাতে বাসন ধোন।) তারপর ব'সে সুস্থির হ'য়ে তিনি পাইপ ধরালেন। দু'দিন আগে রুষ দেশে বেরিয়ার পতন নিয়ে কথা উঠল।

"এ সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়, লর্ড রাসেল?"

রাসেল চিন্তিত স্বরে বললেন : "বলা মুস্কিল।"

আমি বললাম : "এবার হয়ত মালেনকভ মলোটভের দফা সারবে?"

"কে বলতে পারে?" বললেন রাসেল। "কারণ মলোটভও তো মালেনকভের দফা সারতে পারে। তবে এটা ঠিক যে দু'জনের একজন ডুববে : হয় এ, নয় ও।" ব'লে একটু থেমে ধূমপান করতে করতে চিন্তিত স্বরে বললেন : "শক্তি বড় বিচিত্র বস্তু! শক্তির জন্যে মানুষ কত সয় : সর্বদা মৃত্যুভয়ে কাল কাটাতেও রাজি!"

আমি বললাম : "আপনার বলশেভিস্‌মের থিওরি ও প্র্যাকটিস বইটিতে আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ওর সর্বনাশা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে—সে কবে!—আর সে এমন সময়ে যখন বহু চিন্তাশীল মানুষও ওর মোহে প'ড়ে বলশেভিস্‌ম সম্বন্ধে যা-তা উচ্ছ্বাস সুরু করেছিল। আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয় বৈ কি—যদিও অনেকে পরে দেখতে পেয়েছিলেন ওর নিজ মূর্তি যেমন কসলার, গীদ, সিলোনে, রাইট, স্পেণ্ডার ইত্যাদি।"

রাসেল মৃদুহেসে বললেন: "কিন্তু সে-সময়ে আমি অরণ্যেই রোদন করেছিলাম।"

কথায় কথায় চীনদের প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

আমি বললাম: "আপনি কোথায় একবার লিখেছিলেন যে চীনারা হয়ত নতুন এক ধরনের কম্যুনিস্‌ম্ গ'ড়ে তুলতেও পারে।"

"লিখেছিলাম বটে। কিন্তু আমার সে-আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ আজকের দিনে চীন ও রুষ—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। ধরো ওদের বুদ্ধি-বাদীদের ব্রেনওয়াশিং—কী ভয়ঙ্কর! ওরা ঠিক যেন টিয়াপাখির মতন কপ্‌চাতে সুরু করেছে রাশিয়ার বুলি! নিদারুণ!"

* * *

এর পর আমাদের নৃত্যগীত সুরু হ'ল। আমি প্রথমে গাইলাম পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল ··"। পরে ওর জর্মন অনুবাদ—একই সুরে।

রাসেল খুশি হ'য়ে ব'লে উঠলেন:

"Very exciting, very exciting!"

তারপর আমি গাইলাম "বন্দে মাতরম্" আমার স্বরচিত সুরে ইন্দিরার নৃত্যসঙ্গতে। লেডি রাসেল, সুসান ও জন তো আনন্দে অধীর!

লর্ড রাসেল বললেন ইন্দিরাকে: "অবর্ণনীয় সুন্দর! জানো, তুমি যখন এলে আমি তোমার বেশভূষা দেখে মনে মনে প্রশংসা করছিলাম। কিন্তু যখন তুমি নাচ সুরু করলে আমি দেখছিলাম শুধু 'তোমার' সৌন্দর্য।"

তারপর আমি গাইলাম পিতৃদেব-রচিত শিবনামকীর্তন "ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা", যে-গানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন অলডাস হাক্সলি—হলিউডে, বলেছিলেন: "কী শক্তি-উচ্ছল গান!"

রাসেল গানান্তে সোৎসাহে বললেন: "প্রাণশক্তিতে ভরপুর!"

সর্বশেষে আমি গাইলাম ইন্দিরা-রচিত কৃষ্ণনৃত্য "শান্ত গগনমে—কুঞ্জন বনমে মুরলী মধুর বজায়ে"—যেটি প্রেমাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে।

রাসেল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে "অপূর্ব! (Exquisite!)" ব'লেই ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমার প্রতি ভঙ্গিটি এত লাবণ্যময় যে মনে হয়—আহা, যদি প্রত্যেকটিকে আলাদা করে দেখে চেখে চেখে উপভোগ করা যেত!"

আমি বললাম: দেশে ফিরে আপনাকে আমাদের আরো কয়েকটি রেকর্ড পাঠাব।"

রাসেল বললেন: "বহু ধন্যবাদ। যেগুলি তুমি পাঠিয়েছিলে, অতি চিত্তাকর্ষক। আমার ছেলে ও বৌমা তো শুনে উচ্ছ্বসিত।"

বিদায় নেবার সময়ে বললাম: "আপনার কাছে আমি যে কী গভীরভাবে ঋণী, লর্ড রাসেল!—তাইতো আপনাকে একটু আনন্দ দিতে পেরে আমার এত আনন্দ! এ-অধিকার যে আপনি আমাদের দিলেন এজন্যে আপনার কাছে আমরা বড় কৃতজ্ঞ জানবেন।"

রাসেল বললেন: "অধিকার? বরং বলো তোমরা অধিকার দিলে আমাদের এ-নাচগান শোনবার। ধন্যবাদ তো তোমাদেরই প্রাপ্য।"

* * *

কবি বলেছেন: "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই।" উক্তিটি বৈরাগ্যের। বৈরাগ্যের মধ্যে সত্য কিছু আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মিথ্যারও মিশেল আছে বৈ কি। কারণ আমরা অনেক কিছু চাই যা ভ্রান্ত নয় একথা বলা চলে। বৈরাগ্যবাদী তর্ক তুলবেন: "ভ্রান্ত নয় মানে? আমরা চাই ধন জন যশোমান দেহসুখ —কত কী। ভাবি এদের কাছে পাব তৃপ্তি। পাই না তো? সুতরাং চাওয়াটার যে গোড়ায়ই গলদ আছে না-মেনে উপায় কি?" একথা সত্য। আমরা এসব বরের কাছে সে-পরম বস্তু পাই না যার জন্যে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ ক্ষুধিত হ'য়ে ফিরেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে এসব থেকেই কিছু অন্তত পাই। য়ুরোপের বিলাসব্যবস্থার মধ্যে এসে একথা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের বাগানে, নৈসর্গিক শোভায়, ইংরাজের সততায়, হাস্যপ্রিয়তায়—আরো কত কী। এই যে রাসেলের কাছে গিয়ে মন ভ'রে উঠল—বলব কি তাঁর সঙ্গ যে চেয়েছিলাম—ভুল ক'রে চেয়েছিলাম? তাঁর হাসির মধ্যে তৃপ্তি পাইনি একথা বললে কি সত্যের অপলাপ হবে না? মানুষ পথচলায় হাজারো ছোটবড় আশানিরাশা, সুখদুঃখ, হাসি-অশ্রুর কড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে তার অভিজ্ঞতার থলি ভরতি করে। এসবই মায়া—এত বড় কথা শঙ্করাচার্য বা উপনিষদের ঋষি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না। কারণ আমাদের মন অন্তত এখনো "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" এ-মন্ত্রকে মনে প্রাণে অঙ্গীকার করতে পারেনি। যাজ্ঞবল্ক্য বা শঙ্করাচার্যের কাছে যা অপ্রতিবাদ্য উপলব্ধির মর্যাদা পেয়েছে, আমাদের কাছে সে সে-মূল্য পেতে পারে না। আবুহোসেন খলিফার সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসেও ঠিক রাজসুখ পায়নি। একটা বিকাশের পরে যে-চোখে আমরা জগৎকে দেখি সে-বিকাশ অধিগত

হবার আগে সে-দৃষ্টি খোলে না, খুলতে পারে না। আশাভঙ্গ ব'লে একটা বেদনা অবশ্য আছেই, অনেক কিছুর কাছে আমরা হাত পাতি, ভাবি পাব অঢেল, পাই হয়ত মুষ্টিভিক্ষা। কিন্তু তাই ব'লে মুষ্টিভিক্ষাকে শূন্যভিক্ষা বলা চলে না। আমাদের মনের ভাব নানা সময়ে নানা সুরে বাঁধা হ'য়ে থাকে, কে বাঁধে জানি না কিন্তু যখন ঠিক সেই সুরটি অন্য কোথাও বেজে ওঠে আমাদের মনের তার সাড়া দেয়ই দেয়—যাকে বলে অনুরণন—resonance : তৃষ্ণার মুহূর্তে জল অকাট্য তৃপ্তি না-দিয়ে পারে না। একথা পুনরায় উপলব্ধি করেছিলাম নিউয়র্কে ও ইংলণ্ডে যখন দুই রাজধানীতেই দেখা মিলল শাহেদের। বহু বৎসর আগে জর্মনিতে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা। বন্ধুত্ব হয়েছিল গভীর। ওর সৌকুমার্য, শালীনতা, বিদ্যা, সর্বোপরি রসিকতা আমাকে সে-সময়ে নিবিড় আনন্দ দিত। শুনতাম ওর কাছে রাশিয়ার কথা, ইতালির কথা, স্পেনের কথা—শুনতাম নানা জাতির নানা গুণাগুণের কথা। বলত ও কত যে গল্প—বিচিত্র কাহিনী! আমার প্রথম উপন্যাস "মনের পরশ"-এ ওর চরিত্র এঁকেছি খানিকটা—য়ুসুফ নাম দিয়ে। এহেন বহুদিনের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ নিউয়র্কে এক গানের আসরে দেখা হ'তে মনে জাগল উল্লাস। চার পাঁচদিন ওর সাহচর্যে ইন্দিরা ও আমি যে-আনন্দ পেলাম তাকে প্রায় নিখুঁৎ বলা চলে। প্রথম দিন ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে হোটেলে ফিরে এসে আনন্দ আমার উচ্ছল হ'য়ে উঠেছিল—যে-কয়দিন ওর সঙ্গে ছিলাম পরম উল্লাসেই কেটেছিল। একে হয়ত নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক আনন্দ বলা চলে না, কিন্তু প্রাণজগতের আনন্দও কিছু দেয়ই প্রাণীকে, কিছু সহায়তা করেই তার আধ্যাত্মিক বিকাশের—নৈলে জগৎজোড়া প্রাণলীলার মেলা বসতেই পারত না—উপনিষদের ঋষিও লিখতেন না বড় গলা ক'রে: "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—যদি আকাশে বাতাসে আনন্দ না থাকত তবে কেই বা চাইত বাঁচতে?"

সেই শাহেদের সঙ্গে ফের হঠাৎ দেখা ইংলণ্ডে! ও নিউয়র্ক থেকে কানাডা ঘুরে ইংলণ্ডে ঢুঁ মেরে ইতালি যাবে, এমন সময় ও খবর পেল আমরা লণ্ডনে। এল ঝটিতি আমাদের কাছে। তিনচার দিন ফের আনন্দে কাটল। কত গল্পই হ'ল ফের! মানি এ-সব গল্পের আনন্দরেখা চিরস্থায়ী নয়। হয়ত মাসাধিক কাল সহবাস করলে যেত উবে বা পুরোনো হ'য়ে। কিন্তু সৌন্দর্য যখন কোনো অল্প অবকাশের মধ্যে নিবিড় হ'য়ে ধরা দেয় তখন ফ্রেমে-ভরা ছবির মতনই অনবদ্য হ'য়ে ফুটে ওঠে। ঠিক তেম্নি হ'ল আমাদের ইংরাজ বন্ধু পীটারের

স্নেহসঙ্গ পেয়ে। যতই বলি না কেন এ-জগৎ মায়া, এখানে যা কিছু চাই ভুল ক'রে চাই—আমাদের মন যদি মানেও, তবু প্রাণ এ-কথায় পুরো সায় দেয় না। তাই পীটারের ইংরাজি রসিকতা ও শাহেদের ভারতীয় রসালাপে এত তৃপ্তি পেয়েছিলাম—আরো এইজন্যে যে, এ দুই বন্ধুর সঙ্গে একটা সহজ স্নেহের মাধ্যমে এ-রসিকতা উঠেছিল অপূর্ব হ'য়ে। রাসেলের রসিকতার বেলায়ও ঐ কথা। কিন্তু এবার বলি চক ও শাহেদের রসিকতার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। পরে হয়ত ভুলে যাব—থাক না লেখার জালে বাঁধা।

শাহেদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে কার কী মনে হয়। ও হঠাৎ বলল: "শোনো বলি একটা মজার গল্প। আমার এক ইংরাজ বান্ধবী একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক ভূতচক্রে। হঠাৎ প্রায়ান্ধকার ঘরে তাঁর মৃত স্বামীর স্বর শোনা গেল। বান্ধবী তো আত্মহারা। আমরা শুনতে লাগলাম বিদেহী ভর্তার সঙ্গে বিধবা জায়ার সংলাপ:

'জ্যাক্! তুমি?'

'আমি—আমি—লুসি—সাক্ষাৎ আমি।'

'তুমি আমাদের অভাব বোধ করো না, জ্যাক্?'

'না। লুসি।'

'এতই সুখী হয়েছ—যেখানে আছ?'

'হ্যাঁ, লুসি। মহাসুখে।'

'এখানকার চেয়েও সুখে?'

'অনেক বেশি সুখে।'

'কোথায় আছ তুমি এখন? স্বর্গে?'

'ক্ষেপেছ?'...

উত্তরে ইন্দিরা হেসে ওকে বলল শিখদের গল্প: "দুই শিখের পথে দেখা। দু'জনেই কানে কম শোনে। একজন আর একজনকে বলছে: 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গুরুদ্বারে?' (শিখদের মন্দিরকে বলে গুরুদ্বার।)

'না,' উত্তর দিল সে, "আমি যাচ্ছি গুরুদ্বারে।'

'মাপ করবেন,' বলল প্রথম শিখ, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি গুরুদ্বারে যাচ্ছেন।'"

বধিরদের না-শুনে শোনার ভঙ্গি ক'রে বিপদে পড়ার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা এ-রসিকতার মর্মগ্রহণ করতে পারবেন।



শাহেদ খুব হেসে বলল: "তবে শুনুন আমিও বলি আর এক শিখদের গল্প:

"এক যাদুঘরে গেছেন এক মহামহোপাধ্যায় শিখ ধুরন্ধর। সেখানে যাদুঘরের অধ্যক্ষ তাঁকে দেখালেন এক নরকপাল—বললেন এটি হ'ল মহাবীর রণজিৎ সিঙের মাথার খুলি। মহামহোপাধ্যায় সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন। কিন্তু পরে হঠাৎ তাঁর মনে সংশয় এল। বললেন: 'রণজিৎ সিং তো ছিলেন মহাকায় পুরুষ। এ-খুলি যে ছোট্ট—প্রায় শিশুর মাথা!' অধ্যক্ষ বললেন: 'ঠিক। কিন্তু এ-হ'ল তাঁর ছেলেবেলাকারই মাথা।' ধুরন্ধর বললেন: 'ও!'"

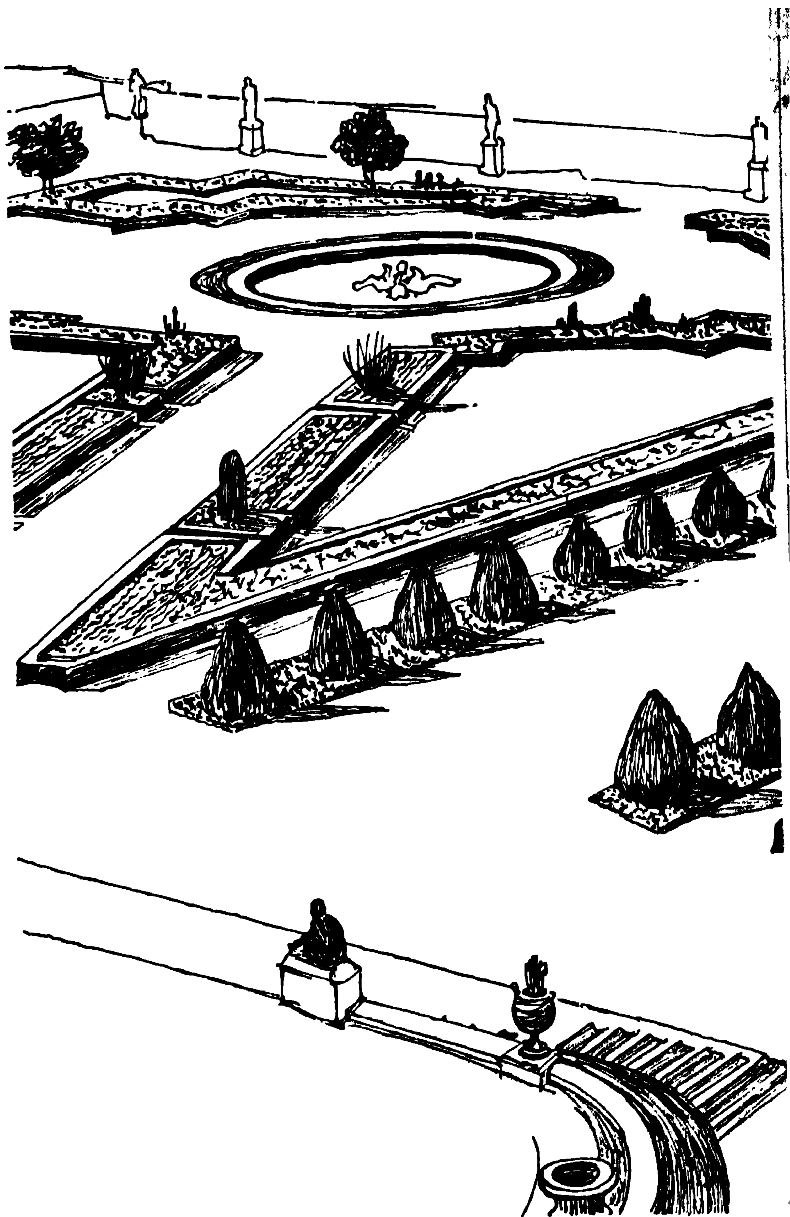
রেস্তরাঁয় খাচ্ছি আমি, পীটার, শাহেদ ও ইন্দিরা। ইন্দিরা খাবার নিয়েছে খেতে পারছে না। আমি বললাম: "নিলে কেন?" ইন্দিরা বলল: "বড্ড বেশি দিয়েছে।" আমি বললাম: "নিয়েছ যখন ফেলতে পাবে না।"

শাহেদ বলল: "তোমার কথা শুনে মনে পড়ল এক কাবুলিওয়ালার কথা। দিল্লি এসে সে লাল লঙ্কা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গোটা এক আধুলির লঙ্কাই কিনে ফেলল। কিন্তু মুখে দিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। চোখে বইল ধারা। তবু সে ছাড়বে না—চিবুতে লাগল প্রাণপণে। একজন বলল: 'মিঞা! কী চিবুচ্ছ?' কাবুলিওয়ালা সাশ্রুনেত্রে বলল: 'আমার আধুলি।'"

পীটার বলল: "তবে আমিও বলি এক বোকার গল্প। এক চিত্রকর আঁকছে ছবি—পথে। হঠাৎ তার এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে বলল: 'বেশ হয়েছে। আমার বাবার ছবি আঁকো।' চিত্রকর বললেন: 'তোমার বাবা কবে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছেন তাঁর মুখ কি আর আমার মনে আছে?' পুত্র বলল: 'তা হবে না। মনে ক'রে আঁকো। এতবড় চিত্রী তুমি—এ যদি না পারবে তবে তুলি ধরেছ কেন?' চিত্রকর কী আর করেন—যা পারেন আঁকলেন। পুত্র বলল সোল্লাসে: 'সাবাস্। অবিকল বাবা! কেবল—তিনি কী বদ্‌লেই গেছেন!'"

অননুতপ্ত ভাবে পুনরায় স্বীকার করছি এদের সাহচর্যে পেয়েছিলাম যে আনন্দ তাকে মায়া বলতে বাধে।

* * *



# ফ্রান্স

# পারিস

পারিসে পৌছলাম আকাশপথে বারই জুলাই। বিনোদ মোদি লণ্ডনে বিমান-ঘাঁটিতে পৌছে দিল তার মোটরে। পীটার ছিল সঙ্গে। বিদায়লগ্নে তার চোখ চিকচিক ক'রে উঠল। সেই শাশ্বত অভিজ্ঞতা—প্রীতির মাধ্যমে একজন সহজেই এসে পৌছল আর একজনের কাছে, মিলল মনের পরশ, ঘটল স্নেহের শুভদৃষ্টি। ইংরাজ জাত সহজে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। তাই পীটারের চোখে জল দেখে মন উঠল আর্দ্র হ'য়ে। মাত্র এ-দুসপ্তাহে ও আমাদের কত কাছেই এসেছিল! ওর বান্ধবী ডোরিস-ও। ডোরিসের বাড়ির এক অংশে পীটার থাকে লণ্ডনের খুব বনেদি পাড়ায়—কুইন্স গেট টেরেস। ওদের ওখানে দু-তিন দিন খাওয়াদাওয়া গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে আমরা ডোরিস ও পীটার দুজনকেই পেয়েছিলাম যেন আরো কাছে। পারিসে পৌছেই ওদের লিখেছিলাম আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। উত্তরে পীটার লিখল ধমকে: "You mustn't write me letters like the one received today unless you want my heart to burst : but perhaps that is a good thing to happen ? Is it possible, I ask myself, that Chartered Accountants actually have feelings like human beings ? It seems that it must be so—in some cases at least. Also the wonder is that you should both take me to your hearts......and how I delight and am proud to be there !"

ডোরিস লিখল: "Dear both of you! Your wonderful affection has warmed us up and made us so happy ! Our thanks are due to you for sparing so much of yourselves so generously. It is quite inadequate to say that we miss you terribly ; the consolation is that we know there is a bond between us, the four of us, that cannot be broken".

ইন্দিরার ইংরাজ মামীমাও (মিসেস মুরিয়েল নন্দা) আমাদের লিখলেন একটি চিঠি। মুখে তিনি বড় বেশি কিছু বলেন নি। ইংরাজ স্বভাবে অনুচ্ছ্বাসী—সবাই জানে। আবেগ প্রকাশ করতে ওদের কী যে লজ্জা! কিন্তু যদিও ওরা উচ্ছ্বাসকে মনের কোলে তা দেবে, মুখ ফুটে বলবে না কিছুতেই। বলে না—নিথর জলের গভীরতা বেশি—still waters run deep ? ওদের হৃদয়ের স্পর্শ

যখন ওরা দেয় তখন দেয় মৌখিক কি লৌকিক ভাবে নয়—অস্থায়ী ভাবে তে নয়ই। ইংরাজ যখন প্রীতির বন্ধনে ধরা দেয় তখন সে সহজে মুক্তি পেতে চায় না। ইংরাজকে যাঁরা ইংলণ্ডে দেখেছেন ও জেনেছেন তাঁদের প্রায় সবারই এই অভিজ্ঞতা হয় একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। রাসেলের প্রীতির স্পর্শ পেয়ে একথা যেন আরো বেশি ক'রে তথা নতুন ক'রে অনুভব করেছিলাম। কবে থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ: ১৯২১ সাল! তবু এ-বত্রিশ বৎসরেও তাঁর স্নেহের উত্তাপ কই একটুও তো ফিঁকে হয় নি! অথচ কত বাঙালীর সঙ্গেই মিতালি হয়েছে কিন্তু উবে গেছে হৃদয়তাপ দেখতে দেখতে! মানুষ অনেক কিছুই চায়—কিন্তু খুব বেশি ক'রে চায়, নিরন্তর চায়, বোধ হয় একটি জিনিস যার জুড়ি মেলা ভার—অপরের প্রীতি—আর এমন প্রীতি যা ক্ষণস্থায়ী নয়। ভগবানের দুটি রূপ আছে: শাশ্বত ও পুনর্নব। জীবনের স্রোতের মধ্যে নিত্য ফুটে ওঠে পুনর্নবের ছবি—পাই চলমানের স্বাদ। কিন্তু আজ আছে কাল নেই এমন বস্তুর মধ্যে রসের অভাব না থাকলেও খতিয়ে অতৃপ্তিই হ'য়ে ওঠে কণ্ঠমালা। তাই যুগে যুগে মানুষ চেয়ে এসেছে চলমানের অন্তরালে অচলপ্রতিষ্ঠের পরম দর্শন। প্রীতির লেনদেনের বেলায়ও ঐ কথা। বলতে কি, কাম ও প্রেমের মধ্যে প্রধান তফাত তো এইখানেই যে, কাম অস্থায়ী, প্রেম স্থায়ী। লরেন্স বলেছেন রোখ ক'রে: "অস্থায়ী—তাই কী? ফুলও তো অস্থায়ী—তাই ব'লে কি সে কম সুন্দর?" না, একটু আগেই কবুল করেছি যে অস্থায়ীর মধ্যেও সৌন্দর্যের রস মেলে বৈ কি, নৈলে অস্থায়ীর জন্যে মানুষ এত কাড়াকাড়ি করত না কখনই! মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তো না মেনে উপায় নেই যে অস্থায়ী রস তীব্র হ'লেও গভীর হ'তে পারে না। যদি পারত তবে স্থায়ীকে চাইত কে? তাই ভারত জোর দিয়েছে বিভুর স্থায়ী রূপের 'পরে, পাশ্চাত্য জগৎ কাড়াকাড়ি ক'রে এসেছে অস্থায়ী চেকনাই নিয়ে—ধন, বিলাস, শক্তি, কামনা, উত্তেজনা, চমক। মানুষের জীবনের পূর্ণায়তি লাভ হয় এই দুই চাওয়ার সমন্বয়েই বটে, কিন্তু তবু বলব সার্থক জীবনের মেলা বসতে পারে স্থায়িত্বেরই অচল ভিৎ-এ, অস্থায়ী চোরাবালির 'পরে নয়। যদি পারত তবে মানুষ শুধু চলমানের কারবার ক'রেই বলত "কৃতার্থোঽস্মি"।

* * *

পারিসের পথঘাটে আবার বিচরণ—কতদিন বাদে! ঠিক ছাব্বিশ বৎসর। পারিস একসময়ে আমার মনকে চমকে দিত—মনে হ'ত সে-চমক বুঝি অফুরন্ত।

কিন্তু না। দেখলাম—ফুরিয়ে গেছে। তবে পারিস বিশেষ বদলায় নি, বদলেছি আমি। তাই সেই থিয়েটার, সেই অপেরা, সেই ভার্সাই, সেই শাঁসেলিসে, সেই বোয়া দ বুলোন, নোৎর্ দাম্, জার্দ্যাঁ দ লুক্সঁবুর্গ—সবই তেম্‌নি চমকপ্রদ থাকলেও এসবের আবেদনের দোলে মন যেন আশ্রয় পায় না আর। আদৌ ভালো লাগে না এতটা বলব না, তবে দেখতে দেখতে হাওয়া! এমন কি, অমন যে ফরাসী রন্ধনশিল্প—মনে হ'ল স্বাদ জুগিয়েও সাধ মেটাতে পারে না আর। এর নাম বৈরাগ্য নয়—এর নাম—কী বলব?—(যাকে মনে টের পাই মুখে বুঝিয়ে বলতে বেগ পাই)—মনে হ'ল যেন এসব থেকেও নেই—ক্ষণিক চিত্তবিনোদন। বৈচিত্র্যের মোহ কেটে গেলে যে-বিতৃষ্ণা না হোক শূন্যতা উপচিত হ'য়ে ওঠে—এ সেই।

পারিসে ইন্দিরাকে দেখালাম কত কী! টুরিস্ট মনোবৃত্তি নেই আমাদের কারুরি। তাই যা কিছু দেখলাম উপর উপর দেখেই ক্ষান্তি। কত শত সৌধ বাইরে থেকে দেখেই ইন্দিরা খুশি। তবে ভালো লাগল পারিসের নানা উদ্যান, নানা অট্টালিকার স্থাপত্য। এফেল টাওয়ারকে দূর থেকে দেখেই দণ্ডবৎ।

* * *

কিন্তু একটি দৃশ্য চম্‌কে দিয়েছিল, তাই বলি একটু—কী ব্যাপার।

পারিসে একটি মায়াঘর দেখলাম ১৬ই তারিখে। মায়াঘরটির নাম Musée Jervin অর্থাৎ জার্ভ্যাঁ নামে কোনো প্রতিষ্ঠাতার জাদুঘর। আশ্চর্য, এতবার পারিসে এসেছি এ-মায়াঘরটির নামও শুনি নি! অথচ কী অদ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটা এখানে দিনের পর দিন নির্বাহিত হচ্ছে!

প্রথম এখানে দেখলাম, নিচের তলায়, নানা নরনারীর মূর্তি—মোমের পুতুল যাকে বলে। কত প্রাচীন ও জীবিত মনীষী রাজা বক্তা মন্ত্রী সেনানীর মূর্তি। দেখলে ভুল হয় জীবন্ত মানুষ ব'লে। লণ্ডনে মাদাম তুসোর জাদুঘরে এসব মোমের প্রতিমা কে না দেখেছেন? তাই এ নিয়ে লেখনী-চালনার মানে সময় নষ্ট।

কিন্তু তার পরে গেলাম এর Palais de Mirages-এ। এর বাংলা তর্জমা—মরীচিকার প্রাসাদ। এর বর্ণনা অসম্ভব। কারণ এ-ধরনের কোনো দৃশ্য যে এ-জগতে আর কোথাও নেই এ নিশ্চিত। যে-বস্তুর কোনো পরিচয়ই কখনো পাই নি তার বর্ণনা করবে কে? দেখতে হয়—শুনে কী হবে! অপরোক্ষ অনুভূতির ব্যাখ্যা করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

তাই বলি সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে: শুধু কৌতূহল জাগাতে।

একটি গোল ঘর। দেয়াল আয়নায় মোড়া। ঘরটিতে কতরকম স্তম্ভ কতরকম দেয়ালি—বাতির আলো নানারঙা—দৃশ্যও বদ্‌লে যায় ক্ষণে ক্ষণে। এইমাত্র যেখানে শিবের মূর্তি ছিল, বদ্‌লে নর্তকীর মূর্তি হ'য়ে দাঁড়াল! কত যে আলোর প্রজাপতি উড়ছে আর প্রতি আলো অজস্র আয়নায় বহুধা চিকমিক ঝিকমিক ক'রে উঠছে! গোলকধাঁধা মনে হয় অথচ আলোর গোলকধাঁধা—সুন্দর সুন্দর কত-রকম ছাদ, অলিগলি, তোরণ! —সে না দেখলে কল্পনা করা অসম্ভব। ফুল ছিঁড়ে বাগানের বর্ণনা কোনো কাজের কথা নয়। বাগানে এসে ফুল দেখুন। পারিসে এ-মায়াঘর দেখাই চাই।

* * *

দিল্লিতে গত বৎসর একটি ভারতীয় ছাত্র—জগদীশ মেহ্‌রা—আমাদের কাছে আসত প্রায়ই। সে আমাদের বলেছিল যে সে রিসার্চ করতে জর্মনি যাবে পাঁচ বৎসরের জন্যে। জর্মনির বিখ্যাত গ্যটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পৌছয় ১৯৫২ সালের শেষে নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গের পড়ুয়া হ'য়ে। সেখান থেকে সে খোঁজ ক'রে বহু কষ্টে আমাদের পারিসের ঠিকানা যোগাড় ক'রে ছুটে এল আমাদের হোটেলে পনরই। কিছুতে ছাড়বে না—গ্যটিংগেনে যেতেই হবে, জর্মনিকে বাদ দিলে আমাদের ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বলল—ওখানে বহু মান্যগণ্য গুণিজ্ঞানী ওকে নাকি ধরেছেন—আমাদের কোনোমতে গ্যটিংগেনে এনে হাজির করতে। অগত্যা রাজি হলাম। ঠিক হ'ল ২১শে ট্রেনে রওনা হ'য়ে ২২শে পৌছব গ্যটিংগেনে ও সেখানে দু-একটি আসর জমিয়ে যাব সরাসর সুইজর্লণ্ডে। আমাদের রাজি করতে পেরে ভারি উৎফুল্ল হ'য়ে ও ১৬ই জুলাই ফিরে গেল গ্যটিংগেনে আমাদের কন্সার্টের ব্যবস্থা করতে। ঠিক হ'ল: আমরা রওনা হব চার-পাঁচ দিন পরে। জর্মনি যাবার কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু ভাবলাম—যখন চরকি-লীলাকে মেনেই নেওয়া হয়েছে তখন বোঝার উপর এ তো শাকের আঁটি! দেখা যাক জর্মনিতে ভাগ্যবিধাতা কী ব্যবস্থা করেন।

* * *

পারিসে দেখা হ'ল দুটি মহিলার সঙ্গে। একজন সুইডেন-বাসিনী। নিউয়র্কে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরার সখিত্ব হয়েছিল। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু মনটি আছে যেমন সরল তেমনি সবুজ। বহু দুঃখ পেয়েছেন। একসময়ে ছিলেন ধনী, কাউণ্টেস—এখন খেটে খান। এখানে এক অনাথ-অনাথার শিবিরে দেখাশুনো করতে এসেছেন। কয়েকমাস পরে আবার নিউয়র্কে ফিরে যাবেন। ইনিই

আমাদের জন্যে পারিসের হোটেল ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। নানাভাবে আমাদের জন্য কত যে করতেন এ বর্ষীয়সী সরলা! ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বেও এঁর স্বভাবসুন্দর অন্তঃকরণে নীচতার ছোঁয়াচও লাগে নি। এঁর এক মেয়ে পণ্ডিচেরিতে আশ্রম-বাসিনী। এক ছেলে সুইডেনে। কিন্তু তিনি চান না কারুর গলগ্রহ হ'তে। তাই চাকরি ক'রে জীবিকা উপার্জন করেন এই ভূতপূর্ব কাউণ্টেস। চুল সবই সাদা হ'য়ে গেছে, কিন্তু চালচলনে এঁর তৎপরতা সমানই আছে। মুখে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের নামও নেই। ইন্দিরা তো এঁকে সখী পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। বিচিত্র বন্ধুত্ব—তরুণীর সঙ্গে বৃদ্ধা না হোক অতিপ্রৌঢ়ার অন্তরঙ্গতা! এঁর নাম মিসেস হেডবিগ হ্যামিলটন।

অন্য মহিলাটি ফরাসী। ঠিক তরুণী বলা যায় না, বয়স্কা—কিন্তু সুন্দরী। প্রসাধনের পারিপাট্যে তো ফরাসিনীর প্রতিভা সহজাত। মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন বোয়া দ বুলোন বাগানে। সেখানে এক নিকষ কুলীন হোটেলে আমাদের খাওয়ালেন প্রায় সাত হাজার ফ্রাঙ্ক ( শতাধিক টাকা ) খরচ ক'রে, এছাড়া পরিচারককে বকশিশ দিলেন থোক একহাজার ফ্রাঙ্ক ( পনের টাকা )।

কিন্তু এ-হেন ধনশালিনী মহিলার আতিথ্য স্বীকার ক'রে মন একটুও স্বস্তি পেল না। তাঁর কথাবার্তা শুনতে শুনতে দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। ফরাসীদেশে একজাতের পাণ্ডা আছে ইংরাজিতে যার নাম occultist—নেপথ্যবাদী। নানা ভুতুড়ে শক্তি নিয়ে এদের কারবার। কিন্তু এরা মনে করে নিজেদের সবজান্তা ও ঋষিকল্প। বাগাড়ম্বরে এদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু এরা প্রায়ই ভুলে যায় একটি কথা: যে, নিজেকে ঠকানো কঠিন না হ'লেও অপরকে ঠকানো ঠিক অতটা সহজ নয়। আমাদের এক বন্ধু বলেছিলেন এঁর কথা, লিখেছিলেন এঁকে আমাদের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস ও ইন্দিরার নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। বন্ধুটি চিনতে পারেন নি এঁকে—তাই ভুলেছিলেন এঁর লম্বা লম্বা কথায়। কিন্তু ইন্দিরার কাছে এ-ধরনের কথা আমল পাবে কেমন ক'রে? যে-সব কথা ইনি বললেন সে-সব ও শুনতে না শুনতে ধ'রে ফেলল—যোল কড়াই কানা।

কিন্তু কী সাংঘাতিক মনোবৃত্তি এ-জাতীয় নেপথ্যবাদীদের! মিথ্যা কথা বলতে এদের বাধে না; চায় এরা লম্বা লম্বা আধ্যাত্মিক বুলি কপ্‌চে সুস্থ মানুষকে তটস্থ করতে। কিন্তু এ-ধরনের কথা আমি গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বহু শুনেছি—তাই টের পেতে দেরী হ'ল না। তবু বলি কী ধরনের জাঁক ক'রে থাকেন এই সব সিউডো-আধ্যাত্মিক পেশাদার:

"শ্রীঅরবিন্দ যা চাইছেন আমিও তাই চাইছি···অতিমানসের অবতারণ··· শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ভার দিয়েছেন তাঁর অসমাপ্ত কাজ নির্বাহিত করার···এক চৈনিক ঋষি আমাকে এসে বললেন কত কথা···আর একবার আমার আ... গিয়েছিল তিব্বতে—সেখানকার এক মহাযোগী দিলেন আমাকে জগত্তারণের ভার ···আমি নানা ভাবে নানা লোককে শক্তি দিয়ে থাকি···নেহরুকে আমিই শক্তি দিচ্ছি দিনের পর দিন···আমি তোমাদের বলতে চাই কত কথা যে!···দিতে চাই মহাবাণী। কত রকম স্তরে যে কত ভাবে কাজ করতে হয় আমাকে!···আমি জানি আমার গত হাজার জন্মের ইতিহাস···অনেককে আমি রক্ষা করি আমার 'হীরকবর্ম' দিয়ে···লণ্ডনে শ্রীঅরবিন্দ-চক্রের সাধক-সাধিকারা আমার কাছ থেকেই শক্তি পাচ্ছেন···" ইত্যাদি হাবি-জাবি কত আড়ম্বর।

সেদিন রেস্তরাঁয় এঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদের মন বিতৃষ্ণায় ভারি হ'য়ে উঠেছিল। অতি কষ্টে বিরক্তি সংবরণ করলাম। অথচ কী জ্বালা—ইনি কিছুতেই আমাদের অব্যাহতি দেবেন না! টেলিফোনের পর টেলিফোন···কত অনুরোধ··· চিঠির পর চিঠি···এসো একবার, আমরা একত্রে ধ্যান করব—দেব তোমাদের ওপার-থেকে-আসা মহাবাণী···আরো কত কী! ভালো ফ্যাসাদ—নাছোড়বন্দ জলৌকা!

এঁর কথা শুনতে শুনতে কিন্তু একটা লাভ হয়েছিল আমার। আধ্যাত্মিক ধূর্তধুরন্ধরদের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে। কিন্তু ইনি কি ধূর্তদের দলে পড়েন? না তো। যদি ধূর্ত হ'তেন তবে কি এ-ধরনের কথা বলতেন আমাদের? নির্বোধ না হ'লে কি এ-ধরনের কথা কেউ বলে গল্‌গল্ ক'রে? লাভটা হ'ল এই যে, অতিবুদ্ধিরা যে নিজের কবর নিজেই কাটে এইটুকু প্রত্যক্ষ ভাবে জেনে সান্ত্বনার সুখ পেলাম। এমার্সন মিথ্যে বলেন নি যে, খুব কম দুঃখই আছে যার উল্টো পিঠে কোনো ক্ষতিপূরণই নেই।

অথচ এঁর কথাবার্তায় পালিশ কিছু আছেই। একটু যদি র'য়ে স'য়ে বড়াই করতেন তবে হয়ত এঁকে দিতাম যাকে বলে benefit of the doubt: কিন্তু ইনি শ্রীঅরবিন্দের যোগধর্মের সহধর্মিণী তথা মর্মিণী এতবড় ফাঁপা দাবিকে কী ক'রে মেনে নিই? মানি—সংসারে অনেক অঘটনই ঘ'টে থাকে যোগশক্তিতে। কিন্তু ইনি যে-ধরনের অসম্ভব কথা বললেন তার মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোর ছিটেফোঁটাও নেই। গোড়া থেকে শেষ অবধি এঁর বাণীর নাম "আমি-বাদ"। অথচ এঁকে দেখে ধূর্ত মনে হয় না। মনে প্রশ্ন জাগে: কেন এ-ধরনের বুলি কপ্‌চে চলে এই

জাতের মানুষ ? কেউ কি বিশ্বাস করে এদের কথায় ? জানি না। জগতে নানা সরল মানুষ আছে যারা সহজেই বিশ্বাস করে। কিন্তু তবু—মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের একটি কথা—"বিশ্বাসের কি একটা লিমিট থাকবে না, মণ্টু ?" অতিপ্রাকৃত নানা ঘটনা এ-জগতে সংঘটিত হচ্ছে এ-কথার ভাষ্য কি এই যে, যে যা বলবে সবই মেনে নিতে হবে ?

না। ইনি আদ্যন্ত নির্ভেজাল প্রবঞ্চক—যাকে বলে শার্লাটান। কেবল দুঃখ এই যে এ-ধরনের শার্লাটান শুধু নিজের আখের নষ্ট ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মের সুনামও নষ্ট করে। খাঁটি ধার্মিক যাঁরা তাঁদেরও অনেক সময়ে লোকে অবিশ্বাস করে এইসব মেকি ধার্মিককে দেখে। একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে অপরে—সেই সেকেলে সনাতন সত্য।

তবু এ-জাতীয় বুলিবাদীদের কাছ থেকেও নিশ্চয় আমরা কিছু শিখি—নৈলে এরা থাকত না। এরা পড়ে অন্ধকারের চরদের দলে। অন্ধকার আলো-কে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরে—এইই কি তার সার্থকতা ? জানি না। তবে যেটা জানি সেটা এই যে, এ-জাতীয় মানুষকে দূর থেকে দণ্ডবৎ করাই পন্থা। তাই ইনি বহু অনুরোধ করলেও প্রথমবারের পর এঁর নিমন্ত্রণ আর আমরা গ্রহণ করি নি।

য়ুরোপে এ-জাতীয় প্রবঞ্চকের নাম শুনেছিলাম অনেকদিন থেকে। পারিসে সর্বপ্রথম চোখে দেখলাম। মন ঘা খেল এ-হেন নির্জলা মিথ্যাচার দেখে। তবে মানুষের গভীরতম পতনের দৃষ্টান্ত থেকেও হয়ত কিছু শিখি আমরা। মনে পড়ে যোগী কবি এ-ইর একটি কবিতা :

রসাতলে পড়ি যবে—দেখি আরো উজ্জ্বল উদার
বর্ণে নীল নভোব্যাপ্তি—যেথা ছিল আসন আমার।

দেবদ্রোহিতার দূরবীণের মধ্যে দিয়েই হয়ত ভগবানের করুণার জ্যোতি উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে। ভাগবতে আছে তিনি নরক ও স্বর্গকে বাঁধেন একই করুণার যোগসূত্রে—অসুরকেও তারণ করেন তাঁর জাদুস্পর্শে। তাই না মহাসুর বলিরাজার উপাধি ভক্তরাজ, যার দ্বারী হ'লেন স্বয়ং নারায়ণ। মিথ্যার কাপালিকরাও উত্তীর্ণ হবে একদিন তাঁর মুক্তিতোরণে। সেদিন দেখতে পাব কেন ভ্রষ্টাচারও ধরাধামে অনুষ্ঠিত হ'তে পেরেছিল।

আজ শুধু এই প্রার্থনা : যেন মিথ্যাকে পরিহাস করতে পারি প্রতি পদে—কারণ তাহ'লেই সত্যকে বরণ করা সহজ হবে।

পারিসে দুটি মহিলাকে পাশাপাশি দেখলাম—সুইডেনের বিধবা ও ফ্রান্সের

মোহিনী—সাদার পাশে কালো। কালোটিকে না দেখলে হয়ত টের পেতাম না সাদাটি ছিল কত সাদা!

* * *

পারিসে এসে লুভ্‌র্‌ না দেখলে চলে? ইন্দিরার খুব দেখার ইচ্ছে ছিল না। ও ভালোবাসে গাছপালা বাগান, প্রাকৃতিক দৃশ্য, হ্রদ নদনদী ফুল পাখি। কিন্তু লুভ্‌রের ছবি দেখে খুশি হ'ল। কেবল একটা কথা ওকে বললাম চুপি চুপি: "জানো ইন্দিরা? লুভ্‌রের অজস্র ছবির নীরব কল্লোলের মধ্যে প'ড়ে দিশাহারা হ'য়ে পড়ি—ভালো লাগে অনেক ছবি যাদের হয়ত আর্ট-মূল্য বেশি নেই। আবার কোনো কোনো ভালো ছবিও ভালো লাগে। আনাড়ির দশাই এই। তবু মনে হয় কখনো কখনো—কিছু বুঝি পেলাম—এসব ছবির নৈমিষারণ্যে বিচরণ ক'রে—যদিও কী যে ঠিক লাভ হ'ল তার নির্দেশ দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু সব কথা যখন বলা হ'য়ে যায় তখনো একটি কথা বলা বাকি থাকে: যে, ছবি দেখা শেষ হ'লে যে-আরাম ছবি দেখে তত আরাম হয় না—অন্তত আমার তো হয় নি। কিন্তু একথা বাইরে প্রকাশ কোরো না তাহ'লে ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাতে পারব না—বলবে সবাই: 'দিক্‌ অনকলচার্ড ফিলিস্টাইন!'"

কিন্তু নোৎর্‌ দামে যেতেই ইন্দিরার মন ভ'রে গেল। বলল: "ব'সে ধ্যান করলে তবে মন শান্তি পেত!"

দেখা ও পাওয়া। শিল্প ও আরাধনা! দুয়ের তফাত আছে। কিন্তু ধর্ম শিল্পের চেয়ে বড় একথা একালে বলতে পারে শুধু সেকেলে মানুষ। তাই সই—আমরা সেকেলে দুর্নামই কিনব—কিন্তু মিথ্যা ব'লে শিল্পরসিক খেতাব চাই না।





# জর্মনি

# গ্যাটিংগেন

জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় গ্যাটিংগেন ( Goettingen )—যেখানে একটি দুটি নয়—ছ ছটি নোবেল লরিয়েট গিশগিশ করছে—বলল মেহ্‌রা সদর্পে। ভাবুন, এককে ছয় দিয়ে গুণ করলে তবে হয় আধা ডজন—রাউণ্ড ডজনের অর্ধেক—এতগুলি নোবেল লরিয়েট এক ঠাঁইয়ে!

এ-হেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সংবর্ধনা,—রেক্‌টরের নিজের নামে নিমন্ত্রণ পাঠানো—জর্মন কাগজে বিজ্ঞাপন আমাদের কীর্তিকলাপের—এতেও যদি স্তম্ভিত না হই তবে হব কিসে?

ঠাট্টা থাকুক। মনটা সত্যিই প্রফুল্ল হয়েছিল কারণ পারিসে খুবই দ'মে গিয়েছিলাম—আরো এই জন্যে যে, সর্বত্র ঠকের দেখা মিলল তার উপর 'গাঁটকাটা' আমার পকেট থেকে একটি থলি বেমালুম আত্মসাৎ করল। ডাক্তার জনসন বসওয়েলকে বলেছিলেন: "There is no such thing as public worry, sir, all worry *is* private worry." কিন্তু দুঃখ এই যে কোনো কোনো প্রাইভেট বিষাদের ছোঁয়াচ মনে লাগলে জগতের গোটা চেহারাটাই বদ্‌লে যায় সময়ে সময়ে। তাই ফ্রান্সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম যতটা পারি ফরাসি জাতির অগুণ ছেড়ে গুণাবলির 'পরেই জোর দিতে। বললাম: "মন! বিমর্ষ হোয়ো না: এরা তোমাকে সর্বত্র চুটিয়ে ঠকালো—তাতে কী হয়েছে? ভালো লোক এখানেও কি মেলে না? পাণ্ডববর্জিত দেশেও তো ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ছিলেন। তবে?"

মানি সবই। তবু পারিস থেকে যখন ট্রেনে wagon-lit coupé-তে উঠলাম গ্যাটিংগেনের দিকে মুখ ক'রে, তখন মনটা ছিলে-ছাড়া ধনুকের মতনই সুস্থ বোধ করল। এর কারণ একাধিক: প্রথমত, ওয়াগঁ-লি ( কিনা বিছানাওয়ালা কামরা ) দিল পরমারাম। দ্বিতীয়ত, দুধারের দৃশ্য দিল বিমলানন্দ—বিশেষ ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে গ্যাটিংগেন আসতে। যেদিকে তাকাই সৌন্দর্য—আর সে কী অপরূপ সৌন্দর্য!—পাহাড়পর্বত, গাছপালা, নদনদী, ফুলফল—মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট বাড়ি। স্থানে স্থানে অবশ্য বোমা-বিধ্বস্ত ভবন চোখে পড়ে এখনো—কিন্তু ইতিমধ্যেই এরা কত যে নতুন বাড়ি তৈরি করেছে! ইন্দিরাকে

কথায় কথায় বলছিলাম: "মানুষ আজো বর্বর আছে মানি, কিন্তু পাশাপাশি সে কিছু সভ্যও যে হয়েছে একথা ভেবে একটু সান্ত্বনা মেলে না কি? এক হাতে সে ভাঙে বটে, কিন্তু অন্য হাতে গড়েও তো!" ইন্দিরাও খুব আশ্বস্ত হ'ল দুধারে নবসৃজনের আভাস পেয়ে। আণবিক বোমার উৎপতনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে এ-জগতের কী চেহারা হবে বলা কঠিন, কিন্তু এ-পর্যন্ত মানুষ বহু অসভ্য আচরণ করলেও সভ্যতা তাকে এখনো ত্যাজ্যপুত্র করে নি। ইন্দিরা বলল: "জর্মনিকে ঠেকানো কঠিন।" ট্রেনের আসন, খাদ্যব্যবস্থা, মালপত্রের স্থান সবই অতি চমৎকার। জর্মন নরনারীর মধ্যে একটিও দুর্বল ক্ষীণ চেহারা চোখে পড়ল না। কিন্তু এ-সবই উপর-উপর দেখা—এ থেকে কেউ যেন ধ'রে নেবেন না যে জর্মনির আভ্যন্তরিক অবস্থা অনবদ্য। চোখে যা দেখেছি বর্ণনা ক'রেই আমি খালাস। কেবল ভরসা এই যে, বিখ্যাত সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপমান্ও লিখেছেন এই কথাই যে জর্মনি যে-ভাবে দু দুবার যুদ্ধে হেরে গিয়েও ফের রাতারাতি নবরাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানে সফল হ'ল তাতে বিস্মিত হ'তেই হয় ভেবে—কী সৃজনপ্রতিভা এ অদ্ভুত জাতির!

গ্যটিংগেনে পৌছলাম দুপুর বেলা। স্টেশনে জগদীশ মেহরা, জিতেন মোহান্তি ব'লে একটি উৎকল দেশীয় ছাত্র, একটি বর্ষীয়সী জর্মন-আমেরিকান মহিলা, দুটি জর্মন তরুণী ও একটি জর্মন ছাত্র হাজির। ছাত্রটির নাম এবেরার ব্যবসার। তাদের প্রত্যেকেরি হাতে পুষ্পমাল্যের বরণডালা।

মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল বৈ কি। কিন্তু ওমা! কোনো হোটেলেই মনের মতন ঘর পেলাম না। কাজেই শহর ছেড়ে আট মাইল দূরে ছুটতে হ'ল—গ্যটিংগেন শহরের উপান্তে। সেখানে গিয়েই চোখ জুড়িয়ে গেল, মন ফের প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

অপরূপ হোটেল! নাম—Wald House: ছোট বটে, কিন্তু কী সুন্দর! চারদিকে রূপসী উপত্যকা, শ্যামল বনানী, সমৃদ্ধ আপেল-বীথিকা সুন্দর গ্রাম্য (অথচ পালিশ করা) রাস্তা—তকতক করছে। আমাদের ওরা তিনতলায় একটি ঘর দিল। বাতায়ন তো নয়—যেন দেবতার বরদান! কারণ সে টেনে আনে সাঙ্গহীন বসন্তের নিখুঁত সৌন্দর্য। "তিলোত্তমা" উপাধি পেয়েছিলেন একটি পৌরাণিকী সুন্দরী। এ-হোটেলটির আশপাশের দৃশ্যের বিশেষণ দেওয়া যাক—তিলোত্তম।

ভুলব না সেদিনকার গোধূলি। না, তখনো গোধূলি-লগ্ন আসে নি। সূর্য

সবে নেমেছেন পাটে। এমন সময় হঠাৎ—চমক চমক চমক! অদূরে সোনার শস্যভরা মাঠে পড়েছে সোনার আলো—পাশেই ছায়া—মাথার উপরে নিটোল ইন্দ্রধনু—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত তার বর্ণবিথার! আর কী উজ্জ্বল হ'য়ে যে সে ফুঠে উঠল—পরিষ্কার বাতাসে! এখানে ওখানে মেঘের অলস রোদ-পোহানো! ঝিরঝির ক'রে বইছে স্নিগ্ধ আশীতল সমীরহিল্লোল (a nip in the air)—রাস্তায় জনমানব নেই, চারদিক শুব্ধ। ইন্দিরাকে বললাম: "চলো চলো—বেরিয়ে পড়ি—আর দেরি করা নয়—"

পদব্রজে দুধারের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পান করতে করতে চলেছি আমরা জনবিরল উপত্যকায়! বলতে ভুলেছি—পরিষ্কার ইন্দ্রধনুটির অদূরে আর একটি ইন্দ্রধনু, তবে অত পরিষ্কার নয়। একা রামে রক্ষা নেই—তায় সুগ্রীব দোসর! যুগপৎ দু-দুটি ইন্দ্রধনু! তবে বোধ হয় প্রথমটির মনে সাধ জেগেছিল এক থেকে দুই হ'য়ে ডবল বিলাসের স্বাদ পেতে! জীবনে সুন্দর দৃশ্য কে না দেখেছে—কিন্তু ক'টা দৃশ্যই বা মনে থাকে? তবে আমাদের মনে থাকবেই থাকবে এ-অপরূপ সন্ধ্যাটির স্মৃতি। গ্যটিংগেন শহরে মনের মতন হোটেল না পেয়ে বিমর্ষ হ'য়েছিলাম এ-জন্যেও অনুতাপ হ'ল। কত কী পাই আমরা দিনে দিনে—কিন্তু ভুলে যাই অদৃশ্য দাতার দাক্ষিণ্যের কথা, ভুলতে পারি না শুধু পাওয়ায় আমাদের জন্মস্বত্বের কথা। তাই মাঝে মাঝে না-পাওয়ার বোধোদয় থেকে পাঠ নেওয়া ভালো:

Rich the treasure, sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain!

* * *

২৪শে জুলাই আমরা হোটেল থেকে গেলাম জর্মন আকাদেমির সুন্দর হর্ম্যে—গ্যটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি হ'য়ে। সেদিন সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ ছিল Professor Dr. Ernst Waldschmidt (অধ্যাপক এর্ন্‌স্‌ৎ ওয়াল্‌দ্‌শ্মিৎ) মহোদয়ের সুরম্য উদ্যানবাটিকায়। আমাদের সংবর্ধনা করতে তিনি অনেকগুলি অধ্যাপক-দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সান্ধ্য ভোজনের পরে অধ্যাপক আমাকে দেখালেন একটি অতি পুষ্টকায় গ্রন্থ, নামও কম যায় না:

'DIE LITERATUREN INDIENS VON IHREN ANFANGEN ZUR GEGENWART' (অর্থ: ভারতীয় সাহিত্য—আদিকাল থেকে অদ্যাবধি। জর্মনরা বইয়ের এইরকম লম্বা লম্বা নাম দিতে কী যে

ভালোবাসে!) বইটির প্রণেতা আমার সুপরিচিত বন্ধু—বিখ্যাত ভারতকোবিদ Helmuth von Glasenapp (হেলমুৎ ফন গ্লাসেনাপ্) যিনি পিতৃদেবের অনেকগুলি গান জর্মন ভাষায় অনুবাদ ক'রে ছাপিয়েছিলেন একটি কাব্যগ্রন্থে, নাম: 'INDISCHE GEDICHTE AUS VIER JAHRTAUSENDEN' (অর্থ: ভারতীয় কাব্য—চার হাজার বৎসরের)।

কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি এমন সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখেছেন জানতাম না। সবচেয়ে আনন্দ হ'ল এ-বইটিতে পিতৃদেবের একটি চমৎকার ছবি দেখে। এ-বইটি জর্মনরা অনেকেই পড়েছেন শুনলাম, কাজেই গ্যটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করতে না করতে আমি পিতৃদেবের নামে বেশ একটু ভারিক্কি হ'য়ে উঠলাম ওদের চোখে। এ-বইটিতে পিতৃদেবের মেবারপতনের বিখ্যাত "ভেঙে গেছে মোর স্বপনের ঘোর" গানটির অনুবাদ দেখলাম অনবদ্য জর্মন ছন্দোবন্ধে। যাক, যা বলছিলাম বলি।

অতিথিদের 'মিষ্টিমুখ' করানো হ'লে পর অধ্যাপক ওয়াল্‌দ্‌শ্মিৎ আমাদের মাল্যতর্পণে যথাবিধি অভিনন্দিত করলেন। অতঃপর আমি গাইলাম হিন্দিতে, বাংলায়, সংস্কৃতে ও শেষে জর্মন ভাষায়: গানান্তে অধ্যাপকবৃন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর Professor Dr. Hermann Heimpel ভারতীয় গানের নিবিড় ভাবোচ্ছ্বাস তথা সাঙ্গীতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন। Professor Dr. C. F. von Weizsaecker বললেন: "এ-গান নিত্যনব স্মৃষ্টির দিক দিয়ে এত আশ্চর্য যে······' ইত্যাদি।

ডাক্তার শ্রাম (Schramm)—ইনি আধুনিক জর্মনিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক—বললেন পাশের এক অধ্যাপককে: 'Isn't it wonderful to sit near the ocean of music and feel the spiritual current flow between oneself and the source?'

এ-সন্ধ্যাটি ভুলব না। কারণ শুধু যে এতগুলি বিদ্বানের দেখা পেলাম এক আসরে তাই নয়—সঙ্গীতবিৎ, ভারতকোবিদদের কাছ থেকে পাওয়া এমন প্রভূত সমাদর! মনে পড়ল সংস্কৃত আত্মপ্রসাদ-বাণী: "প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষূত্তমাদরঃ"—

আপনার 'পরে স্বগুণের 'পরে প্রত্যয় জাগে কবে?
উত্তম সাধু বিদ্বান্ করে গুণের আদর যবে।

* * *

তার পরদিন—২৫শে জুলাই—য়ুনিভার্সিটি হলে আমাদের নৃত্যগীতের আসর বসল। ভিড় অত্যধিক হবে জেনে ওরা টিকিট করেছিল, কিন্তু তাতেও স্থান-সংকুলান হ'ল না: মস্ত প্রেক্ষাগৃহ ভ'রে গেল—বহু লোক দাঁড়িয়েই নাচগান দেখল ও শুনল দুঘণ্টা ধ'রে।

এ-সান্ধ্য অভিজ্ঞতাটি এক হিসেবে আমাদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতাই বলব। কারণ এতগুলি বিদেশী বিদ্বান্, অধ্যাপক, শিল্পী তথা ছাত্রছাত্রী যে-ভাবে আমাদের নৃত্যগীতে একযোগে সাড়া দিল—কিন্তু না, একটু বলিই না কিসের পর কী হ'ল। সংক্ষেপেই বলব অবশ্য।

প্রথমে ডাক্তার শ্রাম আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করার পরে আমি সুরু করলাম গান। প্রথমে গাইলাম পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল"—বাংলায়। তারপরে ইংরাজিতে (শ্রীঅরবিন্দের অনুবাদ), তারপর আমার সংস্কৃত অনুবাদ, সর্বশেষে অধ্যাপক গ্লাসেনাপের জর্মন অনুবাদ। গান প্রথমেই জ'মে গেল—শেষে জর্মন ভাষায় গানটি গাইবার পরে ওদের উৎসাহ হ'য়ে উঠল উদ্দাম—করতালি আর থামে না!

তারপর আমি গাইলাম বন্দেমাতরম্—অধ্যাপক ওয়াল্‌দ্‌শ্মিদের ব্যাখ্যার পরে। ইন্দিরা নাচল আমার গানের সঙ্গে ভারতনাট্যের ভঙ্গিমায়।

এর পরে আমি শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তাঁর "শিবোঽহং" স্তবটির মৎকৃত ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি করলাম। পরে সংস্কৃতে গানটি গাইলাম ঝাঁপতালে।

এর পরে ইন্দিরা-রচিত রাসনৃত্যের গান গাইলাম ওর নৃত্যসঙ্গতে: "সখী সুনো কহি"—যেটি শ্রুতাঞ্জলিতে ছাপা হয়েছে।

তুমুল জয়ধ্বনির পরে বিরতি—দশ মিনিট।

অতঃপর মীরাবাঈ সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দিয়ে মীরাবাঈয়ের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে কিছু ব'লে গাইলাম বিখ্যাত মীরাভজন "চাকর রাখো জী"।

সর্বশেষে গাইলাম "শ্রীরাধার আত্মসমর্পণ"—ইন্দিরা নাচল প্রায় পনের মিনিট ধ'রে।

তার পরে ওদের করতালি হ'য়ে উঠল উদ্দাম। বার বার যবনিকা তোলা হয়, আমরা এসে অভিবাদন করি শ্রোতৃবৃন্দকে, কিন্তু ওরা কিছুতেই ছাড়বে না—"আর একটি, আর একটি"। কী করা? অগত্যা আর একটি নৃত্যসঙ্গতের সঙ্গে গাইতে হ'ল—শিবনাম-কীর্তন।

পরিশেষে আমি বললাম: "আপনাদের কাছে যে-অভিনন্দন আজ আমরা পেলাম তার প্রতিদানে কীই বা দিতে পারি কৃতজ্ঞতা ছাড়া? আর বলি— আমরা যে সুদূর ভারত থেকে আমাদের নৃত্যগীতের ডালি বহন ক'রে এনে উপহার দিতে পারলাম পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঙ্গীতিক জাতির প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে, এতে আমরা ধন্য হয়েছি।"

সর্বশেষে অধ্যাপক ওয়াল্‌দ্‌শ্মিৎ বললেন: "কৃষ্ণ শিব ও মীরা সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি। কিন্তু এঁদের নৃত্যগীতের মাধ্যমে তাঁদের আবির্ভাব যেন চাক্ষুষ করলাম। আমি জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা ছাত্রছাত্রীর তরফ থেকে এই দুটি ভাবোদ্দীপ্ত ভারতীয় শিল্পীকে জানাচ্ছি আমাদের সাদর অভিনন্দন তথা গভীর কৃতজ্ঞতা।"

গানের শেষে অধ্যাপক শ্রাম সস্ত্রীক এলেন স্টেজের পাশের ঘরে। বললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে: "ভারত ও জর্মনির মধ্যে আপনি মিলনসেতু রচনা করলেন।"

অতঃপর আলাপ হ'ল নিউক্লিয়ার ফিসিক্সের বিখ্যাত অধ্যাপক ওয়াইজ-সেকার মহোদয়ের সঙ্গে। তিনি বললেন: "এ-হেন আশ্চর্য সঙ্গীত ও ভাবময় নৃত্য যে আমাকে কী গভীর আনন্দ দিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। এ-কন্সার্টে যদি আমি না আসতাম তবে এ-অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হ'তাম।"

অতঃপর নানা গুণগ্রাহী খ্যাতনামা অধ্যাপকদের কাছ থেকে আসতে লাগল প্রশস্তি। এ-সব প্রশংসাকে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নিতে পারি নি, নেওয়া উচিতও নয়। আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম এই ব'লে যে, আমরা যে বিদেশে এসে ভারতের শিল্প তথা ভক্তির মহিমার কিছুও এদের পরিবেষণ করতে পেরেছি এ আমাদের মহৎ সম্মান। প্রার্থনা জানালাম: "ঠাকুর! এই কোরো যেন এ-অর্ঘকে আমাদের অহমিকা আত্মসাৎ ক'রে স্ফীতিলাভ না করে। মনে রাখি যেন ভারতের মহাসাধকের বাণী:

"তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।"

মীরার কাছেও প্রার্থনা জানালাম। তাঁর বিদেহী স্বর শুনলাম। বললেন তিনি: "তোমাদের জর্মনিতে যেতে বলেছিলাম কেন হয়ত এখন বুঝতে পারছ? কিছু বীজ এখানে উপ্ত হ'ল ঠাকুরের ইচ্ছায়।" ব'লে আমাকে বললেন: "এখানে যে প্রশংসা পেলে তা তোমাদের নিজের ব'লে যে

গ্রহণ করতে চাও না এতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তাই আরো তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি সত্যের দিকে : যে, এইসব অধ্যাপক নিজে থেকে অভিনন্দন করলেন তোমাদের অবদানের। মনে রেখো : এঁদের মধ্যে কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি কিছু বলবার জন্যে।"

শুনে চমকে উঠলাম। সত্যিই তো : এঁরা এসেছিলেন দর্শক হ'য়ে মাত্র! এ-কন্সার্টের না ছিল কোনো পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা, না কোনো ধুমধামের আয়োজন। এ যেন নিজে-থেকে-গ'ড়ে-ওঠা আবহ, যে-আবহ এঁদের চিত্তাকাশে রচনা করেছিল আনন্দের এক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবমণ্ডল। অভিনন্দন উৎসারিত হ'য়েছিল সেই ভাবমণ্ডলেরই উৎস থেকে যেন। প্রশস্তি যখন মামুলি রীতিতে নির্বাহিত হয় তখন তার এক ছন্দ, আর যখন সে নিজে থেকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তখন তার আর এক রূপ!

* * *

এবেরার ব্যবসার ব'লে যে-যুবকটি আমাদের প্রথম দিন সংবর্ধনা করতে স্টেশনে এসেছিল তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। শুনলাম এখনকার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে ও অন্যতম। খুব বলিষ্ঠ দেহ নয় কিন্তু মুখের ভাব বড় সুন্দর। ইংরাজিতে যাকে বলে sensitive face : যেমন মঞ্জুবাক্ তেম্নি সুদর্শন। শুনলাম এখানে শ্রীঅরবিন্দের যে-একটি পাঠচক্র রচিত হয়েছে ও তার প্রধান পুরোহিত। জিতেন মোহান্তি ব'লে একটি উৎকলবাসী যুবক এ-চক্রের কর্ণধার। এ-যুবকটির সঙ্গে কলকাতায় আমার আলাপ হয়েছিল কয়েকবৎসর আগে যখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে আমি শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিই। জিতেন ও এবেরার আমাদের নিমন্ত্রণ করল পরদিন শ্রীঅরবিন্দের পাঠচক্রের অধিবেশনে কিছু বলতে।

গেলাম একটি প্রশস্ত কক্ষে। শুনলাম—মাসে দু'বার ক'রে এখানে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আলাপসভা বসে। আমরা গিয়ে দেখি ঘরভরা লোক—ত্রিশ বত্রিশ জন নরনারী—অধিকাংশই জর্মন। মন ভ'রে উঠল। শ্রীঅরবিন্দের বাণীবীজে এখানেও কিছু ফসল তো অন্তত ফলতে সুরু করেছে। সত্যের বীজে যে-বনস্পতি গজিয়ে ওঠে সে এম্নি ক'রেই ধীরে ধীরে গজায়—রাজনীতির প্রপাগাণ্ডা যেভাবে হৈ হৈ ক'রে ডামাডোল বাজিয়ে পরমুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সে-ভাবে হয় না সত্যের প্রগতি। একথা ওদের বললাম অনেকক্ষণ ধ'রে আমার ভাষণে। বললাম : "এম্নি ক'রেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ধীরে ধীরে

বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের বাণীও পাবে। আপনাদের মনে তাঁর বাণীর প্রতি যে-শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে তাকে যেন আপনারা প্রত্যেকেই সাদরে লালন করতে পারেন এই-ই আমার প্রার্থনা। যেন মনে রাখতে পারেন গীতার বাণী: 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স সব সঃ'—যার যেমন শ্রদ্ধা সে তেম্‌নি হ'য়েই গ'ড়ে উঠে।"

তারপর ইন্দিরাও দিল তার ভাষণ। বলল: "আপনারা যে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন কিছু বলতে তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাদের মনে শ্রীঅরবিন্দের বাণী যে-সাড়া তুলেছে তার জন্যে ভগবানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি শুধু বলতে চাই একটি কথা: আপনারা শ্রীঅরবিন্দের নামে যেন একটি নতুন দল—sect—গ'ড়ে না তোলেন, যেন না বলেন: সত্য শুধু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ধূর্ত অহমিকা প্রায়ই গুরুর নামের নামাবলীতে আত্মগোপন ক'রে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দের বাণীই যেন আপনাদের পূজ্য হয়—শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে এক-দেশদর্শী নরপূজার নূতন অধ্যায় যেন রচিত না হয়—যে-ধরনের নরপূজা টেনে আনে হাজারো সঙ্কীর্ণতা, বলে আমাদের পূজ্য বাণীবাহ ছাড়া আর সবাইকেই অবজ্ঞা না করলে তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখানো হবে না। মহান্ বাণীর প্রচার কাম্য, কিন্তু ব্যক্তির প্রতি অতিভক্তি বাঞ্ছনীয় নয়। মহামানবকে ভক্তি করা নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু সে-ভক্তি যখন অন্য সব মহাজনকে অভাজন ব'লে প্রচার করতে কোমর বেঁধে লেগে যায় তখন তাতে অমৃতফল ফলে না। কারণ, সত্য বিশ্বজনীন—যুগে যুগে মহাসত্যের সাধক হ'য়ে যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সত্যের এক একটা নব দিক্‌পাল হ'য়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু অন্য দিক্‌পালদের নামঞ্জুর করতে নয়—সম্পূর্ণ করতে। আধ্যাত্মিক জগতে একথা ভুললে প্রায়ই গ'ড়ে ওঠে দলাদলি—প্রতি গুরুর শিষ্য ভাবে আমার গুরুর কাছে আর সব গুরুই নগণ্য। এরই নাম দল গড়া—sectarianism—শ্রীঅরবিন্দ যার নিন্দা করেছেন তাঁর Synthesis of Yoga মহাগ্রন্থে।"

আমি সায় দিয়ে বললাম: "সত্য কথা। অনেকদিন আগে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন একটি ছোট্ট চিঠি, যা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। তিনি লিখেছিলেন যে আজকের দিনে ধর্মের বাইরের কাঠামো নিয়ে আর বড় কেউ মাথা বকান না—কেন না আজকের মানুষ আর চাইছে না কাঠামোর আশ্রয়, চাইছে অন্তরের মধ্যে ঊর্ধ্বের আলোর বাতায়ন খুলতে যার

মধ্য দিয়ে আমাদের প্রবর্ধমান মন ও হৃদয়ও চলতে পারে আলোর অভিসারে:
"All religions are a little off-colour now because the need of a larger opening of the soul unto the Light is being felt, an opening through which the expanding human mind and heart can follow."

ইন্দিরার ভাষণ শুনে ওরা চমকে উঠল। ভারতীয় রমণী যে এভাবে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত স্বাধীন চিন্তার আলো বিলোতে পারে ওরা ভাবে নি। এতগুলি বিদ্বান্ ও মনস্বী জর্মন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইন্দিরা যেভাবে নিজের মনের কথাটি পেশ করল তাতে সবাই তৃপ্তি পেয়েছিল আরো এইজন্যে যে, ওর সুচিন্তিত বক্তব্যের মধ্যে সহজ দার্ঢ্যের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠেছিল সরল বিনয়। বলিষ্ঠতা সম্ভ্রম জাগায়, কিন্তু বিনয় এনে দেয় গভীর তৃপ্তি। দার্ঢ্যের সঙ্গে বিনয়ের যোগাযোগে ইন্দিরার চরিত্র বিদেশে যেভাবে ফুটে উঠেছিল তাতে বহু বিদেশীই আনন্দ পেয়েছেন। এর পরেই ইন্দিরা একটি চিঠি পেল আমেরিকা থেকে, সে-চিঠিটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পত্রলেখক আমেরিকার একজন চিন্তাশীল বিদ্বান্ এডিটর—নাম, ইউজীন এক্সমান। তিনি ইন্দিরাকে লিখলেন (২৬.৭.৫৩):

"You have encouraged me enormously by your inner peace and by your determination to see Him who is above all seeking and all desire. I hope you will be sustained by a great striving of His will to achieve in you His purpose. Not only is it *the* way, you must and will be used to help others find their destinies also. Remember me in your prayers......"

ডাক্তার ওয়াল্‌দ্‌শ্মিৎ ইন্দিরাকে পরদিন নিমন্ত্রণ করলেন জর্মন ক্লাসে ভারতীয় নৃত্যের কিছু "মুদ্রা" দেখাতে। আমরা গেলাম ২৮শে তারিখে সকাল বেলা। গিয়ে দেখি এক প্রফেসর ক্যামেরা নিয়ে হাজির: ইন্দিরা পর পর নাচের এক একটি মুদ্রা দেখায় আর তিনি ফটো তুলে নেন। শেষে আমাকে একটু গাইতে হ'ল—ও গানের সঙ্গে অভিনয়নৃত্যের চমৎকার ব্যাখ্যা করল। পরম আনন্দে কাটল সকালটা।

* * *

সন্ধ্যায় জুরিক রওনা হব এমন সময়ে কয়েকটি জর্মন অধ্যাপক ও ছাত্র এসে হাজির। কী করি—তাঁদের ফের গান শোনালাম সংস্কৃতে, বাংলায় ও জর্মন ভাষায়। পিতৃদেবের 'চন্দ্রগুপ্তে' "ঘখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা"

গানটি পর পর বাংলায়, সংস্কৃতে, ইংরাজিতে ও জর্মনে গাইলাম। জর্মনে এ গানটি কী সুন্দর যে শোনায়! দেশে ফিরে এ-গানটি নানা জায়গায় গাইতেই হবে এ ওজস্বী ভাষায়। গানটি পেলাম গ্যটিংগেনে এসে—গ্লাসেনাপের দৌলতে।

* * *

স্টেশনে বিদায় দিতে এলেন অনেকগুলি নবলব্ধ শুভার্থী বন্ধু তথা বান্ধবী। তার মধ্যে ছিলেন এবেরার ও তাঁর বাগ্দত্তা।

ইন্দিরা বলল আমাকে যে মেয়েটির মধ্যে সত্যিই আছে ধর্মতৃষ্ণা। আমেরিকায় দেখেছিলাম এম্‌নি একটি দম্পতি, কিন্তু সেখানে মেয়েটি ভগবানকে চেয়েছিল শুধু ছেলেটি ভাগবত ছিল ব'লে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর "সিন্থেসিস"-এ যে কখনো কখনো ভগবান্ এ-ভাবেও ডাকেন—প্রথম দিকে আর একজনের প্রতি টানের মধ্যে দিয়েই নিজের একটুখানি জায়গা ক'রে নেন অতি গোপনসঞ্চারে। কিন্তু এবেরার দম্পতির মধ্যে তিনি প্রকাশ্যেই কাজ করেছেন। ওরা পরস্পরকে চায় বটে, কিন্তু উভয়েই চায় দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে ভগবানের দিকে এগুতে। এবেরারকে একথা বিশদ ক'রে ব'লে শেষে বললাম: "ভারতে একেই বলে সহধর্মিণী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—বিদ্যা স্ত্রী—অবিদ্যা স্ত্রীর উল্টো।"

শুনে ওরা দুজনেই কী যে খুশি!



# সুইজর্লণ্ড

# পরীরাজ্য

জর্মন দেশ ছাড়তে মন কেমন করছিল। এবারকার ভ্রমণে কোনো দেশেই এত অল্পদিন থাকি নি। কিন্তু জর্মনিতে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে কত পুরোনো স্মৃতিই যে উঠেছিল জেগে! ১৯২১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর আমি জর্মনিতে ছিলাম: প্রাণপণে শিখতাম গান, বেহালা, জর্মন, ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষা। এক দিক দিয়ে বলা যায় যে আমার প্রথম য়ুরোপ-অভিযানে বিদেশী সঙ্গীত ও বিদেশী মন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম আমি জর্মনিতে। তাছাড়া বিদেশে সেই প্রথম পেয়েছিলাম এমন বন্ধু যাদের আজো ভুলতে পারি নি। জর্মনির সব কিছুই যে ভালো লেগেছিল এমন কথা বলব না, কিন্তু ওদের মধ্যে যে আশ্চর্য গঠনপ্রতিভা, নিয়মানুগত্য, শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় দেখেছিলাম তাতে মুগ্ধ না হ'য়েই পারি নি।

এবারকার অভিজ্ঞতা একটু স্বতন্ত্র। গ্রীক দার্শনিক বলেছিলেন: মানুষ এক নদীতে দু'বার স্নান করে না। যে-মানুষ ১৯২১ সালে জর্মনিকে দেখেছিল যৌবনের চোখ দিয়ে, সে-মানুষ ১৯৫৩ সালে তাকে দেখল বৃদ্ধের চোখ দিয়ে। ("বার্ধক্যং"—কিন্তু "জরসা বিনা", মনে রাখবেন!) দুই দেখা এক হ'তে পারে না। কিন্তু তবু একটা মিলও ছিল: আবার অনুভব করলাম—যদিও নতুন ঢঙে—জর্মন জাতির দরদ ও আতিথেয়তার আন্তরিকতা। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায় যে, আমেরিকায় যার সুরু জর্মনিতে হ'ল তার সারা। অর্থাৎ কিনা, আমাদের সাংস্কৃতিক ভ্রমণ হয়ত প্রকৃতপক্ষে এইখানেই সাঙ্গ হ'ল। এর পরের ভ্রমণটুকু হবে আমার "বাড়িমুখো বাঙালী"র ভ্রমণ—ছুটির ভ্রমণ—সাংস্কৃতিক ভ্রমণ নয়। আর সেই জন্যেই মনে হ'ল যে জর্মনিতে এসে তবে-যে কর্তব্যের পূর্ণচ্ছেদ হ'ল এতে হয়ত ভালোই হ'ল। কারণ সাংস্কৃতিক ভ্রমণের উৎসাহ-তাপমান-যন্ত্রের পারা আমেরিকা যেতে উঠতে উঠতে জর্মনিতে পৌঁছল টগবগে টেম্পারেচারে। সঙ্গীতে এরকম উৎসাহ আর কোন্ জাতের মধ্যেই বা প্রকট হ'তে পারত? কী উৎসাহ—অথচ কী অব্যবস্থার মধ্যে! মেহরা বেচারি একা কীই-বা করতে পারত, যদি

না জর্মনির উদার ও প্রবুদ্ধ নরনারী দলে দলে তার সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসত স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহে! তাছাড়া ধর্ম, নৃত্যগীত ও সহজ হৃদয়াবেগের মাধ্যমে দু'দিনে এতগুলি নরনারীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরে তৃপ্তি আমাদের গভীর হ'য়ে উঠেছিল সত্যিই। মন কেমন করবে না? যাক্।

* * *

২৯শে জুলাই ভোরবেলা সুইজর্লণ্ডের এক সীমান্তনগরীতে পৌছলাম—বাসেল। সেখান থেকে জুরিখ মাত্র এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু কী অপরূপ পথ! ইন্দিরা তো আহ্লাদে আটখানা! গিরি নদী বিটপী, উপত্যকা, ফল ফুল—কিসের অভাব? বিধাতা এ-দেশের বুকে সৌন্দর্যের ধারা বর্ষণ করছেন দিলদরিয়া ছন্দে। তার উপরে সুইস জাতি গুণজ্ঞ, মান রেখেছে দানের—কোথাও অনবধানতার চিহ্ন নেই—কুশ্রী বাড়িঘর একটিও নেই, না একটিও বিশ্রী ধূমোদ্গারী চিম্‌নি। রাস্তাঘাট, এমনকি অলিগলিও এদেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তক্‌তক্ করছে। এক এক জায়গায়—ইন্দিরা বলল—"দেখ, কী চমৎকার কাঠের গুদামে কাঠ সাজানো পরিপাটি ক'রে!" মূলধন পেয়ে এরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে নি—খাটিয়ে বহুগুণ করেছে প্রাণপণে। তাছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ এদেশে হয়নি কখনো। কাজেই একদিকে এদের অপচয় হয় নি, অন্যদিকে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকবার ফলে এরা মেজাজে খিটখিটে হয় নি। অত্যধিক ভদ্র নয় হয়ত—কিন্তু স্বভাবে উগ্রও নয়। সর্বোপরি, এদেশে এলেই মন যেন শান্তির ঘুম যায় সৌন্দর্যের কোলে।

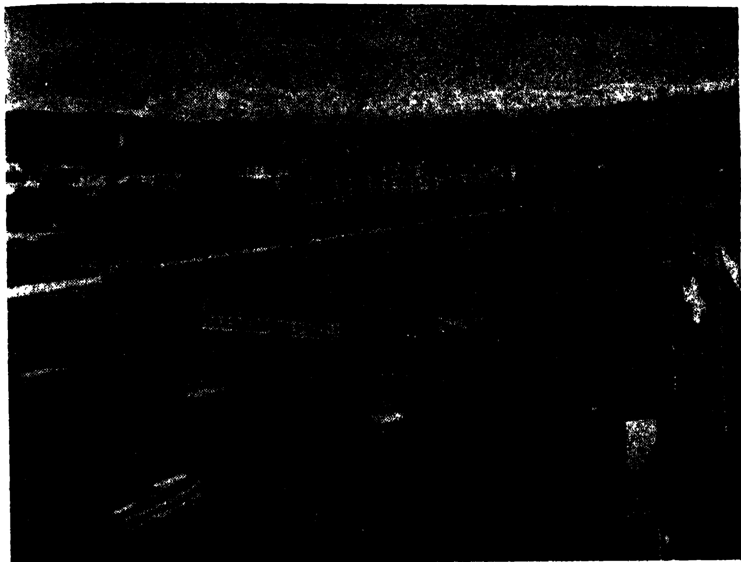
* * *

জুরিখে এসে উঠলাম একটি রমণীয় হোটেলে। পাঁচতলায় পেলাম চমৎকার একটি ঘর। জানালার কাছে ব'সে লিখি আর চেয়ে চেয়ে দেখি সাম্‌নেই বাগান ও জুরিখের প্রখ্যাত হ্রদ (See)। বাঁদিকে আর একটি বাতায়ন দিয়ে দেখা যায় বহুহর্ম্যখচিত হরিৎ শৈলমালা। সকালে বিকালে শুধু এখানে ওখানে পাদচারণ অলস মন্থর ছন্দে। এতদিন বাদে আমরা সত্যি প্রথম ছুটি পেলাম দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে। এ কয়মাস কী ভাবে কেটেছে জানেন শুধু সর্ববিৎ ঠাকুর। এতদিনে তিনি যেন বললেন প্রসন্ন হ'য়ে: "এবার একটু জিরোও বেপরোয়া হ'য়ে।"

* * *

কিন্তু জিরুব মানে কি ঘরের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকা? প্রথম দু'দিন যা বৃষ্টি

আর বৃষ্টি—ঘরের বাইরে যাওয়া ভার! বৃষ্টির বিরামের ফাঁকে ফাঁকে সামনের পার্কে চক্র দিয়ে আসা—এর বেশি বরাদ্দ ভাগ্য মঞ্জুর করলেন না। তৃতীয়দিন হঠাৎ আকাশের কী মর্জি হ'ল—ঘোমটা খুলে চাইলেন অশ্রুসিক্তা ধরণীর পানে



জুরিখ

সূর্যের এক চোখে। অমনি আমরাও উধাও বাইরে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা··· ইত্যাদি। আমাদের দেশে সবিতা তো এমন পর্দানশীন নন—সেখানে বর্ষায় ছাড়া তাঁর আবির্ভাব প্রায় প্রাত্যহিক, তাছাড়া সেখানে তাঁর মেজাজ গরম এ-ও বলব। এখানে তিনি সর্বদা না হোক প্রায়ই স্নিগ্ধ, শুভদ। তাই তাঁর দাক্ষিণ্য সর্বস্বীকৃত। একথা যেন আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করলাম স্টীমারে Rundfahr-এর টিকিট কিনতে না কিনতে। (এ-জর্মন শব্দটির মানে 'চক্র দেওয়া')।

অনেকে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ-বিলাসে গা ঢেলে দেন। আমারও সমুদ্র বা আকাশ ভালো লাগে—তবে তট থেকে। বিমানে আকাশ বা জাহাজে সমুদ্র-সেবন আমার ধাতে সয় না। আমি মাটির মানুষ—মেজাজেও বটে, গড়নেও বটে। তাই স্টীমারে বা নৌকায় চেপে নদীবিহার মাদৃশ মেজাজীর কাছে বিলাসের শিখরচারণ। মনে পড়ে কবি-সুরকার অতুলপ্রসাদের সঙ্গে স্টীমার-বক্ষে সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে

যাওয়া। মনে পড়ে আমার বোন মায়া ও ভগিনীপতি শঙ্করের আতিথ্যে ব্রহ্মপুত্রে কয়েকদিন স্টীমার-বিহারের পরে গঙ্গায় সাতদিন জাহাজে ব'সে 'মনের পরশ' দ্বিতীয় খণ্ড হু হু ক'রে লিখে ফেলা। মনে পড়ে গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যায় সেই নীলস্বর্ণাভ গোধূলি আলোয় মনের মধ্যে গানের সুর জেগে ওঠা। এদেশের জলবিহার তেমনটি নয়—তবু চমৎকার মানতেই হবে। জুরিখ থেকে বেরুলাম বেলা আড়াইটেয়। স্টীমারে দু'ধারের সেই অপরূপ নিসর্গশোভা যেন বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নকে বলতে থাকে: "একবার চেয়ে দেখ দেখি!" দেখি দেখি দেখি—দেখে যেন আশ মেটে না। ইন্দিরা যেতে যেতে বলে: "দাদা! দেখ দেখ ঐখানে উইলোর নিচে কুটীরটি যেন ঘুমিয়ে!......দেখ দেখ, ঐ সামনের সবুজ বাগানে কত ফুল!......দেখ দেখ, ঐ কারা সাঁতার দিচ্ছে!...দেখ দেখ, মোটরবোটে কারা চলেছে জলের বুক চিরে—নক্ষত্রবেগে!..." ইত্যাদি। তার পরে দু'জনে চুপ ক'রে তাকিয়ে। সেদিন সুইসজাতির জাতীয় দিন—১লা আগস্ট। স্টীমারে নানান ভেঁপুর সাজসরঞ্জাম। মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রকৃতির লাবণ্যের সঙ্গে মিলে গ'ড়ে তুলল এক নব সুষমা: রসায়নের ভাষায়—মিশেল নয়, সঙ্গতি—(mixture নয়, compound)—কাজেই সুখের এক নব ছন্দ নয় তো কি? এছাড়া কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা সহযাত্রী! সবার সঙ্গে মিলেজুলে সে এক অভিনব বিলাস!

কিন্তু মানুষ স্বভাবে বৈচিত্র্যকামী—না মেনেই উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলতেন বটে একই সৌন্দর্যের আবহে কবিপ্রাণ নিতুই-নব রসাস্বাদন করতে পারে। কিন্তু কার্যত তিনিও কম ঘুরতেন না—রকমারি সৌন্দর্যের স্বাদে তাঁর অরুচি কোনোদিনো দেখি নি। আমি ভ্রাম্যমাণ ব'লে দুর্নাম কিনেছি, কিন্তু তিনি যে আমার চেয়েও বেশি ভ্রমণ করেছেন একথা ভুললে তো চলবে না। কাজেই মানতে বাধা পাচ্ছি যে, তিনি এক সৌন্দর্যের বেড়াজালের মধ্যেই চিরকাল বন্দী হ'য়ে থাকতে পারতেন। তাছাড়া এসেছি যখন সৌন্দর্যের রাজধানী সুইজর্লণ্ডে, তখন শুধু জুরিখেরই বা নজরবন্দী হ'য়ে থাকব কী-দুঃখে? অথ, বেরিয়ে পড়লাম চৌঠা আগস্ট। ট্রেনে চেপে এলাম বিখ্যাত ইন্টারলাকেন উপত্যকায়।

উপত্যকাই বটে। বত্রিশ বৎসর আগে এসেছিলাম এখানে। মনে আছে শুধু এখানকার অপরূপ হ্রদের কথা। নীলহরিৎ জল—চারদিকে পাহাড়। প্রায় নরওয়ের স্বধর্মী, শুধু ফিওর্ডের জায়গায় হ্রদ বসিয়ে দিলেই নরওয়ে ব'নে যায়

আধা-সুইজর্লণ্ড। হয়ত নরওয়ের পাহাড়-পর্বত আরো মহিমময়—মানে আরণ্য গাম্ভীর্যে হয়ত নরওয়ে আরো অপরূপ। কিন্তু অন্যদিকে সুইজর্লণ্ডের ঘনশ্যামলতার দাক্ষিণ্য হয়ত নরওয়েতে এমন অপ্রতিহত নয়। জানি না—ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের আগের দেখা—তুলনা করা মুস্কিল। কিন্তু দূর হোক গে—তুলনায় সুখবিলাস থাকলেও দুঃখের খেদও যে জড়িয়ে: সুইজর্লণ্ডের তা নেই যা নরওয়ের আছে—এই হায়-হায় ভাব। এরূপ ক্ষেত্রে জ্ঞানী কী করেন? না, সব ভুলে যা পেয়েছেন তাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাখতে চাখতে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন। ইন্‌টারলাকেনে এসে জ্ঞানী হওয়াই ভালো মনে করলাম। আর জ্ঞানী হ'তে বিশেষ বেগ পেতেও হ'ল না। আমাদের হোটেলের সামনেই শৈলমালা। কাছের পাহাড় সবুজ, দূরের পাহাড় তুষারধবল। মন গান গেয়ে ওঠে, মনে পড়ে হিমালয়ের তুষারমেলা!—

শুধু সাদা নয় তো সে—তার সঙ্গে অরুণঝলক ওঠে
দীপ্ত হ'য়ে—সবুজ শ্বেতের শোভার জুড়ি উধাও ছোটে।

ছোটে! স্থির শোভা কি ছোটে? না। কিন্তু ওঠের সঙ্গে ছোটের মিল জুৎসৈ। অবশ্য বেশি সত্যবাদী হ'তাম যদি লিখতাম দ্বিতীয় লাইনটি:

দীপ্ত হ'য়ে—কত-রঙা ফুলের হাসি ফুটে ওঠে!

কিন্তু তাহ'লে বর্ণনাটির মধ্যে ওরিজিন্যালিটি থাকত না যে!

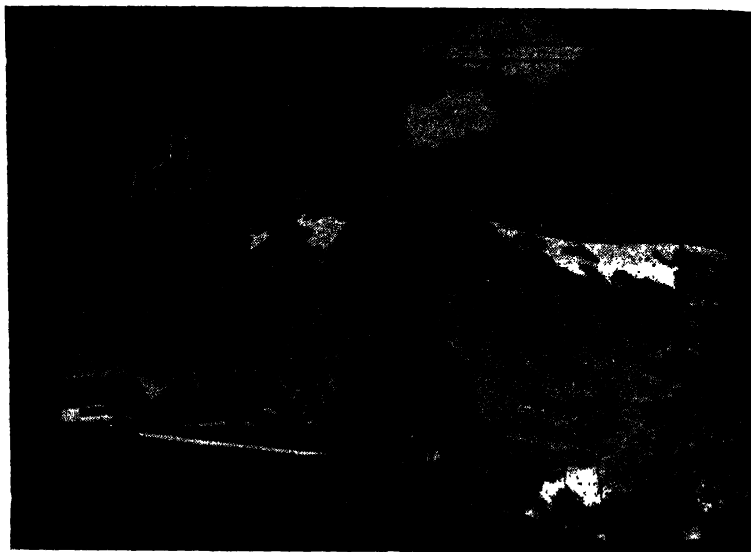
* * *

কিন্তু এবার একটি নতুন দৃশ্য তথা চমকের কথা বলি। এমনটি এযাবৎ কোথাও দেখি নি এই ভুবনে। শুনুন মন দিয়ে, যদিও বর্ণনায় কতটুকুই বা বলা যায় এ-হেন অভিজ্ঞতার!

ইন্‌টারলাকেন থেকে এক ঘণ্টা ট্রেনে চেপে গেলাম গ্রিন্দওয়াল্‌দ্‌ ব'লে একটি শহরে। চমৎকার শহর। পথের শোভাও অফুরন্ত। সবুজ উপত্যকা, ঘনবীথিকা, দুগ্ধস্রোতস্বিনী—ঠিক্ দুধের মত শুভ্রা প্রবাহিনী চলেছে অশ্রান্তা—ফেনিলতার দরুণ শ্বেতাঙ্গিনী নয়—স্বভাবধবলা। ইন্দিরা কেবল বলে: "এমনটি আর কবে দেখেছি?" যাক্। এবার আসল কথায় আসি।

গ্রিন্দওয়াল্‌দের উচ্চতা বুঝি দু'হাজার ফিট। সেখান থেকে রশি উঠেছে আরো পাঁচ হাজার ফিট উঁচু একটি স্টেশনে—তার নাম "প্রথম বিরতি" (First station)। বুঝলেন তো? আচ্ছা। এবার শুনুন আরো মন দিয়ে। একটির পর একটি দুলন্ত দোল্‌না চলন্ত দড়িতে উঠছে হু হু ক'রে—প্রতি চেয়ারে একটি

ক'রে মানুষ। দু'টি চেয়ারে একটি দোল্না। পর পর দু'তিনশো যাত্রী সর্ সর্ ক'রে উঠছে ঝুলন্ত তথা দুলন্ত যুগলাসনে। আমি ও ইন্দিরা পাশাপাশি বসলাম এমনি একটি দোল্নায়—অম্নি হু—হু—হু—শ্!—চলল চেয়ার, চমক দেদার, শিহর অপার! ভাবুন—ষোলো মিনিটে উঠলাম পাঁচ হাজার ফিট! ছিলাম



চেয়ার-লিফ্ট্

দু'হাজারী উপত্যকায়, উঠলাম সাতহাজারী শিখর-লোকের পায়াভারি পদবীতে। সেখানে একটি রেস্তর্াঁয় ভোজন ক'রে তবে পুনর্মূষিকের ডেরায় প্রত্যাবর্তন।

ছি ছি! এর নাম কি বর্ণনা? কিন্তু কী বলবই বা! দুলন্ত চেয়ারে ঝুলন্ত ছন্দে সেই শাঁ শাঁ ক'রে ওঠা……সাম্নে তুষারমণ্ডিত গিরিমালা, পায়ের নিচে নবদূর্বাদল শতরঞ্চ, সর্পিল স্রোতস্বিনী, সুন্দর হর্ম্যরাজি, যেদিকে চাই খোলা আকাশ, বীতবন্ধ বাতাস—নিশ্বাস নিতেও আনন্দ—এর কি বর্ণনা হয়? ইংরাজিতে ওরা নাম দিয়েছে চেয়ার-লিফ্ট্। কিন্তু সে-বর্ণনা প'ড়ে কতটুকু কল্পনা করেছিলাম এ কী জাতীয় রথযাত্রা? ওরা টুরিস্টের জন্যে যা বর্ণনা দিয়েছে টুকে দিই শুনুন—যা প'ড়ে আমরা গিয়েছিলাম "জয়যাত্রায় চল্ মন—আকাশের পথে উজান" গাইতে গাইতে।

ওরা লিখছে মন-কাড়া ভঙ্গিতে : "The chair-lift from Grindwald to 'First' carries you safely and quietly along the mountain-side from the glacier-village Grindwald to the 'First' situated 7,220 feet above sea-level in the region of the Faulkhorn."

( কিন্তু আমরা এ কেদারা-উড্ডয়নের কৌতূহলে দীক্ষা পেয়েছিলাম এ-বর্ণনা পাবার আগেই—আমাদের মাদাম তাইয়ার বলেছিলেন এ-উড্ডয়নের কথা। তাঁর কথা এল ব'লে। )

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—কবিকে লোকে যেমন ভাবে কবি ঠিক তেমনটি নন। লাখ কথার এক কথা। কিন্তু এখানে কবির জায়গায় বসিয়ে দিন "ঝুলন্ত চলন্ত রথযাত্রা"।

নাঃ, আর বর্ণনার পণ্ডশ্রম করব না। শুধু বলব—যদি ওদেশে কেউ যান—তবে গ্রিন্দওয়াল্দ্ গিয়ে এই অপরূপ অবর্ণনীয় রথযাত্রার আনন্দ সঞ্চয় না ক'রে যেন জলগ্রহণ না করেন। অনেক কিছুর সৌন্দর্য আমরা কল্পনা করি বেশি, বাস্তবে দেখে নিরাশ হই—সত্য। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, বাস্তব সময়ে সময়ে তুঙ্গতম কল্পনাকেও হার মানাতে পারে। গ্রিন্দওয়াল্দের রথযাত্রা এই পরমোত্তম শ্রেণীর বাস্তব—কল্পনায় কিছুতেই এর মহিমা, আনন্দ ও চমকের নাগাল পাওয়া যায় না।

বিমানে বন্দী হ'য়ে আকাশকে অভিনন্দন করতে আমার ভালো লাগে না, যদিও দুর্ভাগ্যবশে গত কয়বৎসর ধ'রে নিরন্তর বিমানেই ঘুরতে হয়েছে। বিমান যেন লড়াই করে অন্তরীক্ষের সঙ্গে, সহজিয়া নয়—পাখি যেমন। খাঁচায় বদ্ধ হ'য়ে শার্শির মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে দেখা—ধিক্! সময়ে সময়ে সৌন্দর্য মুগ্ধ করে মানি। কিন্তু বিমানের মধ্যে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। সময়সংক্ষেপই ওর চরম ও পরম অবদান—রসাস্বাদন নয়। কিন্তু এই যে ঝুলন্ত রথযাত্রা, এতে বিমানলভ্য অন্তরীক্ষচারণের দুর্লভ স্বাদ মেলে অথচ নিজেকে বন্দী মনে হয় না। শূন্যে উড়ে চলার আনন্দ অথচ সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মুক্তির স্বাদ, খোলা হাওয়া, খোলা আকাশ, খোলা পাহাড়! অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এর জুড়ি মেলা ভার।

* * *

সুইজর্লণ্ডে এসে দেখা হ'ল আমাদের পূর্বপরিচিতা এক বিদুষী বান্ধবীর সঙ্গে : মাদাম আনিয়া তাইয়ার (Ania Teillard)। জর্মন ও ফরাসী এই

দুই ভাষায়ই ইনি সব্যসাচী। ( সব্যসাচিনী হ'লে ব্যাকরণসম্মত হ'ত কিন্তু লিখতে সাহস হ'ল না। ) মাতৃভাষা ফরাসী, তবে বিখ্যাত জর্মন মনস্তাত্ত্বিক য়ুঙ্গের (Jung) সঙ্গে বহুদিন কাজ করার জন্যেই হোক বা যে-কারণেই হোক জর্মন ভাষায় ইনি তেম্‌নি সহজে লিখতে বলতে পারেন যেমন তাঁর মাতৃভাষায়। স্বপ্ন সম্বন্ধে ইনি একাধিক গবেষণাগম্ভীর বই লিখেছেন য়ুরোপে যার নামডাক আছে। আমাকে একটি এই শ্রেণীর দুর্ধর্ষ বই উপহার দিয়েছিলেন গত বৎসর পণ্ডিচেরীতে—যখন তিনি ভারতভ্রমণে এসেছিলেন কয়েক মাসের জন্যে। বইটি খানিকটা প'ড়ে রেখে দিয়েছিলাম আরো এইজন্যে যে, স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েড-য়ুঙ্গ প্রমুখ তাত্ত্বিকের গবেষণা আমার কাছে একদেশদর্শী মনে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, ইনি এ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞা মানতেই হবে: অন্যভাষায়, বিদুষী মহিলা। বয়স পঞ্চাশের উপর। আশ্রমে আসতে না আসতে আমাদের সঙ্গে এঁর খুব ভাব হ'য়ে যায়। আরো এইজন্যে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে য়ুঙ্গ প্রমুখ গবেষকদের সঙ্গ পরিহার ক'রে ইনি ভারতীয় যোগদৃষ্টিকেই বরণ করেছেন, বুঝতে পেরেছেন যে, অবচেতন সম্বন্ধে ভারতের যোগজ্ঞদের যে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে তার তুলনায় য়ুরোপের গবেষকদের জ্ঞান ও দর্শন নগণ্য না হ'লেও সামান্য তো বটেই। আরো বড় কথা এই যে, ইনি তাঁর পূর্বদীক্ষাকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছেন মনেপ্রাণে সত্যকে চেয়েছিলেন ব'লেই। এমন সত্যবাদিনী, গভীরদর্শিনী অথচ তীক্ষ্ণধী অন্বেষু কোনো দেশেই বেশি মেলে না—বিশেষ ক'রে নারীদের মধ্যে। একটি কথা ইনি বলেছিলেন—শুনে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম: যে, ইনি অবচেতনকে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে ক্ষালন করতে করতেই আধ্যাত্মিক মণিকোঠায় ছাড়পত্র পান কয়েকবৎসর আগে—যার ফলে এঁর চিন্তা তথা জীবনধারার মধ্যে বিপ্লব ঘ'টে যায়। হ'ল কি, ধ্যান করতে করতে একদা ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শুধু দর্শন নয়, নির্দেশ পেতে সুরু করলেন। "অপরূপ সে-দেবমূর্তি, দেবভাষণ"—বলতেন আমাদের প্রায়ই। ভারতে ইনি এসেছিলেন শুধু একটি উদ্দেশ্য নিয়ে: দক্ষিণেশ্বর তীর্থদর্শন—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যারূপে! এ-হেন মহীয়সীর দিকে আমাদের মন যে সহজেই ঝুঁকবে—এ আর বিচিত্র কি? ইন্দিরাকে দেখে ইনি বিশেষ মুগ্ধ হন ও পারিসে নানা সভায় উল্লেখ করেন ওর ধ্যান উপলব্ধির কথা। মীরাকে ইন্দিরা দেখে প্রায়ই ও তাঁর সঙ্গে ওর কথালাপ চলে একথা উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলেন, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উনি ঠিক ঐ ভাবেই পেয়েছিলেন। কয়েকমাস হ'ল ইনি পারিস ছেড়ে এসেছেন সুইজর্লণ্ডে—জুরিখেই যাবেন এখন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে

আমাদের ফের দেখা হয় কয়েকদিন আগে। এখান থেকে জুরিখে ফিরব দিনকয়েকের মধ্যে, তখন পুনরায় হবে এঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা। গত বৎসরে ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে এঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে আমরা যে-ধরনের গভীর তৃপ্তি পেয়েছিলাম সে-ধরনের তৃপ্তি জীবনে বড় বেশি মেলে না। কারণ এঁর আছে শুধু-যে উপলব্ধির ঐশ্বর্য তাই নয়, সেই সঙ্গে এঁর মধ্যে বিকাশ পেয়েছে ভাবের গভীরতা ও ভাষায়ণের সহজ নৈপুণ্য। ফরাসী জাতি আলাপে অসামান্য একথা না জানে কে?

আমাদের ইনি বললেন যে, ১১ই জুলাই আমাদের জন্যে ইনি একটি সান্ধ্য-সভার ব্যবস্থা করেছেন জুরিখে তাঁর এক সুইস শিল্পী বন্ধুর গৃহে। এখান থেকে ফিরেই সেখানে আমি গাইব ও ইন্দিরা নাচবে। তারপর দেব পাড়ি ইতালি। দেখা যাক জুরিখে আসর কিরকম জমে।

কিন্তু এঁর কথা আর একটু বলি, কেননা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান আছে একথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি। শুনে এসেছি—বিশেষ ক'রেই বিজ্ঞানদীক্ষিত ভারতীয় বিশ্লেষকদের মুখে—যে, ধর্ম হ'ল সেকেলে, এতদিন ও জ্ঞানের মুখোস প'রে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্ভেদী তথা নিষ্করুণ রশ্মিছুরিকার প্রসাদে উদ্ঘাটিত হয়েছে ওর কঙ্কালসার নিজমূর্তি। এঁরা বলেন যে বিজ্ঞানের যে-পদ্ধতি বস্তুজগতের নানা তথ্য-নির্ধারণে আমাদের কাজে এসেছে সে-ই করবে অধম-তারণ—আর কেউ নয়। মাদাম তাইয়ার একসময়ে এতটা না হ'লেও এই ধরনের কথাই বলতেন, তারস্বরে না হোক, বেশ নৈশ্চিত্যের মিড়েই। "কিন্তু"—বলেছিলেন ইনি আমাদের—"আমি অবশেষে বিজ্ঞানের খেয়ায় ভবসিন্ধু পার হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছি কেননা বুঝতে পেরেছি যে, ও-পথে মানুষের মুক্তি নৈব নৈব চ: তার জন্যে তাকাতে হবে বাইরের ঝিকিমিকিতে নয়—অন্তরের অতলে। আর এ-বিশ্বাস আমাকে যুক্তি দিয়ে খাড়া করতে হয় নি—অভিজ্ঞতার আলোয়ই গড়ে উঠেছে। ধর্ম মানুষকে যেদিক থেকে বুঝতে চেয়েছিল আমি চেয়েছিলাম তার উল্টোদিক থেকে পরীক্ষা। কিন্তু হ'লে হবে কি, চাক্ষুষ করলাম যে, যোগের অন্তর্মুখী পদ্ধতিই খতিয়ে টেঁকসই। বিজ্ঞানের বহির্মুখী পদ্ধতি খানিক দূর সাঁতরেই পড়ে অথই জলে।"

আর একটু প্রাঞ্জল ক'রে বলি—যদিও বেশি বলায় হয়ত সুফল ফলবে না—আধুনিক বুদ্ধিবাদী মানুষ হেসেই উড়িয়ে দেবে হয়ত। তবু—ভয়টা কিসের? সেদিন পড়ছিলাম বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Warwick Deeping-এর একটি উৎকৃষ্ট

উপন্যাস : The Secret Sanctuary : এতে একটি চমৎকার বিজ্ঞানবিশারদ ডাক্তারের কথা আছে। মানুষটি বৈজ্ঞানিক হ'লেও একদেশদর্শী নন, তাই বলেন না—কলিকালে বিজ্ঞান ছাড়া নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। ভুল ভেঙেছে বৈ কি, নৈলে কি বলতে পারতেন তিনি একটি যুবককে :

"Look here, Jack ! About fifty years ago the scientific school got a swelled head ; it was bumptious and aggressive, and it had excuses, but that swelled-headedness has been coming down. Now we are allowed to mention a thing called intuition. I believe in intuition. I believe some of the older people used to call it faith."

কিন্তু যেহেতু প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক-পরিষদের মাথা গরম হয়েছিল একটু বেশি, তাই এখনো পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয় নি সে-মাথা। আর একটু সময় লাগবে—আর তখনই তাঁরা বুঝবার কিনারায় আসবেন যে সত্যাব্ধির নানান অতলমণিই বুদ্ধি-ডুবুরির নাগালের বাইরে। কিন্তু সে-শান্তদৃষ্টির দিন যে আসন্ন তার কিছু আভাস ইতিমধ্যেই অনেক বৈজ্ঞানিক পেয়েছেন, বুদ্ধি দিয়ে জীবনরহস্যের তল পাচ্ছেন না ব'লে। তাই তাঁরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আজকের দিনে টেলিপাথি, মেটিরিয়ালাইসেশন, লেভিটেশন প্রভৃতি নানা ঘটনাকে বাস্তব ব'লে মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—আরো অনেক কিছু তাঁদের মানতেই হবে ভাবী কালে। মাদাম তাইয়ারও এই কথাই বলতেন আমাদের প্রায়ই যে, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এসব, দেখেছেন এমন অনেক কিছু বিজ্ঞান-বহির্ভূত অঘটন যার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসম্ভব। শুধু তাঁর একটি দর্শনের কথা বলি। শ্রীঅরবিন্দের ফটো নেওয়া হয়েছিল স্বদেশী যুগে চল্লিশ বছরেরো আগে। সে-ছবি সবাই দেখেছে। কয়েক বৎসর আগে—১৯৪৯ সালে—এক ফরাসী ভদ্রলোক আশ্রমে এসে তাঁর বৃদ্ধবয়সের অনেকগুলি ছবি নেন। এই দুই ছবির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল ঢের বেশি—এত বেশি যে, যাঁরা জানেন না তাঁরা হয়ত চিনতেই পারবেন না এ দু'টি একই মানুষের ছবি ব'লে। আচ্ছা। মাদাম তাইয়ার বম্বেতে নেমে ভাবলেন : শ্রীঅরবিন্দ শুনেছি মস্ত যোগী—যাওয়াই যাক না তাঁর আশ্রমে। শ্রীঅরবিন্দের কোনো বইই তিনি তখনো পর্যন্ত পড়েন নি, শুধু লোকমুখে তাঁর নাম শুনেছেন মাত্র। হঠাৎ একদিন ধ্যানে তিনি দেখিলেন একটি সৌম্য বৃদ্ধের মুখ—অপরূপ, জ্যোতির্ময়, অবিস্মরণীয়।

স্বপ্নেতে দেখলেন শ্রীঅরবিন্দের চল্লিশ বছর আগেকার ছবি। তাঁর ধ্যানদৃষ্ট মুখের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো মিল তাঁর চোখে পড়ে নি, কাজেই মনেও হয়নি মিলিয়ে দেখবার কথা। আশ্রমে এসে প্রথম দেখলেন তাঁর বৃদ্ধবয়সের ছবি। দেখেই চম্‌কে উঠলেন—এই মুখই তো তাঁর ধ্যানলোকে দেখা দিয়েছিল! বিজ্ঞান কী বলবে—অবশ্য যদি না তাঁর এ-ধরনের দর্শনকে "স্বকপোলকল্পিত" ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয়। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি চিনতেন না, জানতেন না, তাঁর একছত্র লেখাও পড়েন নি, অথচ হঠাৎ তাঁর ধ্যানে মূর্ত হয়ে উঠল কেমন ক'রে সেই মুখ যে-মুখ তাঁর কোনো বইয়েই এখনো পর্যন্ত ছাপা হয় নি! বইয়ে দেখেছিলেন তিনি চল্লিশ বছর আগের মুখ। ধ্যানে দেখলেন চল্লিশ বছর পরের না-দেখা মুখ!

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এ-ধরনের দর্শনাদিকে হয় হসনীয় হসন্ত নাম দিয়ে করেন ডিসমিশ, না হয় লম্বা লম্বা বুলি দিয়ে জটিল ব্যাখ্যার জাল বুনে বুঝিয়ে দেন অপরকে যা তাঁরা নিজেরা আদৌ বোঝেন নি। ইন্দিরার সঙ্গে মাদাম তাইয়ারের সখিত্ব হ'ল আরো এইজন্যে যে, ইন্দিরারও এ-ধরনের বহু অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না। এসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছি "No Reason Can Explain" নাম দিয়ে। এ-ঘটনাগুলি আমার ও ইন্দিরার ডায়ারি থেকে উদ্ধৃত। এদের মধ্যে তিনটি মাত্র এখানে তুলে দেই আমার বক্তব্যটিকে ফুটিয়ে তুলতে।

১৯৫১ সালের ২রা আগস্ট তারিখে ইন্দিরা তার ডায়ারিতে লিখে রেখেছিল এবং আমাকেও বলেছিল—তার একটি ধ্যানদর্শনের কথা। দর্শনটি এই: ও দেখল দেওয়ান সুরেন্দ্রলাল ব'লে ওর এক বাল্যবন্ধু গোয়ালিয়র থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন: "আমার মা আপনার জন্যে একটি ছোট মালা গেঁথেছেন, সেটি এই খামের মধ্যে পাঠালাম।" ৯ই আগস্ট তারিখে সুরেন্দ্রলালের চিঠি এসে হাজির একটি মোটা খামে—চিঠিতে অবিকল ঐ কথা লেখা ও খামের মধ্যে একটি পরিপাটি ক'রে পাট-করা বকুলফুলের মালা—বালার মতন। মালাটি সযত্নে রেখে দিয়েছি স্মারকচিহ্ন স্বরূপ—কৌতূহলী সন্ধানীদের দেখাতে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই: ১৯শে জুন (১৯৫৩) তারিখে নিউয়র্কে আমাদের একটি গানের আসর হয় শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী দয়ালের বাড়িতে। সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

পুত্র শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ও ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁদের ফ্লাটে মধ্যাহ্ন-ভোজন করতে। ঠিক হয় ২৪শে জুন আমরা যাব তাঁর ওখানে। ২৪শে জুন সকালবেলা ইন্দিরা আমাকে বলে: "আমি দেখলাম পূর্ণেন্দু দেশ-থেকে-আসা কি একটি চিঠি না তার পড়ছেন—দুঃসংবাদ। আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন বোধহয় আজ সেখানে হবে না।" ঘণ্টাখানেক বাদে পূর্ণেন্দুর ওখান থেকে টেলিফোন এল যে দেশ থেকে খারাপ খবর এসেছে—মধ্যাহ্ন-ভোজন স্থগিত রইল। আমরা সেইদিনই বিকেলে উড়ে লণ্ডন রওনা হলাম। লণ্ডনে গিয়েই শুনলাম মহামতি শ্যামাপ্রসাদের শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ। পূর্ণেন্দু শ্যামাপ্রসাদের ভাগনে—শ্যামাপ্রসাদ বুঝি ২৩শে জুন কাশ্মীরে দেহত্যাগ করেন।

তৃতীয় ঘটনা: আমরা তখন সানফ্রান্সিস্কোতে। ইন্দিরা স্বপ্ন দেখল ওর বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রলাল দিল্লিতে বসন্তরোগে শয্যাশায়ী। কিন্তু দিল্লিতে সুরেন্দ্রলালের বসন্ত হবে কেন—ওরা পরম স্বাস্থ্যবান্ পাঞ্জাবি, তাছাড়া ধনী বণিকের বসন্ত কিনা স্বাস্থ্যনিলয় দিল্লিতে? ইন্দিরা আশ্বস্ত হ'য়ে বলল: "তবে বোধহয় এম্‌নি—বাজে স্বপ্ন।"

কিছু দিন বাদে সুরেন্দ্রলালের চিঠি এসে হাজির। তাতে সে লিখেছে তার হঠাৎ বসন্ত হওয়ার দরুন অনেক দিন আমাদের খবর নিতে পারে নি।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক এ-ধরনের অঘটনকে হয় বরখাস্ত ক'রে দেবেন আমাদের মিথ্যুক নাম দিয়ে, না হয় বড় বড় নাম দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে দেবেন চণ্ডীচরণের মতন, যাঁর কথা পিতৃদেব লিখেছিলেন তাঁর হাসির গানে ষাট বৎসর আগে:

"চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থকার,
এম্‌নি তিনি হিন্দুধর্মের করতেন মর্ম ব্যক্ত,
যে, দিনের ম'ত জিনিস হ'ত রাতের ম'ত অন্ধকার,
জলের ম'ত জিনিস হ'ত ইঁটের মত শক্ত।"

কিন্তু আর না। ইন্দিরার এ-ধরনের আরো অনেক উপলব্ধি যদি কখনো ভবিষ্যতে প্রকাশ করি তখন বলব এসম্বন্ধে আরো অনেক বলবার মতন কথা। মাদাম তাইয়ারও তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর এ-ধরনের ও গভীরতর অনেক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। এ-বইটি প্রকাশ করবেন কিনা সে নিয়ে তিনি একদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি বললাম: "নিশ্চয় করবেন। সত্য ব'লে যা জেনেছেন প্রকাশ করবেন না এ কেমন কথা?"

মাদাম তাইয়ার বললেন চিন্তিত সুরে: "তা বটে, কিন্তু এ-ধরনের কথা শুনলে

লোকে প্রায়ই ভুল বোঝে, ভাবে বুঝি অসম্ভব কথা ব'লে সস্তা নাম কেনার চেষ্টা—কিম্বা নির্জলা মিথ্যা প্রলাপ।"

তাঁর দ্বিধা হওয়ার যে হেতু আছে একথা অনস্বীকার্য। কারণ য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকদল মুখে যতই বলুন না কেন—"We are open to conviction", কার্যক্ষেত্রে তাঁদের মন ও বুদ্ধি ছাড়তে চায় না সম্ভব-অসম্ভবের সুচিহ্নিত গতিবিধির পথ। শ্রীঅরবিন্দ একবার লিখেছিলেন একটি গভীর কথা যে, মানুষের মন তার অভ্যস্ত ধারণা নিয়ে ঘর করতে করতে অজান্তে তাদের ভালোবেসে ফেলে যেমন ভালোবাসে দেহী তার নিজের দেহকে। তাই এ-হেন কোনো ধারণার উপরে ঘা পড়লে সে তেমনি দুঃখ পায় যেমন দুঃখ পায় তার কোনো দেহাঙ্গে হঠাৎ আঘাত বাজলে। মন শিরপা তোলে অসম্ভবকে মানতে কেন না সে মানবে কেমন ক'রে যে সে আসলে অতি-অল্পজ্ঞ? যে এতদিন ছিল ব্যবহারিক জগতের বিধাতা না হোক বিচারক তথা দণ্ডধারী, সে যা বোঝে তা-ই অস্তি, যা বোঝে না—নাস্তি—এই হ'ল যৌক্তিক-মনের আত্মপ্রসন্ন ধারণা। তাই সে রুখে ওঠে যখন আচম্‌কা তাকে কোনো অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা বলেন ( শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী ):

Our mind lives far from the authentic Light
Catching at little fragments of the Truth
In a small corner of infinity.

সত্য আলো হ'তে বহুদূরে করে মানব মানস
বসবাস: চাহে নিত্য ধরিতে সাগ্রহে সে ঋতের
খণ্ড খণ্ড অংশ হায় অনন্তের এক ক্ষুদ্র কোণে।

মাদাম তাইয়ার স্বপ্নকোবিদ একথা বলেছি। য়ুরোপীয় স্বপ্নতাত্ত্বিকেরা বলেন —স্বপ্নের জগৎকে নানাভাবে বশে আনা সম্ভব যদি আমাদের অবচেতনকে কোনোমতে একবার চেতন মনের চৌহদ্দির মধ্যে টেনে আনা যায়। মনোবিকলন-মনীষীরা এসম্বন্ধে গত ত্রিশচল্লিশ বৎসরের মধ্যে গবেষণার বিশ্বকোষ প্রণয়ন ক'রে ফেলেছেন বললে একটুও বেশি বলা হবে না। কাজেই সে-সব আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করার না আছে প্রয়োজন, না সার্থকতা। তাছাড়া এসম্বন্ধে আমি কিছুকিঞ্চিৎ পড়াশুনো করলেও বেশি খবর রাখি না। যেটুকু পড়েছি তা থেকে জেনেছি ও শিখেছি শুধু এইটুকু যে এঁরা চান অবচেতন মনকে তুতিয়ে পাতিয়ে চেতন মনের কোঠায় টেনে আনতে, কেননা আমাদের মগ্নচেতন-লোকের নানান্ যত্নলালিত কুজ্‌ঝটিকা চেতনার রাজ্যে আনলেই আলোর

চিকিৎসায় কালো পালায়। মাদাম তাইয়ার এই পদ্ধতিতেই বিশ বৎসর ধ'রে সাধনা ক'রে অবচেতনের অনেক জমাট কুয়াশার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিলেন, যেহেতু এইই ছিল তাঁর পেশা তথা নেশা। "কিন্তু" বললেন তিনি, "আমি ভেবেছিলাম এক, হ'ল আর: অবচেতন লোক আমার তাঁবে আসতে না আসতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমার ধ্যানলোকে দেখা দিতে সুরু করলেন—যার ফলে আমার শুধু অন্তর্জীবনেই নয় বহির্জীবনেও ঘটে গেল বিপ্লব—আমি য়ুঙের শিষ্য ছেড়ে দীক্ষা নিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের—উত্তীর্ণ হলাম ক্ষীণালোক মনোমহল থেকে দীপ্তপ্রভা অধ্যাত্ম-আলোকে।"

* * *

ইন্টারলাকেন থেকে জুরিখ ফেরবার পথে পড়ে লাবণ্যময়ী লুৎসার্ন নগরী। মস্ত শহর। ইন্দিরা বলল, লুৎসার্নে দু'দিন থেকে গেলে মন্দ কি? যৎ চিন্তিতং তৎ কৃতম্: লুৎসার্নের একটি মস্ত হোটেলে এসে উঠলাম, নাম প্যালেস হোটেল।

প্যালেসই বটে। সাম্‌নে হ্রদ থেকে দেখা যায় এ-হোটেলের প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আমাদের ঘরের সামনেই বিশাল লুৎসার্ন হ্রদ। ঘরের সামনেই গাড়িবারান্দা। সেখানে ব'সে লিখে চলেছি—সামনে নীলহরিৎ হ্রদের শোভা দেখতে দেখতে।

কী অপরূপ সুইজর্লণ্ডের হ্রদগুলি! কত রকম রঙ তাদের! সকালে একরকম, বিকেলে আর এক রকম, সন্ধ্যায় আর এক মূর্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখি চেয়ে চেয়ে মুগ্ধনেত্রে। ইন্দিরা থেকে থেকে বলে সোল্লাসে: "দেখ দেখ দাদা, ঐ—ঐ মোটর বোটের পিছনে মানুষ—চলেছে acquaplane ক'রে।" নিউয়র্কে সিনেরামায় দেখেছিলাম এ-বিচিত্র জলচারণ যার কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। মোটর বোট ছুটেছে—দুটি লম্বা দড়ি টেনে। প্রতি দড়ির পিছনে একটি ক'রে মানুষ জলের উপরে সরু কাঠের তক্তায় দাঁড়িয়ে। মোটর তাদের টেনে নিয়ে চলেছে নক্ষত্রবেগে। কী দুর্দান্ত খেলা! ভয় করে না? ভয়! ওদের ঐতেই যে আনন্দ।—ঐ—ঐ, টান সাম্‌লাতে না পেরে হৈ হৈ ক'রে উল্টে প'ড়ে গেল একজন জলে। মোটর বোট ভ্রূক্ষেপও না ক'রে চলল তেম্‌নি উধাও। জলে যে পড়ল সে সাঁতরে তীরে উঠল। যে পড়ল সে ভাসল, যে ছুটল সে হাসল। এখনো আমরা এ-ধরনের জলবিহারে দীক্ষিত হই নি।

কখনো বা দেখি মোটর বোট চলেছে—মাঝি একটি—চলেছে পায়ের জোরে —ঠিক যেমন চলে সাইক্লিস্ট বাইসিক্লে। কখনো ভেসে চলে একের পর এক

পাল-তোলা নৌকা। কত স্টীমার! সাঁতারুও দিচ্ছে সাঁতার। সুন্দর জল —এখানেই তো দিতে হয় সাঁতার! ভাবছি আজ দেব সাঁতার আমিও। কিন্তু ভয় না ক'রে পারে? যে-ঠাণ্ডা জল—জ'মে যাব না তো বৃদ্ধ বয়সে? নরওয়েতে জহরলাল যৌবনেও একবার জ'মে যাবার মতন হয়েছিলেন— লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। যে বেশি জানে সে কি সব সময়ে বেশি নির্ভীক হয়, না সাবধানী? নাঃ—কবি দার্শনিক স্বপনী কায়েম থাকুন তাঁদের স্বভাবেই। আমি এদের প্রাণনৃত্যময় জলবিহার তট থেকেই দেখি এ যাত্রা। বয়স বিস্তর হ'ল: শিং ভেঙে সেই কার দলে ঢোকার কথা বলে না? কাজ কী?

কিন্তু তা ব'লে কি স্টীমারেও চড়ব না, তটে ব'সেই কাটাব সারাদিন? সন্ধ্যায় যাওয়া যাক স্টীমারে। "দেড় ঘণ্টা ঘুরে আসা যাক, চলো"—বলল বীরবালা ইন্দিরা।

"তথাস্তু"। কাটলাম টিকিট, চড়লাম স্টীমারে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। প্রথম শ্রেণীর সুন্দর কামরায় সান্ধ্যভোজন নির্বাহিত করলাম ত্ন'দিকের অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে। এদেশে সন্ধ্যায় জলচারণ এর আগে করি নি। তাই বুঝি এত মুগ্ধ হলাম। দিনের আলোয় হ্রদের সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকের পার্বত্য শোভা দেখা, আর গোধূলির আলোয় দেখা, এ-তুয়ের ছন্দ এক নয়। দিনের আলোয় পাই প্রকৃতিদেবীর উজ্জ্বলতার রস, সন্ধ্যার স্তিমিত লগ্নে রহস্যের রস। চারদিকে কত সুন্দর সুন্দর কুটীর, কুঞ্জ, বীথিকা—গোধূলির আবছা আলোর ঘোম্‌টা প'রে উঁকি দিতে থাকে। এখানে ওখানে ধীরে ধীরে নানা গৃহে দীপ জ'লে ওঠে। হঠাৎ—ও কী? অস্তসূর্যের রাঙা আলো ঢেউয়ের উপর ঢ'লে পড়ে—আশপাশে নীল জল, মধ্যে রাঙা ঢেউয়ের শোভাযাত্রা চলেছে একের পর এক সমান্তরালে। তার পর রবি নামলেন পাটে, তাঁর রাঙা আলো হ'য়ে উঠল নীললোহিত। তুই গিরিমালার মাঝখানে রঙিন জল লাল-নীলে মিলে হ'য়ে উঠেছে যেন পটে-আঁকা ছবিটি! চিত্রী হ'লে এই ময়ূখমহিমার হয়ত আরো বেশি রস গ্রহণ করতে পারতাম যেমন সঙ্গীতজ্ঞ করে গানের সুরের রস। কিন্তু নাই বা হলাম চিত্রী—গভীর আবেশ যখন মনের কূলে ঘনিয়ে ওঠে তখন সে টেনে আনে যে করুণ-মধুর ভাব তার আমেজ তো পেলাম! অন্তর উঠল তো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে—কবিতার সুর উঠল তো গুনগুনিয়ে:

দিনে দিনে কত স্বাদ নিত্যনব ছন্দে দেয় ধরা:
আজ পাই যে সুগন্ধ কাল তার পাই নি তো লেশ!

আজ শুনি পূরবীতে কাল যে আছিল নিরুদ্দেশ,
সন্ধ্যার কারুণ্যে করে শান্তিপাঠ উষা কলস্বরা !

গিরিমালা পরে অবগুণ্ঠন—বিচিত্র, সুরঞ্জিত !
মেঘবালা ঘুম যায় নীল উপত্যকায় সুন্দরী !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসে কী বিষাদ মাধুরীমণ্ডিত !
তটভূমে স্নিগ্ধ হাসি হাসে ফুল, ব্রততী, মঞ্জরী !

শৈল ও কি ? কিম্বা ঘন নীরদের প্রশান্ত ত্রিশূল ?
নিম্নে আবছায়া…ঊর্ধ্বে জ্ব'লে ওঠে কত দীপমালা…
ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপী কে সে ঐন্দ্রজালিক অতুল
আনন্দের ছন্দ রচে হাতে ল'য়ে বসন্তের ডালা !

লাবণ্যের অন্তহীন রাগালাপ সাধে কে সে গুণী
সাঙ্গহীন রঙ্গে ভঙ্গে সুরে তালে আদিকাল হ'তে ?
চঞ্চলের মাঝে কোন্ অচঞ্চল সামগান শুনি
জলে স্থলে মেঘে নভে শৈলপুরোহিতের সুব্রতে !

ব্রত হোক এ-জীবন তাহারি—যে রচিল প্রাণের
অফুরন্ত সনাতন মন্ত্রগীতা রজনী বিহানে।
এ-প্রার্থনা জাগে বন্ধু : অবিস্মরণীয় এ-দানের
অঙ্গীকার সাধি যেন অনন্তের অশ্রান্ত সন্ধানে।

* * *

জুরিখে ফিরে এলাম ১১ই তারিখে। যাঁর বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যায় মাদাম তাইয়ার আমাদের জন্যে সঙ্গীত-সভার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি একজন বিশিষ্ট সুইস ভাস্কর, নাম জানোলি। কথায় কথায় তিনি বললেন যে ভাস্কর হ'য়ে এদেশে জীবিকা-নির্বাহ করা সুকঠিন ব'লে আজকাল তিনি আধা সময় নিযুক্ত করেন পটুয়ার কাজে, আধা সময় ব্যবসাবাণিজ্যে। একবার নামডাক হ'লে এদেশে শিল্পীর ধনাগম হয় বটে, কিন্তু সে-প্রতিষ্ঠা লাভ করতে এদেরও বেগ পেতে হয় প্রচুর। কিন্তু মরুক গে—সঙ্গীতের কথাই বলি।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল। অনেকগুলি শ্রোতা ও শ্রোত্রী এসেছিলেন—নানা জাতের। সুইজর্লণ্ড বর্ণসঙ্করের দেশ। সুইসরা

তাই নানা ভাষাবিৎ। যার সঙ্গেই আলাপ হয় দেখি সে জানে অন্তত তিন চারটি ভাষা। কারুর সঙ্গে কথা বলি জর্মন ভাষায়, কারুর সঙ্গে ফরাসী ভাষায়, কারুর সঙ্গে ইংরাজিতে। এরা ইংরাজী বলে অনেকেই কিন্তু ভালো বলতে পারে না। তাই ফরাসী ও জর্মন ভাষা কাজে এসেছিল।

গান করলাম—স্বদেশী তথা ভক্তিসঙ্গীত। চণ্ডীর দুর্গাস্তব গাইলাম: "দেবি! প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ……"। ইন্দিরা নাচল বন্দেমাতরম্ গানের সঙ্গে প্রথমে, রাসনৃত্যসঙ্গীতের সঙ্গে সবশেষে। ওরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। স্থইজর্লণ্ডে এসে জানোলি-দম্পতির সঙ্গে একরাতের মধ্যেই খুব ভাব জ'মে গেল।

বড় আশ্চর্য দম্পতি: স্বামী স্ত্রী দুজনেই চিত্রী তথা পটুয়া! পরদিন ওঁরা এলেন আমাদের ছবি আঁকতে। ইন্দিরাকে আঁকলেন শ্রীমান্ স্বামী, আমাকে —শ্রীমতী স্ত্রী। স্ত্রী ইন্দিরাকেও আঁকলেন। আধুনিক চিত্রশিল্প ভালো বুঝি না, কাজেই ইন্দিরার ছবির মধ্যে যখন ইন্দিরাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, না আমার ছবির মধ্যে দিলীপকুমারকে—তখন কারুরই কিছু বলার মুখ রইল না। কারণ এই ধরনের আঁকার নামই নাকি মডার্ন আর্ট। কিন্তু লুভ্রে কত ছবি দেখেছিলাম, দেখে মনে হয়েছিল জীবন্ত মানুষকে দেখছি, তথা সুন্দর মুখ। ক্লেয়ার ব'লে এক মহিলার আঁকা বার্নার্ড শ-র ছবি দেখলাম শ-র একটি জীবনীতে। বইটির গ্রন্থকার ক্লেয়ারের স্বামী। তিনি লিখছেন বার্নার্ড শ ক্লেয়ারের আঁকা ছবি দেখে শতমুখে সুখ্যাতি করতেন। একথা সত্য কি না জানি না, কিন্তু যদি সত্য হয় তবে আমাদের মতন আনাড়ির চোখে ফটোগ্রাফই ভালো। ছবি মাথায় থাকুন, আমরা বার্নার্ড শ-র ফটোর মধ্যেই শ-কে খুঁজে পাই—ক্লেয়ার-অঙ্কিত অচিন্ত্য কুরূপের মধ্যে দিয়ে নয়।

যাক্ অনধিকার-চর্চ্চা। যা বলছিলাম। ওঁরা চিত্রকর যেমনি হোন—দম্পতি হিসেবে বড় সুন্দর একথা মানতেই হবে। দুজনেরি এক আদর্শ—কাজেই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে নরনারীর যৌন চুম্বকের টান ছাড়া অন্য একটি টান আশ্রয় পেয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে মানস টান। এ-টান যখন কোনো মিলনের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখি, মন কেমন যেন শুধু তৃপ্তি নয় ভরসা পায়, বলে: এই-ই তো চাই। কারণ যৌন আসক্তির টান যতই কেন না প্রবল হোক, স্থায়ী নয়। দেহের টান যখন মনের টানের আশ্রয় পায় তখন সে যেন একটু অভয় পায়—বিশেষ ক'রে আজকের যুগে যখন দাম্পত্য সম্বন্ধ সব দেশেই অপলকা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। যতই কেন না উচ্ছ্বাস করি ক্ষণায়ু আকর্ষণের

নিবিড়তা নিয়ে, যা দেখতে দেখতে উবে যায় তাকে নিয়ে ঘর করা এক দায়। আধুনিক সভ্যতার মধ্যে একটা প্রবণতা দিনে দিনে যেন আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে—অশান্তি। মানুষ হয়ত পুরোপুরি শান্তি কোনো কালেই পেত না, কিন্তু আজকের দিনে হাজারো কর্মচক্র ও উল্টোপাল্টা আবেগের আবর্তে মানুষ কেমন যেন পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না। আমেরিকার মানুষের মধ্যে এই মানস হাঁপানি বেশি প্রকট হয়েছে সত্য, কিন্তু এর ছোঁয়াচ লেগেছে সব দেশের শান্তিকুটীরেই। তাই তো জানোলি দম্পতির মধ্যে মনের মিল দেখতে এত ভালো লাগল।

শেষদিন দুপুরে ওঁদের ওখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে এসেছিলেন একটি ভারি চমৎকার মানুষ, নাম কর্তি (Corti): যেমন মুখশ্রী, তেম্‌নি ব্যক্তিরূপ। ইংরাজি বেশ ভালোই বলেন। শুনলাম স্থইজর্লণ্ডের একজন নামজাদা দার্শনিক তথা কর্মী। গত যুদ্ধে বহু শিশু নিরাশ্রয় হয়েছে—ইনি হাজারখানেক নানাজাতীয় শিশুকে ঠাঁই দিয়েছেন একটি স্থইস গ্রামে। সময় ছিল না ব'লে এ শিশুপ্রতিষ্ঠানটি দেখতে যাওয়া হ'ল না। কিন্তু কর্তি মহোদয়ের লেখা একটি বই প'ড়ে খানিকটা আঁচ পাওয়া গেল আরো এইজন্যে যে, বইটিতে বহু শিশুর ও শিশুর ধাত্রীর ছবি ছিল। এদের নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তিনশো বৎসর আগের এক দার্শনিক মানবপ্রেমিক পেস্‌টালোজির থিওরি অনুসারে। শিশুরা আবাল্য নানা জাতির শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা ও পড়াশুনো করতে করতে মানুষ হচ্ছে ও শিখছে সহজিয়া ঢঙে যে সবার উপরে মানুষ সত্য, জাতিভেদ নাই নাই। কর্তি সাহেব অনেকক্ষণ বেশ গুছিয়ে বললেন শ্লেগেল ব'লে এক দার্শনিকের কথা। তাঁর ভাবটা এই যে, ভগবান্ সর্বাঙ্গস্থন্দর নন সম্পূর্ণও নন...কিন্তু তিনি স্বভাবে স্রষ্টা বটে এবং শক্তিও তাঁর যে কিছুকিঞ্চিৎ আছে এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। এই শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে বস্তুবিশ্বের যাবতীয় ঘটন-অঘটনে—রেখারঙে—রূপরাগে। ফলে বিশ্বের বিকাশই বলো বা পরিবর্তনই বলো একটা কিছু হচ্ছে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটা জিনিসও হচ্ছে বা ঘটছে: বিশ্বকে (Cosmos) গড়তে গড়তে তিনি নিজেও গ'ড়ে উঠছেন। আর যেহেতু তাঁরও এইভাবে বিকাশ হচ্ছে সেহেতু বলতেই হবে তিনি স্বয়ংপূর্ণ নন। যদি হ'তেন তাহ'লে সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন কী দুঃখে? না: সৃষ্টি নিটোলও নয়, নিখাদও নয়। কিন্তু পোড় খেতে খেতে, ঘা খেতে খেতে মানুষ যেমন শিখছে পূর্ণযোগের ক্রমবিকশমান মন্ত্র

তেমনি মানুষের স্রষ্টাও ধাপে ধাপে উঠছেন আত্মোপলব্ধির আরোহিণীতে। মানুষের সঙ্গে ভগবানও চলেছেন আত্মবিকাশের পথে। এ-সিদ্ধান্তে শ্লেগেল পৌঁছেছেন এই যুক্তির নির্দেশে যে ভগবান যদি সবদিক দিয়ে নিখুঁত ও আত্মতৃপ্ত হ'তেন তবে তিনি সে-পূর্ণতার আনন্দ ছেড়ে এ-অপূর্ণতার হাজারো বিড়ম্বনার ফাঁদে পা দিতেন না কখনই।

কর্তি সাহেব আরো বললেন: "ভারতের জ্ঞান বহু বিকশিত। তাই ভারতের কাছে আমরা জানতে চাই ভগবানের এই যে ছবি আমাদের এক বিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক কল্পনা করেছেন সে-ছবি সত্য কি না। কী বলেন আপনি?"

আমি বললাম: "ভারতে আমরা ঠিক এভাবে মনের যুক্তি দিয়ে ভগবানের থই পেতে ধাওয়া করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অচিন্ত্য—যদিও উপলব্ধিগম্য। মানে, তাঁর স্বরূপ কিছু অনুভব করা যায়—কিন্তু মানস উদ্যমে তার বর্ণনা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। তবে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছেন তাঁরা সবাই সমস্বরে এই একই এজাহার দিয়েছেন যে, তিনি নিখুঁত ও মানুষকে টানছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অচলপ্রতিষ্ঠ সর্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণতারি দিকে: কী ভাবে টানছেন তার একটু আধটু হদিশ মন পেতে পারে, কিন্তু তাঁর স্বরূপ স্ব-ছন্দ কী ভাবতেও মন বুদ্ধি দিশাহারা। কারণ মনের অতীত একটি অনুভব-লোক আছে যেখানে পৌঁছানো যায় এবং পৌঁছলে দেখা যায় যে মন ধারণাই করতে পারে না তিনি আসলে কী।"

কর্তি সাহেব একথা শুনে প্রসন্ন হলেন না, বললেন: "আপনি যা বলেছেন তার তাৎপর্য যে আমরা বুঝতে পারি না এমন নয়। কিন্তু হয়েছে কি জানেন? মন নিয়েই আমাদের কারবার—দূরবীণে অণুবীণে আমরা যা কিছু দেখি শুনি মনই সেসব দেখাশোনাকে নিয়ে যাচাই করে—করতে বাধ্য। কারণ এ-জগতে আমরা জন্মেছি কয়েকটি বোধশক্তি নিয়ে যাদের ভিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের 'পরে। কিন্তু এই সব বোধশক্তি আমাদের কাজে আসে কেবল তখন যখন মন তাদের যাচাই ক'রে, পরখ ক'রে নিদান দেয় কোন্ বোধের বা দর্শনের মূল্য কতটুকু। এককথায়, মন বিনা আমাদের না আছে গ্রহীতা, না বিচারক। তাই হেগেল বলতেন: 'যদি অতীন্দ্রিয়বাদীদের এই কথাই সত্য হয় যে মন দিয়ে ভেবে বিশ্বরহস্যের কোনো কিছুরই তল পাওয়া যাবে না, যেতে পারে না—তাহ'লে আমি বলব: বেশ তাহ'লে আমি হাল ছেড়ে দিলাম—এ-ধরনের জীবন নিয়ে

আর কারবারই করব না—যা হয় হোক—আমার আর বাঁচবার কোনো তাগিদই রইল না।' না। একথা আমরা মেনে নিতে পারি না যে, মন ভেবেচিন্তে শেষটায় এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে বাধ্য যে হার মানা ছাড়া আর গতি নেই। আমরা মন ও বুদ্ধির হাল-ছেড়ে-দেওয়ার বাণীকে গ্রহণ করতে পারি না জ্ঞানের চরম বাণী ব'লে।"

ইন্দিরা এবার কথা কইল, বলল: "হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা কে বলছে? ভারতের মুনি ঋষি দ্রষ্টারা একবারও বলেননি যে কোনো কিছুরি তল পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন আপনারা হেঁকে বলেন যে তল পাবার একমাত্র হর্তাকর্তা হচ্ছেন মন-ডুবুরি মহারাজ, তখনি ওঠে যত বাদবিতণ্ডা। হয়েছে কি, আপনারা সরাসর ধ'রে নিয়েছেন যে, খতিয়ে এই বস্তুবিশ্বকে মাপবার গুনবার বুঝবার ভার একা মনের—আর কারুর নয়। আমরা বলি—মানে ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনি মনীষী বলেন—'মনের শক্তি সীমাবদ্ধ—সে খানিকদূর অবধি আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার পরে হবেই হবে দিশাহারা।' আপনারা একটা জিনিস যেন এখনো পর্যন্ত ভালো ক'রে ভেবে দেখেন নি ব'লে আমাদের মনে হয়: যে, আপনাদের এ-মনগড়া ধারণা বা দাবিটি অযৌক্তিক যে বলে: 'আমার আজকের নাবালক মন বিশ্বের সর্বরহস্যের বিচারক ও ব্যাখ্যাতা হবার শক্তি ধরে।' অযৌক্তিক বলছি এই জন্যে যে আপনারাও নিশ্চয়ই এটা মানেন যে মানুষের মন ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে। দশহাজার বৎসর আগেকার গুহাবাসী বর্বর মানুষের মন এ-বিশ্বরহস্যের যতটা তল পেয়েছিল আমরা নিশ্চয় তার চেয়েও তলিয়ে বুঝতে পারি, একথা মানেন তো?"

কর্তি সাহেব বললেন: "বটেই তো।"

ইন্দিরা বলল: "তাহ'লে এ-সিদ্ধান্তকেও যৌক্তিক ব'লে আপনাদের মানতেই হবে যে আরো দশহাজার বৎসর পরে আরো-বিকশিত মানব-মন বিশ্বরহস্যের আরো অনেক কিছু বুঝতে পারবে যা সে আজ পারছে না। কেমন?"

কর্তি সাহেব চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে সায় দিলেন শুধু।

ইন্দিরা বলল: "বেশ। তাহ'লে বলব আপনাদের সচেতন হবার সময় এসেছে যে আপনারা মনের শক্তি ও এলাকা নিয়ে আজকের দিনে যে-সব সিদ্ধান্তে পৌছেছেন সে-সব 'আজকের মনের' চিন্তাবলে গ'ড়ে-ওঠা সিদ্ধান্ত। কাজেই দশহাজার বৎসরের পরে যে-মন গড়ে উঠবে সে-মন খুব সম্ভব আজকের

মনের অনেক মান্যগণ্য রায় ও সিদ্ধান্তকে উল্টে দেবে, যেমন আজকের মানব-মন উল্টে দিচ্ছে দশহাজার বৎসর আগেকার মানব-মনের অনেক রায় সিদ্ধান্ত এজাহার। কাজেই আমরা বলতে চাই—আপনাদের যুক্তির 'পরে ভর ক'রেই —যে, যদি আপনারা বড় গলা ক'রে বলতে পারেন যে আপনাদের আজকের মন বিকাশের চরম শিখরে উঠে পূর্ণ প্রবীণ হ'য়ে উঠেছে তাহ'লেই আপনাদের এ-ঘোষণা করার এক্তিয়ার হবে যে আমাদের মন যার নাগাল পায় না সে নাস্তি বা নামঞ্জুর। কিন্তু আপনি বলবেন কি যে, কোনো মনীষীর মন এ-যুগেও এতবড় দাবি করতে পারে? যদি না পারে তবে তার পক্ষে এ-ধরনের পরোয়ানা জারি করা কি স্পর্ধার কথা নয় যে, ভাগবত সত্যকে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করবার ভার একা আমারই। আর একটা কথা: ভারতের মহাসাধকেরা শুধু যে দর্শনের দিকেই বড় তাই নয়, তাঁদের মনও বিকাশের কোঠায় খুব উঁচুতে উঠেছে। তাই তাঁরা এই বিকশিত মনের ভাষা দিয়েই এ-বিশ্বের ভাষ্য করেছেন ও করছেন—দেখিয়ে মনের দৌড় কতদূর পর্যন্ত। তাঁরা মনকে মোটেই হেসে উড়িয়ে দেন না, কেবল বলেন: মন যার দিশা পায় না তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে সে স্পর্দ্ধাটাই হ'য়ে উঠবে হসনীয়।"

কর্তি সাহেব বিস্ফারিত চক্ষে বললেন: "আপনাদের কথা আমাকে চমকে দিয়েছে। কেবল—মাফ করবেন—আপনারা তাহ'লে কি এইই বলতে চান যে মন সব অন্তিম তত্ত্ব নিয়ে মাথা বকানো ছেড়ে দেবে?"

আমি বললাম: "তা কেন? ভারতের মনীষীরা কি মন দিয়ে বুঝতে কম চেষ্টা করেছেন? আমাদের বিখ্যাত শাস্ত্র যোগবাশিষ্ঠে বলছে: "তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ—স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।" মানে: বাঁচে তো সবাই—পশুপক্ষী এমন কি গাছপাতাও বাঁচে, কিন্তু বাঁচার মতন বাঁচে সে-ই যার মন আছে বেঁচে। অন্যভাষায়, আমরা বরাবরই মনকে বুদ্ধিকে দিয়ে এসেছি তার প্রাপ্য সম্মান—ব'লে এসেছি যে মনের ধর্ম যখন গণন মনন তখন তাকে মাপতে ভাবতে মানা করা ভুল, প্রত্যেকেই তার স্বভাবে থাকবে এইই ঠিক্‌, নিগ্রহ হ'ল অপকর্ম। কেবল একটা কথা আমাদের মনে হয়: যে, মন যখন প্রশ্নবাদ করে, 'কেন?' তখন সে আগে থাকতে—a priori—স্বতঃসিদ্ধবৎ ধ'রে নেয় যে, এ-কেনর যথার্থ ও সম্পূর্ণ উত্তর তার বোধগম্য হ'তে বাধ্য। শিশু অনেক প্রশ্নই ক'রে। কিন্তু দাম্পত্য জীবন কী বস্তু এ-প্রশ্ন সে যখন করে তখন কি বলবেন যে এ-প্রশ্নের উত্তর তার শিশুমনের কাছে বোধগম্য হ'তে

বাধ্য? য়ুরোপ ধ'রে নিচ্ছে—যে-কথা ইন্দিরা এইমাত্র বলল—যে তা: আজকের শিশুমন বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে যা যা প্রশ্ন করছে সে-সব প্রশ্নের উত্তর বুঝবার সে অধিকারী। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাটিই—hypothesis—যদি নাকচ হয়—তাহ'লে মনের মানা বা সায়কে খুব বড় ক'রে দেখা চলে কি? বলি শুনুন: আপনি পড়বেন শ্রীঅরবিন্দের Life Divine বইটি—যাঁর দর্শনের কাছাকাছিও আসতে পারেন নি কোনো পাশ্চাত্য দার্শনিক। মন কতটা বুঝতে পারে—যার ওপারে সে পড়ে অথই জলে—তার তিনি একটি বড় চমৎকার ছক কেটেছেন মনেরই তুলি দিয়ে। এ ছক কেটে তিনি বলেছেন যে, এর পরে কী আছে জানতে চাইলে মনের গণ্ডী পেরুতে হবে।"

কর্তি সাহেব বললেন: "Life Divine ? দর্শনের বই ?"

আমি বললাম: "হ্যাঁ, কেবল দর্শন বলতে আপনারা যা বোঝেন আমরা ঠিক তা বুঝি না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লেখা মন দিয়ে না পড়লে একথার মর্মগ্রহণ করতে পারবেন না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলি—যা তিনি লিখেছেন এ-বইটিতে: যে, ভারত যে-সময়ে জ্ঞানের শিখরচারী ছিল—সেই বৈদিক যুগে জিজ্ঞাসুরা আসত তত্ত্বদর্শীদের কাছে এ-প্রশ্ন নিয়ে নয় যে, অমুক অমুক বিষয়ে আপনার মত কী? তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল: অমুক অমুক বিষয়ে আপনি কতটা জেনেছেন, উপলব্ধি করেছেন? অন্যভাষায়, ভারতে আমরা বরাবর জোর দিয়ে এসেছি অপরোক্ষ অনুভবের উপরে—আলোচনা বা তর্কের উপরে না। তাই দর্শন আমাদের কাছে মাত্র বুদ্ধির ব্যায়াম বা মনের মাজাঘষা নয়—যদিও আমরাও মানসিক ভাষারই সাহায্য নিয়েছি আমাদের দর্শন-উপলব্ধিকে মূর্ত ক'রে তুলতে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপনাদের দর্শনের তফাৎ এই যে আপনারা বলেন: প্রাণপণে চিন্তা ক'রে দেখ—বুঝবে। আমরা বলি: প্রাণপণে চিন্তা ক'রে যখন মনের কীর্তির শিখরে পৌছবে তখনই দেখতে পাবে যে তার পরেই সুরু অধ্যাত্ম শৈলমালার—যার চূড়ায় উঠতে হলে মনের যন্ত্রপাতি আর কোনো কাজেই আসবে না। ইন্দিরা সেদিন গুরু নানকের গুরুগ্রন্থ প'ড়ে শোনাচ্ছিল সানফ্রান্সিস্কোয়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন: যানবাহন স্থলপথে খুবই কাজ দেয় কিন্তু সাগরতীরে আসার পরে সে অচল, তখন জাহাজকে ডাক দিতে হয়।"

কর্তি সাহেব বললেন: "আপনাদের কথা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে।

বিশ্বাস করবেন আমিও জিজ্ঞাসু, যদিও মনের—কিন্তু সে যাক্—আগে Life Divine পড়ি তারপর হয়ত বুঝতে পারব আপনারা কী বলতে চাইছেন।"

* * *

ইন্দিরাকে ফিরবার পথে আমি বললাম: "বড় চমৎকার মানুষ এই দার্শনিকটি।"

ইন্দিরা সায় দিয়ে বলল: "শুধু তাই নয়। He is a personality—সত্যিকার আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও চিন্তা এঁর মুখে আলো ফেলেছে: There is a light on his face."

আমি বললাম: "তুমিও ওঁর মুখে না হোক্ মনে কম আলো ফেলো নি।"

ইন্দিরা সরোষে বলল: "অমন করলে আর মুখ খুলব না।"

আমি বললাম: "অমন কাজটি কোরো না। খৃষ্টদেব বলেননি কি—One does not hide the light under a bushel ?"

* * *



# ইতালি

# রোম

জুরিখের বিমানঘাঁটির মতন এমন সুন্দর বিমানঘাটি আর দেখিনি। এর চেয়ে বড় কাণ্ডকারখানা হয়ত দেখে থাকব, কিন্তু এমন নয়নমনোহর ঘাঁটি বুঝি জগতে দুটি নেই। তবে একথা বলা হয়ত উচিত নয় কারণ জগতের কয়টা বিমানঘাঁটিই বা দেখেছি? কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লি, বম্বে, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ব্যাংকক, হংকং, টোকিয়ো, হনোলুলু, সানফ্রান্সিস্কো, লসেঞ্জেলস, শিকাগো, নিউয়র্ক, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (কানাডা), লণ্ডন, পারিস, জুরিখ ও রোম—ব্যস্। কায়রোর ঘাঁটি দেখব ২২শে আগস্ট। তাই এবার বলি একটু ভরসার স্বরে যে এই যে-ঘাঁটিগুলির নাম করলাম এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ঘাঁটি জুরিখের। তা হবে না? একে রামে রক্ষা নেই তায় সুগ্রীব দোসর? একে সুইস দৃশ্য, তার উপর সেখানে সুইস বৈজ্ঞানিক ও এঞ্জিনিয়রের গড়া ঘাঁটি!

কিন্তু যখন রাত নটায় রোম পৌঁছলাম তখন চম্‌কে গেলাম: বিমান থেকে রোমের দীপমালা সে যে কী অপরূপ! এমনটি তো আর দেখিনি! তবে ফের তর্ক উঠবে কয়টি নগরেই বা সন্ধ্যায় নেমেছি? তা বটে। মরুক গে তুলনার বিড়ম্বনা। বলি তিন সত্যি ক'রে যে রাতের রোম বিমান থেকে দেখায় অপরূপ অপরূপ অপরূপ—এবার তো কেউ আপত্তি করবেন না?

সত্যি, সে দৃশ্য ভুলব না। নিয়ে গেল যেন এক অলকাপুরীতে। দেখবেন দেখবেন দেখবেন রাতের রোম বিমান থেকে। অবিস্মরণীয়। অলমতি-বিস্তরেণ।

* * *

রোমে নেমে আরো আনন্দ। কী সুন্দর হাওয়া! সত্যিকার বাসন্ত সমীর, মলয় হিল্লোল যাকে বলে। শুনেছিলাম রোমে এখন দারুণ গরম। কোথায় গরম? দুপুরবেলাও মন্দানিল, সকাল সন্ধ্যায় তো কথাই নেই। ঘরের মধ্যে খালি গায়েই ব'সে থাকা—স্নিগ্ধ রাতে খালি গায়ে শয়ন—লেপকম্বলের বালাই নেই। এর চেয়ে বেশি আনন্দ কি কল্পনীয়?

যে-হোটেলে আমরা ছিলাম তার গালভরা নাম—Albergo Palazzo

Ambasciatory—মানে হোটেল নয়, সাক্ষাৎ প্রাসাদ। কিন্তু ওরা জানে না (বেচারি!) যে আমরা এসেছি আমেরিকা থেকে—যেখানকার সৌধ গগনস্পর্শী, তোড়জোড় অকল্পনীয়। ইতালির হোটেলকে যদি প্রাসাদ বলি তবে আমেরিকার হোটেলকে কী বলব শুনি? অতিপ্রাসাদ না মহাপ্রাসাদ?

না, ঠাট্টা নয়। আমেরিকায় যখন ছিলাম তখন আমেরিকার অনেক কিছু দৃষ্টিকটু লাগত, ওদের উচ্চারণভঙ্গি শ্রুতিমধুর নয়, ওদের চালচলন একটু বেশি রকম বেপরোয়া, ওরা অশান্তিবিলাসী—এই ধরনের কত কথাই সকটাক্ষে বলেছি—কিন্তু আমেরিকা কাছ থেকে দেখায় এক—দূর থেকে আর। আর সবচেয়ে বেশি আহত করে ওদের সঙ্গে তুলনায় অন্য সব দেশের হোটেলের নগণ্যতা না হোক্ সামান্যতা। হোটেলারাম যদি কারুর লক্ষ্য হয় তবে সে যেন আমেরিকাকেই বলে স্তবের সুরে বাংলা তোটকে:

প্রভু, বন্দি তোমার অপরূপ মহিমা
যার ছন্দ তালের অবলুপ্ত সীমা!
মরি ঐন্দ্রজালিক—বিলাসের প্রতিভা!
অতি বিস্ময়কর—যথা দীপ্ত দিবা।

যদি চাও কভু উঠতে সাতাশ তলাতে
নিয়ে যায় দ্বারী একটি বোতাম টেপাতে।
যদি চাও বরফের মধু কুল্পি সুখে
গেলে 'ড্রাগশপে' অমনি সে গলবে মুখে।

প্রতি কক্ষে পাশেই টেলিফোন রিনিনি
মুখে বলতে না বলতে মুহূর্তে জিনি!
নভে পুষ্পকে বিজ্ঞাপনের রটে জয়
আলাদিন-প্রদীপের কথা কল্পনা নয়।

আরো লিখতে পারতাম আমেরিকা-স্তব—যদি হাতে সময় থাকত। কিন্তু নেই, সুতরাং ইতালির পালাগান সেরে নিই—বেলা থাকতে থাকতে।

ফ্রান্সে প্রথম চোখে পড়ে আমেরিকার তুলনায় এরা কত পিছিয়ে। ভিড়ে ঠেলাঠেলি, মানুষের চেঁচামেচি, পথে অজস্র পিকপকেট—তাছাড়া যা চাও পেতে বেগ পেতে হবে। হোটেল, রেস্তর্\u200cাঁয়, রাস্তায়, সর্বত্রই ব্যবস্থার অভাব।

মুখ মিষ্টি বটে, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ইতালি আরো অগোছালো। রাস্তা-ঘাটে এক ধার থেকে অপর ধারে যাওয়া সুকঠিন—পুলিশ রেগুলেট করে ক্বচিৎ—লাল নীল আলো কোথাও আছে কোথাও নেই—এক কথায় অব্যবস্থার জয়জয়কার।

তবু বলব—ইতালি সুন্দর। ইন্দিরাকে একদিন কথায় কথায় বলছিলাম: ভাবতে আশ্চর্য লাগে কিন্তু তবু একথাটা সত্য যে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সৌন্দর্য বাস করতে পারে, পক্ষান্তরে চরম শৃঙ্খলার মধ্যেও কায়েম হ'তে পারে অনড় অচল শ্রীহীনতা। নিউয়র্কের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রোমের তা নয়। কিন্তু তবু ইতালি সুন্দর, আমেরিকা পরিচ্ছন্ন। আমেরিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই এমন কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। কিন্তু সে-সৌন্দর্যের মধ্যেও কোথায় যেন তৃপ্তির অভাব, অথচ কিসের অভাব বলা কঠিন। যেমন কোনো কবিতা ছন্দে মিলে ঝঙ্কারে সুন্দর হ'য়েও অতৃপ্তিকর। যাক এ-গবেষণা। রোমের কাহিনী একটু বলি।

১৯২২ সালে আমার একটি বন্ধু লাভ হয়। তার নাম ভ্লাদিমির ভানেক। জাতিতে চেক। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ও দেশের হ'য়ে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ল'ড়েছিল। ওর বীরত্বের পুরস্কার দিল কৃতজ্ঞ চেক সরকার ওকে চেকোস্লো-ভাকিয়ার একজন রাজদূত বাহাল ক'রে। ১৯২৭ সালে ও যখন পারিসে কনসাল হয়েছিল তখন আমি ওর অতিথি হয়েছিলাম ওর রম্য পারিসিয়ান হর্ম্যে। প্রাগেও আমি ওর আবাসে ছিলাম কয়েকদিন।

১৯৩৯-৪৪এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওর নানারকম অভিজ্ঞতা হয়। রাজদূতও হয়, পরে ওকে চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়তে হয় বলশেভিকদের উপদ্রবে। সুইডেনে দু'বছর জেলে থাকে জর্মনদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করার দরুন। রণান্তে মুসোলিনির প্রাসাদ থেকে ও বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়েছিল একবার। কিন্তু বৃথা! সর্বাসহিষ্ণু বলশেভিক-সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে বনিয়ে চলা ওর সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। ও সুইডেনে একটি সুইড মহিলাকে বিবাহ ক'রে প্রৌঢ়-বয়সের উপান্তে এসে জীবিকা উপার্জন করা সুরু করল বণিক হ'য়ে। গ্যটিংগেন থেকে ওকে আমি লিখেছিলাম যে, আমরা আগস্টের মাঝামাঝি রোমে পৌছব। ও চের্ভিয়া (Cervia) বলে এক শহর থেকে মোটরে রোম পর্যন্ত ছুটে এল ওর স্ত্রী আনা লিসা ও মেয়ে মিরাকে নিয়ে। মোটরে আসতে ১২ ঘণ্টা লাগল। ও এত কষ্ট করেছিল নিছক বন্ধুত্বের খাতিরে। ১৯২৭ সালে জুন মাসে ওর সঙ্গে শেষ দেখা—পারিসে। তারপর দেখা হ'ল ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৩।

অতি সুপুরুষ ভ্লাদিমির। দীর্ঘাকৃতি, গৌরকান্তি, বলিষ্ঠ। মাথার চুল এখন

শাদা—( ছাপ্পান্ন তো, হবে না ! )—কিন্তু মুখে সেই যৌবনের প্রসন্নতা, সদানন্দ উজ্জ্বলতা।

সমর্সেট মমের একটি লেখায় পড়েছিলাম—আধিব্যাধির দুঃখে নীচ মানুষ আরো নীচ হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু মহৎ মানুষ হয় আরো মহৎ। কথাটা মনে লেগেছিল, কারণ জীবনের দিকে নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে দেখলে একথা সত্য ব'লেই মনে হয়। ভ্লাদিয়া এ-উক্তিটির সপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ওকে যারাই জেনেছে চিনেছে তারাই মহৎ ব'লে শ্রদ্ধা করেছে। বহু দুঃখকে ও হাসিমুখেই বরণ করেছে মৃত্যু পর্যন্ত পণ করে। সত্যি, মানুষের মতন মানুষ। স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ, কল্পনায় আদর্শবাদী ও অভীপ্সায় ভাগবত এ-বন্ধুটিকে ভালোবেসেছিলাম প্রথম আলাপের দিন থেকে। কালাতিপাতে সে-প্রীতির বন্ধন একটুও শিথিল হয় নি। ওর স্ত্রী একদিন বলেছিল ইন্দিরাকে : "Dilip—Vladia's dearest friend on earth."

ভ্লাদিয়া শুনত যে কী আগ্রহে ভারতের জ্ঞানী সাধুসন্তদের কথা ! ভারতের 'পরে ওর শ্রদ্ধা দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বৎসর দুই আগে ও আশ্রমে আসতে চেয়েছিল। আসা হয়নি নানা কারণে। কিন্তু আমার মনে হয়—যেকথা ওকে এবার বলেছিলাম একদিন কথাচ্ছলে—যে ওকে ভারতে আসতেই হবে। ভারতের সঙ্গে ওর যে-যোগ সে জন্মলব্ধ নাড়ীর যোগ নয় বটে, কিন্তু কল্পনায় যে আর এক নাড়ী গ'ড়ে ওঠে তার টান যে আরো প্রবল ! নৈলে ও আমাদের জন্যে সব কাজ রেখে বারো ঘণ্টা মোটর চালিয়ে ছুটে আসত কি ?

দেখা হতেই জড়িয়ে ধরল। "বয়স হ'য়েছে তোমার ভ্লাদিয়া"—বললাম আমি, "সব চুল যে পেকে গেছে।"

ও হেসে বলল : "আর তোমার যে সব প'ড়ে গেল তার উপর !"

অনেকদিন বাদে এই পরম বন্ধুটির সঙ্গে দেখা—কী আনন্দে যে কাটল তিনদিন ! সারাদিন ও মোটর নিয়ে আমাদের ঘোরালো, দেখালো—সেণ্ট পিটার গির্জা, কলিসিয়াম, কাতাকোম্ব্ এ-ও-তা কত ধ্বংসস্তূপ—ইতালি ধ্বংসস্তূপে ভরা—কিন্তু কী সুন্দর স্তূপ !

বললাম ওকে হেসে : "এসব ধ্বংসস্তূপ দেখে যেন নিজের ছবি দেখছি এদের মধ্যে।"

ভ্লাদিয়াও হাসল : "হেরে গেলে। স্তূপগুলি ধ্বংস হয়ে আরো সুন্দর হয়েছে যে।"

প্রীতির রসায়নে তুচ্ছ কথাও রসাল হ'য়ে ওঠে—অকারণ হাসির তোড়ে বহু

দিনের পুঞ্জিত ক্লান্তি কেটে যায়। এই কয় মাস কী কর্মাবর্তের মধ্যেই না সাঁতার কাটতে হয়েছে! এতদিনে মনে হ'ল "আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি"!

সত্যি যেন হারা যৌবন এল ফিরে। নিয়ে গেল ও ষোলো মাইল দূরে 'অস্তা' নাম্নী বেলায়। সেখানে সমুদ্রে স্নান করলাম আমরা চারজন—ভ্লাদিয়া, আনা লিসা, চতুর্দশী মিরা ও আমি। ইন্দিরা তটে ব'সে আমাদের আনন্দ দেখে হাসল দার্শনিকের হাসি, ভাবটা : কী ছেলেমানুষ!

সেদিন ছিল সারা ইতালিতে কি এক পার্বণ—ছুটি। উঃ! সমুদ্রতীরে যতদূর দেখা যায় শুষ্ক নরনারী হয়েছে সজল—আবালবৃদ্ধবনিতা যাকে বলে। কোনো সাগরতীরে এত দীর্ঘ বেলাভূমিতে এত অগুন্তি স্নানার্থীকে একসঙ্গে স্নান করতে কখনো দেখিনি। ফিরে এলাম হু হু শব্দে মোটর চালিয়ে। বাপ্ রে, ভ্লাদিয়া কী দুর্দান্ত সারথি! ঘণ্টায় একশো কিলোমিটর ওরফে সাড়ে বাষট্টি মাইল রেটে মোটর হাঁকালো! কাপুরুষ হ'তে ভয় পেলাম ব'লেই নিজের মুখ চেপে ধরলাম, বলিনি "ধীরে রজনী, ধীরে"!

১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে ভ্লাদিয়ার ওখানে আমি গাইলাম অরবিন্দ-স্তব সন্ধ্যাবেলা ধূপ জ্বালিয়ে "তব নৌমি শুভঙ্কর শান্তিঝরম্ চরণং কমলাগ্রহমার্তিহরম্…" ইত্যাদি। তারপর গাইলাম ইন্দিরার রচিত নাম-কীর্তন "রাধে গোবিন্দ বোল তু মুখসে" যে-গানটি 'প্রেমাঞ্জলি'তে' ছাপা হয়েছে। ভ্লাদিয়ার চোখে জল। শেষে নাচল ইন্দিরা মীরাবাইয়ের "চাকর রাখো জী" নবলব্ধ পাঠের সঙ্গে, যেটি ছাপা হয়েছে 'শ্রুতাঞ্জলি'তে।

অপরূপ আনন্দে ও শান্তিতে কাটল সন্ধ্যাবেলা। ভ্লাদিয়া ইন্দিরার কাছে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল : "ভুলব না এ-নৃত্য!"

* * *

ইন্দিরা ধরল পোপকে দেখতেই হবে। ভ্লাদিয়া বলল : "বেশ কথা, আমি খোঁজ নিচ্ছি।" নিয়ে গেল ওর এক বান্ধবীর ওখানে। তিনি ওর স্বদেশিনী—চেক্, বিবাহ করেছেন এক ইতালিয়ানকে। তাঁরা বললেন : "এখন পোপ বাস করছেন রোম থেকে ১০ মাইল দূরে তাঁর একটি আরাম-নিলয়ে। সেখানে গাড়ি-বারান্দায় দর্শন দেন প্রতি রবিবারে বিকেল বেলা সাড়ে পাঁচটায়।"

গেলাম সেখানে বিকাল বেলা : প্রাসাদের নাম Castel Gandolfa : চমৎকার অট্টালিকা—এক রমণীয় হ্রদের ধারে।

কিন্তু গিয়ে দেখি—কী কাণ্ড! আট দশ হাজারেরো বেশি লোক দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণে। ভ্লাদিমা আগে থেকেই প্রাসাদাধ্যক্ষকে বলেছিল আমাদের কথা। সে যে কী কথা জানতাম না—কিন্তু তার ফল হল প্রত্যক্ষ: আমাদের জন্যে ভদ্রলোক চমৎকার জায়গা ক'রে দিলেন গাড়িবারান্দার ঠিক নিচেই, সব দর্শকদের নাকের সাম্‌নে।

প্রথমে একদল ইতালিয়ান শিশু ধরল সুন্দর স্তব—পোপের নামগুণগানই হবে। বড় সুন্দর লাগল। সঙ্গীত এদের রক্তে যে—গান সুন্দর না হ'য়ে পারে?

তারপর পোপ এসে দাঁড়ালেন সাম্‌নের বারান্দায়। অম্‌নি জনকল্লোল তুমুল হ'য়ে উঠল: "পোপের জয় হোক—শতজীবী হোন তিনি—" ইত্যাদি বন্দনা।

পোপ কমনীয় হাসি হাসলেন, জনতার বিক্ষোভ থামলে তিনি তাঁর ভাষণ সুরু করলেন—প্রথমে ইতালিয়ান ভাষায়, পরে ফরাসীতে, সর্বশেষে ইংরাজিতে। প্রতি ভাষাতেই করলেন প্রার্থনা: মানুষ সব দেশেই এক—সর্বহিতেই হ'ল আত্মহিত—ভগবানকে চিনতে হবে, (গীতার ভাষায়) "সুহৃদং সর্বভূতানাম্‌"—এই জাতীয় অনবদ্য কথা। শুনতে ভালোই লাগল—বিশেষ পোপের সুন্দর ভাষণভঙ্গির জন্যেও বটে, আর এদেশে ভগবানের প্রসঙ্গ বহুদিন বাদে শুনতে পেলাম ব'লেও বটে।

পোপ বলতে জানেন। কিন্তু মনে তবু প্রশ্ন জেগে উঠল: এ-ধরনের ভাষণে কাজ কতটুকু হয়? কজন লোক ধর্মের কাহিনী শোনে—'চোরা' না হ'য়েও? মানুষ আজকের দিনে চায় কী বস্তু? মনোজ্ঞ নীতিকথা—না, সাধু-জীবন-যাপনের বলিষ্ঠ প্রেরণা? মানি—পোপ ধার্মিক। তাঁর সৌম্য কান্তি দেখে মনে হ'ল তিনি সত্যিকার সাধুই বটে, মেকি ধর্মধ্বজ নন। কিন্তু তবু এইভাবে জনতার কাছে নীতিপাঠ ক'রে ফল হয় কতটুকু? জানি না। তবে এ কথা মনে হ'ল যে পোপ যা ভালো বুঝেছেন তা করছেন। মানুষের হিতসাধন এক দুরূহ ব্যাপার। কেই-বা কতটুকু করতে পারে বিশ্বহিত? শুধু কি তাই? ভালো করতে গেলেও যে অনেক ক্ষেত্রেই মন্দ হয়, জীবনের এ-পরম অভিজ্ঞতাটিকে না-মেনেই উপায় নেই। তবু রাজনীতিকরা বলেন প্রপাগাণ্ডা চাই, চাই, চাই। কিন্তু প্রপাগাণ্ডায় যে জগৎ ভ'রে যাবে একথা তাঁরা নিজেরাও তো বিশ্বাস করেন না। তাঁরা এ-বাণী প্রচার করেন—এই তাঁদের পেশা ব'লে—কারুর কারুর হয়ত নেশাও—কিন্তু তার বেশি নয়।

তবে এ নিয়ে অনন্তকাল তর্ক চালানো চলে। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এ-যুগের প্রাণের

বাণীটি কী। উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "বিশ্বমানব।" এই কথাটি আমাকে আরো পরিষ্কার ক'রে লিখেছিলেন তাঁর একটি পত্রে, যেটি 'তীর্থংকর' তৃতীয় সংস্করণের ২০০-২০২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। তাতে এক স্থানে আছে: "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।"

কিন্তু মানুষের শুধু ব্যক্ত রূপের 'পরেই জোর দিয়ে বুদ্ধির বকযন্ত্রে তার স্বরূপতত্ত্বকে চুঁইয়ে তথ্যরূপে পেশ করলে তার মানবতাকে বোঝা যায় কিনা, এ-নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই উপনিষদ ঝুঁকেছেন অন্য দিকে। বলছেন ( শ্বেতাশ্বতর ):

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥" অর্থাৎ

যে পরম ব্যোমব্রহ্মে রাজে বেদ তথা দেবগণ
তাঁহারে যে জানে না সে কেন করে শ্রুতি অধ্যয়ন ?
চরিতার্থ শুধু সেই—জেনেছে তাঁরে যে-মহাজন।

এহেন "বেদিতব্য" পরমতমকে জানতে হ'লে শুভবুদ্ধির মন্ত্রণা অপরিহার্য, তাই বললেন ঋষি:

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

কিন্তু এই শুভবুদ্ধিতে উত্তরণের পথনির্দেশ দেবে কে? আজকের দিনে জগৎজোড়া যে-হাহাকার বেজে উঠেছে প্রাণশক্তির ডামাডোলের ঠিক উল্টো পিঠেই—যখন জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করাও ভেবে দিশা পাচ্ছেন না মানুষকে আত্মঘাতী প্রবৃত্তির হাত থেকে কী ক'রে বাঁচানো যাবে—এ-হেন যুগে শুধু মানুষকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে যে তার মানবতার রহস্য ভেদ করা যাবে এ-ভরসা বোধ হয় মনীষীদের মধ্যে কারুরই নেই। তাই বোধ হয় চিন্তাশীল মানুষ অনেকেই পুনরায় ধর্মের জিজ্ঞাসালয়ে খবর নিচ্ছেন নানা রাস্তার—যদি চোরাগলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এই আশায়। পোপের ভাষণে এই জাতীয় অনুক্ত অন্তর্গূঢ় প্রশ্নের উত্তর ছিল। শুধু তাই নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকায় আজ মানুষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে কম্যুনিসম্ সমস্যার সমাধান নিয়ে। পোপ সর্বান্তঃকরণে কম্যুনিস্ট আদর্শের বিরোধী, তাই তাঁকে কেন্দ্র করে বহু কম্যুনিস্ট-পরিপন্থী এখানে সোৎসাহে ঝাণ্ডা উড়োয়। কাজেই খতিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কিছু ঘোরালো।

অর্থাৎ পোপের ধর্মজীবনের জন্যেই যে এরা তাঁকে অধিনায়ক রূপে বরণ করেছে তা নয়—অন্ততঃ সকলে নয়—কম্যুনিস্‌মের তরঙ্গকে যারা নানান্ জাঙাল দিয়ে রোধ করতে চাচ্ছে তারা পোপরূপী জাঙালকে কাজে লাগাতে চেয়ে তাঁর কাছে এসে জয়ধ্বনি করছে, বলছে—

প্রণমামি শিবং শিব ধর্মগুরো!

কিন্তু এ গেল একদল লোকের কথা—মানে যাঁরা ধর্ম চায় না, চায় শুধু তাকে খাটিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে মুনফা হাতিয়ে নিতে। কিন্তু আর একদল লোক আছে যারা পোপকে ভক্তি করে মনেপ্রাণে। এদের দৃঢ় ধারণা যে, পোপ তাঁর আশীর্বাদে পাপ থেকে মুক্তি ( absolution ) দিতে পারেন। মধ্যযুগে এ-মনোভাব খৃষ্টানদের খুবই ব্যাপক ছিল, কে না জানে? হাল আমলে এ-মনোভাব চিন্তাজগতে কুলীন পদবী পায় না ব'লেই খানিকটা অনাদৃত হয়েছে, বিশেষ ক'রে তাঁদের কাছে, যাঁরা বিজ্ঞানকে "সারাৎসার" পদবী দেন। কিন্তু তবু এ-দেশেও অনেক লোক এখনো আছেন—বিশেষ করে ইতালিতে—যাঁরা পোপকে জগৎ-গুরু বা ভগবৎ-প্রতিভূর উপাধি দিয়ে তাঁর স্তবস্তুতি করেন। অনেকে এদেশে পোপের ছবি লকেটে গেঁথে বুকের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন, বা বেদীতে তাঁর মূর্তি বসিয়ে ধূপদীপ জ্বালিয়ে তাঁর আরাধনা করেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিছক বিশ্বাসী, কিন্তু আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁরা পোপকে পুণ্য-শুভ্র, মহামতি ব'লেই শ্রদ্ধা করেন। মানে যদি পোপ শুচিমান্ না হ'তেন, তবে তাঁরা এঁর কাছে হাত জোড় করতেন না।

ভালো। কারণ সাধুজীবন ভালো একথা কে না মানবে? তবু জানতে ইচ্ছা হয়—যে-পোপকে আমরা দেখলাম তিনি গড়পড়তা খৃষ্টানের মতন একদেশদর্শী, না সত্যিই মহানুভব? মানে, তিনি কি সত্যিই ভাবেন যে, রোমান ক্যাথলিক যারা নয় তারা সবাই সরাসর নরকে যাবে? জানি না। তবে এ-যুগে এ-ধরনের কথা কি কারুর মনেই ঠাঁই পায়? যদি পায় সেটা হবে দুঃখের কথা। তবে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, কাজেই কী ক'রে বলব তাঁর মনোগত ভাবধারা কোন্ খাতে চলেছে? খতিয়ে শুধু এইটুকু লাভ হ'ল যে পোপকে দেখে সত্যিই ভালো লাগল, মনে হ'ল য়ুরোপে একটি খাঁটি সাধুর দর্শন পেলাম। শুনলাম বৈদেহী স্বর: "পোপ সত্যিই ধার্মিক, পবিত্রচরিত্র, সত্যনিষ্ঠ।"

মনে মনে তাঁকে প্রণাম করলাম। কারণ এ-যুগে একযোগে এ-তিনটি উপাধির দাবি করতে পারেন কজন মহানুভব?

ভ্লাদিয়ারা বিদায় নিল ১৭ই আগস্ট সকালবেলা। সারাটা দিন কেবলই ওদের কথা মনে হ'তে লাগল। ইন্দিরা ভ্লাদিয়ার মনোজ্ঞ ব্যক্তিরূপে মুগ্ধ হয়েছিল প্রথম থেকেই। বিদায় দেবার সময়ে ওর চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল। সারাদিনই ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগল ভ্লাদিয়ার কথা—কী সুন্দর, কী মহৎ, কী স্নেহপ্রবণ··· !

কয়েকদিন বাদে ভ্লাদিয়ার চিঠি এল ফরাসি ভাষায় লেখা :

"তোমাদের সঙ্গে দেখা মাত্র তিনদিনের, কিন্তু মিলনের তৃপ্তিকে কষা যায় না সংযোগের স্থায়িত্বের অনুপাতে। বিশেষ ক'রে ইন্দিরার পুণ্য সংস্পর্শ···" ইত্যাদি !

মন উঠল আর্দ্র হ'য়ে। বিদেশী বন্ধু, স্বদেশী বন্ধু কেন বলি ? বন্ধুত্বের প্রাঙ্গণে দেশজাতিবর্গের উপাধি তো "এহো বাহ্য"। হৃদয় যখন হৃদয়কে মালা দেয় তখন এসব অবান্তর টীকা-তিলক-নামাবলী কি মুহূর্তে অবান্তর হ'য়ে ওঠে না ?

মনে পড়ল অতুলপ্রসাদের গান :

"আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই,
স্বজন যদি হ'ত আপন হ'ত না মোর আপন সবাই।"

আপন হওয়া নিয়েই কথা। বন্ধু আপন ব'লেই আনন্দময়—স্বজনকে যে যায় ছাপিয়ে।

# ভেনিস

সেই ভেনিস—যেখানে ১৯২২ সালে এসেছিলাম ভ্লাদিমির সঙ্গে—লুগানোতে রোমা রোলাঁর সঙ্গে কথাবার্তার পরেই। একসঙ্গে এখানে কয়েকদিন কী আনন্দেই কেটেছিল! সুবিধা হয়েছিল ভ্লাদিমি চমৎকার ইতালিয়ান বলতে পারার দরুন। (শুধু কি ইতালিয়ান? ও মাতৃভাষা চেক্ ছাড়া জর্মন, ফরাসি, রুষ, পোলিশ, সুইড প্রভৃতি নানা ভাষাই বলতে পারে।) ইতালিতে চলাফেরা এক ফ্যাসাদ—কী দরদস্তুর করে এরা বিদেশীর সঙ্গে! ভ্লাদিমি আমাদের কর্ণধার থাকার দরুন আর কারুর কথায় কান দিতে হয়নি। তারপর ওর ওখানে প্রথমে অতিথি হ'য়ে কদিন থেকে বুদাপেস্ত ও ভিয়েনা হ'য়ে ফিরতি পথে আবার একদিন কাটাই এই ভেনিসে—চাঁদনি রাতে। চাঁদের আলোয় ভেনিস নগরী দেবভোগ্যা।

কিন্তু জনহিত নিয়ে মতভেদে যেমন তর্ক চলতে পারে অফুরন্ত দাপটে, তেমনি কোনো কিছু সুন্দর কিনা এ নিয়েও তর্ক চলতে পারে অশ্রান্তকাল। রূপের বিচার নিয়ে মানুষ কত রকম বিতণ্ডাই ক'রে এসেছে আবহমানকাল কিন্তু কে কবে বলতে পেরেছে শেষ কথা, নিদান দিতে পেরেছে রূপোত্তম ও রসোত্তমের অভিজ্ঞান কী? কীট্‌স্ বললেন বড় গলা ক'রেই:

'Beauty is truth, truth beauty'—that is all
Ye know on earth and all ye want to know.

কিন্তু এতে বাধল আরো ফ্যাসাদ—একটা সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে পড়তে হ'ল আর একটা সমস্যার কবলে। সুন্দর কী? না, সত্য। সত্য কী? না, সুন্দর। অথচ সর্ববিধ সত্য—অন্তত সত্য বলতে আমরা যা বুঝি—সুন্দর নয়, তথা সুন্দর বলতে যা বুঝি সে অনেক অসত্য অনর্থেরই সৃষ্টি করে।

এই ভেনিস দেখেই একজন বিচক্ষণ শ্রদ্ধেয় মানুষ লিখেছিলেন—ভেনিসকে নিয়ে লোকে কেন এত মাতামাতি করে তিনি ভেবে পান না। যেমন নোংরা এর খালের জল, তেমনি দুর্গন্ধ এর নানা 'জোলো' গলি—দেখলে ভয় করে রোগে ধরল বা!...ইত্যাদি।

প'ড়ে আমরা হেসেছিলাম। একই বস্তুকে (তা সে সত্যই হোক্ বা সুন্দরই হোক্) দুজন দর্শক বা ভাবুক উল্টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সম্পূর্ণ উল্টো রায় দিতে পারে—যেমন একই প্রতিজ্ঞা (premiss) থেকে দুজন তার্কিক

সম্পূর্ণ উল্টো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন বহুবৎসর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। একজন সৈনিক যুদ্ধান্তে বলেছিল: "এই যুদ্ধ যে চাক্ষুষ করেছে তার মনে আর সন্দেহ থাকতে পারে না যে ভগবান্ আছেন।" আর একজন বলেছিলেন: "এ-যুদ্ধের পরে আর কি কারুর মনে হ'তে পারে যে এ-ছন্নছাড়া জগতের কোন কর্ণধার থাকতে পারে?"

বয়স যখন কম থাকে তখন মানুষের উৎসাহ থাকে বেশি। উৎসাহ খুব ভালো জিনিস কে না মানবে?—অথচ ঠিক এই উৎসাহের দরুনই হয় তার ঠিকে ভুল। আশাশীল স্বপনী বলছেন: "মানুষ স্বভাবে দেবতা।" আশাহত বাস্তবী বলছেন: "মানুষ স্বভাবে শয়তান।" এ নিয়ে খেদ ক'রে কী হবে? এমন কি "আমি আছি" এ-হেন অপ্রতিবাদ্য স্বয়ংসিদ্ধ সত্যের সত্যকেও অনেক বৈজ্ঞানিক উড়িয়ে দিচ্ছেন! বলছেন—তুমি? তুমি কে হে? জড়কণার সমষ্টি। কিন্তু এ উক্তিকেও আবার নাকচ করছেন একদল, বলছেন: জড়কণা কিনি—শুনি? অণু পরমাণুও তো তাড়িত প্রবাহ। অথ, সিদ্ধান্ত—শুধু যে আমি ব'লে কিছুই নেই তাই নয়—জড় ব'লেও কিছু নেই—ম্যাটার সর্বতোভাবে নস্যাৎ। দেখে শুনে কবি বাইরন ধরলেন সেরা স্বর—ব্যঙ্গের—বললেন তাঁর ডন জুয়ানে:

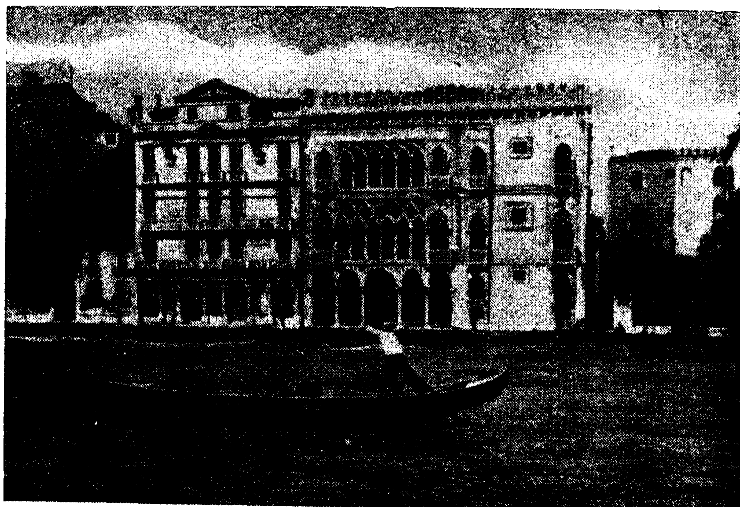
When Bishop Berkely said 'there was no matter'
And proved it—'twas no matter what he said.

অর্থাৎ শুধু যে কেউ কোথাও নেই তাই নয়—কে কী বলে তাতেই বা কী আসে যায়? অবশ্য যদি কেউই কোথাও না থাকে তবে কে কী বলে কিছু আসে যায় না তো বটেই, যেহেতু যে নাস্তি তার মুখের কথাও তো অস্তি হ'তে পারে না, সুতরাং সে কী বলে না-বলে সে নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। কেবল দুঃখ এই যে, এই আলোচনা যে নিষ্ফল এ-ধরনের সিদ্ধান্তও নামঞ্জুর, যেহেতু যখন কেউ কোথাও নেই তখন কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা সফল বা নিষ্ফল এ-প্রশ্নও ওঠে না—যেহেতু দিনদুনিয়াটাই শূন্যবাজি। কেবল মুস্কিল এই যে জগৎটা শূন্যবাজি একথা বলেছেন যিনি তিনিই যদি না থাকেন তবে শূন্যবাদ প্রচার করছেনই বা কোন্ নাস্তিক আর করলেই বা শুনছেন সে কোন্ আস্তিক?

মরুক গে এসব বৈয়াকরণিক বিতণ্ডা। আমি ধরে নেব—দিলীপকুমারও

আছেন, ভেনিসও আছে—ভেনিসের দৈনলিপি বর্ণনা ছাপবার কালি-কাগজও আছে আর ছাপাবামাত্র পড়বার লোকও—দুচার জন অন্ততঃ মিলবে, যথা কালিপদ গুহ রায়, কালিদাস নাগ, ইন্দু রায়, কালিদাস রায়, বিধুভূষণ মল্লিক—আরো হয়ত দুচারজন। আমার নিশানা তাঁরাই—অর্থাৎ বাউলের ভাষায়—"দরদী"। তাই নারায়ণং নমস্কৃত্য দরদীর জয়গান ক'রে সুরু করি ভেনিস কীর্তনের সংক্ষিপ্ত গৌরচন্দ্রিকা।

ভেনিস জলময়ী নগরী জানেন—অন্ততঃ শুনেছেন—অনেকেই। অর্থাৎ এখানে অলিগলি পথঘাট ইঁটপাথর দিয়ে তৈরি নয়—তৈরি লবণাম্বুরাশি দিয়ে। কোথাও কোথাও অবশ্য স্থলপথও আছে কিন্তু ভেনিসে চলাচল প্রধানত জলে—



ভেনিসের গণ্ডোলা

তরণী, স্টীমার, মোটর বোট ও গণ্ডোলা এই চারিটি জলযানে। এছাড়া গত্যন্তর নেই যেহেতু কুমিরকে বাদ দিয়ে এই নীলহরিৎ জল মানুষ খাল কেটে টেনে এনেছে সাক্ষাৎ সমুদ্র থেকে—যিনি ভেনিসকে ঘিরে আছেন চার দিকেই মেখলাবেষ্টনীর মতন। মনে পড়ে কালিদাসের বর্ণনা :

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

সত্যিই নৌকোয় ক'রে বেড়াতে বেড়াতে দূরে দিগন্তে তমালতালী না হোক বনরাজিনীলা বেলাভূমি দেখা যায়। আর দেখা যায় অজস্র ভিড় ছোটবড় স্টীমারের, অগণ্য মানুষের।

ভিড় ব'লে ভিড়! ভোর রাতে উঠে দেখি তখনো রাস্তায় লোক চলেছে: এর কারণ ভেনিস হ'ল প্রমোদ-নগরী, জগতের সর্বত্র থেকে টুরিস্ট যায় ফ্রান্সে—পারিসে, ইতালিতে—ভেনিসে। পারিসে যায়, কেননা পারিস না দেখলে জীবনই বৃথা এই প্রসিদ্ধি আছে। ভেনিসে আসে, কারণ ভেনিস সুন্দরীকে না দেখে মরলে অতৃপ্তাত্মা আর কোনো তর্পণেই তর্পিত হবেন না এই প্রবাদ সুপ্রতিষ্ঠ।

অবশ্য সৌন্দর্য নিয়ে ফের সেই চিরন্তন তর্ক উঠতে পারে—কারণ রূপরাগ মঞ্জুর শুধু তার কাছে যে তার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে শিখেছে:

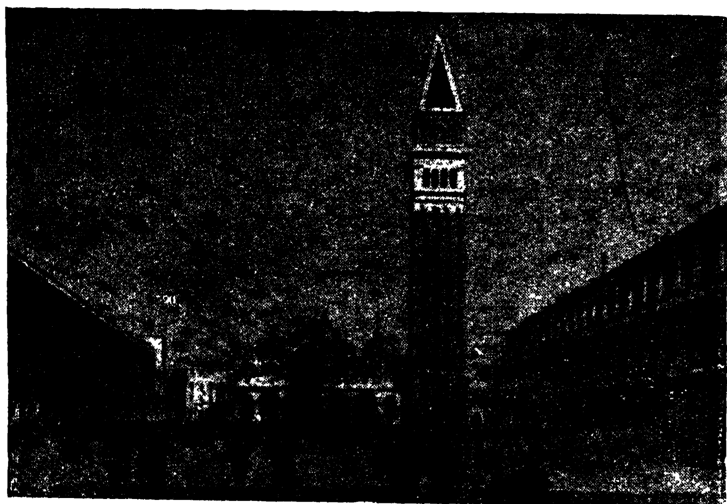
"তুমি আছ তুমি আছ হে লাবণ্যময়ি!
আমার অন্তররাজ্য-বিলাসিনি অয়ি!
যে-সুর বাজাও তুমি বীণায় তোমার
আমার হৃদয়তন্ত্রে কাঁপে সে-ঝঙ্কার।
কী তোমার ছন্দরূপ, কিসে বিরচিত
তনু তব—আজো আমি জানি না। বিস্মিত
বিমুগ্ধ নয়নে সখি, তবু চেয়ে রহি
কবিচিত্তবিনোদিনি হে মাধুরীময়ি!"

ভেনিসে এসে এম্‌নিতর গানের সুর, কাব্যের গুঞ্জনই প্রাণে জেগে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। যেদিকে তাকাও—সবই নূতন। এমনটি আর কবে দেখেছি?—বলে মন। জানি অনেক গৃহই মলিন, অনেক খালের জলই ক্লিন্ন, ভেনিস-বাসীরাও কিছু আহামরি গন্ধর্ব-কিন্নর নয়। তবু সব জেনেও মানতে হবে যে এ-যাবৎ এ-হেন নগরী মানুষ আর কোথাও গড়ে নি আমাদের মর্ত্যলোকে। ব্রাউনিং বলেছিলেন তাঁর একটি কবিতায় যে—মানুষ স্রষ্টা পদবী দাবি করতে পারে এইজন্যে যে তিনটি ধ্বনি মিলিয়ে সে সৃষ্টি করে চতুর্থ ধ্বনিকে নয়, ঝল্‌কে তোলে একটি আশ্চর্য তারাকে:

That out of three sounds he frames
not a fourth sound, but a star.

ভেনিস নগরীকে রোমক স্থপতি, ভাস্কর, পূর্তকরা "সৃষ্টির" এই মহাপদবীতেই উত্তীর্ণ করেছিলেন। তাই না ও বিনোদিনী।

কাল শেষ রাতে উঠে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। দেখে যেন চোখের আশ মিটতে চায় না : সাম্‌নে উদার নীলাব্ধি উদয়গোধূলির আলোয় ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, অথচ প্রাগূষা লগ্নেও স্টীমার চলেছে সমানে যাত্রী নিয়ে—পথে পথিকও চলেছে একটি আধটি—সারারাত আমোদপ্রমোদ ক'রে ঘরের ছেলে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরছে বুঝি! সাম্‌নেই গম্বুজ—কোনো মন্দিরেরি



ভেনিসের পিয়াৎসা

হবে। একটু দূরেই ওপারের "কলঙ্করেখা"-বৎ বেলাভূমি—কিরণপরী লুডো নগরীর। হোটেলের সাম্‌নে বাঁধানো রাস্তা—কিন্তু না, কী বর্ণনা করব ছাই! সৌন্দর্যের বর্ণনা খানিকটা হয় বটে চারু চিত্রে অথবা কান্ত কাব্যে। কিন্তু ছবি আঁকতে আমি জানি না এবং অন্ততঃ আপাততঃ কবিতা লিখবার সময় নেই বা প্রেরণার অভাব যাই বলুন। সুতরাং আর না, শুধু এইটুকু ব'লেই ইতি করি যে, ইন্দিরা আনন্দ রাখবে কোথায় ভেবে পায় না।

"কে ভেবেছিল দাদা, যে সুন্দর—এত সুন্দর হয়!'—এইই ছিল ওর মনের "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে"-র পাঠান্তর। এইখানেই ভেনিসের গৌরচন্দ্রিকা তথা পালাগান সাঙ্গ হোক্।

আজ রাতের ট্রেনে রোমে ফিরব। কাল সন্ধ্যায় সেখানে ভারতীয় রাজদূত শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনের দূতাবাসে নৃত্তগীতের আসর সেরে পরশু আকাশপথে

কায়রো যাত্রা। রোমে কাল সন্ধ্যায় নৃত্যগীতের সভা কেমন জমে, যদি সময় পাই তো পরশু লিখে রাখব সংক্ষেপে।

কিন্তু সে তো পরের কথা পরে। আজ সব ছাপিয়ে মন আনন্দে অধীর হয়েছে—বম্বে পৌঁছব কয়েকদিনের মধ্যেই। বম্বে কিছু ভেনিস নয়—তবু ভারতের পুণ্যধূলি তো তার নামাবলী। বম্বে থেকে পুণা ও দিল্লি হয়ে যাব হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে—গাইব শঙ্করস্তব সেই আনন্দের তিলোত্তমার উদ্দেশে:

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে!

* * *

বলতে ভুলেছি—রোম থেকে ভেনিস গিয়েছিলাম "এয়ারকণ্ডিশণ্ড" ট্রেনের কামরায়। আমেরিকায় বলতে গেলে সব ট্রেনই এয়ারকণ্ডিশণ্ড—কবোষ্ণ-মনোজ্ঞ অথবা শীতল-মনোজ্ঞ। কিন্তু ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের অন্য সব দেশের ব্যবস্থা তো আমেরিকার মতন নয়। কোথায় পাবে এরা আমেরিকার ড্রয়িং-রুম ট্রেন? আমেরিকাতে যারাই কিছুদিন বাস করে—ফিরে আসে ঈষৎ উন্নাসিক (snobbish) হ'য়ে: "এঃ!—কোথায় এরা, আর কোথায় আমেরিকা!"—এই ভাব। আমেরিকায় যখন যাই নি তখন আমেরিকা-প্রত্যাগতদের এই উন্নাসিকতা নিয়ে বন্ধুমহলে ঠাট্টাতামাসা করেছি বৈ কি। কিন্তু দেখলাম: আমেরিকা গিয়ে কিছুদিন থাকতে থাকতে সেখানকার অত্যধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুব্যবস্থার মোহ মনকে রঙিয়ে তোলে যেন অজ্ঞাতসারে। তাই এমন কি ইংলণ্ড-যে-ইংলণ্ড সেখানেও বিলাসের অভাব বোধ করেছিলাম আমেরিকার পরে। এত কথা বলার উদ্দেশ্য—ইতালিতে হঠাৎ এয়ারকণ্ডিশণ্ড ট্রেনে উঠে মন চম্‌কে গেল—ব'লে ওঠে আর কি—"এ কী! আমেরিকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একটুখানি ক্ষীণ রেশ এখানে এল কোত্থেকে?" তাই গরম ইতালিতে এসে সুশীতল এয়ারকণ্ডিশণ্ড কামরায় ঢুকবামাত্র মন কেমন যেন উজিয়ে উঠল। ভাবলাম বিলাসের এম্‌নিই মায়া বটে: তার স্বস্তি অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে যেমন একদিকে সে-বিলাসে সচেতন ভাবে আর আরাম পাওয়া যায় না, তেমনি তার অভাবেও মন খুঁত খুঁত করে। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন যে এযুগে কৃচ্ছ্রসাধন করা খানিকটা অনাবশ্যকই হয়ে উঠেছে—কেননা যেখানে বিনা শ্রমে বা স্বল্প শ্রমে সুখস্বাচ্ছন্দ্য হাতের কাছে পাওয়া যায় সেখানে তাকে অর্ধচন্দ্র দিতে যাওয়া খানিকটা অর্থহীন। অভাবে পড়লেও সন্তুষ্ট থাকব—এইই হ'ল অনাসক্তির মূল কথা—কৌপীনবন্ত না হ'লে যে

ভাগ্যবন্ত হওয়া যাবেই না এমন কথা হয়ত সেকালে অনেকে মেনে নিতে পারতেন, কিন্তু একালে শিরোধার্য করা কঠিন।

সত্য কথা। কিন্তু অভাব আর অব্যবস্থা তো সমার্থক নয়। ইতালিকে আমেরিকার তুলনায় অরাজক বললে হয়ত একটু বেশি বলা হবে, কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাবালক বললে একটুও অন্যায় হবে না। পথে ভিখিরি, স্টেশনে পকেটকাটা, বাজারে চেঁচামেচি—কখনো বা প্রকাশ্যেই মারামারি, যেখানে সেখানে দরদস্তুর, কথায় কথায় ঠকানো, বিশৃঙ্খলা, সৌজন্যের অভাব—ওমা, এ যে প্রায় আমাদের দেশ গো! ফ্রান্সের সঙ্গেও ইতালির এসব ক্ষেত্রে মিল খুব বেশি। এ-যুগে এ-দুটি জাতিকে বলা যেতে পারে ডেকেডেণ্ট, নিম্নমুখী। জর্মনি, জাপান, ইংলণ্ড আর যাই হোক ডেকেডেণ্ট নয়—বলিষ্ঠ শ্রমশীল উদ্যমী। ইতালিয়ানরা, আমাদের মতনই সুখপ্রিয়, অলস, স্বপ্নচারী, ভাববিলাসী। গ্রীকদের দেশে যাই নি, তবে যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে মনে হয় আজকের গ্রীকরা হেলেনিক গ্রীকদের বংশধর হ'তে পারে কিন্তু কুলতিলক নয়। সম্ভবতঃ মিশর ও পারস্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। তবে এ-ধরনের সাধারণ সূত্রের—sweeping generalisationএর—দাম বেশি নয়। মানে কোনো দেশকে একটু ভালো ক'রে না জেনে তার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে যাওয়ায় বিপদ আছে। ধরুন—আমরা ভারতীয়। কী বিশেষণ আমাদের সহজ উপাধি? প্রোগ্রেসিভ না ডেকেডেণ্ট? এক সময়ে খুব বড় গলা ক'রেই বলতাম যে, আমাদের মধ্যে আছে অন্তত ধর্মের ক্ষালিনী তথা আরোহিণী শক্তি। আজ মনে সংশয় এসেছে। গড়পড়তা ভারতবাসীকে কি সত্যই স্বভাবধার্মিক বলা চলে? বাইরের কোনো পর্যটক যখন আমাদের দেশ দেখে প্রায়ই হতাশ হ'য়ে তাঁদের দেশে ফিরে বলেন—ভারতবাসীর মতন সর্বহারা, দুর্ভাগা জাত আর দুটি নেই—তখন আমরা তাঁদের 'পরে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠি বটে, কিন্তু যদি তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দেশকে দেখতাম তবে কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারতাম তাঁরা মিথ্যাদর্শী? এক সময়ে বলতাম: "ভারতে জনসাধারণ দুর্গত হ'লেও মহামানব আমাদের দেশে কত জন্মান—দেখ দেখ জগৎ!" কিন্তু এবার ওদেশে গিয়ে কেবল বলতে হ'ল স্বর্গত মহামানবদের কথা—জীবিত ভারতীয়দের মধ্যে কাকে ধরতে পারি ওদেশে মহৎ ব'লে? ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটিমাত্র তুঙ্গচরিত্র মানুষ ছিল—মহামতি শ্যামাপ্রসাদ। একে একে শুকাইল ফুল সব, নিভিল দেউটি।

তবে এ-ধরনের খেদকে আঁকড়ে থাকাও কিছু নয়। তাছাড়া এ-বিশ্বাস

পোষণ করবার সঙ্গত কারণ আছে যে ভারতের যত দুর্দশাই হোক না কেন এখনো এদেশে ঋষি, কবি, নিঃস্বার্থ দেশভক্ত, উদার মহাপ্রাণ মানুষ সহজেই সর্বজননমস্য হয়। অন্য ভাষায়, ভারতে আজও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বকে সাধারণ মানুষ সহজেই শ্রদ্ধা করে। দৃষ্টান্ত—গান্ধিজি, বিনোভাজি। গীতায় বলেছে যে, যে যাকে শ্রদ্ধা করে সে তাই হয়। কথাটি প্রমাণ করা যায় না হয়ত, কিন্তু তবু শ্রদ্ধা ক'রে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে মনে হয় বাণীটি ধ্বনিসার নয়—জ্ঞানসার।

* * *

এ-ধরনের খেদ কেন হ'ল? কারণ বিদেশে অনেকগুলি ভারতীয় দেখেছিলাম যাঁদের মতিগতি দেখে একটু চম্‌কে যেতেই হয়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে পারব। আমেরিকায় একবার একটি উচ্চপদস্থ ভারতীয় রাজপুরুষের (official) গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়। রাজপুরুষটি ভারতীয় সভাসমিতিতেও ভারতীয় বেশ পরতে সাহস পান না—ভারত স্বাধীন হবার পরেও। তাঁর স্ত্রী বাগ্মাদিনী, ধনিকন্যা—শাড়ি পরেন বটে কিন্তু আমেরিকায় এসে আর তাঁর স্বদেশে ফিরতে মন যায় না—বলছিলেন আমাদের একদিন। চাইবেন কেনই বা? আমেরিকায় কত ধুমধাম, নাচগান, গালগল্প, কাবারে, ঢলাঢলি, ককটেল-পার্টির অশ্রান্ত কল্লোল! আমাদের দেশ তো ঘুমিয়ে! কাজেই তিনি এক আমেরিকান মহিলার কাছে আমাদের সামনেই অম্লানবদনে খেদ করছিলেন যে, নিরালোক ভারতে ফিরবার কথা ভাবতেও তাঁর মনখারাপ হ'য়ে যায়, অথচ নিরুপায়—তাঁর স্বামীর পঞ্চবার্ষিক চাকরির মেয়াদ ফুরুল ব'লে—আর মোটে এক বৎসর, তারপর—হায় রে!—ফিরতেই হবে নিঝুম দেশে—বললেন আলোকপ্রাপ্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

আমেরিকান মহিলাটি ছিলেন বুদ্ধিমতী, বললেন মুখটিপে হেসে: কিন্তু দেশে ফিরতে যদি না চান তবে ফেরার কী দরকার? আপনার স্বামীর চাকরির আয়ু তো ইচ্ছা করলেই টেনে আর পাঁচ বছর বাড়িয়ে নিতে পারেন।

ভারতীয় আলোকপ্রাপ্তা: তা কেমন ক'রে হবে? তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছিল পাঁচ বৎসরের জন্যে—তার মধ্যে চার বৎসর হ'য়ে গেছে—

আমেরিকান মহিলা (আকর্ণবিস্তৃত হেসে): ও তো বইয়ের পাঠ, থিওরি, কাজের বেলায় অচল। বিশেষ যখন—কে না জানে বলুন—ভারত সরকার রাজপুরুষদের বাহাল করেন তাঁদের গুণমূল্যের বিচারে নয়, ধনসম্পত্তির

এজাহারে। আপনার বাবামশায় ধনী ব'লেই না আপনার স্বামিমশায় মোট মাইনেয় এদেশে এসে রাজপুরুষ বনেছেন। এ-হেন পিতৃদেবের কন্যার কুতো ভয়ম্? একটু তদ্বির করলেই আপনার স্বামী আরো পাঁচ বছরের জন্যে কায়েম হবেন।

ভারতীয় আলোকপ্রাপ্তা একগাল হেসে কী বললেন শুনতে পেলাম না, তবে তাঁর মুখচোখের ভাব দেখে মনে হ'ল একথায় তিনি খুব খুশি হয়েছেন।

ইন্দিরা আমাকে হেসে বলল জনান্তিকে: "দাদা, আলোকপ্রাপ্তার একবারও মনে হ'ল না যে এ-পিতৃগৌরবে কীভাবে ডুবল পতিগৌরব!"

আত্মসম্মানবোধ যার নেই সে কি পরের সম্মান পেতে পারে কখনো? আমেরিকানরা স্বদেশগৌরবী, কাজেই জানে স্বদেশদ্রোহীর নিজমূর্তি। নিখরচায় ককটেল পেলে তারা এদের বাড়িতে এসে গলাধঃকরণ করতে পেছপাও হয় না বটে, কিন্তু মনে মনে হাসেই হাসে, ভাবেই ভাবে—"ভারতীয়রা কেন মিথ্যে বিদেশে মান পেতে চায় বিদেশী রীতিনীতির অনুকরণে!"

একথা বললাম বড় দুঃখেই। বিদেশে অবশ্য একথা বলব না—ঘরের লজ্জার কথা কে আর বাইরে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করতে চায়? ইংরাজি ইডিয়মে বলে নিজের ময়লা কাপড় প্রকাশ্যে ক্ষালন করা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু স্বদেশে ফিরে আমাদের বহু স্বদেশবাসীর এই ধরনের পরমুখাপেক্ষিতার কথা সাত কান করার সময় এসেছে। য়ুরোপে ও আমেরিকায় অনেক মোহমুগ্ধ ভারতীয় ললনাকেই স্বকর্ণে শুনেছি বলতে: দেশে ফিরতে তাঁদের মন চায় না—ভারতবর্ষে কি মানুষ থাকে? ইত্যাদি। ভারত স্বাধীন হ'লে কী হবে—slave mentality—দাসমনোভাব যে আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে বহু শতাব্দীর দাসত্বের ফলে—বলত সুভাষ, আজও মনে পড়ে। আর মজ্জার রোগ দুশ্চিকিৎস্য—কে না জানে?

* * *

যাক্ এবার ইতালির শেষ অধ্যায়ের অবতারণা করি—দুঃখের কথা ছেড়ে আনন্দের কথা ব'লেই মধুরেণ সমাপয়েৎ করি।

বিদেশে কয়েকটি সাঁচ্চা ভারতীয় অভিজাতকে দেখেছিলাম, যাঁদের দেখে মনে আনন্দ হয়েছিল। দুজনের কথা ইতিপূর্বে বলেছি—টোকিয়োর রাজদূত ডাক্তার রাউফ ও সানফ্রান্সিস্কোর কনসাল হুশেন সাহেব। কিন্তু এঁদের চেয়েও বেশি আরাম পেলাম রোমের বাঙালী রাজদূত শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনের সঙ্গে

আলাপ ক'রে। কারণ ইনি মনেপ্রাণে ভারতীয় তথা বাঙালী। কথাবার্তা চলাফেরা কোথাও ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্স চোখে পড়ল না।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হ'লাম এঁর আন্তরিক হৃদ্যতায়। রোমে পৌঁছে আমি সেনমহাশয়কে এম্‌নি একটি চিঠি দিয়েছিলাম শুধু আমাদের আসার খবর দিয়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজরথ পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক হ'ল আমাদের নৃত্যগীত হবে দূতাবাসে।

সভায় গিয়ে দেখি—উঃ কী কাণ্ড! শুধুই রাজদূত—রাজদূত—রাজদূত! আর সে কত জাতের! কানাডিয়ান, রুমেনিয়ান, চেকোস্লোভাকিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ইজিপ্শ্যান, ইংরাজ, আমেরিকান—ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের নামধাম হয়ত জানতে পারতাম না, যদি না নৃত্যগীতান্তে এঁরা প্রত্যেকে এগিয়ে এসে সধন্যবাদে প্রশংসা করতেন যথাবিধি আত্মপরিচয় দিয়ে। কিন্তু মরুক গে—এ-আসরে কত জাতির প্রতিনিধি ছিল সে-ফিরিস্তি সম্পূর্ণ না-ই হ'ল। ভারতীয় গানে ওরা আনন্দ পেল কিনা এইটুকুই বর্ণনীয়।

সত্যিই পেল, কেন না আমাদের নৃত্যগীতের পরে এরা যেভাবে উচ্ছ্বসিত তারিফ করল—একের পর এক—তাকে লৌকিক তারিফ মাত্র বলা চলে না। বলতে ভুলেছি—শ্রীযুক্ত সেন আমাকে শ্রোতাদের কাছে পেশ করেছিলেন সুরুতেই আমার নামধাম ব'লে ও শেষে আমাকে গুণবান ব'লে বরণ ক'রে। তাঁর ভাষণের একটি কথা উল্লেখযোগ্য।

তিনি বললেন: "দিলীপকুমার সঙ্গীতবিশারদ, কবি, সাহিত্যিক—অনেক কিছু। কিন্তু তাঁর পরিণতি হয়েছে একটু আশ্চর্য ঢঙে। তিনি শিল্পী হ'লেও বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতেই ডিগ্রী নিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গণিত ছেড়ে সাহিত্য ও সঙ্গীতকেই প্রথম বরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্য শুধু এই নয়। তারপরে তাঁর অন্তর্জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত তথা সাহিত্য তাঁর কাছে হ'য়ে উঠল গৌণ—তিনি বনলেন সংসারত্যাগী, যোগী। আর এ কেবল ভারতেই সম্ভব।"

মানতে হবে ভারতীয় মতিগতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সেন কিছু "ঘরের কথা" জানেন।

* * *

মিশরীয় রাজদূত গানান্তে বললেন সোৎসাহে: "শুনছি আপনি এখান থেকে কায়রো যাচ্ছেন। এ-হেন নৃত্যগীত যাতে কায়রোতে সবাই উপভোগ

করতে পারে সে-ব্যবস্থা হওয়াই চাই। মিশরবাসীরা এর কদর করবেই করবে।"

আমি বললাম: "কায়রোতে কাউকে তো জানি না।"

তিনি বললেন: "সে কি! কায়রোতেও তো ভারতীয় দূতাগার আছে—Indian Embassy."

আমি মনে মনে ভাবলাম: এম্বাসি তো আছে—কিন্তু আম্বাসাডারের মেজাজ কিরকম জানি না তো। মুখে বললাম: "ওঁদের খবর দেব—যদি ওঁরা কোনো ব্যবস্থা করেন ভালোই—কারণ ভারতীয় নৃত্যগীত তথা ধর্মবাণী প্রচারের জন্যেই তো সারা বিশ্বে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি গত সাতমাস ধ'রে।"

টহল ব'লে টহল! রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন গান গেয়ে সারা ভারতবর্ষ এভাবে কেউ চ'ষে ফেলেনি। আজ তিনি থাকলে হয়ত ভারতবর্ষ শব্দটির স্থলে "দিনদুনিয়া" বসিয়ে দিতেন।

কিন্তু বয়স হ'ল পঞ্চাশোর্ধ্ব—আর কত টহল দেব—কত গান গাইব? অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন "কত গান তো হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও?" এভাব আমার মনোভাবের অবিকল প্রতিচ্ছবি নয় তবে খানিকটা বটে।

কত গান তো হ'ল গাওয়া আর গাইব কতদিন?
যায় বেলা দিনের শেষে—করো চরণের অধীন।

এই ধরনের ভাব মনে উঠছে গুনগুনিয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কিছু যায় ঝ'রে। একটা পরিবর্তন হয়: যা আগে হয়ত খুব বেশি ভালো লাগত, আর এখন তেমন ভালো লাগে না—মানে, ভালো লাগতে-না-লাগতে মন মুখ ফিরিয়ে নেয়। পিতৃদেব একটি গান বেঁধেছিলেন সে কবে:

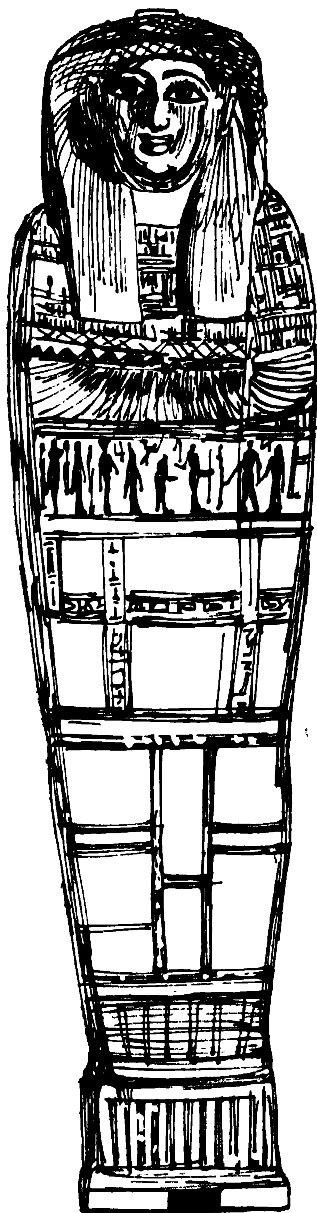
"জগৎ যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না আর তায়—
নিয়ে যায় সব ভেঙে চুরে, শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।"

একে বার্ধক্য-বৈরাগ্য বলা চলে কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে এ-ধরনের বৈরাগ্য যখন আসে তখন চেষ্টা ক'রে আর যৌবনের দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনা যায় না। তখন আমি পণ্ডিচেরিতে—বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ, সে সময়ে

এইরকম মনোভাব-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে লিখেছিলাম একটি গান—"ভাগবতী গীতি" বইটিতে পুরো গানটি আছে :

সুন্দর, এসো ভেসে চাঁদের খেয়ায় !
সান্ধ্য তিমির যবে অন্তর ছায়।
নব নব দোললীলা-রঞ্জন-ছন্দে
আধজাগা কিশলয়-সাধে অফুরন্তে
এসেছ পান্থ, আজি এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায় :
আলোক বিদায় যবে চায়
ভরো ডালা নিশিগন্ধায় ॥

# মিশর



# কায়রো

কত দেশ তো হ'ল দেখা—এই সাত মাসে! নয়া দিল্লি থেকে আকাশে উড্ডীন হয়েছিলাম সে কবে—৮ই জানুয়ারি মধ্যরাত্রে। তারপর হিল্লি মক্কা মদিনা না হোক, মক্কার কাছাকাছি তো এসে পৌছলাম আজ ২২শে আগস্ট—অক্ষত দেহে! যাকে বলে জুল ভার্নের ভাষায় "বিশ্বপ্রদক্ষিণ সাত মাসে"। দিল্লি থেকে হংকং; হংকং থেকে টোকিয়ো; সেখান থেকে যথাক্রমে হনোলুলু, সানফ্রান্সিস্কো, হলিউড, লসেঞ্জেলস, সান্তা বার্বারা, বিগ্‌সুর, কারমেল, শিকাগো, নিউয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস, গ্যটিংগেন, জুরিখ, ইন্টারলাকেন, লুৎসার্ণ, রোম ও ভেনিস হ'য়ে অবশেষে উপনীত কিনা সুপ্রাচীন মিশর দেশের পরমাসুন্দরী রাজধানী কায়রোতে—যার পিরামিড তথা নরসিংহ-মূর্তি—"স্ফিংক্স"—জগতের সাতটি শ্রেষ্ঠ বিস্ময়ের অন্যতম! ঠিক "নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বচনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা" না হোক—"পুলকৈর্নিচিতং বপুর্মম" হ'ল বৈ কি—মানতেই হবে।

রোম থেকে বি-ও-এ-সি'র পরমানন্দ-নিলয় আকাশপক্ষীর পাখায় মাত্র পাঁচ-ঘণ্টায় কায়রো পৌছলাম রাত স-এগারোটায়। আমাদের আমেরিকান বান্ধবী নাতাশা রম্‌বোভা আমাদের দিয়েছিলেন নাম ধাম তাঁর এক মিশরবাসী বণিকবন্ধুর —মাগুইদ সেমেদা। তাঁকে তার করেছিলাম রোম থেকে। আর লিখেছিলাম চিঠি এক গুজরাতি বন্ধুর সতীর্থকে আলেকসান্দ্রিয়ায়। কায়রোতে পৌছে দেখি উভয়েই মোটর নিয়ে হাজির—প্রথম বন্ধু সশরীরে, দ্বিতীয় বন্ধু পাঠিয়েছেন তাঁর এক প্রতিনিধিকে, নাম আলবানি কার্মেলো।

এ-হেন জমকালো অভ্যর্থনায় গর্বের চেয়েও বেশি লাভ হ'ল আশ্বাস—এ-বিভুঁয়ে এমন দু-দুটি মিত্রের ভরসা পেয়ে। দুটি মোটরের একটিতে চাপিয়ে দিলাম আমাদের অজস্র মালপত্র, অন্যটিতে সুখাসীন হ'লাম আমি ও ইন্দিরা। অতঃপর পনরো মাইল সোজা সড়কে উধাও হওয়া: স্নিগ্ধ নৈশ মলয়ে দেহমন জুড়িয়ে যাওয়া। যখন মিশরের প্রাণদায়িনী নীলনদীর তটে বিখ্যাত সেমিরামিস হোটেল-অট্টালিকায় এসে পৌছলাম তখন নিরন্তর-ভ্রমণের পুঞ্জিত ক্লান্তির চিহ্নলেশও নেই আর!

নদী, নদী, নদী! কি জানি কেন—আমরা, বাঙালী জাত, সবচেয়ে ভালোবাসি বোধহয় নদী, নয় কি? এ-ভালোবাসা অযৌক্তিকও নয়: জগতে সর্বত্রই সব প্রাচীন সভ্যতার পত্তন হয়েছে নদীতীরবর্তী জনপদে। সমুদ্র হয়ত নয়নোন্মীলক, প্রাণশোধক; কিন্তু নদী হ'ল মনোরমা, জীবনধারিণী। ইন্দিরা বলল: "মিশরের মরুভূ-ক্ষেত্রে তার প্রাচীন মহাসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে কে? মাত্র একটি নদী—নীলনদী—নয় কি?" শুনেই চম্‌কে উঠলাম—কথাটা যেন জেনেও জানি নি। ইন্দিরা বলল: "দাদা, ভাবো, যদি এই নীলনদী না থাকত, কোথায় কে গড়ত তোমার পিরামিড ও স্ফিংক্স, কে নির্মাণ করত এর অজস্র মূর্তি, প্রতিমা, মন্দির?"

সত্য কথা। সমুদ্রেই হয়ত নদীর শেষ পরিণতি, সমুদ্র না থাকলে হয়ত নদীর ধমনীতে জল বইতেই পারত না। তবু বলব সমুদ্র আমাদের কাছে বড়জোর শিক্ষাদায়ক উপাধ্যায়, কিন্তু নদীই হ'ল আমাদের আশ্রয়ধাত্রী—তার কোলেই আমাদের প্রাণ ঘুম যায়, মন গান গেয়ে ওঠে। হ'তে পারে সমুদ্রকে আমরা পাই নয়নানন্দ রূপে, কিন্তু নদীই হ'ল আমাদের আত্মার আত্মীয়া—অবশ্য প্রলয় প্লাবন না হ'লে! কিন্তু আর উচ্ছ্বাস নয়। মিশরের কথাই বলি।

কতদিন থেকে ভেবে এসেছি মিশর দেখব। বিখ্যাত (সপ্তম) ক্লিওপেট্রার রূপরাগের কথা প্রথম পড়ি ইতিহাসে নয়—শেক্ষপীয়রের নাটকে—যাঁর সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "Age cannot wither nor custom stale her infinite variety!"

সেই ক্লিওপেট্রার দেশ! না, কাব্যোচ্ছ্বাসে বুঝি দিগ্‌ভ্রম হয় বা! মিশরের গৌরব স্বৈরিণী-সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা নয়—মিশরের গৌরব তার প্রাচীন সংস্কৃতি। কত দেশের সঙ্গে ছিল তার যোগসূত্র! কবে থেকে সে সৃষ্টিরত! ইতিহাসের পাতায় পড়া যায় মিশরের Paleolithic, Neolithic, Predynastic Period-এর কথা—যার পরে এল মিশরের বিশ্ববিশ্রুত রাজবৃন্দের কাহিনী—Pharaoh, Ptolemy, আরো কত শত ভুঁইয়া। আবাল্য য়ুরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বকোবিদদের মুখে শুনে এসেছি: বাবিলন মিশর পারস্য প্রমুখ দেশই মানুষের আদি সভ্যতার জনয়িতা। এঁরা ভারত তথা চীনকে বহুদিন ধ'রে অবজ্ঞা ক'রে এসেছেন সম্ভবত ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ছোঁয়াচে, খানিকটা হয়ত এই জন্যেই যে ভারতের বা চৈনিক আধ্যাত্মিকতার খাঁটি সোনার রঙ এঁদের অনাত্মিক, অনীশ্বর, তর্কপ্রবণ মনে ঠাঁই পায় নি। কাজেই মিশরের সভ্যতা ভারতের বা চীনের সভ্যতার

পুরোবর্তিনী একথা না মেনেও সানন্দেই অঙ্গীকার করব যে, মানবসভ্যতার সুরু হয় যে-কয়টি দেশে তাদের মধ্যে মিশর কৌলীন্যের দাবি করতে পারে। পাষাণ-চিত্র, বর্ণমালা-উদ্ভাবন, পঞ্জিকা-প্রচলন, শস্ত্রাদি-গঠন, পূর্তকার্য, সৌধনির্মাণ, স্থাপত্যবিজ্ঞান, ভাস্করশিল্প, মন্দির-রচন প্রভৃতি বিদগ্ধ কীর্তিকলাপে মিশর সগর্বে কালের দরবারে প্রাচীনতম ও কুলীনতম সভাসদদের তথা রূপকারের পদবী দাবি করতে পারে। কিন্তু মরুক গে ঐতিহাসিক কচকচি। বলেইছি তো—আমি মনেপ্রাণে ভারতীয়, তাই ঐতিহাসিক তথ্যকে বেশি বড় ক'রে দেখতে পারি না, কে কবে কী করেছিল কার আগে বা পরে এ নিয়ে মাথা বকানো ভাগবতী ভাষায় "আয়ুষাং অসদ্ব্যয়" মনে করি। সবচেয়ে বড় যে-কীর্তি সে হ'ল আত্মার—তার নাম ধ্যান, প্রেম, অনুকম্পা। ভারতে আবহমানকাল প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে আত্মিক সত্য, সভ্যতার অরুণোদয় থেকে তার দৃষ্টি নেপথ্য-নিবদ্ধ —এই সত্যই আমার কাছে সবচেয়ে বরেণ্যতম তথা আনন্দময় সত্য। তাই মিশর নানা কীর্তিতে মহীয়ান্ একথা স্বীকার ক'রেও বলব যে ভারতের চোখে মিশর বড় তার মমি বা পঞ্জিকা-প্রবর্তনের জন্যে নয়—বড় এই জন্যে যে মিশর ইন্দ্রিয়জগতের বাস্তবতাকে ছাপিয়ে অনেকদূর এগিয়েছিল অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞালোকে। এই প্রগতির ফলেই মিশরে অজস্র মন্দির গ'ড়ে ওঠে, নেপথ্যবাদ-এর প্রবর্তন হয়—সবচেয়ে বড় কথা, সমুচ্ছ্রিত হ'য়ে ওঠে মিশরের আদি সম্রাটদের পিরামিড তথা স্ফিংক্স। জগতে পিরামিডের নাম বোধকরি সবচেয়ে বেশি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তার পিরামিড নয়, মিশরের পরমতম গৌরব তার স্ফিংক্স—কি না নৃসিংহ-মূর্তি। পিরামিডগুলির রচনাকাল খানিকটা জানা গেছে পুরাতাত্ত্বিকদের গবেষণায়, কিন্তু স্ফিংক্স-মূর্তি যে ঠিক কবে রচিত হয়েছিল নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। তবে ঐতিহাসিকরা বলেন যে, খুব সম্ভবত মিশরের Fourth Dynastyর চতুর্থ ফারাও ( সম্রাট্ ) খাফরে-র রাজত্বের সময়েই এ-মূর্তি গড়া হয় খৃষ্টপূর্ব আটাশ থেকে ছাব্বিশ শতকে ( ২৭২৩-২৫৬২ )।

কিন্তু আধ্যাত্মিক মূল্যবিচারে মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি স্ফিংক্স হ'লেও মিশরের আর একটি মস্ত কীর্তি ওদের নেপথ্যতাত্ত্বিক গবেষণা। এই ইন্দ্রিয়-জগতের বাইরে রকমারি জগৎ আছে জৈব প্রাণমন যাদের নাগাল পায় না, কিন্তু মানুষ যোগ ও ধ্যানবলে এমন কয়েকটি অনুভবশক্তি তথা দৃষ্টিশক্তি অর্জন করতে পারে যাদের মাধ্যমে অদৃশ্য অনেক কিছুই তার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে

ওঠে। এ-সত্য ভারতের যোগীদের কাছে মাত্র তর্কসিদ্ধ সত্যের কোঠায় পড়ে না, অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুভবের সাক্ষ্যে এ-সত্য আমাদের কাছে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে। শ্রীঅরবিন্দের কাছেই সর্বপ্রথম আমি এইসব জগৎ তথা তাদের গোচরীভূত হওয়ার বিশ্বাসযোগ্য খবর পাই, কিন্তু এ-সত্য আমাদের দেশের বহু যোগী ও যোগপন্থী কমবেশি সাক্ষাৎ উপলব্ধির সাক্ষ্যে জেনে মেনে এসেছেন সে কবে থেকে! য়ুরোপে এ-যুগে এ-সব আশ্চর্য শক্তি তথা অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে সংশয়ই সুপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু মধ্যযুগে পাশ্চাত্য যোগসাধকদের অনেকেই এ-সব শক্তি তথা দর্শনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। কিন্তু সে অনেক পরে। ভারত এই জ্ঞানজগতে সিদ্ধ ও দ্রষ্টাদের মধ্যে অগ্রণী তথা শীর্ষারূঢ় হ'লেও মিশর পুরাকালে এই মধ্যজগতের খবর পেত তার নানা তান্ত্রিক তথা যৌগিক প্রক্রিয়ালব্ধ মাধ্যমে। এরই নাম নেপথ্যতত্ত্ব—occultism—যাকে অনাধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায়ই ভুল ক'রে mysticism নাম দিয়ে থাকেন। এক হিসেবে অবশ্য এজাতীয় অভিজ্ঞতাকে মিস্‌টিক বলা চলে—(নাম নিয়ে বেশি মারামারি ক'রে ফল নেই)—যদি মিস্‌টিক বলতে বুঝি অতীন্দ্রিয় সত্য। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যেরও বহু স্তর আছে। ভক্ত স্বয়ং ভগবানকে নিয়ে যখন সাধনা করেন তখন তিনি মিস্‌টিক বা যোগী; যখন ভগবানের নিচের অথচ দৃশ্যজগতের ঊর্ধ্বে বা আশেপাশের অলক্ষ্য জগৎ ও তথ্য নিয়ে গবেষণা করেন তখন তিনি occultist—নেপথ্যতান্ত্রিক, এই ধরনের সংজ্ঞা-নির্ণয় করাই ভালো। নৈলে নেপথ্যতান্ত্রিকদেরকে যোগী বা ভক্ত উপাধি দিতে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন, সবার বড় যোগী শুধু তিনি যিনি পূর্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত :

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন!"

যিনি সর্বকর্ম ছেড়ে ভগবানের পূর্ণ শরণ নেন তিনিই যোগিরাজ, পরম ভাগবত, জ্ঞানিবর্য। কিন্তু নেপথ্যতান্ত্রিকদের কারবার রাজগুহ্য সর্বোত্তমকে নিয়ে নয়—মাঝপথের হাজারো যোগলভ্য অনুভব-লোকের পান্থশালাকে নিয়ে। মিশরে এই ধরনের মধ্যপথের তীর্থযাত্রী ছিলেন বহু। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিছক শক্তিমদমত্ত কাপালিক বা অভিচারী হ'য়ে ভগবদ্‌পথভ্রষ্ট হয়েছেন, অর্থাৎ একটু আধটু যোগবিভূতি অর্জন করতে-না-করতে আত্মাভিমানের প্রমত্ততায় "ভূমৈব সত্যং" মন্ত্র হারিয়ে শ্রেয় ছেড়ে প্রেয়কেই আঁকড়ে ধরেছেন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও বলা যায় যে, এ-দৃশ্যমান জগতে নানা নেপথ্যজ্ঞানের পরিধি এঁরা ধ্যানাদি-সাধনায় বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন যার পরিণামে অনেক কিছু কুফল-ফললেও খতিয়ে মানুষের লাভও কিছু হয়েছে বৈ কি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা লেখায় দেখিয়েছেন কেমন ক'রে নেপথ্যতাত্ত্বিকদের ধ্যানাদি-ক্রিয়ালব্ধ শক্তির আলো প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ খানিকটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেছে। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পথে বাধা অগুন্তি। তাদের মধ্যে একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল যোগলব্ধ নানান্ বিভূতি, যাকে পরমহংসদেব বলতেন "সিদ্ধাই"। এইসব সিদ্ধাই নিয়ে প্রাচীন মিশর বহু চর্চা করেছে, যদিও মিশরের ইতিহাসে এসব শক্তির প্রকাশ্য উল্লেখ বেশি মেলে না। না মিলবার কারণ—চলতি ঐতিহাসিকরা আদৌ অভিজ্ঞ নন এইসব নেপথ্যজগৎ তথা নেপথ্যশক্তির হালচাল সম্বন্ধে। তবু কেউ কেউ কিছু আঁচ পেয়েছেন প্রাচীন মিশরের রকমারি নেপথ্যগবেষকরা কী ভাবে মানুষের জ্ঞানজগতের সীমান্ত প্রসারিত ক'রে দিয়ে গেছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মিশরের নেপথ্যতাত্ত্বিকদের খবর যদি বা কিছু মেলে গবেষণার প্রসাদে, তার খাঁটি অধ্যাত্মসাধকদের অনুভব উপলব্ধি প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে বললেই হয়। শুধু আচম্কা এখানে ওখানে কোনো মূর্তি বা ইঙ্গিতে পাওয়া যায় এ-শ্রেণীর প্রজ্ঞার ঈষদাভাস—যেমন স্ফিংক্সের মূর্তি। কেবল মুস্কিল এই যে, অধ্যাত্ম সত্যের সাধক এইজাতীয় মূর্তি বা সাক্ষ্যকে যে-চোখে দেখেন, অসাধক তাদেরকে সে-চোখে দেখতেই পারেন না। তাই পিরামিডেরই জয়জয়কার কিন্তু স্ফিংক্স নিয়ে বড় একটা কেউ উচ্ছ্বাসী হ'তে ভরসা পান না। পাবেন কেমন ক'রে? বলে না—জহুরী না হ'লে জহর চেনা সম্ভব নয়? অধ্যাত্মসত্যের সন্ধানী না হ'লে অধ্যাত্মসত্যের আভাস ইঙ্গিতকে ধরা শক্ত। তাই "স্ফিংক্স" নামকরণ—কিনা রহস্যময়—ঝাপ্সা। তবে ঐহিকদের কাছে পরমার্থতত্ত্ব যে ঝাপ্সা মনে হবে এ তো জানাই। চেতনার বিকাশে যে-সব সত্য বা প্রকাশ বোধগম্য, অবিকাশের কোঠায় তো আর তারা সমান প্রাঞ্জল হ'তে পারে না। তাই না মিশরের ভারতীয় রাজদূতাগারের এক রাজপুরুষ আমার কাছে এসে অম্লানবদনে বলতে পারলেন: "স্ফিংক্সের মূর্তি দেখে কী যে নিরাশ হ'লাম……" ইত্যাদি। কিন্তু এ-সম্বন্ধে পরে লিখব স্ফিংক্স তথা পিরামিড দর্শনে যা যা আমাদের মনে হয়েছিল—যথাপর্যায়ে।

* * *

মধ্যরাত্রে ঘুমভাঙা চোখে হোটেলের সামনের বারান্দা থেকে দেখলাম

নীলনদীর বুকে পড়েছে চাঁদের কিরণ। সে যে কী অপরূপের রূপায়ণ—স্বপ্নরাজ্যের অঙ্গরাগ! বারান্দায় ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। এই সেই নীলনদী যার তীরে প্রাচীন মিশরসভ্যতা বসিয়েছিল তার কীর্তি-অকীর্তির রাজধানী! কালাতিপাতে কত কী বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু নীলনদী তেম্‌নি চলেছে গান গেয়ে:

Men may come and men may go
But I go on for ever!

পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম একা। কারুর কোনো অনিষ্ট করি নি, চলেছি নীলনদীর তীরে "আন্‌মনা গো আন্‌মনা"—আনন্দহিল্লোলেফুল্লহৃদি ভালো-মানুষের পো—এমন সময়ে মাগো!—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—

পাশ দিয়ে চ'লে গেল চকিতের প্রায়
দুটি উট—করে স্নায়ু "ত্রাহি ত্রাহি" হায়!

অ্যাঁ? ফুটপাতেও উট! নয়া দিল্লিতে ফুটপাতে দ্বিচক্রযান চলে, পারিসের বিখ্যাত Avenue des Champs Elysée-তে ফুটপাতে মোটর চলতেও দেখেছি স্বচক্ষে (এ অতিরঞ্জন নয়)—কিন্তু

দ্বিচক্রযান নয় এ তো নয়—সাক্ষাৎ উটপাখি!
অষ্টাবক্র, কুশ্রী, করাল—দংশেও, জানো না কি?

কিন্তু আর না। গাড়িবারান্দায় ব'সে নীলনদীর শোভা দেখতে দেখতে কায়রো-কাহিনী লেখা এখন বন্ধ রাখি। বিকেলে বন্ধু মাগুইদ সেমেদা আসবেন, মোটরে ক'রে নিয়ে যাবেন পিরামিড তথা স্ফিংক্স দেখাতে, তারপর ফের কলম ধরা যাবে। এখন ধুতি প'রে খালি গায়ে, খালি পায়ে

তরুবীথিসেতুমিনারখচিত দেখি নীলনদতটের শোভা:
ইতিহাস তথা রূপউল্লাস—মোহন মাধুরী, কী মনোলোভা!

* * *

কায়রোয় আমাদের একটি কন্সার্ট দিতে হ'ল বৈ কি। প্রথম এলেন কায়রোতে ভারতীয় দূতাগার থেকে শ্রী কে. বি. ট্যাণ্ডন। বললেন "ইণ্ডো ইজিপ্সিয়ান ফাউণ্ডেশন" ওরফে "আল মিস্‌র" (আরব ভাষায়) আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ করছেন।

সময় ছিল মাত্র দুদিন। কিন্তু এরা এত তৎপর যে একদিনেই চার পাঁচটি সংবাদপত্রে—ফরাসি ও ইংরাজি দুই ভাষায়ই—আমাদের নাম ধাম গুণপনা ছাপিয়ে ফেলল একাধিক ছবি সমেত! কার্ডও ছাপিয়ে ফেলল নক্ষত্রবেগে—রঙ্গমঞ্চ, যবনিকা, স্পট-লাইট—কী নয়? তবে এরা স্বভাবে যাকে বলে সাংবাদিক, কাজেই এদের পক্ষে এসব তো করামলকবৎ, কি না স্বধর্মে আশু সিদ্ধি।

যথাকালে কনস্থলেট থেকে এল মোটর, গেলাম আমরা ফিনি হলে (Finny Hall)। গিয়ে দেখি ঐ মস্ত ঘরেও লোক ধরে না। মাত্র দুদিন ওরা নৃত্যগীত-বাসরের বিজ্ঞপ্তির সময় পেয়েছিল, কিন্তু দেখলাম তাই যথেষ্ট। বন্দোবস্ত সব জড়িয়ে চমৎকার!

ইন্দিরাকে দেখে ওদের কী যে ভালো লেগে গেল! কত ভাবে যে ওরা ওর ছবির পর ছবি নিল ও পরে ছাপিয়ে ফেলল দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে—ফরাসি, ইংরাজি তথা আরব ভাষায়! শুধু কি এই? নাচ শেষ হ'তে না হ'তে এক সিনেমা-অধিনায়ক এসে ওকে ধরলেন: "একটা ছবি ক'রে যান—মাস তিনেক মাত্র লাগবে।" দক্ষিণা দেবে আশাতীত—সত্তর হাজার মুদ্রা। ইন্দিরা আমার স্কন্ধে "না"-র দায়িত্ব চাপিয়ে তো খালাস হ'ল: "আমার গুরু অনুমতি দেবেন না।" আর যাবে কোথা? আমাকে ওরা এসে চেপে ধরল: "কেন অনুমতি দেবেন না?" মিস মাগদা—এক যশস্বিনী চিত্রতারকা—আমাকে বললেন: "দোষ কি? সিনেমা কি আপনি দেখেন না?—যদি দেখেন তবে তাতে আপনার শিষ্যা একটি ছবি ক'রে যাবেন না কেন?" সে ইন্দিরাকেও লোভ দেখাল প্রচুর: "আপনি সিনেমায় বাজিমাৎ ক'রে দেবেন—কী যে আপনাকে দেখাবে!—আপনার পার্সনালিটি, মুখাবয়ব, গড়ন (figure), হাসি—সবাইকে মুগ্ধ ক'রে দেবে!"

কিন্তু মরুক গে এসব অবান্তর ধুমধামের কথা। যেটা প্রাসঙ্গিক সেটা এই যে, কায়রোয় আমাদের অদৃষ্ট-তারকা হু হু ক'রে মধ্যগগনে উঠে গেল দেখতে দেখতে! যে-সমাদর ওরা করল আমাদের 'ফিনি হলে'—ঐ ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে যাকে বলে "সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য"! নৃত্যগীতান্তে সে কী তুমুল করতালি! গ্যাটিংগেনের কথা মনে করিয়ে দিল। পরে পাঁচ ছয়টি কাগজে বেরুল সে এক গঙ্গা কথা! সবটা উদ্ধৃত করা শোভনও নয়—স্থানাভাবও বটে। তবু বাদ-সাদ দিয়ে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিই। একটি কাগজে লিখল: "নৃত্যগীত

আমাদের নিয়ে গিয়েছিল যেন এক স্বপ্নরাজ্যে—ভারতের অমেয় আত্মার মধ্যে—insondable l'âme de l'Inde—অবগাহন—" ইত্যাদি।



নৃত্যবেশে ইন্দিরা দেবী ও চিত্রতারকা

আর একটি পত্রিকায় লিখল : "Quand la danse et le chant atteignent ce degré de charme et de séduction comme le spectacle qui nous a été donné d'applaudir hier soir, ils constitue une véritable ivresse pour less sens auditifs et visuels. Dilip Kumar Roy chante tantôt en solo et tantôt pour accompagner Indira Devi dans ses danses......Le technique chorêgraphique de Indira Devi, prodigieusement expressive, dédie la ferveur des gestes rituels aux dieux de l'Inde......Ses évolutions empruntent aux monuments la beauté des figures de pierre.........Modulant avec une rapidité surprenante, Dilip Kumar Roy dédie sa mélopée au dieu Krishna ...Et la priére de la danseuse se transforme en extase...Tel est le spectacle fascinant que les organisateurs ont présenté."

সংক্ষেপে ভাবার্থ: "এ-নৃত্যগীত আমাদের নেত্র ও শ্রুতিকে যেন নেশায় ডুবিয়ে দিল, ইন্দিরা দেবীর আঙ্গিক প্রকাশলীলায় অদ্ভুত সুন্দর, আর সে-প্রকাশ

তিনি উৎসর্গ করলেন ভারতের দেবতাবৃন্দকে। পাষাণমূর্তির ভঙ্গির মতন সুন্দর তাঁর অঙ্গভঙ্গি। দিলীপকুমার? কী আশ্চর্য স্বরবিন্যাসে যে তাঁর গানকে নিবেদন করলেন কৃষ্ণদেবকে, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য হ'য়ে উঠল উচ্ছ্বসিত আনন্দ। উদ্যোক্তারা আমাদের এম্‌নিই একটি মোহময় দৃশ্য উপহার দিলেন।"

আর একটি ফরাসী পত্রিকায় লিখল: "De l'enthousiasme d'abord et de remerciements ensuite pour avoir su nous transporter dans un monde nouveau, celui du mystère et du mysticisme······Dilip Kumar Roy nous subjugua par la mélodie de son chant tandis que Indira Devi exprimait par sa danse les paroles de son maitre. Pathétique, dirions-nous, oui, patriotique, oui, mais······nous ajouterons-nous, extraordinairement captivant ! Nous regrettons que ces deux artistes de grand talent aient deja quitté le sol d' Egypte."

ভাবার্থ: "উচ্ছ্বাস ও ধন্যবাদ—আমাদের এক নব রহস্যময় জগতের স্বাদ দেবার জন্যে। দিলীপকুমার তাঁর সুরে আমাদের মন কেড়ে নিলেন, ইন্দিরা দেবী গানের কথাকে নৃত্যে রূপ দিয়ে······করুণ, দেশ-ভক্তিতে উদ্বেলিত—কিন্তু সর্বোপরি, আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর। এ দুটি মহাগুণবান শিল্পী যে মিশর ছেড়ে চলে গেছেন, ভাবতে দুঃখ হয়।"

আর একটি কাগজে ইন্দিরাকে brilliante (ভাস্বর) বিশেষণে অভিহিত ক'রে এত কথা লিখল ওর নৃত্য সম্বন্ধে যে উদ্ধৃত করা অসম্ভব।

আর একটি পত্রিকায় ছাপল এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি। তার একটু উদ্ধৃত করি। ইন্দিরাকে অজস্র প্রশংসা ক'রে লিখলেন সমালোচক: "Les evolutions paraissent si libres, si degeagées de toute contrainte······tant de sincérité que Dilip Kumar touche son auditoire······l'esprit de la manifestation, la ferveur du chanteur······les pas et les attitudes de la danseuse créent un climat des plus prenants. On ne se trouve plus devant une scène mais dans un temple."

ভাবার্থ: "ইন্দিরা দেবীর নৃত্য এমন স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাধীন প্রতি পদক্ষেপ ও ভঙ্গি······দিলীপকুমারের আন্তরিকতা যা শ্রোতাদের আর্দ্র ক'রে তোলে—এসবই সৃষ্টি করে একটি মনোজ্ঞ আবহ। মনে হয় আমরা একটি দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে নই—একটি মন্দিরে এসেছি।"

প্রথম রাতের বন্ধু কার্মেলো ফের এলেন একদিন সকালে, নিয়ে গেলেন তাঁদের মোটরে কায়রোর বিখ্যাত জাদুঘরে। মিশরী পাষাণমূর্তি অবশ্য ইতিপূর্বেই দেখেছিলাম নানা জাদুঘরে। বিশাল মুখ, উদর, বুক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! হাত পা অনেক সময়েই দেহের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ'য়ে গেছে—কিন্তু মুখাবয়ব বেশ কান্তিময়। পুরাকালের সে কত রাজা, কত মন্ত্রী, কত রাণী! মন্দ কি! দেখতে ভালোই লাগল ঐতিহাসিক না হ'য়েও।

আরো দেখলাম কত কী—যাক্। শুধু বলি এখানে দেখলাম বিখ্যাত টুটানখামেনের আবিষ্কার। অষ্টাদশ রাজবংশের (dynasty) এক রাজা স্মেন্‌খখারে চতুর্দশ শতাব্দীতে নাম নিয়েছিলেন টুট-আংখ-আমুন, মানে আমুন-দেবের জীবন্ত প্রতিমা। ১৯২২ সালে এই রাজার টুম্ব্ আবিষ্কৃত হ'তে সারা জগতে সাড়া প'ড়ে যায়—কেননা এই টুম্ব্-নগরীতে সে-যুগের কত কী পাওয়া যায়—বিছানা, রথ, মূর্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোসন, অলঙ্কার, মমি, কফিন, চেয়ার ইত্যাদি—যাদের সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে কায়রোর জাদুঘরে। এসব দেখার আগ্রহ যে আমার খুব বেশি উদগ্র ছিল এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কারণ বলেছি—ঐতিহাসিক মন আমার নয়। আমি ভালোবাসি সুন্দর মূর্তি, সৌধ, মন্দির। কবে কারা কোথায় কী ধরনের আসবাবপত্র নিয়ে জীবনযাপন করত, জানবার কোনো তাগিদই আমি মনের মাঝে খুঁজে পাই না। কেবল একটি কৌতূহল ছিলঃ মিশরী মমি দেখব। বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম মানুষের মৃতদেহকে এরা নাকি আশ্চর্য উপায়ে সংরক্ষিত করত নানা মালমশলার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। শুনেছি রুষদেশে লেনিনের মৃতদেহকে মমি ক'রে রক্ষা করেছেন আধুনিক রাসায়নিকরা। এও পড়েছি যে, আমরা নাকি এযুগেও পারি নি, যা মিশরের রাসায়নিক পেরেছিল—মমিকে অক্ষতদেহে রক্ষা করতে। কিন্তু দেখে যা নিরাশ হ'লাম! দূর্! এর নাম জীবন্ত দেহের অক্ষত সুরক্ষণ? দেহগুলি নানা মুখোষ বা আবরণে আবৃত। যদি বা এখানে ওখানে এসব আবরণের ভাঙচুরের—chink—মধ্যে দিয়ে দেহ দেখা যায় তো সে অতি কুশ্রী, কদর্য। এ-হেন মমির জগৎজোড়া নামডাক হ'ল কেমন ক'রে? কীই বা সার্থকতা এভাবে কদর্য জীর্ণ দেহকে জীইয়ে রাখার? রুচির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো নিষ্ফল—ও সমাধান হবার নয়। তাই যাঁরা মমি-উৎসাহী তাঁদের রুচিকে বিকৃত বলব না। কিন্তু এটুকু বলবার অধিকার আমাদের আছেই যে মমি দেখে একটুও ভালো লাগে নি,

এবং সারাজগতে মমি-গুণগানের কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য হেতুই আমরা খুঁজে পাই নি।

তবে টুটানখামেনের নানা রথ, অলঙ্কার, ছড়ি, আয়ুধ, সমাধি-পেটিকা প্রভৃতি মোটের উপর ভালোই লাগল। কিন্তু আর না—এসব তথ্য যাঁরা চান তাঁরা পুরাতাত্ত্বিকদের লেখা হাজারো বিশদ বর্ণনা ও স্তবগান পাবেন বইয়ের পাতায়।

* * *

সামেদাকে ইন্দিরা শুধালো—মিশরের খাঁটি নৃত্য দেখা যায় কি না? তিনি "নিশ্চয়ই" ব'লে একদিন রাত্রে নিয়ে গেলেন এক কাবারে-তে। কিন্তু সেখানে পনেরো আনা নাচ ও গান য়ুরোপীয়। ওরা সার্কাসও দেখাতে ছাড়ল না। একটি না ছুটি নৃত্য দেখলাম, শুনলাম খাঁটি মিশরী নৃত্য। কিছু প্রাচ্য আমেজ আছে একথা মেনেও বলব যে, এই যদি মিশরের শ্রেষ্ঠ নৃত্যের যথার্থ নমুনা হয় তবে মিশরের নৃত্যকলাদিকে "আহামরি" বলা চলে না। সঙ্গীত সম্বন্ধেও ঐ কথা। ভারতীয় এক-আধটি রাগের সুর বাজল বটে ওদের অর্কেস্ট্রায়—যথা কালাংড়া, রামকেলি—কিন্তু সে-সাদৃশ্য সামান্যই। মাঝে মাঝে নৃত্য জলদ হয় সুরের সঙ্গে তাল রেখে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাকিটুকু পাঁচমিশেলি—প্রেরণাহীন।

আধুনিক মিশরবাসীদের সম্বন্ধে কী বলব ভেবে পাই না। পুরাকালে মিশর একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশীলন করেছিল একথা কে না মানবে? কিন্তু মুসলমান সভ্যতার অভ্যাগমের পরে মিশরের সে-আদিম সভ্যতা যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে একথা অকুতোভয়েই বলা যায়। আধুনিক মিশরবাসীকে বাইরে থেকে দেখে তো মনে হয় য়ুরোপের পোষ্য সন্তান। কার্মেলোর মুখে শুনলাম কায়রোতে অর্ধেকেরো উপর নরনারী বিদেশী—য়ুরোপের নানা জাতিই এখানে এসে কায়েমি হ'য়ে আছে বহুদিন ধ'রে। তাই কায়রোয় মিশরবাসীদের বহু নরনারীকে বাইরে থেকে দেখতে হুবহু য়ুরোপীয় মনে হয়—কারণ বস্তুতঃ তারা য়ুরোপীয়ই বটে—খানিকটা অন্ততঃ।

যাহোক এ-হেন মিশ্রণের ফলে একটি নবসভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে এখানে। সে-সভ্যতা ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে বলা কঠিন। তবে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় তাতে খুব বেশি ভরসা হয় না যে, আধুনিক মিশরের কোনো বিশিষ্ট দান গ'ড়ে উঠবে বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে। কিন্তু এ নিয়ে বেশি বলতে সাহস হয় না—কেন না, বলেছি, কোনো দেশকে এভাবে উপর উপর দেখে বিচার করতে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। শুধু সাধারণ ভাবে দু-একটা কথা ব'লেই ক্ষান্ত হব।

মিশরকে প্রাচ্য বললে হয়ত ভুল হবে না। কাজেই যখন কায়রোয় পৌঁছই

তখন এ-প্রাচ্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিছু দেখব এ-আশা পোষণ করেছিলাম বৈ কি। কিন্তু যা দেখলাম তা এই যে, মিশর যেন ষোলো আনা য়ুরোপীয় বন্‌তেই বদ্ধপরিকর। চীন-জাপানে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আধুনিক মিশরের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কোথায় —মনে প্রশ্ন জাগে। আধুনিক মিশর রমণী তথা পুরুষ হুবহু য়ুরোপীয় বেশভূষা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া এঁরা জাতিতেও অনেকেই নাকি য়ুরোপীয়— শুনলাম কার্মেলো ও তাঁর এক ইতালিয়ান বন্ধুর মুখে। কাজেই মিশরের বিশিষ্ট সভ্যতা বজায় রাখবার জন্যে এঁদের মাথাব্যথা হওয়ার বিশেষ কোনো হেতুও নেই। তবে হয়ত এখানে এখন একটা নতুন সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠছে—পূর্ব ও পশ্চিমের সমুচ্চয়ে। পশ্চিমের প্রভাব আজ বিশ্বজনীন। আধুনিক জীবনের নানান ধরন-ধারণ ও ভাবধারা প্রায় সব দেশেই এক। বিজ্ঞানের প্রভাবে ও যন্ত্রবাদের চাপে সর্বত্রই মানুষের মন একটা অনুরূপ ছাঁচে গ'ড়ে উঠছে। এ নিয়ে খেদ করা বৃথা। তবু ভাবতে মনে একটা আক্ষেপ হয়ই যে, সব দেশেই মানুষ একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালাই হবে—সবাই এক গোয়ালে মাথা মুড়ুবে। বিশ্বসংস্কৃতির এ-হেন পরিণতি হয়ত হবে না শেষ পর্যন্ত—এ-আশাকে মনে ঠাঁই দিয়েই আপাতত ক্ষান্ত হওয়া যাক্। "আশা" বলছি এই জন্যে যে, সব মানুষ যদি একই ভাবধারার স্রোতে চলে তবে তাতে ক'রে বৈচিত্র্যের হবে ভরাডুবি।

* * *

এবার কায়রো তথা আমাদের বিশ্বভ্রমণ-সংহিতার শেষ পর্বের পালাগান সুরু তথা সারা ক'রে "দেশে দেশে চলি উড়ে"-র শান্তিপাঠ উচ্চারণ করি: অর্থাৎ কায়রোর শ্রেষ্ঠ তীর্থবর্ণনা—পিরামিড-স্ফিংক্স-কাহিনী।

সবাই জানেন মিশরের সম্রাটের নাম "ফারাও"। এঁরা ছিলেন যাকে বলে ছত্রপতি—অক্ষরে অক্ষরে—যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ যাঁদের ছিল নেশাও বটে, পেশাও বটে। কথায় কথায় করতেন এঁরা যুদ্ধ বা নিত্যনব দিগ্বিজয়। কিন্তু জয়ের উল্টোপিঠেই পরাজয়—কাজেই এঁরা মাঝে মাঝেই হেরেও যেতেন—বলা বাহুল্য সে-সব বর্ণনা মিশরের ইতিহাসে বেশ প্রাঞ্জল ভাষায়ই বর্ণিত হয়েছে—কাজেই সে-ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিও আমি করব না, বলব শুধু যা দেখলাম স্বচক্ষে, আর দেখে মনে কী ধরনের ভাবোদয় হ'ল—ব্যস্।

বন্ধু সেমেদা তাঁর মস্ত মোটরে নিয়ে গেলেন কয়েক মাইল দূরে পিরামিডে—যার চূড়া আমাদের হোটেলের বারান্দা থেকে দেখে অবাক হ'তাম। অবাক

হ'বার কথা বৈ কি—পর্বতচূড়া খোদার সৃষ্টি এই-ই শুনে এসেছি আশৈশব। এখানে মানুষ করল খোদার উপর খোদকারি—নিজে হাতে রচল পাষাণস্তূপের আশ্চর্য "পর্বত" না হোক "পাহাড়" তো বটেই। সর্বোচ্চ পিরামিডটি—যাকে বলা হয় "জগতের সপ্তম বিস্ময়ের অন্যতম"—উচ্চতায় ১৩৭ গজ ও ভূমিলগ্ন বেড় ২৩০ গজ—সমচতুষ্কোণ। এটি রচনা করিয়েছিলেন, "চতুর্থ রাজবংশের" বিখ্যাত খুফু নামক ফারাও।

পিরামিড মানে সমাধি। প্রতি ফারাওয়ের দেহ একটি সার্কোফ্যাগাসে (সমাধি-পেটিকায়) রেখে এক-একটি পিরামিডের নিচে কবরস্থ করা হ'ত। ইংরাজি ভাষায় একে বলে tomb—কিন্তু বলাই বাহুল্য পিরামিড বড় যে-সে "টুম্ব্" নয়—গিরিপ্রমাণ স্মৃতিস্তম্ভ। এর বেশি খবর যাঁরা চান তাঁরা সহজেই অজস্র গ্রন্থ তথা বিশ্বকোষের পাতা উল্টে দেখবেন—সাংবাদিক হওয়া আমার স্বধর্ম নয়।

কিন্তু একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে—মিশর দেশের রাজন্যবৃন্দের এ-হেন উচ্চাশা! পিরামিডকে তাজমহলের সগোত্র কোনো অনিন্দ্য রূপস্তম্ভ বলা যায় না। পিরামিড এঁরা রচনা করাতেন শুধু নিজের নামধাম উত্তরযুগের জন্যে রেখে যেতে। আধুনিক যুগে আমরা হাজার হাজার শ্রমিককে খাটাই বটে; কিন্তু পণ্যলোভে, বাণিজ্যের উচ্চাশায়—নাম রেখে যেতে নয়। কিন্তু পিরামিডের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। অন্যভাষায়, এ-কীর্তি বৈশ্যকীর্তি নয়—ক্ষাত্রকীর্তিই বলব। ভাবুন—ছোট-বড় অজস্র শিলার স্তূপ সাজিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক গ'ড়ে তুলল এক একটি পিরামিড। সে-বিশাল পিরামিড স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না কী দুরূহ কৃতি ও অধ্যবসায় নিয়োজিত করা হ'ত এ-শ্রেণীর স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে! কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা আর নয়—যা দেখলাম ব'লে কীর্তন সাঙ্গ করি।

সেমেদা বললেন পিরামিডকে দুরকম আলোয় দেখাই চাই: অস্তসূর্যের সোনালি আলোয়, তথা পৌর্ণমাসীর রূপালি চন্দ্রিকায়।

যে কথা সেই কাজ: পিরামিড-প্রাঙ্গণে পৌছলাম—ঠিক তখন যখন রবি পাটে নামছেন।

ধূ ধূ বালি, উদার প্রান্তর, স্নিগ্ধ নির্মল হাওয়া—দেহ জুড়িয়ে গেল—মন উদাস। মীরাবাঈয়ের বিখ্যাত গান মনে গুনগুনিয়ে উঠল: "নয়ন ললচাওত, জিয়ারা উদাসী।" আহা, যদি তার পরের চরণটি আবৃত্তি করতে পারতাম এ-অঙ্গীকার ক'রে: "সাঁওল বনমে বাজে সাঁওলকী বাঁসী!"

না, শ্যামলের বাঁশি শুনি নি বটে, কিন্তু কিছু সেদিন শুনেছি সেই প্রান্তরে—যদিও তার কী নাম দেব জানি না। তবে যদি বলি তার নাম বৈরাগ্য-রাগিণী তবে হয়ত সত্যের অপলাপ হবে না।



পিরামিড

এদিকে-ওদিকে যেদিকে তাকাই, দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী পিরামিড-গিরি। মৃত্যুকে আমরা ডরাই স্বভাবে। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে কান পাতলে দুটি পরিষ্কার সুর শোনা যায়: একটিকে বলা যেতে পারে অবসানের পুরবী, আর একটিকে আগমনীর বিভাস: সন্ধ্যা ও প্রভাতের সমন্বয় বলব কি?

ব্যাখ্যা জল্পনা থাকুক। ভাবুন—একবার কল্পনা করুন—চার পাঁচ হাজার বৎসর আগে বিক্রমাদিত্য রাজবৃন্দ রচনা করিয়েছিলেন এই আশ্চর্য স্মৃতিস্তম্ভগুলি, যারা মহাকালের স্থূলহস্তাবলেপকে উপহাস ক'রে আজও দাঁড়িয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ! পুরাকালের কিছু ছবি, কিছু খোদাই-করা মূর্তি আজও টিঁকে আছে, কিন্তু তারা নৈপুণ্যে বিস্ময়কর হ'লেও বহরে বিপুল নয়। একথা বলছি না যে, কোনো সৃষ্টির মহিমা তার বহরের অনুপাতেই বিচার্য; কিন্তু একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, আয়তনের ঔদার্য মনের মধ্যে একটি বিশেষ গাঢ় রসের সঞ্চার করে। রোমের বিশাল সেণ্ট পিটার গির্জা, বা সিস্টিন চ্যাপেলের দেয়ালে ও ছাতে

মাইকেল এঞ্জেলোর বিরাট ও অজস্র ছবি দেখে মন অভিভূত হয় না কি? যতই কেননা বলি শিল্পসৃষ্টিতে আয়তন অবান্তর, রসোপভোগের ক্ষেত্রে সৃষ্টি সুন্দর হ'লে ব্যাপ্তির একটি বিশিষ্ট রসমূল্য অনস্বীকার্য। পিরামিডের আয়তন দেখে তাই যদি মন বিস্ময়ের আনন্দরস একটু বেশি ক'রেই পেয়ে থাকে তবে তার জন্যে অনুতপ্ত হওয়া কিছু নয়।

কিন্তু শুধু আয়তনই নয়। এ-ধরনের মহাকায় শিলা চার হাজার বৎসর আগে মানুষ নিচে থেকে উপরে ওঠাত কী করে? তখন তো ক্রেন-জাতীয় উত্তোলক যন্ত্রাদি ছিল না। তবে? এ-প্রশ্ন এ-যুগে বহু দর্শকের মনেই উদয় হয়। কিন্তু সে যাক্। কীর্তির আসল বিচার তার মাধুর্যমূল্যে, ব্যাখ্যা তো "এহো বাহ্য"।

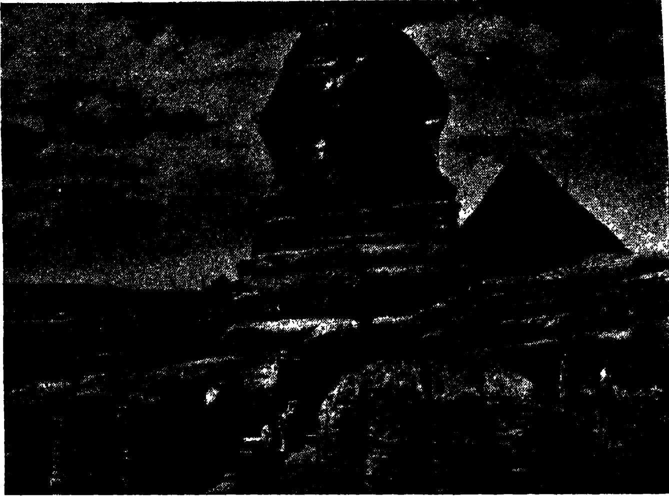
বিস্ময়, বিস্ময়, বিস্ময়! কী ভাবে সে-যুগের স্থপতিরা গ'ড়ে তুলেছিল এই ধরনের গিরি—যে জাগতিক মাধ্যাকর্ষণকে বিদ্রূপ ক'রে আজো নির্বিচল দাঁড়িয়ে! বিধাতার গড়া শৈলমালার মধ্যে দার্ঢ্য আছে মানি, কিন্তু এ-ধরনের আকৃতি-কলাকারু তো নেই। এ তো নয় যা-তা ক'রে সাজানো পাষাণস্তূপ—এ যে অতিকায় শিলার পরে শিলাবিন্যাসে একটি বিশেষ ধ্যানরূপকে ফলিয়ে তোলা! সৃষ্টি ব'লে সৃষ্টি! আর সে কোন্ সুদূর অতীতে!

ইন্দিরা পিরামিড দেখে সব্যঙ্গে করেছিল একটি মন্তব্য: "দাদা! এরা কী শক্তিই ব্যয় করেছিল মহাসৌধ গ'ড়ে তুলতে। তাই সৃজনের গর্ব এরা করতে পারে বৈ কি। কিন্তু আমরাও বড় কেওকেটা নই—পারি গর্ব করতে: তোমরা যুগ যুগ ধ'রে যা গ'ড়ে তুলেছ, আমরা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করতে পারি মাত্র একটি আণবিক বোমায়। ধ্বংসের শক্তিই তো সব শক্তির সেরা।" চম্‌কে উঠেছিলাম কথাটা শুনে। কিন্তু সে যাক্—পিরামিডের কথাই বলি।

পিরামিড অসাধ্যসাধনের দিক থেকে মানুষের একটি পরমাশ্চর্য কৃতি মেনেও সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে এর মধ্যে কীর্তি থাকলেও নেই রূপের শ্রেষ্ঠ বিকাশ—কি না ব্যঞ্জনা—সুষমার লাবণ্যবিলাস। অর্থাৎ সে মহান হ'লেও "কাঙাল নয়ন" তার "দ্বার হ'তে ফিরে ফিরে" আসে না। অন্যভাষায়, পিরামিড মানব-মনের একটি মহতী অভীপ্সার প্রকাশ হ'লেও সে-অভীপ্সা সর্বোচ্চ শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ নয়। বিস্ময়কর, কিন্তু মাধুর্যময় নয়।

একথা হয়ত তেমন ক'রে উপলব্ধি করতাম না যদি না পিরামিডের পরেই

দেখতাম নরসিংহের বিরাট স্ফিংক্স মূর্তি। মানুষের মুখ ও সিংহের দেহ তথা নখমুষ্টি—থাবা—এই দুয়ের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এ-অপরূপ বিগ্রহ। ভাগবতে



স্ফিংক্স

পড়েছি নৃসিংহের বর্ণনা কিন্তু সে হ'ল মহাকালের দৈত্যসূদন রূপ: "করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চল-ক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রুকুটীমুখোল্বণম্":

জিহ্বা যাহার স্ফুরে ক্ষুরধার লেলিহান করবালের প্রায়,
দংষ্ট্রা করাল আনন ভয়াল ভীমভ্রুকুটির ভীষণতায়!

কিন্তু এ-নরসিংহ করাল ভীষণ লেলিহান নয়—এ গম্ভীর, উদার, মহিমময়: স্বরাট্ ধ্যানমূর্তি! থাবা পেতে অচঞ্চল আসনে আসীন—ভঙ্গি সিংহের কিন্তু মুখ যোগীর—সুদূর-দিগন্ত-নিবদ্ধ ঋষিলোচন; কী লোচন! কী ললাট! কী কেশরকুন্তল! যত দেখি আশ মেটে না যেন। কার রূপ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে ওর গভীর দৃষ্টির সামনে! বার বার স্মরণ করলাম এর স্রষ্টা—সেই অনামী রূপকারকে। ভাস্কর বটে! কিন্তু শুধু ভাস্করই নয়: পাষাণে উৎকীর্ণ নেত্রে যিনি ফোটাতে পারেন এ-ধ্যানদৃষ্টি তাঁকে প্রণাম প্রণাম প্রণাম! মন রসিয়ে উঠল এক বিচিত্র ভাবরসে—লিখলাম তর্পণ:

চারিধারে শুভ্র নির্মল বালুকা—উন্মুক্ত, উদার, বিহীনবন্ধ!
অস্তাভ কিরণে ধরে কী সন্ন্যাসী রূপ! বহে স্নিগ্ধ পবন মন্দ!

মন্দিরের সম স্বপ্নালু, উদাস পিরামিড-হর্ম্য—সুন্দর, দীপ্ত—
আলোহিত রশ্মিজালে মায়াময় দেখায়—নয়ন রহে অতৃপ্ত !
চল্লিশ শতাব্দী পূর্বে কে স্থপতি রচেছিলে হেন সমাধি কান্ত—
চল্লিশ শতাব্দী পরেও যে রাজে অচলপ্রতিষ্ঠ, ভাস্বর, সান্দ্র !
কত স্তূপ ভায় হেথায় হোথায় বিচ্ছুরি' নিটোল শান্তি অনিন্দ্য !
অটল, মহিমময়—মনে হয় ইন্দ্রজাল—যথা পুষ্প অবৃন্ত !

আমরা দেখেছি কীর্তি মানবের : বিলাসপ্রাসাদ, অমিতরঙ্গ।
দেখেছি গৌরবী অট্টালিকা, দুর্গ, সেতু ও মিনার, ঘোর সুড়ঙ্গ :
জনতাবাহিনী-তারিণী বিমান, বিশাল তরণী স্পর্ধে যে অব্ধি
ধায় মদভরে করিয়া ঘোষণা ঝঞ্ঝাবিজয়িনী বিজ্ঞানশক্তি।
কিন্তু কোথা কেবা পাষাণসম্ভারে নির্মিয়াছে হেন অসাঙ্গ কীর্তি
অফুরন্ত যার গরিমা বিথার, মৃত্যুঞ্জয়ী যার মহাসমৃদ্ধি ?
ক্ষণায়ু নরের দম্ভসমারোহ ভঙ্গুর প্রাণের উচ্ছ্বাসী নৃত্য :
বৈরাগ্য উদাত্ত স্বরে রটে : "নহে কালের সাম্রাজ্যে কিছুই নিত্য।"
মানব যখন গায় গর্বভরে : "মহিমা আমার কে করে খর্ব ?"
হাসে মহাকাল তরঙ্গে উত্তাল করিয়া নিশ্চিহ্ন কৃতির দর্প।
কিন্তু তুমি আছ আজো পিরামিড ! শুনি কর্ণে তব পাষাণতূর্য :
"নহি আমি ক্ষীণ, যুগে যুগান্তরে ভায় বিবস্বান্ আমার সূর্য !
রচি আমি দেখ কী স্বপ্নগহন শৈলধ্যানাসন গগনমন্ত্রে
মহেন্দ্রজালিক প্রতিভা আমার করিতে প্রচার জলদমন্দ্রে !"

কিছুদূরে ও কী দেখি ? আর এক অচলপ্রতিষ্ঠ পাষাণকীর্তি :
আনন ধ্যানীর, মুষ্টি, দেহ তথা কেশর সিংহের—অমিতদীপ্তি !
বিশাল উন্নত ললাটে এ-কোন্ ধূর্জটি-সন্নিভ ঔদার্য শান্ত !
গভীর লোচনে কোন্ অমিতাভ দর্শনের জ্যোতি—ধ্রুব, অভ্রান্ত !
সুদূর দিগন্তে রহে চাহি' সেই অপরূপ মূর্তি প্রাতিভ চক্ষে !
কার অগুণ্ঠিত আভা দীপ্যমান—কোন্ অন্তর্জ্যোতি ধরে সে বক্ষে !
নৃসিংহাবতার-কাহিনী রচিল ভারতের এক মনীষী দ্রষ্টা :
আভাস তার কি পেয়েছিল দূর মিশরের এক স্বয়ম্ভু স্রষ্টা ?

অবিস্মরণীয়া এ-অপরিমিতা প্রজ্ঞা জেগেছিল কি তার মর্মে—
যার অনিরুদ্ধ প্রবাহ পুঞ্জিত হ'য়ে প্রমূর্তিল ভাস্করনর্মে ?

নমো নমো মহামহিমার্ণব শিল্পী, ধ্যানী !—যার প্রেরণানন্দ
এ-হেন বিগ্রহে করেছিল বন্দী তারে যে স্বভাবে মুক্ত অবন্ধ।
যে-অমরাদিত্য সঙ্গীতের মন্ত্র-জপে যুগে যুগে জাপক ধন্য,
বাগ্বাদিনী-বাক্‌ও মানে হার যার দিতে বাণীরূপ পরমধন্য,
সে-নিরবসানা অধরা রাগিণী গাহিলে পাষাণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী
কে তুমি—চরণে যার যুগে যুগে তীর্থযাত্রী আজো প্রণমে বন্দি' !

* * *

তারপর ? আর কি ? মিশরের নীলনদী—অবিস্মরণীয়া ! চাঁদের আলোয় শেষ রাতে তার অপরূপ লাবণ্য কি ভুলব কোনো দিন ?

গৈরিকবর্ণা লো শান্তস্রোতস্বিনী নীল নদী, নীল নদী, অদ্বিতীয়া !
মিশরের অন্তরসঙ্গীতসুরধুনী ! লাবণ্যবিলাসীর পরমপ্রিয়া !
শুনেছি আশৈশব কীর্তিকাহিনী তব মাধুরীর গৌরব হে সুন্দরি !
যুগযুগান্তে গেছে মুছিয়া চিহ্ন কত—তুমি আজো অমরণী রূপসী, মরি,
বহিছ অমৃতধারে আজো ধরি' বুকে তব মিশরের কত স্মৃতি স্বপ্নময়ি !
আসীন তোমার তটে কবি এক করে অভিনন্দন তব দান-মহিমা অয়ি !

পুণ্যভূ ভারতের গঙ্গা যেমন প্রাণদেবী, তুমি মিশরের প্রাণের সুধা,
আশ্রয় দিলে কত দিগ্বিজয়ীরে কত স্বপনীর মিটালে মা, হৃদয়ক্ষুধা !
সনাতন মিশরের মর্মমুকুরে তব ফলিল বর্ণ কত রূপে ও ধ্যানে !
বালুকারাজ্যে তুমি কোথা হ'তে পেলে হেন অফুরপীযূষদিশা—
কেহ কি জানে ?
মিশরের কল্পনা রঞ্জিল আল্পনা যত—তার তুমি দেবী, চিরপ্রেরণা।
আশিস তোমার পেল পান্থ কত না, নিরানন্দ আনন্দের গূঢ় দ্যোতনা !

প্রণমি তোমারে ওগো মরমীর মরমিয়া ! নহ তুমি জলরাশি চেতনাহীনা :
বহ্নির তেজ গলি' করুণায় উচ্ছলি' উঠিল লহরে তব নির্মলিনা !

## উপসংহার

কায়রো থেকে ২৬শে আগস্ট সন্ধ্যাবেলা বিমান ধরলাম বম্বে-অভিমুখে। কিন্তু বিমান ধরবার আগে ফের—সে কী জ্বালা! বলি কী ব্যাপার!

যে-বিমানটিতে আমরা দুটি আসন পেয়েছিলাম সেটি কায়রো থেকে বম্বে উড়ে যেতে পথিমধ্যে সাউদি আরব দেশে খানিকক্ষণের জন্যে থামে ভোর রাতে। এখন মুস্কিল এই যে, আমাদের প্রমাণ করাই চাই যে, আমরা ইহুদি নই। কারণ আরব দেশের ত্রিসীমানায়ও ইহুদিদের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না—এই হ'ল সাউদি আরবের রাজার ফতোয়া। অগত্যা আমাদের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল কায়রোর ভারতীয় রাজপুরুষদের। তাঁরা ছাড়পত্র দিলেন যে, আমরা খাঁটি ভারতীয়, হিন্দু—তবে আমরা বিমানে উঠতে পেলাম।

একবার ভাবুন সহৃদয় পাঠক, কী ব্যাপার! সাউদি আরব দেশে আমরা নামছি না—বিমান অবতরণ করছে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে। কিন্তু ঐ এক ঘণ্টার জন্যেও কোনো যাত্রীর সাউদি আরব দেশে প্রবেশ নিষেধ, যদি তিনি জাতে হন ইহুদি। আরব দেশের সঙ্গে ইসরেলের যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই এই ধরনের বিজাতীয় জাতীয় আক্রোশ জমে উঠেছে মুসলমানের মনে। বোধ করি মুসলমানদেরও ইহুদিরা ঠিক এই ভাবেই অর্ধচন্দ্র দেন প্যালেস্টাইনে। কবি লরেন্স বিনিয়ন বৃথাই উচ্ছ্বাস করেছিলেন :

Who is not my brother and who is not my sister ?
O wonder of human eyes !
Have I passed you by nor perceived how luminous in you
All infinity lies ?

নয় কে আমার ভাই এ-জগতে—নয় কে আমার বোন ?
হে মহামহিম আত্মীয় আঁখিতারা !
পাশ দিয়ে ভুলে গেছি কি গো চ'লে ?—তাই কি দেখি নি সেথা
অনন্ত ভায় উজ্জ্বল—আপনহারা ?

যাই হোক, বিমানে চড়বার কয়েক ঘণ্টা পরেই হু-শ ক'রে বিমান নামল সাউদি আরবের খ্যাতনামা ডেহরান শহরে। সেখানে তখন সময় ব্রাহ্মমুহূর্ত যাকে বলে—মানে ভোর চারটে।

কিন্তু বিমান থেকে বেরুতে-না-বেরুতে—কী কাণ্ড! উঃ—এত গরম যে কোনো দেশে হ'তে পারে—তা আবার দিনে-দুপুরে নয়, ভোর রাতে—ভাবুন একবার! না জানি দুপুরে এখানে প্রতি বালুকণা কী আগুন নিয়ে খেলা করে! শুনলাম একশো চুয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপ ওঠে! ভোর রাতে তখনও বুঝি একশো কুড়ি। ভাবতে পারেন কি?

শুনলাম এখানে অনেক আমেরিকান বণিক আসেন সাউদি আরব মরুর বুক থেকে পেট্রোল শুষে নিতে। সাউদি রাজা ইব্‌ন্ সাউদ এঁদের ঠাঁই দেন মোটা দক্ষিণার পরিবর্তে। কিন্তু বরফের দেশের মানুষ এ-আগুনের আখড়ায় দিনের পর দিন কাটায় কোন্ কাণ্ডারীর মন্ত্র জপ ক'রে? পড়লাম বিবরণীতে যে তাঁরা দিনে থাকেন এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে, সন্ধ্যায় যান এয়ারকণ্ডিশণ্ড চিত্র-নাট্যশালায়, চড়েন এয়ারকণ্ডিশণ্ড ট্রেনে, হয়ত খেলাধুলোও করেন এয়ারকণ্ডিশণ্ড চত্বরে। বুঝলাম, কিন্তু কখনো কি বাইরে বেরুতে হয় না? থাক্ এ-জল্পনা। নিশ্চয়ই ওঁরা পারেন ব'লেই থাকেন। কিন্তু এ-পারার তাগিদ কী? উত্তর দিয়েছেন ইংরাজ কবি সে কবে—তিনশো বৎসর আগে—বলছেন টাকা-দেবী—

She is the sovereign queen, of all delights :
For her the lawyer pleads, the soldier fights !

সব পুলকের রঙিন রাণী উনিই—ওঁরই তরে
বাগীশ বোনে যুক্তি রণেশ লড়াই ক'রে মরে।

কিন্তু না, ইতিমধ্যে প্রগতি হয়েছে আরো অনেকখানি: আরো অনেক অসাধ্য সাধন করে মানুষ এই রঙিন রাণীর জন্যে: সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙিয়ে বরফের দেশে গিয়ে তিমি-শিকারে ব্রতী হয়, ঘুমের দেশে গিয়ে ঢাক পিটোয়, রাতের দেশে হানা দিয়ে মাসের পর মাস আলো জ্বালিয়ে বাস করে সূর্যের মুখ না দেখে, আবার মরুভূমির রাজ্যে এসে বৎসরের পর বৎসর কাটায় এয়ার-কণ্ডিশণ্ড হোটেলে: আকাশে ওড়ে, পাতালে নামে, জলে ডোবে—এককথায় অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভাকে আবাহন ক'রে জীবন দিয়ে প্রমাণ করে:

দেখ দেখ হায়! টাকা যারা চায় কী অসাধ্য নিতি সাধে:
হাতে ক'রে প্রাণ ওড়ায় নিশান, পড়ে আপনারি ফাঁদে।

কোথা আমেরিকা সুখ-দীপালিকা—কোথা ধূধূধূধূ বালি !
আগুনের ঘর শীতল বাসর !—দেয় তারা করতালি :
"জয় জয় জয় ! ধনতন্ময় আমরা ভুবন ভ্রমি'
দিন নিই কিনে রূপচাঁদ চিনে—বণিক মহোদ্যমী !"

* * *

বম্বে পৌঁছলাম ২৭শে আগস্ট দুপুর বেলা। বিমানঘাটিতে বন্ধুবর সার চুনিলাল মেতা ও শ্রীমান্ যোগেন্দ্র রস্তোগি ফুলের মালা নিয়ে হাজির। মনে গুনগুনিয়ে উঠল :

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি :
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি !

ভ্রমণসূচী যথা পর্যায়েঃ

৮ই জানুয়ারি ১৯৫৩, নয়াদিল্লি থেকে উড়ে—হংকং, টোকিয়ো, হনোলুলু, সানফ্রান্সিস্কো, বার্কলী, হলিউড, সান্তা বার্বারা, বিগ্ সুর, কারমেল, লস এঞ্জেলেস, শিকাগো, নিউয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, লণ্ডন, গ্লস্টার, পারিস, গ্যটিংগেন, জুরিখ, ইন্টারলাকেন, লুংসার্ন, রোম, ভেনিস, কায়রো হ'য়ে বম্বে প্রত্যাবর্তন ২৭শে আগস্ট ১৯৫৩।

* * *



ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার

## ভ্রমণ-চুম্বক

শ্রীমান্ অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়কে—

বহুদিনের পরে হঠাৎ ফুর্সৎ আজ মিলল বুঝি ঃ
গুনগুনিয়ে ছড়ায় চিঠি লিখতে তোমায় সোজাসুজি।
দূর বিদেশে চরকিবাজির সাঙ্গ যে প্রায় হ'ল পালা ঃ
দেহের যখন থামে গতি—কলমকে দিই বরণমালা।
ঘোরা লেখার জোড় মিলিয়ে উধাও চলা সহজ না কি ?
পেশী যখন হয় চঞ্চল—মন ঘুম যায়—জানো তা কি ?
তাই দেহটি এলিয়ে সোফায় মন হ'ল আজ এনার্জেটিক ঃ
বলি—কী কী কাজ ও অকাজ ওড়ার পথে সাধল পথিক।

প্রথমে হংকং—সেখানে পৌঁছেছিলাম দিনের শেষে।
কী দেখেছি ?  একদিনে হায়, কী দেখা যায় অচিন দেশে ?
শুধু বলি ঃ  হংকং নন কান্তা শুধু নিরুপমা ঃ
সত্য সাজের প্রসাধনে ধনেশ্বরী, মনোরমা।
বণিকপ্রিয়া বিলাসিনী সবাইকে দেন ডাক ঃ "স্বাগতম্।"
চীন জাপান আর সাহেব মিলে বাড়ালো তার গর্ব-কদম!
উদার পথে কত প্রাসাদ অট্টালিকা নাট্যশালা!
চীন হরফে বিজ্ঞাপনও কণ্ঠে শ্রীলার দোলায় মালা।

তার পরে ভাই পথে জাপান পড়ল—সেথায় আম্বাসাডর
রাউফ-মহোদয়ের গৃহে ঠাঁই মিলল—জাগল শিহর!
ভারত যে আজ স্বাধীন—যেন তাঁর প্রসাদেই নবস্বাদে
করলাম ভোগ চেখে চেখে প্রতি পদে, দিনে রাতে।

কী অপরূপ বাগান ওদের! মন্দির ওদের!—সর্বোপরি :
জাপানীর সে-গৃহসজ্জা—তিলোত্তমা, মরি মরি!
খ্যাতনামা "আসাই"-হলে নৃত্যগীতের জমল আসর,
দলে দলে জাপানীরা করল জয়ধ্বনি—আদর।

পরে কোথায়? হনোলুলু—নাম শুনেছি বাল্যকালে :
জানত কে বা এমন নামের দেশেও রাজেন খুশখেয়ালে
ধনী মানুষ নানা দেশের ইন্দ্রপুরী বসিয়ে সেথায়!
সুখের ঘরেই রূপের বাসা—এও শুনেছি ছেলেবেলায়।
সেখানেও গান হ'ল এক সিন্ধুদেশের শেঠের ঘরে :
নৃত্যগীতের প্রশংসাও করল সবাই কলস্বরে।
বলল আরো থাকতে দুদিন—গাইতে আরো নানা সভায়,
কিন্তু সময় ছিল না, তাই দিলাম পাড়ি আমেরিকায়।
আমেরিকা! আমেরিকা! নাম শুনেছি কবে থেকে!
করলাম কী কাণ্ড সেথায়—লিখবই আজ বায়ুবেগে।

আজব দেশে যেতেই ছোঁয়াচ লাগল ওদের ঘুর্ণিপাকের।
ঘোরে ঘোরায় চুটিয়ে ওরা—ভাবে না হায় কেবল আখের।
তাই সেখানে গানের পরে করলাম গান, বক্তৃতা ও
আলোচনা অন্তহীনা—নাচল অফুর ইন্দিরা-ও।
ফ্রান্সিস্কো, লসেঞ্জেলেস, শিকাগো, নিউয়র্ক—আরো ভাই
কত কী-ই যে দেখলাম—চাই লিখতে তো সব—সময় যে নাই!
এই ফুর্সৎ আজ আছে—কাল উড়ব উধাও আরেক দিকে :
হোক, তবু আজ মনের সাধে যা পারি তা যাবই লিখে।
আমেরিকায় কতগুলি জল্‌সা আমরা জমিয়েছি—তা
আন্দাজ কি করতে পারো?—কথকতাও—জানো কি তা?
চল্লিশ পঞ্চাশটি গানের মজলিস হ'ল নাচের সাথে :
সকাল দুপুর বিকেল সাঁঝে—কখনো বা নিশুত রাতে!
কখনো রামকৃষ্ণপীঠে, কখনো বা প্রেক্ষাগৃহে,
কখনো ইউনিভার্সিটি, "সাল*"-য় কভু—জানো কি হে?

মান্ধাতার সে-আমল থেকে এমন শফর কেউ করে নি :
না বুঝেও ভাষা কি সুর স্বাদলো ওরা—খুঁৎ ধরে নি।
বলতে ওরা চায়—কিন্তু শুনতেও চায় কৌতূহলে :
হুজুগেও নিত্য মাতে আবালবৃদ্ধ দলে দলে।
এক দিকে বেশ হিসেবি, আর অন্যদিকে দিলদরিয়া,
নিজের পায়ে চায় দাঁড়াতে, দরকার হ'লে হয় মরিয়া :
কিন্তু ওরা হকচকিয়ে যায়—যেই কেউ ওদের কথা
দেয় শুনিয়ে—চায় না পেতে দুঃখ, কিম্বা দিতে ব্যথা।
হাততালি নয় শুধু—দিতে দক্ষিণাও এগিয়ে আসে :
কামায় ওরা যেমন—তেমনি উড়িয়ে দিতেও ভালোবাসে।
নাম হ'ল খুব বৈ কি—ওরা করল সে কী জয়ধ্বনি !
শুধু ভাবি—হৈ-চৈ-য়ে কি যায় না খোয়া পরশমণি ?

না না—দিগ্বিজয়ের পরে পেসিমিসম—এ কি ভালো ?
প্রাণ ভ'রে তাঁর নাম করেছি—গান ক'রে তাঁর ছড়িয়ে আলো।
সৎকথারি বসিয়েছি পাঠ, বলেছি সন্তদের কথা—
আনন্দ আর ভক্তিরই তো বইয়ে জোয়ার—দিই নি ব্যথা
কারোর প্রাণেই, চাই নি কিছুই—সহজ সখ্য মৈত্রী বিনা :
খুলি নি তো জাঁকজমকের প্রদর্শনী—বুঝলে কি না ?
গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী, মানী, ভাবুক, রসিক নানাবিধ
সবাই কিছু সুখ পেলো তো, বললো তো : "বাঃ! জানিনি তো
ভারতীয় নৃত্যগীতের ভাব রস রূপ এমন রঙিন !
তাই তোমাদের দিই সাধুবাদ ও তরুণী এবং প্রবীণ !"
( বৃদ্ধ ওরা বলেনি কো সাতান্নোয়ও আমায় কভু :
হয়ত ভেবে থাকবে মনে—বলেনি মুখ ফুটে তবু।
এই দেশেতেই শুনি : "ও কী ! পাকল যে চুল, পড়ল যে টাক !"
লাজুককে কি এমন ক'রে লজ্জা দিতে হয়—দিয়ে হাঁক ? )
যাক্, কাহিনী করি সুরু ফের ধ'রে খেই সরল মনে :
কয়েকটি তো শুনবে সুজন—আর যদি কেউ নাও শোনে।

কার্নেগির তো নাম শুনেছ : অঢেল দাতা কোটি কোটি
বিলিয়ে ডলার ধন্য হ'ল—ভাবতে অবাক্! পিছু হটি!
সেই সমিতির "শান্তিগৃহে"-ও নৃত্যগীতের জমিয়ে আসর
পেয়েছি নিউয়র্কে যে আমরা ওদের কী সমাদর!—
দেখতে যদি স্বচক্ষে ভাই, বলতে—আহ্লাদে আটখানা :
"ঢাল তরোয়াল বিনা এ-কোন্ সর্দার এলো দিতে হানা?
একটি শুধু হার্মোনিয়ম—শিষ্যা-সাথী একটি বিনা
তুটিও নয়—তবু এদের মন যেন গায় : 'ভয় জানি না'।

তারপর এলাম উড়ে দোঁহে : ইন্দিরা আর দিলীপকুমার
আমেরিকা থেকে সোজা লণ্ডনে—আনন্দে অপার।
সেখানে এক মস্ত সভায় ফের বসালাম নৃত্যগীতের
আমরা আসর—কবি কাজী লণ্ডনে আজ : তাঁর খরচের
কিছু টাকা টিকিট ক'রে তুলে দিতে। আশা করি
যাবেন এবার সেরে—আহা করেন যেন তাই শ্রীহরি!

তারপর? সে বলব বা কী! সাক্ষাৎ লর্ড রাসেল-গৃহে
গান গাইলাম ইন্দিরার সুনৃত্য সাথে—জানো কি হে?
সেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল—যিনি আজ পেয়েছেন 'লর্ড' এ-খেতাব—
কী সাধুবাদ দিলেন যে—তাঁর মুখের চোখের সে যে কী ভাব!
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে—না থাক্, বেশি বলা নয় কো ভালো :
আলো যদি ঝরিয়ে থাকি—সে তো তাঁরি কৃপার আলো।

সেখান থেকে পারিস হ'য়ে গ্যটিংগেনের নিমন্ত্রণে
জর্মনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম খুশি মনে।
সেখানে কী সমারোহ—বলতে তো চাই পঞ্চমুখে :
কেবল বাসি ভয়—যদি বা দুর্মুখেরা ওঠেন রুখে!
যদি বলেন—কিন্তু ডরাই কেন? যাব সত্য ব'লে,
যে যা বলে বলুক—আমরা যাই যেন সব নিন্দা দ'লে
লক্ষ্যপথে। শঙ্কা কেন—মিথ্যা যখন নয় কাহিনী?
দুর্জনে 'বাজ' বলে যাকে—সুজন দেখে 'সৌদামিনী'।

জর্মনিতে সুধী, মানী, বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিক
অধ্যাপকের কেন্দ্রে কী যে আদর পেল বাউল পথিক!
ইন্দিরা সে নাচল কী নাচ—পরে ওদের জয়ধ্বনি!
থামবে না তো—হাঁকবে কেবল : "ছড়াও আরো মুক্তামণি!"
তুমুল কাণ্ড! কী করা যায়? বললাম : "হবে একটি নাচ আর।"
অমনি এল নীরবতা সূচীভেদ্য—পরমবিথার!
শিবভজনের সাথে নেচে ইন্দিরা চমক জাগালো,
তার পরে অধ্যাপক সুজন বলল কথা ভালো ভালো।
বলল : "এঁদের নৃত্যগীতে উঠল জেগে আচম্বিতে
কৃষ্ণা-মীরা-শিব-শঙ্কর-ধ্যান আমাদের গহন চিতে।"
বললেন এক পণ্ডিত : "আজ বাঁধলে সেতু তোমরা গুণী,
জর্মনি-ভারতের মাঝে ইন্দ্রজালের মন্ত্র বুনি'।"
কত সাহিত্যিক, প্রফেসর, কত ছাত্র ছাত্রী এলো :
সবাই বলে সোচ্ছ্বাসে : কে নৃত্যগীতে কী ধন পেল!

তার পর দিন করল ওরা নিমন্ত্রণ এক মঞ্জু হল্-এ
গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের পাঠচক্রে। দলে দলে
কত যে সন্ধানী এলো শুনতে ভাষণ মহাধ্যানীর
যাঁর ধ্যানে এ-যুগে এলো নব আশা আলোকবাণীর।
ইন্দিরাকে বলতে কিছু ধরলে ওরা দলে দলে,
বলল উঠে সে : "তোমাদের একটি কথা যাবই ব'লে :
অরবিন্দ দেবকে যদি 'মহাপুরুষ' দাও উপাধি,
তাঁরি উদারতার মহাবাণীর সুরে কণ্ঠ সাধি'
চলতে চেয়ো জীবনপথে—তাঁকে যদি মান দিতে চাও
বোলো না—তাঁর মতন মহান্ হয়নি কো কেউ কভু কোথাও।
গুরুর নামে দলাদলি কোরো নাকো গায়ের জোরে :
যে যেখানেই মহাগুরু—প্রণাম কোরো ভক্তিভরে।"
তারপরে বললাম আমিও ভালো ভালো কথা কত—
নয় লেখা আর সম্ভব আজ—করছে কলম ইতস্ততঃ।

বলছে : থামার পালা এলে থামাই শোভন। মিষ্টি কথন
সব চেয়ে ভাই 'ঢাকের বাদ্যি'—জানোই জানো তোমরা সুজন।

তার পর ওরা চড়িয়ে দিল ট্রেনে—সটাং এলাম হেথায়
সুইজর্লণ্ড-রাজধানীতে—রূপের রাণীর মিলন মেলায়।
শৈলমালা, ফুল, বনানী, হ্রদ হর্ম্যরাজির শোভা,
সবার উপর—শান্তিময়ী বাসন্তিকা মনোলোভা।
ছমাস ধ'রে ভেসে ভেসে কর্ম-ঢেউয়ের ঘূর্ণিপাকে
একটু জিরুই—স্বপ্নতটে যখন খেয়া এসে লাগে।
তাই তো ছড়ার নাচের পালা এলো কাজের পালার পরে :
ছন্দে মিলে গাঁথলে মালা ছোট্ট মালাও মনে ধরে।
তোমরা যখন পাবে লিপি—আমরা বোধ হয় থাকব রোমে :
ততদিনে হয়ত আরো বলার কথা উঠবে জ'মে।
আজ নীলিমার নীলসাগরে আলোর তরী মেঘের পালে
চলে উজান বেয়ে সে-কোন্ অচিন তীরে অলস তালে।
চারিদিকে রক্ত জবা, নীল ভায়োলেট, সাদা লিলি,
সোনার গোপাল বলে যেন এ ওকে : "ভাই, কোথায় ছিলি ?"
অদূর হ্রদে স্নান করে যে কত শত স্নানার্থী আর
স্নানার্থিনী কলোচ্ছলা গায় হাসে—দেয় কেউ বা সাঁতার !
কেউ বা তটে 'কোকা কোলা' পান করে, কেউ শবাসনে
চক্ষু মুদে রোদ পোহায়—আর কেউ ললনা পশম বোনে।
রাতে চাঁদের তারার সভা বসায় উদার অমল গগন,
ভোর না হ'তে নতুন সকাল—অতৃপ্ত যে আজো নয়ন !
বিশ্বজগৎ নয় তো কুরূপ, মানুষ শুধু পায় নি চাবি
পরকে আপন করতে আজো কেন যে—তাই কেবল ভাবি !
আলেয়া তো নন ভগবান্—দেন তো আজো চাইলে তিনি :
তবে কেন হিংসাদ্বেষের করে মানুষ বিকিকিনি ?
অঙ্কুশে কার হাজার হাজার যাত্রী উধাও লক্ষ্য বিনা ?
হৃদয় যখন জানে—কেন মন কাঁদে : "হায়, পথ চিনি না !"

প্রশ্ন এমন করব কত ? ঢেউ গুনে কে পার পেয়েছে ?
সেই জেনেছে—অচেনাকেই যে জীবনে সার জেনেছে।
প্রশ্ন ছেড়ে তাই অকূলে গা-ভাসিয়ে যাক-না চলা :
মন তো বৃথাই তর্ক করে—হায়, যুক্তির ছলাকলা !
ভালোবাসা নিও দোঁহে, চিঠি লিখো ফিরতি ডাকে :
তূর্ণ যদি লেখো—পাব রোমে, দেশে ফেরার আগে।

ইতি। জুরিখ, সুইজর্লণ্ড। ৩. ৭. ৫৩

পুনশ্চ :—

সাত আট মাস গেছে কেটে। ঘরের ছেলে ফিরে ঘরে
আজ পেল ফের ফুরসৎ—তাই আবার কবি কলম ধরে
পুনশ্চ পাঠ নিতে সেরে : যেটুক ছিল সেদিন বাকি
আজ করবই পূরণ—এ-পণ—নৈলে দুয়ো দেবে না কি ?
কর্ম রচে কর্মেরি জাল—ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি :
"শেষ করো গান সম-এ"—বলেন বীণাপাণি মা-জননী।

অথ :—

জুরিখেও জমল আসর এক শিল্পীর উপরোধে :
কত গুণীর মিলল মেলা বিশ্বজনীন রসবোধে !
পটুয়া তিনি—গৃহস্বামী—কত জাতিই জুটল সেথায় !
কত ভাষার ভাষী এল ভিড় ক'রে যে ভাই, সে-সভায় :
ফরাসী, চেক, জর্মন, জু, ইতালিয়ান, আমেরিকান—
ছোট্ট দেশে মস্ত সভা—লীলাময়ের এম্নি বিধান !
নাচ হ'ল, গান হ'ল, কিছু বর্ণনাও হ'ল সেথায় :
ভারতীয় ভাব বোঝাতে হ'ল—ওরা বুঝতে যে চায়।

তারপরে হু-শ্ ক'রে উড়ে নামলাম এক স্মরণীয়
সন্ধ্যাবেলায় রোমে—আলোর সে কী বাসর কমনীয় !
আকাশ থেকে নিচের শহর করে মরি, ঝিকিমিকি !
বহুরঙা এমনতর রাজধানী আর দেখেছি কি ?
স্ফুরৎপ্রভার দীপালিকা—হয় না মনে—মর্ত্যধাম এ—
যখন হু হু ক'রে বিমান আকাশ থেকে ধরায় নামে !

ইতালির যে-আম্বাসাডর—পরিচিত ছিলেন আগে
উনিশ শো বিশ সালে—যখন মিলত প্রতি পথের বাঁকে
নিতুই নব পুলক রঙিন, নয়ন নবীন করত যেদিন
বিশ্ববরণ রসিয়ে আপন দেখার রসে শ্রান্তিবিহীন।
( আজ নেই সে-আবীর-আবেশ—অনেক কিছুই তাই তো ধূসর
আজকে দেখি—মানে, মরু আজ মনে হয় ধূ ধূ, উষর। )
এমন সখা করলেন আদর রাজভবনের রূপসভাতে
দিলাম ভাষণ সেখানেও, গাইলাম গান নাচের সাথে।
বহুদেশের রাজকীয় দূত ও দূতী ফুল্ল মনে
এলেন সেথায় বি-আর-সেনের 'অফীশিয়াল রিসেপশনে'।
বললেন সেই সভায় তিনি : "দিলীপকুমার ছিলেন ভোগী,
পরে ক'রে গানকে পেশা তারি নেশায় হলেন যোগী।
এ শুধু সম্ভব আমাদের ভারতদেশে—আজো যেথায়
ধর্মই হয় কর্মনাশা—এ-রহস্য বোঝাই যে দায়!"

তারপর কী করলাম এই মহোৎসবের শাঁক-বাজানো
হ'লে সারা—শুনতে কি চাও? গেলাম সোজা মন-মাতানো
অপরূপার আলোকপুরে—ভেনিস-নাম্নী বিলাসিনী :
অলি গলি সবই যেথায় চলোর্মিলা, বিনোদিনী!
অশ্ব মোটর নেই যেখানে—আলাদিনের অচিন পুরী!
যেথাই তাকাও—রাসেশ্বরী ঝরান অঝোর রংমাধুরী!
চাঁদনি রাতে হয় মনে যে, স্বপ্নতটে এলাম ভেসে
জাগরণের-সব-বিস্বাদ-ভুলিয়ে-দেওয়া নিরুদ্দেশে!

তারপরে ফের আকাশপাখির পাখায় উড়ে পরম সুখে
উধাও হলাম সুরধুনী-'নীল'-মেখলা কায়রো মুখে।
পিরামিড আর নরসিংহ আসীন যেথা আজো অচল
অটল ধ্যানের প্রতীকসম—মৃত্যুঞ্জয় কীর্তিযুগল।
বর্ণনা তার সম্ভব নয়—চেষ্টা তবু চাই তো করা,
তাই লিখেছি বইয়ের পাতায় কাহিনী তার মনোহরা।

সবশেষে, আরব শ্রোতাদের মাঝে নৃত্যগীতের বাসর
বসালাম এক রঙ্গপীঠে—ইন্দিরার আর আমার আসর।
মুসলমানের সভায় ভজন, 'বন্দে মাতরম্' গেয়েছি
ইন্দিরার স্বনৃত্য সাথে—না, বলি নি : "ভয় পেয়েছি।"
সবচেয়ে ভাই মানলাম অবাক্ দেখে ওদের উচ্ছলতা :
করল ওরা কী যে উছাস, ভুলে—এ পৌত্তলিকতা !!
কবে যে সে বলেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ দৃঢ়স্বরে :
"বিশ্বে আদর পাবেই এ-গান—আজ হোক্, কি দুদিন পরে।
বর্ণ জাতি আচার ভেদের বাঁধ ভেসে যায় গানের স্রোতে :
অন্যথা এর নেই নেই—হয় সত্যেরি জয় শুভব্রতে।"
করেছিলাম তর্ক বটে সেদিনে তাঁর সাথে আমি :
আজ মানি হার—বিশ্বজনের পেয়ে আনন্দের সেলামি।
নৈলে যারা প্রতিমাকে করলে পূজা মারতে আসে—
তারাও কেন আর্দ্র হ'য়ে বলল ভজন ভালোবাসে ?
হিন্দু মুসলমান কে বলে তফাৎ ?—শুধু মোল্লা-পুরুত।
ভালোবাসার আলোয় দেখি—ভুবনে নেই কেউ অচ্ছুত।
সবাই যে এক মায়ের ছেলে—নয় কে আপন ধরাতলে ?
পর ভাবলেই পর—বলে যেই হৃদয়—"এসো"—হৃদয় গলে।
হয়েছে কি, মন যা বলে—মনগড়া সে সব ধারণা :
জাগলে প্রাণে জোয়ার গানে—সব মনে হয় আরাধনা।
সব দেশে আর সব যুগে আর সব রসিকের অন্তরে যে
ভক্তি পূজার রাঙলে লগন অকূল বাঁশি ওঠেই বেজে।
সেই মুরলী যে শুনেছে একবার—সে আর কি পারে
থাকতে সাড়া না দিয়ে সেই বাঁশির ডাকে—অভিসারে ?
নামের তো নেই সংখ্যা তাঁহার—মিথ্যে করি মারামারি
আমরা মানুষ আত্মঘাতী—জিৎ চেয়ে তাই নিত্য হারি।
চোখ মেলি না, তাই দেখি না—আসেন তিনি ছদ্মবেশে
যে-রূপে চায় যে—তার কাছেই ধরেন সে-রূপ বরদ হেসে।
দেশে দেশে তাই আমাদের হরিহরের ভজন শুনে
দিল সাড়া বিশ্ববাসী—ফুল ফুটল অফাল্গুনে।

নয় নয় এ কথার কথা, গর্বও নয়—শপথ করি :
সব ভুলে যে-ই গায় তাঁর গান—তাকেই দয়া করেন হরি।
সেই দয়ারি মহাপ্রসাদ বিলিয়ে এলাম দেশে দেশে
নৃত্যগীতে আমরা দোঁহে—ভক্তি-প্রেমের পরম রেশে।
আমরা বলি—আমরা করি, এরি তো নাম ভ্রান্তি মায়া :
তিনি করান ব'লেই করি—নৈলে সবই ছায়ার ছায়া।
কায়রোতেও এই সত্যই উঠল ফুটে আচার জাতির
ভাসিয়ে জাঙাল—ভুলিয়ে দিয়ে মিথ্যে লড়াই মাতামাতির।

বম্বে মুখে আবার যখন ফিরলাম উড়ে—মনে মনে
এই মন্ত্রই করেছি জপ : "করলেও ভুল—শ্রীচরণে
ঠাঁই দিও নাথ, পথের চলায় পড়ি যদি বারে বারে,
হাতটি ধ'রে উঠিয়ে দিও আলোর কোল এ-অন্ধকারে।"

ইতি। মাদ্রাজ। ১২ই মার্চ, ১৯৫৪

# পুনশ্চ

নদী যখন উধাও গতির নেশায় তখন জলকণাদের কী অভিজ্ঞতা? না, তারা দেখা পায় নিত্যনূতন তট গ্রাম ক্ষেত বনানী। কাজেই তাদের যদি সচেতন কল্পনা করি তবে শুনব প্রতি কণাটিই বলবে কলকল্লোলে: "আমার দেখাশোনা এখনো শেষ হয়নি তো—যতই চলি ততই দেখি—আরো, আরো, আরো।"

পুনশ্চর সাফাই এইটুকুই। আমাদের ১৯৫৩ সালের বিশ্বভ্রমণে আমরা যা যা দেখেছিলাম, জেনেছিলাম, ভেবেছিলাম তার একটু জের টানলে তবেই আমাদের দেশে দেশে উড়ে চলার ইতিপর্ব আসবে, ভ্রমণ থামবে। এ-জের টানতে চাই আরো একটি কারণে: বলি। "দেশে দেশে চলি উড়ে" যখন লিখেছিলাম তখন মনে প্রশ্ন জেগেছিল: বন্ধুবান্ধবদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ভাষণাদির মাধ্যমে আমাদের যে-নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার এজাহার ফুটিয়ে তুলতে চাইছি বাংলার পাঠকপাঠিকা কি সে-এজাহারকে ঠিক চোখে দেখতে, ঠিক কানে শুনতে পারবেন? এক বৎসরেই "দেশে দেশে চলি উড়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হওয়া গেছে। স্থতরাং মনে হ'ল যে, গত দু'বৎসরে নানান্ বিদেশী মনের আরো যে-দু'চারটে ঢেউ আমাদের ভারতীয় মনের তটে এসে লেগেছে তাদের কলকাকলির একটু খবর দেওয়া মন্দ নয়—পরিশিষ্টের ছন্দে নয়, পুনশ্চর ছন্দেই বলব। বিদেশী বিদেশিনীর কাছ থেকে আমি জীবনে লাভ করেছি বিস্তর। আমার প্রথম উপন্যাস "মনের পরশ"-এ এ-লাভের বিবৃতি দেওয়া স্থরু হয় ১৯২৬ সালে, সম্ভবত "দেশে দেশে চলি উড়ে"-তেই এ-প্রচেষ্টার শান্তিপর্ব। কাজেই যেহেতু এ-জাতের রচনায় এই-ই আমার শেষ প্রয়াস, সেহেতু আর একটু বললামই বা—"অধিকন্তু ন দোষায়" ব'লে একটি আপ্তবাক্যও তো রয়েছে। তবে এ-পুনশ্চ অধ্যায়টি সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত করতেই হবে—শুধু স্থানাভাবের জন্যেই নয়, "সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্" ব'লে একটি প্রতিস্পর্ধী উপদেশের জন্যেও বটে। কিন্তু কী ভাবে বলব যা বলতে চাইছি ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল—পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে বেপরোয়া ঢঙে মন্তব্যাদি প্রকাশ ক'রে গেলে হয়ত পাঠকের পক্ষে প্রত্যেক ক্ষেত্রে খেই ধরা একটু সহজ হবে।

১৩৩ পৃষ্ঠার পরে। এ-পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি মহামনস্বী অলডাস হাক্সলির সঙ্গে আমার পত্রালাপের কথা। এখানে আমাকে-লেখা তাঁর কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত করলে নিশ্চয়ই পাঠকমাত্রেই খুশি হবেন।

পনরো ষোলো বৎসর আগে পর পর তাঁর অনেকগুলি বই প'ড়ে তাঁকে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখি পণ্ডিচেরি থেকে। সে-পত্রে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, যে-ব্যঙ্গসংশয়ী অলডাস হাক্সলি বিশ বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে তাঁর Jesting Pilate বইটিতে ভারতীয় যোগীদের নাভিবদ্ধ দৃষ্টি (navel-gazer) ব'লে ঠাট্টা করেছিলেন, যে-অলডাস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, হেলম্ হোল্ৎস, ফ্যারাডে প্রমুখ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের জীবনকেই একসময়ে মহত্তম মানবজীবনের নমুনা ব'লে মনে করতেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির হঠাৎ এমন আমূল পরিবর্তন হ'ল কী ক'রে— যোগীদের জীবনযাত্রা ও বাণীকেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি ব'লে বিশ্বাস করতে পারলেন কেমন ক'রে? সেই সঙ্গে আমি তাঁকে লরেন্স সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি চিঠির কপি পাঠিয়ে দিই। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে-লেখা তাঁর এই মূল্যবান্ পত্রাবলিতে লরেন্স সম্বন্ধে যা যা লিখেছিলেন সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তবে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যের মর্মবাণীটিই ছিল এই যে, লরেন্সের মধ্যে যোগীর সহজ শিবনেত্র খানিকটা উন্মীলিত হওয়া সত্ত্বেও য়ুরোপীয় দেহে জন্মলাভ করার দরুণই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন। গুরুদেব লিখেছিলেন: "Lawrence had the psychic push inside towards the Unseen and Beyond at the same time as a push towards the vital life which came in its way. He was trying to find his way between the two and mixing them up together till, at the end, he got his mental liberation from the tangle, though not any clear knowledge of the Way. For that, I suppose, he will have to be born nearer the East or, in any case, in surroundings which will enable him to get at the Light."

শ্রীঅরবিন্দ আরো লিখেছিলেন যে, লরেন্স মানুষের যে-নব দ্বিজন্মের পথনির্দেশ খুঁজেছিলেন সে-নির্দেশ তিনি পান নি এই বিষম ভ্রমে পড়েছিলেন ব'লে যে, প্রাণশক্তির রাজ্যই হ'ল অধ্যাত্মের খাসমহল, কিন্তু প্রাণলোক তো আত্মার সতীর্থ নয়—ওর আত্মপ্রকাশের একটি পথ মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "The passage you have quoted certainly shows that Lawrence had an

idea of the new spiritual birth." কিন্তু হ'লে হবে কি, "Lawrence was held back...because he was seeking for the new birth in the subconscient vital and, taking that for the Invisible Within, he mistook Life for Spirit, whereas Life can only be an expression of the Spirit."

এর উত্তরে অলডাস আমাকে লেখেন :

California U.S.A. 22.8.40

Dear Mr. Roy,

Your letter has reached me here after much delay···Now let me reply to your questions. I have been interested in mysticism ever since I was an undergraduate. For some time this interest was predominantly negative : that is to say, I read a good deal of Western and Eastern mystical writings, always with intense interest, but always with a wish to 'debunk' them. Later, the interest became positive. I have never had a guru, though of course I have been helped by several people, Hindu and European. The mystical writings I find most profitable are those of Eckhart and his fourteenth century successors, and of the French mystical school of the seventeenth century. I have also found a great deal in Buddhist literature. When and if the world is ever at peace again, I should like to return to India and see it with other eyes than those with which I saw it when I was there last, fifteen years ago.

Sri Aurobindo's remarks on Lawrence interested me very much. That mysticism of life, of which, like Whitman, like Blake and so many others, Lawrence was an exponent of genius, seems to me now the most subtle and beautiful of all forms of idolatry. It is easy enough to see the idolatrous nature of such monstrous aberrations as nation-worship, leader-worship, socialism-worship. Not so with life-worship. It seems good, beautiful, divinely inspired ; and yet it is just as much an idolatry as the others and perhaps, in the long run, nearly as pernicious—though it may be that the passage from the worship of life to that of spirit may be easier than the passage from, say, nation-worship to spirit. I don't know.

Aldous Huxley

তাঁর সাড়াতে উৎসাহিত হ'য়ে আমি তাঁকে নানা চিঠিতে নানা প্রশ্ন করা স্বরু করি এবং অনেক প্রশ্নেরই উত্তর পাই তাঁর কাছ থেকে। সে-সব প্রশ্নোত্তরের বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভবও নয়, তার প্রয়োজনও দেখি না। তবে তাঁর একটি পত্রের উদ্ধৃতি না দিলেই নয়। পত্রটি দীর্ঘ ব'লে বাংলা অনুবাদ দিলাম।

কালিফর্নিয়া

৮ই জুলাই, ১৯৪২

প্রিয় দিলীপকুমার রায়,

শ্রীঅরবিন্দের বইগুলি পাঠাবার জন্যে আমার অনেক ধন্যবাদ জানবেন। আশা করি বইগুলি আমি শীঘ্রই প'ড়ে ফেলতে পারব। কিছুদিন যাবৎ আমি পাশ্চাত্য মিস্‌টিসিজ্‌ম্ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি, এ-সম্বন্ধে রকমারি মূল পুঁথিপত্র তথা বিশেষজ্ঞ-দের-লেখা ইতিহাস সমালোচনা প্রভৃতি পড়তে হচ্ছে।...

"Grey Eminence" ব'লে আমার একটি বই আমার প্রকাশকদের বলেছি আপনাকে পাঠাতে। এ-বইটিতে আছে একটি অদ্ভুত লোকের ইতিহাস ও আলোচনা। তিনি ছিলেন প্রথমে রিচেল্যুর সহযোগী, পরে হন তাঁর পররাষ্ট্রসচিব। ধর্মে মিস্‌টিক হওয়া সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে তিনি হ'য়ে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রনীতিক ও শক্তিমন্ত্রী (power-politician) এবং সবশেষে, য়ুরোপীয় ত্রিংশবৎসরব্যাপী যুদ্ধকে দীর্ঘবিলম্বিত করবার প্রধান পাণ্ডা। তাঁকে বলতেই হয় ইতিহাসের একটি অত্যদ্ভুত মানুষ—যিনি ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্যাগুলিকে প্রবলভাবে মূর্ত ক'রে ধরেন।

এখন রাজনীতি প্রসঙ্গে আসা যাক্। ক'মাস আগে মিস্টার মূরের সঙ্গে আমার এখানে দেখা হয়েছিল এবং ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়। ... এতদূর থেকে ভারতীয় রাজনীতির সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। ক্রিপ্‌স্ সাহেবের প্রস্তাব সম্বন্ধেও কোনো রায় দেওয়া সহজ নয়—আরো এই জন্যে যে, বর্তমান জগতে সঙ্গত ও শুভবুদ্ধিপ্রসূত রাজনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার সংশয় ক্রমেই গভীর হ'য়ে উঠছে। কারণ আজকের জগতে চল্‌তি জীবনদর্শন ভ্রান্ত তো বটেই, যেহেতু বেশির ভাগ লোকের ধর্মসাধনার রীতি হয় নাস্তি না হয় বিপথগামী, এবং সেই সব মুষ্টিমেয় পরমভাগবতের সংখ্যা সাংঘাতিক রকম অল্প, যাঁদের বাদ দিলে জগৎ সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক অন্ধকারে ডুববেই ডুববে। তাই

আমার প্রধান চিন্তা রাজনীতি নয়, আমার মাথাব্যথা সেই সব বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ নিয়ে যাদের উপরেই সব সার্থক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা দাঁড়িয়ে। রাজনীতিতে আমি রক্ষণশীল (Conservative)—এই অর্থে যে, আমি বিশ্বাস করি যে, যদি কেউ বর্তমান পরিবেষ্টনীর শুভ চিহ্নগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, কি যৌক্তিক আদর্শবাদের পথে ফলিয়ে তুলতে চান, তা'হলে তাঁকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা সিদ্ধির পরিপন্থী নয়। এর মানেই হ'ল আপোষ, ধীরছন্দ (gradualism) ও অহিংসাকে বরণ করা, তথা আত্মঘাতী বিপ্লব ও যুদ্ধবিগ্রহকে বাতিল করা। আমাদের বর্তমান রাজনীতির মুস্কিল হয়েছে এই জন্যে যে, আজকাল জগতে রক্ষণশীল আর নেই বললেই চলে—আজ কেবল জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী—দক্ষিণমার্গী বা বামমার্গী। এঁরা সবাই আপোষবিরোধী এবং স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। এঁদের উদ্দেশ্য অবশ্য কখনোই সিদ্ধ হ'তে পারে না, কেননা যে-সব উপায় এঁরা অবলম্বন করতে চান তার ফলে ছাড়া পাবে এমনতর ধ্বংসশক্তি যে আমরা রাতারাতি পৌঁছব অরাজকতায় যার অন্তিম পরিণতি অত্যাচার-উৎপীড়নে। চরমপন্থা—তা সে যে-কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন—নিজেই নিজের ব্যর্থতার পরম প্রস্তুতি (Radicalism—of whatever kind—is the absolute guarantee of its own insuccess) এই সব ভেবে আমার মনে হয় যে, ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব গ্রহণ করলেই যেন ভালো হ'ত, কারণ এই প্রস্তাবের ভিত্তি হ'ল এমন ধরনের রক্ষণশীল আপোষ-পন্থা বা সমন্বয় যা চিরদিন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বৃটিশ রাজনীতির চরিত্রলক্ষণ হ'য়ে এসেছে এবং এই পন্থাই ভবিষ্যৎ সাফল্য তথা গঠনমূলক প্রচেষ্টার পথ পরিষ্কার ক'রে চলতে পারে। "শেষ পর্যন্ত যাবই যাব যা হয় হবে", অথবা "আপোষ করব না কিছুতেই" এই জাতীয় মনোভাব সর্বদাই বিপজ্জনক ও প্রায়ই সর্বনাশা। "Agree with thine adversary while thou art in the way with him," is the eminently sound advice of the Gospels ; and the same sense of the appalling dangers inherent in going too far was always present to the Greek mind which saw *Hubris* (insolence or excess) under the continual menace of avenging fate.

জেরাল্‌ড্‌ হার্ড এখানেই আছেন আজকাল। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য গভীর বৈ কি। তিনি পাশ্চাত্য মিস্‌টিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক চর্চা করেছেন, প্রাচ্য যোগেরো তিনি কিছু খবর রাখেন। দক্ষিণ কালিফর্নিয়া হ'ল প্রেততাত্ত্বিক (psychists), নেপথ্যকোবিদ (occultists), মন্দমতি বিধর্মী হিন্দুযোগী

এবং বেকুব বুজরুকিবাজ হট্টতন্ত্রীর রাজ্য। অবশ্য এখানে কয়েকটি খাঁটি প্রবুদ্ধ ও ধার্মিক লোকও আছেন, যেমন বেদান্ত মিশনের সন্ন্যাসীরা তথা কতিপয় য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাঁরা খাঁটি মিস্‌টিমিস্‌ম্ সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন ও জীবনে তার সাধনা করেন। ···

শ্রীঅরবিন্দকে আমার শ্রদ্ধা দেবেন এবং এই দারুণ দুর্দিনে আপনি ও আপনার বন্ধুবর্গ আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। ইতি।

অলডাস হাক্সলি।

এর পরে আমি অলডাস হাক্সলিকে আমার Among the Great তথা শ্রীঅরবিন্দের Life Divine পাঠিয়ে ঈষৎ আক্ষেপ প্রকাশ করি যে শ্রীঅরবিন্দের মতন প্রতিভার অবতারকে পাশ কাটিয়ে সম্প্রতি এমন অনেককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে যাঁদের লেখার সাহিত্যিক মূল্য অতি সামান্য। এর উত্তরে অলডাস লেখেন :

হোটেল রেজিস, নিউয়র্ক
১৬ই জুন, ১৯৪৮

প্রিয় দিলীপকুমার রায়—

আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে আমি অনেকদিন চিঠিপত্র লিখতে পারি নি। কিন্তু মনে হয় আপনাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলাম আপনার বইটিতে শ্রীঅরবিন্দের অধ্যায়টি আমার কত ভালো লেগেছিল এবং তা থেকে কত কিছু জানতে পেরেছিলাম। (I think I wrote to you about your book *Among the Great*, saying how much I liked the section on Sri Aurobindo and how helpful I found it.)

সামনের কয়েকমাস আমাকে নিরন্তর ভ্রমণ করতে হবে। আমি আমার প্রকাশকদের লিখছি আপনাকে আমার Perennial Philosophy বইটি পাঠাতে। এ বইটিতে আমি একটি সনাতন প্রসঙ্গের পুনরালোচনা করেছি একটু অভিনব ঢঙে। আশা করি আপনার ভালো লাগবে।

ফ্রান্সে যদি আমার গীদ্ কি ব্রামের সঙ্গে দেখা হয় (সামনের গ্রীষ্মে আমি সম্ভবত দু'চারদিন ফ্রান্সে কাটাব) তাহ'লে খোঁজ নেব নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে। যদি ওঁরা মনে করেন আমার কথায় কাজ হবে তাহ'লে আমি Life Divine-এর স্বপক্ষে বলব। আমি মনে করি এ-বইটি শুধু যে বিষয়বস্তুর গৌরবে গৌরবী তাই নয়, দার্শনিক ও ধর্মসাহিত্যে এটি একটি অতি চমৎকার বই। (If I see Gide

or Blum in France—I expect to be in that country for a short time this summer—I will find out what is being done about the Nobel Prize recommendation and add a word of my own, if they think that would be of any avail, in favour of *Life Divine*, which I regard as a book not merely of the highest importance as regards its content, but remarkably fine as a piece of philosophic and religious literature.) ইতি

আপনাদের অলডাস হাক্সলি

২০০ পৃষ্ঠার পরে। এ-পাতায় টম পাওয়ার্সের একটি চিঠি দিয়েছি। ওর আন্তরিকতা তথা স্নেহশীলতা আমাদের প্রথম থেকেই মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে ওর জীবন যে-দিকে মোড় নিল তাতে আমরা একটু চম্‌কে গিয়েছিলাম বৈ কি। আমরা ১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি ওর একটি চিঠি পাই, তাতে ও লেখে যে ও অবশেষে সংসারজীবন ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছে খৃষ্টান গির্জায়। ইন্দিরা শুনে সানন্দে ওকে লেখে: "ভগবানের চরণে যে-ই কেন না আত্মসমর্পণ করুক সে-ই আমাদের পরমাত্মীয়। কিন্তু তুমি 'খৃষ্টান গির্জা' বললে কেন? তুমি কি মনে করো আমরাও খৃষ্টদেবকে গভীর ভক্তি করতে পারি না? জানো, সানফ্রান্সিস্কোয় ডেভিড হাণ্টারের সঙ্গে একদিন একটি গির্জায় আমরা গিয়েছিলাম ১৯৫৩ সালে। সেখানে ধ্যানের সময়ে আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম খৃষ্টের ক্রস ধীরে ধীরে কৃষ্ণের বাঁশির রূপ নিল। তুমি তো তোমাদের তথা আমাদের ধর্মের খবর রাখো, তাই জানো যে আমরা কোনোদিনই একদেশদর্শী অসহিষ্ণুতার মন্ত্রে সাড়া দিই নি। আমরা জানি—কৃষ্ণ ও খৃষ্ট একই পরমপুরুষের দুটি মহারশ্মি—অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কি বার বার এই কথাই বলেন নি যে, ভগবানকে যে যে-রূপে ডাকে তাকে তিনি সেই রূপেই দর্শন দেন। দাদাও তোমাকে আজ এই কথাই লিখেছেন। তিনি আমাকে বলছিলেন একটু আগেই যে, আমরা দুজনেই তোমার অভীপ্সার কথা শুনে গর্ব অনুভব করছি। কেন না ভগবানের কাছে দান চাইতে পারে অনেকেই কিন্তু খুব কম মানুষই ভরসা ক'রে সব ছাড়তে পারে তাঁর জন্যে। 'দাও আমাকে' না ব'লে 'নাও আমাকে' বলবার সাহস এ-সংসারে ক'জনের আছে? তুমি ভাই, আমাদের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ও স্নেহ নিও। যাঁর জন্যে তুমি সংসারের মায়া মমতা কাটিয়ে অকূলে ঝাঁপ দিলে তিনি যেন তোমাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন—তুমি যেন নিজেকে তাঁর পায়ে অকুণ্ঠে বিলিয়ে দিতে পারো—তোমার

জন্যে আমাদের কৃষ্ণমন্দিরে শুধু এই প্রার্থনাই করব আমরা দুজনে। তাঁর আশীর্বাদ তোমাকে উত্তীর্ণ করুক পরম অমৃতলোকে। ইতি—

তোমার দিদি ইন্দিরা।

পুঃ। হ্যাঁ, একটা কথা: অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলেছ কেন? ভগবান্ কি বর দেন যোগ্য অযোগ্য বিচার ক'রে? তা যদি দিতেন তবে করুণা কথাটার কি কোনো মানে হ'ত? করুণা মানেই অহেতুক, আমাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দেওয়া। অন্যভাষায়, কৃপা মাইনে নয়, এমন কি পুরস্কারও নয়, কৃপা হ'ল—ঐ যে বললাম—বর, প্রসাদ।"

ইন্দিরাকে ও মাঝে মাঝে দরদভরা পত্র লিখত, অনুরোধ করত ওর জন্যে প্রার্থনা করতে, ওকে ভরসা দিয়ে চিঠি লিখতে। একটি চিঠিতে "শ্রুতাঞ্জলি"-তে মীরার গভীর বাণী প্রকাশ করার জন্যে ও উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছিল যে এ-বাণী থেকে ও যে শুধু আলো পেয়েছে তাই নয়, পেয়েছে বল, আশ্বাস, পথের পাথেয়। এছাড়া ও মাঝে মাঝেই লিখত ওর নানা আদর্শসংকটের কথা।

এম্নি সময়ে হঠাৎ ওর সব দ্বিধা সংকট গেল কেটে, ওর মন কেমন ক'রে উঠল তাঁর জন্যে যাঁর ডাক সম্বন্ধে যোগী-কবি এ-ই (জর্জ রাসেল) লিখেছিলেন একটি অপরূপ চতুষ্পদী:

I sometimes think—a mighty Lover
Takes every burning kiss we give :
His lights are those which round us hover,
For Him alone our lives we live.

কভু মনে হয়—যেন এক মহাপ্রেমিক সুন্দর
করে অঙ্গীকার প্রতি প্রণয়ীর 'চ্ছসিত চুম্বন,
তাঁরি আলোমালা রচে আমাদের ঘেরিয়া অন্তর,
তাঁরি তরে শুধু করি আমরা এ-জীবন যাপন।

সঙ্গে সঙ্গে ওর সব সংশয় ছিন্ন হ'য়ে গেল, ও ঝাঁপ দিল অকূলে, ইন্দিরাকে লিখল সব কথা জানিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে। ইন্দিরার অভিনন্দন ও স্নেহাশিস পেয়ে ও লিখল (১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৫):

প্রিয় দিদি,

তোমার গভীর স্নেহ ও দরদ এমন দান যার পুরো দাম দিতে আমি অক্ষম। মনে প্রশ্ন জাগে এর আমি যোগ্য কি না। তুমি যে লিখেছ ভগবানের করুণা

আমাদের অযোগ্যতার বাধা মানে না—সেজন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি যে আমাকে ভুলে যাও নি, তুমি যে আমার জন্যে প্রার্থনা করো—ভাবতেও আমি যেন নববল পাই। যখনই আমার মনে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে এই চিন্তা যে, তোমার ও দিলীপকুমারের মতন ঈশ্বরৈকান্ত দুটি মানুষ আমাকে স্নেহভরে বরণ করেছে বন্ধু ব'লে—তখনই আমার মনে জ্ব'লে ওঠে আনন্দের আলো। আমার নিজের আনন্দ আরো গভীর হ'য়ে ওঠে যেম্নি ভাবি আমার আনন্দে তোমার আনন্দ অনুভব করবার আশ্চর্য শক্তির কথা।

আমাকে সাহায্য কোরো যে-ভাবে ভগবান তোমাকে নির্দেশ দেন। ভগবদেকান্ত জীবনের ছন্দের সঙ্গে তো আমি পরিচিত নই দিদি। তুমি বহুদিন যাবৎ একান্তী, হয়ত এছাড়া অন্য কোনো ছন্দের জীবন তুমি ভুলেই গেছ। কিন্তু আমি যে অজ্ঞান দিদি, তাই না তোমার জ্ঞানের আলো আমার এত প্রয়োজন। তোমার কাছে আমি যে কী কৃতজ্ঞ তা কেমন ক'রে জানাব? তোমার কাছে পেয়েছি কত কী—তবু আশা রাখি আরো অনেক কিছু পাওয়ার।

তোমার ছোট ভাই
টম পাওয়ার্স।

এ-চিঠিটি উদ্ধৃত করলাম আরো এই জন্যে যে আমরা রিচার্ড মিলারের (২৮৪পৃঃ) নানা চিঠিতেই খবর পেতাম টমের। সে লিখত টম অনেক সময়েই ক্ষেপে উঠে কী যে উড়ো তর্ক করে! কিছুই যেন মানতে চায় না তখন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাত টমের আন্তরিকতার কথা, নানান্ অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। কখনো কখনো (লিখত রিচার্ড) টমের মধ্যে জেগে উঠত অদৃশ্য ও দুরবগাহ সব কিছুকেই অস্বীকার ক'রে সদর্পে ঘোষণা করার প্রবৃত্তি যে ভগবৎকৃপা প্রমাণাভাবাৎ অসিদ্ধ এতটা বলা না গেলেও মানুষ তার নিজের নিয়তি নিজেই গড়বে—Man is the architect of his own fortune—অলক্ষ্যের কাছে হাত পাতলে তিনি হাত উপুড় করেন না, ইত্যাদি। রিচার্ড এ-ধরনের কথা শুনে উঠত আগুন হ'য়ে, বলত: এ ধরনের জাঁক শূন্যবাদী সংশয়ী ও বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকের মুখে সাজতে পারে, কিন্তু ভগবৎপথের তীর্থযাত্রীর মুখে শোনায় ভগবৎ-বিদ্রোহের ম'ত। তখন টমের উগ্রভাবের তাপ ক'মে আসত—বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মসমর্পণ মন্ত্র মনে ক'রে। একথা ও মাঝে মাঝেই লিখত, ভারতের প্রজ্ঞার তর্পণে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ইন্দিরাকে জানাত কৃতজ্ঞতা আরো এই জন্যে যে, ভারতের গভীর বাণী ওকে প্রথম স্পর্শ করে ইন্দিরারি পুণ্য ব্যক্তিরূপের মাধ্যমে—(because of the

compelling influence of your holy personality)—এই জাতীয় কথা। আমাকেও ও লেখে একটি মর্মস্পর্শী পত্র—আমার অভিনন্দনের উত্তরে :

August 14, 1955 New York

My dear Dilip Kumar,

May God pour a special measure of His glory upon you for your graciousness and love for one who has at last somehow stumbled into the King's courtyard.

As I have written to Indira, your understanding of my good fortune and your capacity to share my joy are amazing. Next only to the happiness of having finally found the Grace to enable me to surrender, is my happiness in being accepted, weak and unfit as I am, into spiritual brotherhood. My thanks go out to you from a full heart.

With love and deep appreciation.... Tom.

আমাদের আমেরিকা রওনা হবার কিছুদিন আগে মীরা একবার আমাদের বলেছিলেন আমেরিকায় গিয়ে অর্থোপার্জনের কথা আদৌ না ভাবতে। আপনা থেকে কিছু আসে আসুক, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু একটি কথা : যে, আমরা বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছি শুধু আবাদ ক'রে আসতে গুরুর ও কৃষ্ণের নামের কয়েকটি বীজ—ব্যস্, আর কিছু না। অর্থাৎ শুধু আমাদের সাধ্যমত ভারতের আত্মার বাণীবীজ দু'হাতে ছড়িয়ে আসাই হবে আমাদের একমাত্র দায়, তার ফলে ফসল ফলবে কি না সে-পরিণামচিন্তা আমাদের পদে পদে বর্জন ক'রে চলতে হবে। উপনিষদের কথা মনে পড়ল বৈকি : কর্তা তো আমরা নই, কর্তা শুধু সেই অদ্বিতীয় বর্ণাতীত পুরুষ যিনি "বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" অর্থাৎ যিনি "শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত ক'রে, বহুর সঙ্গে যুক্ত ক'রে, অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন"।* কিন্তু "যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—এ-আপ্তবাক্যে আমাদের আস্থা থাকলেও এ-ধরনের দুরাশাকে মনে ঠাঁই দিতে আমরা উভয়েই বেশ একটু বেগ পেতাম বৈ কি যে, পাণ্ডববর্জিত বিজ্ঞানদৃপ্ত পাশ্চাত্যে গুরু কৃষ্ণ নামের কোনো ফলপ্রসূ বীজ ছড়িয়ে আসার শক্তি আমাদের আছে। কিন্তু বিশ্বভ্রমণের পরে ঘরের ছেলে ঘরে

* রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ..............শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

ফিরে পুনায় আসীন হ'য়ে আমাদের "হরিকৃষ্ণ মন্দির"-এর পত্তন করার পরে ধীরে ধীরে দেখতে পাই যে—আশ্চর্য ব্যাপার!—এসব বীজের কয়েকটি অন্তত অঙ্কুরিত হয়েছে। কী ভাবে—আরো কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত করলে হয়ত পরিষ্কার হবে।

২৩৪ পৃষ্ঠার পরে। শ্রীমতী নাতাশা রামবোভার কথা লিখেছি। ওর হৃদয়টি ছিল বড় সুন্দর। ১৯৫৫ সালে শ্রীমতী হেভবিগ হ্যামিলটন (৩২৫ পৃঃ) দুরবস্থায় পড়েন। তাঁর মেয়ে শ্রীমতী মাদলীন হ্যামিলটন আমাদের পণ্ডিচেরি আশ্রম থেকে পাগল হ'য়ে সুইডেনে পালিয়ে যান। হেভবিগ মেয়ের শুশ্রূষার জন্যে নিউয়র্ক থেকে ছোটেন সুইডেনে। এই সময়ে নাতাশা ও মড বন্ধুবান্ধবদের ধ'রে মাদলীনের জন্যে এক হাজার ডলার চাঁদা তুলে হেভবিগের হাতে দেয়। নাতাশা স্বোপার্জিত অর্থে নিউয়র্কের খরচ চালাত। বিদুষী, তেজস্বিনী, সহৃদয়া ও স্বাবলম্বিনী: একাধারে এতগুলি মহৎ গুণের সমাবেশ সংসারে দুর্লভ বৈ কি। কিন্তু এছাড়াও ওর মধ্যে ছিল আর একটি বিরল গুণ—বা গুণ না ব'লে সহজবোধ বলাই ভালো। বহুদিন ধ'রে ধ্যানধারণাদি করার ফলে ও এক আঁচড়েই মানুষ চিনতে পারত ওর সাধনলব্ধ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আমাদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটি দিনে দিনে কী ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল সে-পরিচয় মিলবে ওর একটি চিঠি থেকে যেটি আমরা পাই লণ্ডনে। ও ইন্দিরাকে লেখে নিউয়র্ক থেকে (৫ই জুলাই ১৯৫৩):

প্রিয় ইন্দিরা,

তুমি যখন গগনপোতে লণ্ডনের দিকে উড়ে চলেছিলে ঠিক সেই সময়ে আমি কী করছিলাম জানো?—আমার মনের মধ্যে চাইছিলাম তোমার সহায়তা, শক্তি-প্রসাদ। অমনি হঠাৎ মীরার আবির্ভাব! আমার মন শান্ত হ'য়ে যায়—জানতে পারি—সবই চলেছে যথাযথ। (I contacted Mira strongly and knew that everything was as it should be.)

তুমি প্রায়ই বলতে যে, তোমার শুধু একটি কামনা আছে: সেই সর্বাধার অদ্বিতীয়কে জানা, প্রেমের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। একথার অর্থ পরিগ্রহ করতে আমাকে একটুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বোন, সব প্রাপ্তিই তো একটা বিকাশ—স্পষ্টতর দর্শনের বিকাশ, গভীরতর জ্ঞানের বিকাশ, মহত্তর শুদ্ধির বিকাশ—যার ফলে পর্দার পর পর্দা স'রে যায় আমাদের দৃষ্টির সামনে থেকে!

শুধু এই উপায়েই আমরা বিধাতার পার্থিব বিধানের মর্মগ্রহণ করতে শিখি, তাঁকে দেখতে শিখি তাঁর স্বরূপে—আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে নয়। এর নাম তো পালানো (escapism) নয়, এইই তো চিরন্তন হ'য়ে-ওঠা (eternal Becoming), ভাগবত প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য, শক্তি, করুণা ও সরসতাকে উত্তরোত্তর মূর্ত ক'রে ধরা।

তোমার জন্যে আমার সত্যি মন কেমন করে। তুমি যখন নিউয়র্কে ছিলে তখন যখনই ভাবতাম তুমি কাছেই আছ—অমনি মন ভ'রে উঠত। এ-যাত্রা তোমাকে আরো একটু বেশি ক'রে কাছে পাওয়ার সুযোগ হ'ল না। না-ই হোক: আমাদের প্রত্যেককেই তো কিছু সাধনা করতে হবে। তবু মনে হয়—একদিন হয়ত ফের অবসর পাব সেই গভীরতর সংস্পর্শের জন্যে যা খাওয়ার টেবিলে ব'সে গল্পগুজব করতে করতে লাভ করা যায় না, বা নানা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চকিত মুহূর্তে লাভ করা যায় না (which cannot be achieved across a dinner table or in a rushed moment between other appointments.)

আর দু'চার মাসের মধ্যেই তুমি পৌঁছবে তোমাদের দেশের শান্ত আবহের মধ্যে—কিন্তু সেখান থেকে যখন তুমি ফিরে তাকাবে অতীতের পানে তখন তুমি দেখতে পাবেই পাবে যে তোমাদের ভ্রমণ ফলপ্রসূ হয়েছে (something has come of your trip)।

তোমাদের কথা আমি স্মরণ করব। যদি ভবিতব্য হয় তবে সম্ভবত সামনের জানুয়ারি মাসে তোমাদের সঙ্গে আমার ফের দেখা হবে ভারতবর্ষে। নৈলে হয়ত আর কোনো দিন।

ফের বলি: ভগবানের আশীর্বাদ যেন তোমাদের দুজনকে ঘিরে থাকে—তোমরা যেন তাঁর কাছ থেকে নিত্য পাও, আর যা পাও বিলিয়ে চলতে পারো (Again, may the blessings of the Divine One be upon you both—may you both continue to give forth and to receive.)

তোমাদের নিত্যশুভার্থিনী
নাতাশা।

নাতাশার সম্বন্ধে আর একটু ব'লেই ক্ষান্ত হব। বলেছি—বহুদিনের ধ্যান-ধারণার ফলে ও নেপথ্যতত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল। কিন্তু তবু প্রথমদিকে ও আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলিতে প্রকাশিত মীরার বাণীতে

পুরোপুরি বিশ্বাস করে নি। আমরা যে সত্যাশ্রয়ী এ-নৈশ্চিত্য ওর মনে প্রথম থেকেই জেগেছিল বটে, কিন্তু তবু ওর হয়ত মনের কোথায় যেন একটা সংশয় মতন ছিল—এতটা কি সত্যি হ'তে পারে? প্রথম ওর বিশ্বাস হ'ল যেদিন ওখানে একটি আমেরিকান মহিলার ওখানে আমরা ভজন করি। সে-আসরে ইন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে নাতাশাও মীরার আবির্ভাব চাক্ষুষ করে ও মুগ্ধ হয় তাঁর জ্যোতির্ময় ভক্তিবিহ্বল মূর্তি দেখে। এর কিছুদিন পরে আর একদিন ওর হয় ভারি একটি আশ্চর্য দর্শন যার ফলে ও আমাদের দিকে আরো ঝোঁকে। সেদিন আমাদের বন্ধু ইউজিন এক্সমান দুপুরবেলা আমাদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ খাইয়ে ইন্দিরাকে বলেন ওর সঙ্গে একটু ধ্যান করে কিছু প্রেরণা পেতে চান। ইন্দিরা রাজি হয় ও আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে বাইরের ঘরে তিনটি আসনে ব'সে আধ ঘণ্টা ধ্যান করি। ধ্যানান্তে এক্সমান ইন্দিরাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্থান করতে না করতে আমাদের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। টেলিফোনে নাতাশা বলে: "আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম এমন সময় পরিষ্কার শুনতে পাই এক অলোক বাঁশি। শুনেই আমি ধ্যানে বসি ও বসতে না বসতে স্পষ্ট দেখতে পাই তোমরা তিনজন তোমাদের হোটেলের বাইরের ঘরটিতে তিনটি আসনে বসে ধ্যানস্থ। আমার দর্শন সত্য না ভ্রান্ত জানতেই তোমাদের টেলিফোন করা। হ্যাঁ, আমি মীরার আবির্ভাব ফের চাক্ষুষ করি ধ্যানে বসার সঙ্গে সঙ্গে।" মন্তব্য অনাবশ্যক।

২৪৭ পৃষ্ঠার পরে। মিস আনা হারিসনের কথা লিখেছি। ও বিবাহিত জীবনে সুখী হয় নি, তাই ডাইভোর্সের পরে নিজের কুমারী নামই পুনর্গ্রহণ করে। ও আমাদের কাছে ওর নিজের জীবনের অনেক দুঃখের কথাই বলে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু এইটুকু বলি—দুঃখের ফলে ওর চরিত্রের উন্নতিই হয়, ধনিকন্যা ছিল বেপরোয়া বিলাসিনী, ঘা খেয়ে হ'ল অন্তর্মুখী। আমেরিকান ধনিকন্যাদের মতিগতি সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ সংবাদ আমরা পেতাম ওর কাছে। যোগজীবন সম্বন্ধে আমাদের দুজনকে ও কত প্রশ্নই যে করত! নিউয়র্কে পল রিশারের সঙ্গে ও দেখা করেছিল (পল রিশার আমাদের আশ্রম-জননী মিরা রিশারের দ্বিতীয় স্বামী)। ওর মুখে শুনতাম তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপের কথা। ১৯২৭ সালে ফ্রান্সে পল রিশারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল। পল রিশারের উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপ ও আশ্চর্য কথালাপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম যে কথা আমার "এ দেশে ও দেশে" বইটিতে বছর

পনরো আগে প্রবন্ধাকারে লিখেছিলাম। আমার একবার ইচ্ছা হয়েছিল এ-চিন্তাশীল ধ্যানী মানুষটির সঙ্গে ফের দেখা করার, কিন্তু নানা কারণে হ'য়ে ওঠে নি। যাক্। আনা ভাবুকদের সঙ্গ চাইত একথার উপর জোর দিতেই পল রিশারের প্রসঙ্গ তুললাম।

আনা আমাদের সত্যিই সহায়তা করেছিল শ্রীঅরবিন্দের নাম প্রচারে। তুদিন ওর সালঁ-তে আমাদের বক্তৃতা হয় যার ফলে অনেক চিন্তাশীল শ্রোতার মনেই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগে। আনা সত্যিই চাইত সাধুসঙ্গ। আমাদের কাছে ও এসেছিল কেবল সৎকথা শুনতেই নয়—বিশ্বাসের কিছু পাথেয় সংগ্রহ করতে। ফলে আমাদের মধ্যে একটি সুন্দর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছিল দিনে দিনে। কী ভাবে—ওর একটি ছোট পত্র থেকেই প্রতীয়মান হবে—যেটি ও লিখেছিল নভেম্বরে—আমরা পাই মাদ্রাজে। ও লেখে :

New York
November 9, 1953

Dear Indira Devi and Dada,

Someone that I hold very highly has just left this country after a brief visit. It was a feast after famine—the last feast being when you were here. To-night I am with all three of you, recapturing the blessing of your atmosphere. America is a desert for people like you. I hope we may produce some in this country one day.

I hope now that you are back in India, your health is better, Indira, and that you have both the rest you needed after your strenuous world-tour. You gave us much and I hope to be able to do it justice.

If there is anything I can do for you from this country, please do not hesitate to ask me. If you have a free moment, please let me know how you both are. I know your schedule must be overburdened, so I hesitated to ask you for something that will add to it, such as this letter. Until a free moment really comes, forget this request.

With love,
Anna Harrison.

জীবনের পথচলায় কত পথিকের সঙ্গেই পথে দেখা হয়। কালাতিপাতে তাদের মধ্যে ক'জনকেই বা মনে থাকে? কিন্তু আনাকে বোধহয় কোনোদিনই ভুলব না। ওর কথা মনে থাক্‌বে শুধু ওর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখশ্রীর জন্যেই নয়, ওর গভীর বেদনালব্ধ জিজ্ঞাসার জন্যে, ওর চরিত্রের সৌকুমার্যের জন্যে, ওর উদার আতিথেয়তার জন্যে—সবচেয়ে, ওর নিজেকে পিছনে রেখে আমাদের কাজের নানাভাবে সহায়তা করতে চাওয়ার জন্যে। প্রতিদান না চেয়ে শুধু দানের আগ্রহেই যাদের দাক্ষিণ্য বিকশিত হয়ে ওঠে তাদের সংখ্যা এ-জগতে খুব বেশি নয় বলেই তাদের দেখা-পাওয়া অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়ে একটা মস্ত লাভ বৈ কি।

৩১৭ পৃষ্ঠার পরে। পীটার চকের সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু লিখতে পারতাম যা নিছক ব্যক্তিগত আনন্দ পরিবেষণ নয়। কিন্তু স্থানাভাব—তাই ওর মাত্র আর একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করব। ও লিখেছিল লণ্ডন থেকে ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৪ তারিখে—আমরা তখন মান্দ্রাজে:

আমাদের অতিপ্রিয় দাদা ও দিদি!

তোমাদের ৮ই মার্চের চিঠি আমদের গভীর আনন্দ দিয়েছে। তোমাদের বিশ্বভ্রমণে আমাদের মন বরাবরই তোমাদের পিছু নিয়েছে, প্রেরণা পেয়েছে তোমাদের স্মৃতি থেকে।

আমি এখনো পথ চেয়ে আছি—কবে মীরা আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে উদ্বুদ্ধ করবেন পরমার্থের পথে। আহা, ইন্দিরা, যদি আমি তোমার পায়ের কাছে সপ্তাহে অন্তত একবার ক'রেও বসতে পারতাম! ডোরিসের কথা আলাদা। ওর চিত্তস্থৈর্য অভাবনীয়। ওর বিশ্বাস এত গভীর যে সাইক্লের টায়ারের মতন তাকে থেকে থেকে পাম্প না করলে সে চুপসে যায় না—যেমন আমার যায়। সে একাই এক শ—অক্লান্ত কর্মিষ্ঠা! কিন্তু আমার খুঁটি তুমি ও মীরা।

আমি সম্প্রতি রমণ মহর্ষি সম্বন্ধে ফরাসি ভাষায় লেখা একটি বই প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমার একটি নিবন্ধে এ-বইটি থেকে অনেক কিছুই উদ্ধৃত করেছি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'লে প'ড়ে জানিও—তোমাদের কেমন লাগল। এতে আমি লিখেছি—কেন আত্মাভিমান থেকে মুক্তি না পেলে কোনো সিদ্ধিই হবার নয়, এবং ঐ প্রসঙ্গে আরো নানা কথা।

প্রিয় দাদা দিদি! তোমাদের আমি আমাদের প্রণাম ও ভালোবাসা পাঠাচ্ছি। আমরা জানি—তোমরা সম্প্রতি কী দারুণ দুঃখ ও মনঃকষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছ—সত্যের জন্যে তোমাদের কতখানি ত্যাগ করতে হয়েছে—যদিও ঠিক এই ত্যাগের জন্যেই আবার অনেকে তোমাদের দূষছে। সংসারে এম্‌নিই হয়। সহজ পথের পথিক হ'য়েই যারা চলতে চায়, দুর্গম পথের তীর্থযাত্রীকে তারা যে শুধু তারিফ করতে পারে না তাই নয়—পদে পদে ভুল বোঝে। কিন্তু আমি জানি এ-জন্যে তোমরা কেউই মনে ক্ষোভ পুষে রাখবে না। ভগবান্ তোমাদের তাঁর করুণা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন—কয়েকজন নগণ্য দুর্মুখের নিন্দাবাদ তোমাদের কী করবে?

আমাদের কথা তোমাদের প্রার্থনা-মন্দিরে মাঝে মাঝে স্মরণ কোরো, আর পাঠিও তোমাদের স্নেহস্পর্শ, জানিও তোমাদের খবর। ইতি।

তোমাদের পীটার।

এ-পত্রের শেষে ডোরিস পুনশ্চ দিয়ে লিখল :

"I send you both my dear love and abiding gratitude for the inspiration we draw from the thought of what you have become and still more from what you are going to become." অল্প কথায় ডোরিস এম্‌নি সুরে কত কথাই যে ব'লে ফেলত!

* * *

৩৩৭ পৃষ্ঠার পরে। গ্যাটিংগেনে একটি ঘটনা ঘটে যার কথা লেখা হয় নি। পুনশ্চ তো এই জাতীয় ভুলসংশোধনের জন্যেই। সানফ্রান্সিস্কোয় আমার গানের ক্লাসে (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা) ডেভিড ডানলপ ব'লে একটি আমেরিকান ছাত্র ভারতীয় গান শিখত। তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ও সহজাত বিনয় আমাদের মন টেনেছিল। আমাদের গান শুনে সে উজিয়ে উঠত, প্রায়ই বলত ভারতীয় রাগরাগিণীর মধ্যে কী একটা জাদু আছে—শুনতে না শুনতে মন যায় উদাস হ'য়ে। আমাদের গানে ও সত্যিই গভীর ভাবে সাড়া দিয়েছিল। কাজেই গ্যাটিংগেনে আমাদের গানের আসরে হঠাৎ ফের ওর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ইন্দিরা ও আমি উভয়েই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলাম—আরো অচিন বিভুঁয়ে চেনা দরদীর পুনরাবির্ভাবে। ও গ্যাটিংগেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বুঝি রসায়নে গবেষণা (রিসার্চ) করতে এসেছিল। গ্যাটিংগেনের রঙ্গমঞ্চের নাচ শেষ ক'রে গ্রীনরুমে ফিরতেই ইন্দিরা দেখে কি, ওর নাচের ওড়নার উপরে দুটি সুন্দর হাত ঘড়ি, লেখা—তোমার দুই পুত্রের জন্যে। ব্যস্। নিখুঁত

দান বৈ কি। খৃষ্টের নির্দেশ মনে পড়ল: "When thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth"—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—বর মিলল অথচ বরদ রইল অধরা।

কিন্তু ও ধরা প'ড়ে গেল কেন সহজেই অনুমেয়। গ্যাটিংগেনে ও ছাড়া আর কেউই তো জানত না ইন্দিরার দুই পুত্রের কথা। পরদিন 'আ লা শার্লক হোম্‌স্' ওকে চেপে ধরতেই ও হেসে বলল: "তা বটে, আমার লেখা উচিত ছিল জর্মন ভাষায়—Geburtstag-geshenk für Sie (তোমাদের জন্যে জন্মদিনের উপহার)।" যাক্।

তারপর ওর সঙ্গে গ্যাটিংগেনে এখানে ওখানে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, হাসিগল্প, আলাপ-আলোচনা। দুদিন বাদেই ফের বিচ্ছেদ হবে ভাবতে সত্যিই কষ্ট হ'ল—প্রায় সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে উঠি আর কি। অথচ আশ্চর্য এই যে সানফ্রান্সিস্কোয় যখন ছিলাম তখন ওকে এত কাছে পাই নি তিন মাসেও। না, ভুল হ'ল। আশ্চর্য নয়—এইই স্বাভাবিক। কারণ আমেরিকায় ও হাজারো আমেরিকানের মধ্যে একটি হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, গ্যাটিংগেনে—হাজারো অপরিচিতের মধ্যে একটি চেনা মুখ—যেন প্রায় বিদেশীর মধ্যে স্বদেশীর দেখা পাওয়ার সগোত্র, নয় কি? নূতনত্বের মাদকতা আছে মানি, কিন্তু পরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের মধ্যেও রস ফুটে ওঠে বৈ কি যদি সে-পরিচিতকে কাছে পাই স্নেহের সহজ টানে। ওকে পেয়ে গ্যাটিংগেনে আমাদের দুজনেরি মনে হ'ত কেবল পীটারের সেই long lost brother-এর গল্প।

"এক যে ছিলেন দাদা," বলল পীটার, "যাঁর ছিল এক ভাই। হঠাৎ ভাইটি নিরুদ্দেশ। বহুদিন বাদে দাদার দেখা বিদেশে এক ভবঘুরের সঙ্গে। দাদা তাকে সাগ্রহে ডেকে আনলেন বাড়িতে। খাইয়ে দাইয়ে সাশ্রুনেত্রে প্রশ্ন: 'বলো তো ভাই, তোমার বাঁ কনুয়ে কি একটি তিল আছে?'

'না তো!'

'ডান উরুতে একটি কাটার দাগ?'

'না না।'

'তল পেটে একটি আঁচিল?'

'ধেৎ।'

'তবে আর কী? ফিরে পেয়েছি আমার হারানিধিকে—my long lost brother!' ব'লেই ওকে জড়িয়ে ধ'রে কী কান্না!

ডেভিড খুব হাসত এ-জাতীয় গল্প শুনে।

আমরা স্বদেশে ফেরার প্রায় বৎসরখানেক পরে—২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তারিখের একটি পত্রে—ও লেখে গ্যটিংগেন থেকে (আমরা তখন পুনায় আমাদের সদ্যোজাত হরিকৃষ্ণ মন্দিরে পূজারী):

প্রিয় দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবী,

প্রায় একবৎসর আগে তোমাদের সঙ্গে আমার ফের দেখা হয় গ্যটিংগেনে—হয়ত আমাকে তোমাদের মনে থাকতেও পারে?

তোমাদের সঙ্গে জর্মনিতে আমার পুনর্মিলন তোমাদের কাছে হয়ত একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, কিন্তু আমার কাছে থাকবে চিরদিনই অবিস্মরণীয়। কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, তোমাদের সংস্পর্শে আমি এমন কিছু পেয়েছিলাম যে শক্তি ধরে শুক্‌নো শাখায়ও ফুল ধরাবার। এ ছাড়া তোমাদের মধ্যে আমি পেয়েছিলাম আমার একটি উদগ্র আশা ও স্বপ্নের পুনরাশ্বাস—(confirmation of a frantic hope and dream)—তোমরা যেন এসেছিলে আমাকে মনে করিয়ে দিতে যে আমাকে কিছু সাধনা করতে হবে, বিনা সাধনা কোনো সিদ্ধিই করায়ত্ত হয় না, হ'তে পারে না।······দিলীপ! তোমার Sri Aurobindo Came to Me বইটি আমি ভারতবর্ষ থেকে আনিয়ে পড়েছি। ফলে আমার সাম্‌নে যেন অগুন্তি দ্বার খুলে গেছে এমন এক সম্ভাবনার—যার কোনো ধারণাই আমার ছিল না।

এ-বইটির শুধু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে কী হবে? তার চেয়ে বলি একটু—তোমার গুরুতর্পণ থেকে আমার কী ধরণের লাভ হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের নানা দার্শনিক রচনার ভাবগভীরতায় আমি মুগ্ধ হ'লেও তাঁর লেখা থেকে আমি কোনোদিনই অনুমান করতে পারি নি গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটির অন্তরঙ্গতা, মাধুর্য। আমার মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে নি গুরু কী বস্তু—শিষ্যের কাছে তিনি আসেন কী ভাবে—কী আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর শক্তি ও জ্ঞানকে নিয়োগ করেন শিষ্যের তল্পি বইতে, তার জীবনের নানা ভার লাঘব করতে। আমি ভাবতাম—বুঝি গুরু শিষ্যকে পথের নির্দেশটুকু

দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন, বুঝি শিষ্য বামন হওয়ার দরুন পায় না মহাকায় গুরুর নাগাল। তোমার বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এ-ধারণা বদলে গেছে—গুরুকে এখন আমি বেশ কল্পনা করতে পারি শিষ্যের শুধ্ দিশারি সারথি রূপেই নয়—তার অন্তরঙ্গ ও মহান্ বন্ধুরূপে।

কিন্তু এতদিন আমি তোমাদের এ-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করি নি নিছক সংকোচবশে, ভেবে পাই নি—কতটা প্রার্থনা ও আবেদন জানানো শোভন, সঙ্গত। যা আমাদের হাতের কাছে থাকলেও আমরা হাতড়ে পাই না তার জন্যে আমাদের কী অতৃপ্য তৃষ্ণা! তাছাড়া সুরু করব কোন্‌খান থেকে? একলা এ-পথে চললে লক্ষ্যে পৌছনো প্রায় অসম্ভবেরি কাছাকাছি, নয় কি? When one stands, deathly pale and quiveringly weak, before the ascending slope of something until now only vaguely imagined, then the cry to those who might help is frenzied, too demanding and rather unattractive······and so on and so on, oh, how endless are our qualms, misgivings, questionings!

ইতি। তোমাদের ডেভিড ডানলপ

এ-দীর্ঘ পত্রে ও আরো বহু কথাই লেখে, সে সব উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শুধু আর একটি কথা ব'লেই এ-প্রসঙ্গের ইতি করব। এর পরে ওকে আমরা পাঠাই ইন্দিরার শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি। এ-বই দুটি প'ড়ে ১২ই মার্চ্চ ১৯৫৫ তারিখের পত্রে ও লেখে:

"শ্রুতাঞ্জলি ও প্রেমাঞ্জলি আমার মনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকবে। না, মন না ব'লে হৃদয় বলাই হয় ত ভালো, কারণ এ-বই দুটির বাণীর মাধ্যমে আমি যেন তোমাদের উভয়ের সঙ্গেই আরো গভীর আন্তর সান্নিধ্য অনুভব করেছি। বই দুটির শেষে ইন্দিরার গানগুলির তুমি যে-কাব্যানুবাদ করেছ সেগুলি অপরূপ ও মহান্ (exquisite and magnificent) এবং শেষে তোমাদের উভয়ের ডায়ারি থেকে মীরার গভীর বাণীর যে-উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছ তার ফলে আমার আঁধার মনেও জ্ব'লে উঠেছে আলো।

তোমাদের কত কথাই না জানাতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু চিঠিতে কতটুকু আকুলি-বিকুলিই বা জ্ঞাপন করা যায় বলো? তাই আজ কেবল এইটুকু ব'লেই থামি যে, ফের তোমাদের দেখা পেতে ইচ্ছা করে, তোমাদের আদর্শের সহযোগী হ'তে সাধ যায়। যদি আরো একটু বলতে সাহসী হই—যদি বলি আমার বড় ইচ্ছা হয়

তোমরা আমার সম্বন্ধে মীরাকে দুচারটি প্রশ্ন ক'রে আমাকে জানাও তাহ'লে সে কি বড় বেশি আশা ?

ইতি। তোমাদের ডেভিড ডানলপ

কে বলতে পারে—এই সব বিদেশী বিদেশিনীর সঙ্গে ফের দেখা হবে কি না, আমাদের সংস্পর্শে যে-অভীপ্সার অঙ্কুরগুলি তাদের মধ্যে আজ মাথা তুলেছে তারা ফুল ফোটাবে কি না, ফল ফলাবে কি না? ভগবানের চরণে শুধু এইটুকুই প্রার্থনা—যেন এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ হয় শুভবুদ্ধির, যেন আমাদের আদানপ্রদান হয় শুধু অন্তরাত্মার, যেন আমাদের নিস্বার্থ প্রীতি আমাদের প্রত্যেককে আলোর পথে ঠেলে দেশকালের বেড়াজাল পেরিয়ে উত্তীর্ণ করে সর্বকালের সর্বদেশের অন্তরপুরুষের অমৃতলোকে যাঁর সম্বন্ধে ঋষি ঘোষণা করেছেন মৃত্যুহীন সুরে : "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"

শেষে মাত্র আর দুটি প্রিয়বন্ধুর পত্র উদ্ধৃত ক'রেই ইতি করব মন্তব্য বাদ দিয়ে—যেহেতু এ-পত্রগুচ্ছের মর্মস্পর্শী অভীপ্সাই এনে দেবে আনন্দময়ের পরম বাণী।

* * *

২৯৬ পৃষ্ঠার পরে। লিখেছি নিউয়র্কে শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই ডেভিড হাণ্টার ছুটে আসে সুদূর কালিফর্ণিয়া থেকে। নিউয়র্কে ওর স্নেহময় সাহচর্যে ক'দিন আমাদের কাটে যে কী গভীর আনন্দে তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা পেয়েছি ২৯৩-২৯৬ পৃষ্ঠায়। ডেভিডের চোখ ছল ছল ক'রে উঠল ফের নিউয়র্কের বিমানঘাঁটিতে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে। এর পরে ও আমাদের প্রায় প্রতি দু মাস অন্তর একখানি ক'রে চিঠি লিখে এসেছে। চিঠি ও বড় সহজে লেখে না, কিন্তু যখন লেখে কী সুন্দর ভঙ্গিতেই অল্প কথায় ফুটিয়ে তোলে ওর গভীর হৃদয়ের ছবি, আন্তরিক স্নেহের বাণী! ওর শুধু দুটি চিঠি উদ্ধৃত করব এখানে। ও ১৬ই মার্চ, ১৯৫৪ তারিখের একটি পত্রে ইন্দিরাকে লেখে—আমরা তখন মাদ্রাজে :

প্রিয় দিদি,

সে কি বলো ? আমি তোমাকে যে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলাম গত নভেম্বরে! সেটি কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল তাহ'লে ?…

তোমার অপরূপ কবিতাগুচ্ছ রিচার্ড মিলার আমাকে পাঠিয়েছে। সে আমাকে আরো লিখেছে—তুমি না কি আমাকে ও রিচার্ডকে দেখেছ তোমার এক ধ্যান-দর্শনে, দেখেছ আমরা দুজনে তোমাদের আশ্রমে তোমাদের নামকীর্তনচক্রে গান গাইছি। যেন এ-দর্শন ফলে—এছাড়া, আর কী বলব?

এমন দিন যায় না দিদি, যেদিন তোমাদের কথা মনে ক'রে আমার মন ভ'রে না ওঠে—যেদিন মনে না হয়—ফের কবে দেখা হবে আমাদের? তোমাদের ছবি আমার পূজাবেদীতে রেখেছি—যেখানে একটি প্রদীপ সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখি।…আর একটা কথা বলব? ব'লেই ফেলি। আমার সময়ে সময়ে সত্যি ভারি আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে যারা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে তাদের মনে এ-ব্যবধানের দরুণ বিশেষ কোনো ব্যথা কি বেদনা নেই। কিন্তু যে-তুমি দিদি, আমাদের চেয়ে কত এগিয়ে, এবং বাস করো তাঁর খাসমহলে—সে-তুমি কি না কান্নাকাটি করো তাঁর বিরহে! কিন্তু তারপরেই আবার মনে হয়—না এই রকমই তো হবার কথা: যাদের তিনি কাছে টানেন শুধু তারাই মর্মে মর্মে বোঝে কেন তাঁকে না পেলেই নয়—যে তাঁর যতই কাছে পৌছেছে সে বুঝি ততই তৃষিত হ'য়ে ওঠে আরো গভীর সান্নিধ্যের জন্যে। দিলীপ আমাকে একবার বলেছিল তোমাদের কে এক বৈষ্ণব কবির কথা: যে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরম মিলনের মুহূর্তে পরম বাধা হ'য়েছিল শ্রীরাধার কণ্ঠের একখানি সূক্ষ্ম হার!

কৃতকৃত্য হও তুমি দিদি! শিবের পূর্ণ ক্ষেমশক্তি যেন তোমার আশ্চর্য তীর্থ-যাত্রায় তোমাকে এগিয়ে দেয় আরো—আরো। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিতে ভুলো না। আবার বলি—তোমার কবিতাগুলি কী অপরূপ!

ইতি। তোমার ভাই ডেভিড হা'ন্টার।

আমি ওকে মান্দ্রাজ থেকে মহাযোগী শ্রীজয়কৃষ্ণ গিরির সঙ্গে আমার কথাবার্তার রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম—যাঁর কথা পরে (১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি) আমার *Kumbha—India's Ageless Festival* বইটিতে প্রকাশিত হয়। আমি ওকে লিখেছিলাম প্রয়াগে গঙ্গাতীরে এ-মহাযোগীর ও অন্য নানা সাধুর পুণ্যসঙ্গে আমাদের দিনগুলি কী আনন্দেই কাটত! উত্তরে ও আমাকে লেখে:

প্রিয় দিলীপ,

তোমার চিঠি পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হয়েছে: আহা, আমি যদি থাকতাম তোমাদের সঙ্গে—যদি পেতাম গঙ্গাতীরে ভগবদ্রাশ্রিত মহাসাধুদের পুণ্যসঙ্গ!

আমাকে মহাযোগী শ্রীজয়কৃষ্ণ গিরির সম্বন্ধে আরো লিখো—যদি আরো কোনো আলাপ আলোচনা হ'য়ে থাকে তাঁর সঙ্গে।

আগামী সপ্তাহে আমি আর একটি নাটক মঞ্চস্থ করব—পরম আত্মিক সত্যের অভিসারী মানবাত্মা সংসারের কাছ থেকে কত আঘাত সয় এই হ'ল তার বিষয়বস্তু। তুমি যদি আজ এখানে থাকতে তবে বোধহয় তৃপ্তি পেতে এ-নাটকটি দেখে। তুমি ফের কবে আসবে আমাদের দেশে? আমার মনে আছে একবার তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে আমেরিকায় ধর্ম নিয়ে নাটক কোথাও অভিনীত হয় কি না।

বলতে ভুলেছি, ভজন সম্বন্ধে তুমি সেদিন কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের এক আসরে যে-ভাষণটি দিয়েছিলে রিচার্ড মিলার তার একটি টাইপ করা রিপোর্ট আমাকে পাঠিয়েছে। পড়তে পড়তে সত্যি, ফের আমার মন কেমন ক'রে উঠল—I felt homesick to hear you again and see Indira dance! থেকে থেকে প্রায়ই আমার চারদিকে যেন ঘনিয়ে উঠতে থাকে তোমাদের দেশের যুগযুগান্তের অভীপ্সা ও ভাবের আবহ। আমার মনে হয়—তোমাদের দেশের ভক্তির আবহাওয়ায় আত্মার অভীপ্সা যেন ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। কিন্তু উপায় কি? এ-দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার সময় আমার আসে নি। তবে সে এজন্যে নয় যে, আমি মনে করি এইই আমার স্বদেশ। না, কোনো দেশকেই আমি বরণ করতে পারি না আমার স্বদেশ ব'লে, মনে হয়—আমার স্বদেশ আর কোথাও, কিন্তু কোথায়—কে বলবে? (Yet the hour has not struck for me to leave *this* country. I cannot say *my* country. For no country inspires in me that feeling. Somewhere else is my home. Where—I do not know.)

ভগবানের শান্তি ও আশীর্বাদ যেন তোমাদের উভয়কে ঘিরে থাকে—পৌঁছে দেয় তোমাদের পরম স্বদেশে। আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো ভাই—যেন আমি ভগবানকে ভালোবাসতে পারি সবচেয়ে ও সব ছেড়ে।

ইতি। তোমাদের ডেভিড হাণ্টার

এবার সমাপ্তি টানি রিচার্ড মিলারের দুটি মাত্র চিঠি উদ্ধৃত ক'রে। এ-দু'বৎসরে ও আমাদের নিয়মিত চিঠি লিখে এসেছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে বললেই হয়। সুন্দর সরল ভাষায় ও নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের কত খবরই যে দেয়, প্রাণের অভীপ্সার কত ছবিই যে আঁকে, মনের কত গভীর বিশ্লেষণ! বুদ্ধি ও প্রতিভা ওর সহজাত। ওখানে intelligence test-এ একবার ও প্রথম হয়। কিন্তু ওর অতিসজাগ মন

একসঙ্গে সাড়া দেয় নানা দিকে। তাই ও কষ্ট পায়ও কম নয়। কিন্তু সে যাক। ওর যে-দুটি চিঠি উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি তার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠুক ওর আশ্চর্য কবিত্ব, উচ্ছল আদর্শবাদ, সর্বত্যাগের স্বপ্ন—সর্বোপরি, ওর কৃষ্ণদাস হবার আকুতি। ও তৃষিত হ'য়ে আছে—কবে আমাদের পুণ্যভূমিতে আমাদের সদ্যোজাত আশ্রমে এসে আমাদের বৈষ্ণব সাধনায় যোগ দেবে। ওর বহুদিনের কামনা ছিল মীরা যেন ওকে তাঁর প্রত্যক্ষ স্পর্শ দেন। এই দুই বৎসরের নিরন্তর প্রার্থনার ফলে ও সেদিন হঠাৎ পেয়েছে সে-বর—লিখছে ওর ২৮শে আগষ্ট ১৯৫৫ তারিখের পত্রে :

My dearest Dada,

After I had got into bed, or perhaps before, I had a feeling that Mirabai would dictate something. A few lines came in bed. I just intercepted them to "set them down" :

I speak to thee with Krishna's voice of Grace.
Think not His Grace to wound with barbs of hate
Nor trample in the mire His blessed Name.
Thy deadly insults cannot deflect the aim
Of thy soul's destined path of Love and Light.
No power of Night can wrench thee from His clasp,
Stronger than the strongest links of Fate.
Surrender now to His one will of bliss
And be hence evermore redeemed from tears
And sighs of despond's stark decrees, made null
By His all-purifying bonds of love.

I don't know how clearly or truly this was given to me. I did have a sense of being told something and feeling your joy, but I hope I am not wishful thinking. I don't believe so. Something within me told me at about midnight that Mirabai would give me a message. She did by poetry. Ask her, please.* For I am sure she came near, because my body tensions were soothed and I felt a psychic blessing.

Here is a poem I wrote to Didi all by myself.

---

* মীরা আমাকে বলেন—আমার প্রশ্নের উত্তরে—যে রিচার্ড সত্যিই পেয়েছিল তাঁর স্পর্শ, ওর মনের ভুল নয়।

## TO INDIRA

O golden dance of mystic raptured Love
That sings of Life Divine at Krishna's feet
In gleaming canticles of rhythmic joy
No earth perversions mar or darkness hinders,
But holding in a poise of Lotus Grace,
The virgin flame of star-born purity
The darkness slays and wins the Haven of dream.
The hallowed echoes of His mystic footfall
That showered ambrosia once on Brindaban's
Enchanted dust—return to weave their spell :
Those miracle rhythms fashioned to Truth Eternal.
Indira, dancing in Light upon the meadows,
Has quickened the memory of Light in Earth's
Dim heart and overflowed in sleepless Love.
She spreads its message to the wonderous moon
And speaks to stars of their heritage of bliss.
Only the voice of Krishna inspires her steps
And commends her graceful form to motion's beauty,
Flowering in the Light of Krishna's Love.

## TO DADA

O unborn Beauty, take birth in my heart,
A shrine of Light beneath the storms of life,
A resonant hymn to sky beneath the tempest,
A song of harmony's pledge to suffering souls,
O haunting Cadence ! feed my soul with nectar,
Born of thy blest repose, thy Flute of Grace.
O Sleep ! dissolve my discord in thy peace !
O rich starland of mystic songs of Love !
O Brindaban of thrill and beauty ! beckon
With thy archangelic signs to thy tender grove
Where Radha leans her golden head of love
On thy blue breast of everliving rapture

Whence first the flawless radiance descended
Making the hills and meadows reel with joy.

May my defeats change by Krishna's Grace to the last triumph of self-sacrifice !

Richard

New York, September 3, 1955

Dear Dada,

Last night Mira gave me a few more lines which I may well call Light of giving. Here they are. (I am now sure that she came, as I felt her contact too vividly.)

I visit thee with a message from His light
Made manifest through thy Guru, thy one Lord.
The spirit wins to victory not through might
Of mind or life but only through the soul's
Deep urge to squander all its cherished treasures,
Burning in humble love that bargains not.
How can that be named Love which fears to lose
The shadows for the flame, sparks for the Light's
Own source enshrined in the mystic dream of the heart ?
Give, give : I bless thee with my Lord's command.
Pray, pray to become the playmate in this world
Of the only Singer in the void of space,
A loyal ray of the only Sungold Truth.
Surrender to thy God and Lord, my child,
And be for ever thy Guru's perfect son.

Please give Mira my soul's deepest thanks. My love I offer at your feet alone and beg the privilege of becoming a pauper, staking all I have and am. May I sit like a Yogi of song from the crack of dawn till the stroke of midnight burrowing with my mystic hearing ever deeper into some psychic core of sound whence streams of divine music would outwell and my environment change into a fairy Brindaban. I will also set some of your lovely, soulful poems to music ; for

Now tingles in my limbs my Guru's Grace,
Aflame with Krishna's song of Love sublime.
I have won the starry haven at His dear feet.
Divine and lovely is my joy and fresh
As the morning song upon the virgin hills,
White with inviolate flowers, around which play
Lone irised fountains mirroring the sunbeams.
Upon me gaze from the crystal depths of space
The eyes of angel Time in cosmic trance.

P.S. My dearest Didimoni and Mother and Holy Sister! I beg your blessing that I may become a perfect son to Dada and stay havened at his feet for ever—like you.

Your child, Richard

এমন ওজস্বী সুন্দর কবিতার অনুবাদ সুসাধ্য নয়। তবু বাংলার কাব্যানুরাগী তথা দরদী সন্ধানীদের জন্যে মীরাবাঈ রিচার্ডকে যে-দুটি বাণী বহন ক'রে এনে দিয়েছিলেন সে-দুটি কবিতার অনুবাদ নিচে দিলাম—বিশেষ ক'রে সেই সব পাঠকের জন্যে যাঁরা ইংরাজি মিস্টিক কবিতার রস গ্রহণ করতে বাধা পান। মীরাবাঈ ওকে বলেছিলেন ( ২৭শে আগষ্ট ) :

এসেছি কৃষ্ণের দিব্যকরুণাকণ্ঠের বাণী বহি' :
হিংসার সায়কে কভু সে-কৃপারে কোরো না আঘাত,
ম্লান পঙ্ক বুকে তাঁর ধন্য নাম দলিও না পায়ে।
দারুণ বিদ্রোহ তব তোমার আত্মার সুচিহ্নিত
প্রেম ও আলোর লক্ষ্যস্বর্গ হ'তে পারিবে না তারে
ফিরাতে কখনো : গাঢ় তমিস্রার চমূ পারিবে না
তোমারে ছিনায়ে নিতে ভাগবত আলিঙ্গন হ'তে,
নিয়তির দৃঢ়তম শৃঙ্খলেরো চেয়ে যে প্রবল।
সে-আনন্দময় ইচ্ছামাঝে দাও সঁপি' আপনারে,
তাহ'লে লভিবে মুক্তি চিরতরে অশ্রু হ'তে তব,
ব্যর্থ হবে হতাশার দীর্ঘশ্বাস করুণ বিধান
সর্বশুদ্ধি-বিধাতার পরম প্রেমের মন্ত্রবলে।

২রা সেপ্টেম্বর মীরা রিচার্ডকে বলেছিলেন :

এসেছি তোমার কাছে ঐশী জ্যোতির্বাণীবাহ রূপে,
যে-বাণীরে দিল মূর্তি তোমার অন্তরনাথ গুরু।
লভে না বিজয় আত্মা মনের কি প্রাণের প্রতাপে :
জয়ী হয় সে কেবল—যবে দেয় বিলায়ে সে তার
প্রিয়তম রত্নমণি—দেয় যবে নিজেরে আহুতি
প্রেমযজ্ঞানলে নিত্য সর্তহীন প্রশ্নহীন সুরে।
নয় নয় সে তো প্রেম—বাসে ভয় যে হারাতে তার
ক্লিন্ন ছায়া চিরশিখা করিতে বরণ, কুণ্ঠিত যে
বিসর্জিতে তার ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গেরে সে-আলোক তরে
নিহিত যাহার উৎস অন্তর্গূঢ় স্বপ্নের মন্দিরে।
দাও তব যাহা আছে—দাও তুমি বিলায়ে দুহাতে
যা কিছু আপন তব—আমার নাথের এ-আদেশ
এনেছি বহিয়া আমি আমার আশিষ সাথে আজ।
করো শুধু এ-প্রার্থনা—যেন পারো হ'তে লীলাসাথী
সে-মহালীলাময়ের—গায় যে নিঃসঙ্গ শূন্যমাঝে।
হ'তে পারো যেন তুমি অদ্বিতীয় সে স্বর্ণরবির
একান্ত আপন রশ্মি। করো বৎস, আত্মসমর্পণ
ইষ্টের চরণে তব—হ'য়ে আজ গুরুর তোমার
অনিন্দ্য দুলাল চিরতরে।

ইন্দিরার সঙ্গে যতই তর্ক করি না কেন, গভীর উপলব্ধির কথা মহাপূজারিণীর মহা আশীর্বাদ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা একটু হয়ই। কিন্তু মনে হয় যে, সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশ করার প্রত্যবায় থাকতে পারে না। অবশ্য এ হ'তে পারে যে সত্য ব'লে যাকে বরণ করেছি অজ্ঞানে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'লে দেখা যায় সে সত্য নয়, ব অর্ধসত্য। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও পরম করুণাময় অপ্রসন্ন হ'তে পারেন না যদি ছায়াকে আলো ব'লে বরণ ক'রে থাকি না জেনে—ভ্রান্তিবশে। তাছাড়া অসহায় ভ্রান্তিরো কোথাও না কোথাও ক্ষতিপূরণ আছেই আছে নৈলে ভুল জগতের এতখানি জায়গা জুড়ে রাজত্ব করতে পারত না।

ফাউস্টে গেটের মহাপ্রত্যয়ের দীপ্তবাণী কি ভুলবার ?—

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewuszt.

অর্থাৎ

সত্যাশ্রয়ী যবে ধায় অন্ধকার-অঙ্কুশে—তখনো
পরম সত্যের দিশা জ্বলে তার আন্তর চেতনে।

কিন্তু সব কথা বলা শেষ হ'য়ে গেলেও একটা কথা না-বলা থেকে যায় অথচ যা বলা দরকার। সেটা এই যে সত্যকে যে মনে প্রাণে চায় সে পায়ই পায়। তাই আমরা পেয়েছি মহৎ কৃপা—গুরুর আশীর্বাদ, মীরার নির্দেশ, কৃষ্ণের করুণা। এর পরে কে কী বলবে না বলবে, বিশ্বাস করবে না করবে গৌণ হ'য়ে ওঠে না কি ?